না ভাল করে আস্বাদ করে দেখলে সমাজে শিল্পকলার আবির্ভাব হয় না', তাঁদের একথা স্বীকার করা চলে না। সংসার-লেশহীন অধ্যাত্ম-ঘন-মূর্তি শ্রীবুদ্ধকে বিকশিত করবার জন্তই কলা ও সেবার মধ্য দিয়েই এক বিরাট রূপকার (Artist) ও বিজ্ঞানী সংঘের সৃষ্টি হয়েছিল। লাউজি এবং কনফুসের নীতি ও দর্শনকে অবলম্বন করেই চৈনিক কৃষ্টির আবির্ভাব, খৃষ্টকে অবলম্বন করে ইউরোপী সভ্যতা, মহম্মদকে অবলম্বন করেই ইসলামী অনুশীলন মোরক্ক হতে উত্তর ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আগেই বলে রেখেছি কোন যুগের কোন সত্যকেই উপেক্ষা করা বা বর্ব্বরতা অথবা অন্ধ-বিশ্বাস বলা চলে না। প্রত্যেক যুগের দেশকালোপযোগী সত্য অল্প হলেও অসত্য নয়। সুদূর কাল হতে জীবনের অল্প সত্যকে অবলম্বন করে অধিকতর সত্যের বিকাশ দিচ্ছি আমরা সমাজ, রূপায়ণ ও পণ্য শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে। আরও দেখি এবং ইতিহাস সাক্ষ্যও দেয়, যে জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং সংযম যে কোনও উপায় অবলম্বনে অধিকতর প্রকট সেই জাতিই নিকৃষ্ট আত্মসংযমী জাতির ওপর প্রভাব বিস্তার কোরে এক বিরাট সভ্যতার গঠনে সমর্থ হয়েছে; পরন্ত যখনই তা ভোগ-কলুষিত হয়ে ওঠে, তখনই তাদের সংখ্যাত্মা সংকুচিত হয়ে সেই জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। বহু জাতির এই ভাবে ধ্বংস উপলব্ধি করেই সতর্ক-ভারত চিরকাল মুক্তি চিন্তা নিয়েই কাটিয়েছে এবং এখনও কাটাচ্ছে। নিত্যের উপাসক বলেই তাদের জাতীয় প্রবাহ এখনও নিত্য; পরন্ত অনিত্যের উপাসকদের সমাধিস্তম্ভ তাদের স্বদেশে এবং বিদেশে এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

এই মুক্তির সন্ধান হতেই তারা যে সাহিত্য ও দর্শন সৃষ্টি করেছে তা জগতের প্রত্যেক শান্তিকামীর একমাত্র অবলম্বন এবং মুক্তিকামী বলে যে তারা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, ঔষধ, স্থপতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রূপায়ণ ও পণ্য শিল্প প্রভৃতি শাস্ত্রে অপারদর্শী ছিল, একথা যে বলে সে অন্ধ।

যাই হোক, ইন্দ্রিয়-তান্ত্রিকদের "বহু-শিল্প পশুর সিংহ গর্জনে" এখনও তারা ভীত নয় "ধার্ম্মিক ঋষিদের তত্ত্বই" এখন ভারত-ভারতী সমগ্র জগতের সমক্ষে 'challenge-রূপে দায়ের করেছে এবং সমগ্র বিজ্ঞানের চিন্তারাশি এখন সেই দিকেই ধীরে ধীরে চলে পড়ছে। স্তূপীকৃত অর্থ এবং কামের অসংযমই জগতে যত অনর্থের মূল। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মার্জ্জিত ও অন্তর্মুখ করলে যে অশেষ সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের এক অপূর্ব্ব রাজ্যশ্রীর সম্মুখস্থ হওয়া যায় তা কামভোগতৃপ্ত, অর্থগৃধ্নুর পক্ষে অচিন্তনীয় ব্যাপারই বটে। কাম-কাঞ্চনের complex মনুষ্য মস্তিষ্কে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বলেই, আজ যত সামাজিক জটিলতা ও নানাবিধ ism-এর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আজ যদি ত্যাগ ও সেবার বাণী প্রত্যেক জাতীয় পতাকায় লেখা থাকে তা হলে জগৎ পরিচালন ব্যাপার অনেক সরল হয়ে আসে এবং অনেক উৎপাত ও অশান্তির ঝঞ্ঝাট হতে মানুষ বেঁচে যায়। ভারত বহুযুগের পরীক্ষার ফলে এমন একটা সাহিত্য ও দর্শন সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক জটিলতার সমাধান। চিকাগোর পাশ্চাত্ত্য ইন্দ্রিয়-তান্ত্রিক, হেডন (A. Eustace Haydon) আমাদের দেশের প্রতীচ্যভাবী মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিকৃত মস্তিষ্ক দেখে সহাস্যে বলছেন, "The intellectuals, who have been satisfied to rest in the all-enveloping security of an eternal Absolute, grow restless in the presence of a doctrine which insists upon universal change and relativity." তাঁরা একটু হিন্দু দর্শনে প্রবেশ লাভ করলেই বুঝতে পারবেন যে বার্গসোঁর "সার্ব্বজনীন পরিবর্ত্তন" এবং আইনষ্টাইনের

"আপেক্ষিকতা" ভারতবর্ষের ছুটো পুরাণ কথা মাত্র। বৌদ্ধ মাধ্যমিক এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীদেরই ঐ কথা ছুটো মাত্র উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সংস্করণ। সে যুগেও যেমন "অচল অব্যয়" বিচলিত হন নি, পরন্তু ঐ সকল মতবাদের ভেতর দিয়ে মহিমান্বিতই হয়েছিলেন, এ যুগেও ধীরে ধীরে নব্য-বেদান্তীদের যুক্তি-বায়ু অবিশ্বাসের সকল মেঘ অপসারিত করে, সেই আলোর সহস্রদলকে অচল-মহিমায় আবির্ভূত করচে।

হিন্দুর ধর্ম্ম দুঃখাদর্শ নয়—"অনিত্য দুঃখান্বিত" জগৎ পরিহারের দ্বারা বেদান্ত অনন্ত সুখাদর্শ বিশ্বের নিকট বিচার্য্যরূপে রজু করেচে। জগতে অনেক সুখাদর্শের অভ্যুদয় ঘটেচে বটে, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই দেখা যায়, তা এ জগৎ সুখ পরিত্যাগের দ্বারা মেঘের পরপারে কোন এক অদৃশ্য লোকের অজ্ঞেয় অস্পষ্ট বিবৃতি। বৈজ্ঞানিকও বলেন, 'কোনও সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত মানব জড়া প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং সকল হৃদ্ রোগের অবসান করবে।' কিন্তু বেদান্তী বলেন, 'জগৎ তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে না, —কোনও সুদূর ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না—অনন্ত, চিৎসদানন্দ তোমার আত্মাতেই বর্ত্তমান। প্রতীয়মান জগতের সুখে মুগ্ধ না হয়ে, যথার্থ জগৎ ও আত্মসত্তা অবগত হও, তা হলে এই যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, বিরহ, ব্যাধি, —যার জ্বালা প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক উভয়েই ভোগ করচেন,—আর ভোগ করতে হবে না, সর্ব্বাবস্থায় ভূমানন্দের অধিকারী হয়ে থাকতে পারবেন। এর চাইতে চরম সুখাশাবাদ মানুষ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি।

হিন্দু ধর্ম্ম একদেশী নয়। "যে সন্দেশের আস্বাদ পেয়েচে, তার কাছে যেমন চিটে গুড় কিছু নয়"— সংসারের প্রত্যেক ঘটনায় যখন দেখা যাচ্ছে যে "একটা কুকুর ও দার্শনিক একই প্রকার লালসা নিয়ে একই প্রকার দ্রব্য খেতে পারে না"—বৃহৎ আনন্দের প্রত্যক্ষানুভূতি যখন মানব-জ্ঞানের অভিজ্ঞতার একটা সত্য ঘটনা, তখন চর্ম্ম ও জিহ্বা-তৃপ্ত্যাদর্শ টাকেই সর্ব্বব্যষ্টি-জীবনের ভিত্তি বলে আমরা কি করে গ্রহণ করতে পারি অথবা ধর্ম্মে চরম-বৈরাগ্যকেই বা কিরূপে অস্বীকার করা চলে।

তবে একথাও আমরা অস্বীকার করি না যে কাপুরুষ জড়-স্বভাবের দুঃখ সহটা দাস-মস্তিষ্কের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, পক্ষান্তরে মহত্ত্বজ্ঞে তিতিক্ষাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির একমাত্র পন্থা। সেই জন্য শাস্ত্র বৈরাগ্যের অধিকারী নির্দ্দেশও করে গ্যাছেন। মনু (২।২২৪) বলচেন, "কেহ বলেন যে আধ্যাত্মিক সম্পদই একমাত্র আদর্শ, কেহ বলেন যে কামকাঞ্চন-ভোগই জীবনের একমাত্র আদর্শ, কেহ বা উভয়ের সমন্বয় স্বীকার করেন।" অধিকারী ভেদে প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে প্রযুজ্য। কপট-বৈরাগ্যের সমর্থন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কখন করেন নি, তার প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ভোগ-স্পৃহা নিয়ে যে বৈরাগ্য তাকে ভগবান "মিথ্যাচার, ক্লীবত্ব, অনার্য্য-সেবিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য" বলেচেন। এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই আমাদের অতীতের গড়া সভ্যতার বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত শিথিল করে দিচ্চে। জগতের প্রতি কোণের প্রতি আবিষ্কারের সুযোগ যে জাতি গ্রহণে অসমর্থ হবে, তার পক্ষে অর্থনীতি তথা জীবন-রক্ষা এক মহা সমস্যা হয়েই দাঁড়াবে। বিশ্বের কর্ম্মপদ্ধতি এমন ক্ষিপ্র-গতিতে পরিবর্ত্তিত হচ্চে যে, যে জাতি সদা সজাগ নয়, সে এমন পিছিয়ে পড়বে যে অপর জাতির সমতালে যাওয়া তার পক্ষে জীবন-মরণ-সমস্যা। বিজ্ঞান ভারতবর্ষে এসে ভারত-ভারতীকে কতটুকু সুখী করেছে জানি না, তবে এটা সত্য কথা যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতীয় কৃষকের লাঙলে, তন্তুবায়ের তাঁতে, শিল্পীর যন্ত্রে সে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়েছে যে আজ তাকে চোখ মুছতে মুছতে

দেখতে হচ্চে কেন কর্ম্মোপাদান তার শ্লথ মুষ্টি হতে সহসা খুলে পড়ল।

প্রাণ পাখী এখনও উড়ে যায়নি। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের 'ধর্ম্ম' ও 'প্রাণের বিকাশ' হচ্চে একই কথা। তাই ধর্ম্মই এখন নির্দ্দেশ করচে, "Work is Workship"—"বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" প্রত্যেক কর্ম্মের ভেতর দিয়ে আমাদের আত্মশক্তিরই বিকাশ ঘটচে, তাই প্রত্যেক কর্ম্ম, যা আত্মার প্রসারতা এবং জগতের কল্যাণ আনে—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আত্মেশ্বরেরই পূজা। All India National and Social Congress, All India Women's Congress, League of Indian Youth, Child Welfare Leagues, Marriage Reform Association, Hygiene Societies প্রভৃতি সবই আত্মার সম্পূর্ণতা লাভে প্রগতি-পথের একটা অপরিত্যাজ্য উপাসনা। কিন্তু এই উপাসনার বিবৃদ্ধি ও আমিত্বের প্রসারের সহিত মানবাত্মা এমন এক আধ্যাত্মিকতার অসীম স্তরে অবস্থান করেন যে, সেখানে সদসৎ কোনও কর্ম্ম কোলাহলই তাঁকে স্পর্শ করে না। এই হচ্চে ভারতের আদর্শ—বৈরাগ্য, অকর্ম্ম, তূষ্ণীম্ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

শতবর্ষ পূর্ব্বে ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার সুপ্রভাতে ভারতের গাঢ় তমিস্রা ঘুচাতে যে অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্কের উদয় হোলো, সমস্ত জগৎ সেই তরুণ অরুণের প্রথম করুণা কিরণ স্পর্শে পুলকিত হয়ে গেয়ে উঠলো—

"অযুত কণ্ঠে বন্দনাগীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে,
তব অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে
পশিছে!"

ভারতের ভাগ্যাকাশ বহুবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারের ঘোরঘটাপূর্ণ অমানিশার নিবিড়তার তুলনায় সে সব অন্ধকার আলোক বলেই গণ্য হতে পারে। মুসলমান বিজয় ও রাজত্বের কয়েকশতাব্দী ধরে যখন তরবারির আঘাতে মন্দিরের পর মন্দির ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছিল অথবা ঐগুলি মসজিদের উপকরণ যোগাচ্ছিল, তখনও ভারতের হিন্দুপ্রাণ জাগ্রত, তখনও সে তার ধর্ম্ম ও বিগ্রহ রক্ষার্থে ধনপ্রাণ দিয়ে যথাসাধ্য প্রয়াসে ত্রুটি করে নি, কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন হিন্দুর ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার-সমূহ বলে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হচ্ছিল, তখন হিন্দু তার চিরপূজিত ইষ্টদেবকেও পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতম্মন্যগণ যেদিন পিতৃপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকে পরিহাস করে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণগণ যাঁরা এক সময় জ্ঞানগরিমায় এ ধর্ম্মকে রক্ষা করেছিলেন—বর্ত্তমানে কুসংস্কারের পুঁটলীকেই তাঁরা ধর্ম্ম-বোধে আঁকড়ে ধরায় পূর্ব্বোক্ত প্রভাব থেকে দেশকে তাঁরা রক্ষা করতে পারেন নি। রাজা রামমোহন রায় ঔপনিষদিক ধর্ম্ম প্রচলনে যথেষ্ট প্রয়াস পেলেও উহাকে খ্রীষ্টীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে না পারায় এবং হিন্দুর দেবদেবীকে পুতুল বলে অবজ্ঞা করে হিন্দুধর্ম্ম হতে স্বীয় ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করায়, তিনি ঐ নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাহায্যে হিন্দুভারতকে স্বীয় সনাতন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হন নি। তাই হিন্দুর সেই সব

হারাবার দিনে, ভারতের সেই নিজস্ব খুইয়ে মরণ-যাত্রার ক্ষণে দুর্য্যোগময়ী অমানিশার অবসান করতে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন হতে অধিকতর উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করতে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী এই নব রাগে রঞ্জিত তরুণ তপনের আবির্ভাব। গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৭, ৮

তাঁর সেই কথা রক্ষার নিমিত্তই "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ"-রূপে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু এবারে শুধু সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য,—ধরা ছোঁয়া খুব শক্ত। তবে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি আজ পঞ্চাশ বছরও পূর্ণ হয় নি শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল শরীরের অন্তর্দ্ধান ঘটেছে—এর মধ্যেই বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক তাঁর উদার বাণী মুগ্ধহৃদয়ে গ্রহণ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে এবং ঐ ভাব সমূহের রূপায়তনের উদ্দেশ্যে স্বকীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছে। শ্রীরামচন্দ্রকে বানরে রাক্ষসে পূজো করেছিলো, বুদ্ধদেবের শরীর ত্যাগের ৫০০ বৎসর পরে মহারাজ অশোক তাঁর সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন, ঈশাবতার ঈশামসিকে জেলেমালার অনুসরণ করেছিল, কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর ঘোর জড়বাদের দিনে সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেবমানব জ্ঞানে পূজা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাঁর জীবনাদর্শ ও উদার বাণী "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" পৃথিবীময় প্রচার করা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনায় আমরা দেখতে পাই বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারকুলের জীবনে যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তৎপ্রসূত যে সকল উপলব্ধি তাঁদের অন্তরে আবির্ভূত হয়—এক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে তার সকলগুলির পূর্ণ অভিব্যক্তি। উক্ত মহাপুরুষগণ এক এক পথে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে ঐ ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য বলে প্রচার করে যান, কিন্তু এই নিরক্ষর প্রায় ব্রাহ্মণ-পূজারী পৃথিবীর যাবতীয় বিশেষবিশেষ ধর্ম্মমতাবলম্বনে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও সাধককুলের মুকুটমণি হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ দিচ্চেন। বুদ্ধদেবের প্রতি তাকালে দেখি ছ বছর ধরে তাঁর কঠোর সাধনা, ঈশামসির চল্লিশদিনের ঈশ্বর ব্যাকুলতায় কাটানো ভিন্ন অন্য কিছু জানি না, মহম্মদের সাধনেতিহাস অস্ফুট, শঙ্কর ও চৈতন্যের সাধনার সময়ও অল্প, আর নবযুগে আবির্ভূত এই দেব-মানবের পানে চাইলে দেখি দ্বাদশবর্ষ ধরে সাধনার তুমুল সংগ্রাম। ঐ বারটি বছর তাঁর নিদ্রা ছিলনা, খাওয়া দাওয়ার ওপরে কোন লক্ষ্যই ছিল না, এমন কি শরীর রক্ষার মত যত্ন নেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল—ছিল শুধু অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় সাধনার পরে সাধনার অনুষ্ঠান, উপলব্ধির পর উপলব্ধি এবং উদ্দাম প্রবাহের সর্ব্বশেষ ছয়মাস দেহবুদ্ধি বিরহিত হয়ে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান। যাঁরা শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁরাই জানেন এত বিভিন্ন প্রকারের সাধনা কোন মহাপুরুষই কোন কালে অনুষ্ঠান করেন নি। সব সাধনার শেষে তিনি বললেন, "সর্ব্ব ধর্ম্ম মতই সত্য, যত মত তত পথ।" শাস্ত্রে অবশ্য একথা পূর্ব্ব থেকেই পাই। বেদ বলছেন, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। শিবের স্তুতিতে আমরা হিন্দুর ছেলেরা নিত্যই প্রায় পাঠ করি—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ শিব-মহিম্ন,৭

গীতায় ভগবানও বলছেন, "যে যথা মাং

প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"(৪।১১), এ সব কথা পুঁথিতেই লেখা ছিল। কিন্তু "পাঁজিতে বিশ আড়া জল আছে, পাজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও পড়ে না।"

জগৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো—সকল ধর্ম্ম ফুটে উঠেচে শ্রীরামকৃষ্ণের এক জীবনের তপস্যায়। যুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক সাধনার ভাবঘন মূর্ত্তি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের মূর্ত্ত-সমন্বয় প্রতীক এই মহামানবের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গভীরতায় ও ঔদার্য্যে শাস্ত্রকেও অতিক্রম করেছে। যুগাবতার ঠাকুরের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচারিত হলে পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্মগ্লানি নিবারিত হয়ে সব ধর্ম্মকেই পরম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবে এবং হিন্দুমুসলমানে ক্রিশ্চিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীকেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে ভ্রাতৃভাবে সকলকে নিবদ্ধ করবে—এই আশাতেই জগৎ জুড়ে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ঋষিগণের দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত সামঞ্জস্য করতে না পেরে ভাষা মুচড়িয়ে ঐগুলি নিজ নিজ "সম্প্রদায়ানুরোধাৎ" ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমার্গকে জটিল করে তুলেছিল এবং অন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আচরণকে বিদ্রূপের কুটিল হাসিসহ উপেক্ষা করছিল। "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়; উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, পরন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা সাপেক্ষ"—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উপলব্ধি ও উক্তি হিন্দুর অনন্ত শাস্ত্র বুঝবার পক্ষে যে কতদূর সহায় হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিংসাদ্বেষ ঘুচিয়ে যে সকলের মিলন-সেতু নির্ম্মাণ করবে তা অল্পচিন্তাতেই বুঝতে পারা যায়।

এখনও যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন—ভগবদ্-ভাব-বিভোর, সমাধি-স্নাত, আত্মভোলা পরমহংস হলেন-নয় আধ্যাত্মিক রাজ্যের খুব উঁচু সাধক, না-হয়ত তিনি মহাপুরুষ বা অবতারই হোলেন, কিন্তু তিনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে দুনিয়াকে এমন কি জিনিষ দিয়েছেন যাতে আমরা অত ঘটা করে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব করতে যাব? আর তিনি ত কখনও মান চান নি। আপনারাও ত জানেন এক গভীর রাতে তিনি বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করছিলেন আর বিরক্তিভরে চারধারে থুথু ফেলছিলেন। ঘরে তখন বাবুরাম মহারাজ ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে?" ঠাকুর বললেন "মা এক ধামা নাম যশ দিতে এসেছিলেন।" নাম যশ যে মাকে ভুলিয়ে দেয়। ও ত তিনি চিরদিনের তরে ত্যাগ করেছেন সুতরাং মা এখন প্রলোভন দেখালেও যা একবার ত্যাগ করা হয়েছে তা পুনরায় গ্রহণ করা যায় কিরূপে। আর একদিন প্রতিষ্ঠার কথা মনে উঠতেই মা দেখালেন, "ও যে বৃদ্ধ বেশ্যার বিষ্ঠাতুল্য।" গুরু, কর্ত্তা, বাবা এ সব অভিমানোদ্দীপক কথা ত তিনি শুনতেই পারতেন না,' তিনি যা চান নি, তারই অবতারণা করলে কি তিনি খুসী হবেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো যে হাঁ তিনি এমন জিনিষ দিয়ে গেছেন—যার জন্য আমরা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র-জীবনে এবং গোষ্ঠী-জীবনে তার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবো; কারণ তিনি মানব জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষগণ দেখিয়ে গিয়েছেন এবং যা আমরা ভুলতে বসেছিলাম—সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য আরও উজ্জ্বল করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই যদি স্থির না হোলো তবে লক্ষ্যবিহীন নৌকার ন্যায় অকূল জীবন-সমুদ্রে মানুষ কোনদিকে এগুবে? ঈশ্বরলাভই

মানব জীবনের উদ্দেশ্য। উক্ত মহাবাণী—বিস্মৃত মনুষ্যসমাজ যখন কামকাঞ্চনের নেশায় বিভোর হয়ে সভ্যতার সঙ্গে বর্ব্বরতারও বীজ রোপণ করছিল, যা আজ অঙ্কুরিত হচ্ছে সমর ও মহাসমররূপে—তখন এই আপন ভোলা জগদম্বার বালকই প্রথম মনুষ্যসমাজকে শোনালেন, "এ ত পথ নয়, ভোগোপকরণ দিয়ে ত ভোগের তৃষ্ণার শান্তি হবার নয়, ত্যাগেই একমাত্র শান্তি হবে," আর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও আমরা দেখি ত্যাগের এক অদ্ভুত পরাকাষ্ঠায় পৌঁচেছে। হেথায় শুধু কামকাঞ্চন নাম-যশ কায়মনোবাক্যে ত্যাগ নয়, —অভিমান অহঙ্কার পর্য্যন্ত ত্যাগ। ছোট"আমি" পাকা"আমি"র দীপ্তিতে লজ্জিত। লুপ্তপ্রায়, এ ত্যাগ তিনি অর্জ্জন করেছিলেন, ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, সাধনা করে। রাত্রিবেলা গোপনে অপরের বাড়ীর পায়খানা পরিষ্কার করতে করতে তিনি ভাবতেন, "আমি ত ম্যাথরের চেয়ে কোন অংশে বড় নই, আমি কারুর চেয়ে-বড় নই।" এ ভাবটি যতদিন না ঠিক ঠিক অর্জ্জিত হয়েছিল ততদিন কি তিনি সুস্থির হতে পেরেছিলেন? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ছিলেন, তখনকার দিনে অনেক গরীব, কাঙাল এমনকি নীচ-জাত, দুশ্চরিত্র-ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রসাদ গ্রহণ করত; ঠাকুর তাদের ভোজনের পরে কয়েকদিন নিজে তাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার এবং তা হতে কিঞ্চিৎ প্রসাদরূপে গ্রহণও করেছিলেন। এই ভাবে তিনি স্বীয় অভিমান ধ্বংসের অভিযান চালিয়েছিলেন। শুধু একবার ভেবে দেখুন ক্ষুদ্র 'অহং'টাকে এবং তৎপ্রসূত স্বার্থপরতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করতে পারলে সমাজজীবন কত সুখের হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর একটি বিশেষ দান— মানুষকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবার ভাব। তিনি তীর্থ-দর্শন পথে দেওঘরের সন্নিহিত কোনও পল্লীর অনশন-ক্লিষ্ট পল্লীবাসিগণের দুঃখে ব্যথিত হয়ে রোদন করেছিলেন এবং মথুরানাথকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মুখে অন্ন তুলে দিতে অনুরোধ করেন। মথুরানাথ আর্থিক অবস্থা অসচ্ছলতা হবে এই আশঙ্কায় অস্বীকৃত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে বললেন, "কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকবো; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে আমি যাব না।" মথুরাবাবু অগত্যা তাহাদিগকে পরিতোষ করে খাইয়ে বস্ত্রাদি দান করে খুসী করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণ এবং "শিবজ্ঞানে জীব সেবা"-রূপ শিক্ষাই যুগাচার্য্য স্বামিজী কর্ত্তৃক বহুল প্রচারিত হয়ে জগতকে এক নূতন কল্যাণকর ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। কথাপ্রসঙ্গে আমরা এ কথারও উল্লেখ করেছি যে শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভূমিকম্প, জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য আকস্মিক বিপদে পর্য্যুদস্ত জনসাধারণের সাহায্যকল্পে সেবাকার্য্যের নিমিত্ত ও সাধারণের ভিতর শিল্পশিক্ষা প্রচলনের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হবে এবং ঐ ভাণ্ডার হতে বিপন্ন দুস্থ নরনারায়ণের সেবা করা হবে। যতদিন সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, সংযম মানুষের ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ জীবনে এবং ব্যাপকভাবে সমাজে শান্তি ও আনন্দের উৎসরূপে মনুষ্য-বিবেকে বিবেচিত হবে, ততদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ঐ সকল গুণরাজির শ্রেষ্ঠ বিকাশ-ভূমি রূপে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেই। মনুষ্য হৃদয়ে যতদিন মনুষ্যত্বের পূজা হবে, ততদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তার প্রথম অর্ঘ্য পাবেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে সত্য কথা, তিনি মান যশ চান নি, অবতার বলে সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্তিভরে বলেছিলেন যে "অবতার কথায় ঘেন্না ধরে গেছে"। তিনি যে অবতার প্রতিম পুরুষ তৈরী করতে পারতেন। এখনও ত তিনি

নাম যশ চাচ্ছেন না, তবে তাঁর পুণ্য জীবন আলোচনায় আমরা শুদ্ধ ও পবিত্র হব এবং জগৎ তাঁর অমৃত বাণী স্মরণ করে ধন্য ও কৃতার্থ হবে। এই জন্যই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। দুরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-সমুদ্রের ক্ষুদ্র দুএকটি তরঙ্গ আমার জীবন-দোলায় যে আঘাত দিয়েছে, তাই আপনাদের সামনে প্রকাশ করলাম, একবার সেই রূপ-সাগরে ডুবতে পারলে যে কত শত প্রেম-রত্ন-ধন মিলবে তার সন্ধান আর আমি কি করে দেবো?

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'কৃষ্টিভবন' প্রতিষ্ঠা, পুস্তক ও চিত্রমালা প্রকাশ, ধর্ম্ম-সম্মেলন, বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, খ্যাতনামা দেশনায়ক, অজ্ঞাত নানা দেশপ্রেমিক জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে স্বদেশের অনেকেই এবং বিদেশ-সমূহের মনীষিগণ ও ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন ও করবেন। এই অনুষ্ঠান যাতে ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার প্রযত্ন চলছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভারত হতে যে ভাবধারা উঠে সমস্ত জগতকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে দিয়েছে, তা কালে প্রচারিত হয়ে সমস্ত জগতে শান্তি এনে দেবে এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দর্শন বিজ্ঞানকে একত্র সম্মিলিত করে, এক নূতন যুগের সৃষ্টি করবে। আমরা এই নবযুগের সূচনায় আচার্য্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি মন্ত্র স্মরণ করছি "হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার একদেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও।

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর, এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

"আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!"

শ্রীসারদা চরণ
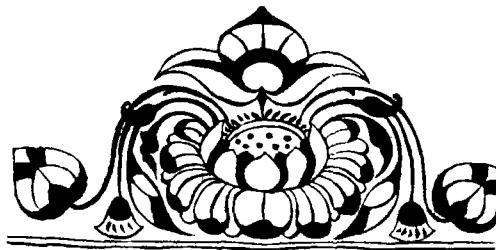
সিংহলের কথা

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশে" উল্লেখ আছে যে যে দিন ভগবান গৌতম বুদ্ধ কুশীনারে মহানির্ব্বাণ লাভ করেন, ঠিক সেই দিনই বঙ্গবীর বিজয় সিংহ সাত শত সেনানী লইয়া সিংহলে পদার্পণ করিয়া সিংহলী জাতি সৃষ্টি করেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী-প্রতিভার নিদর্শন যে সকল স্থানে লক্ষিত হয় তন্মধ্যে সিংহলই সর্ব্বপ্রধান। বিজয় সিংহের নামানুসারেই এই লঙ্কাদ্বীপ সিংহল বলিয়া পরিচিত। বিজিত জাতির অঙ্গে বিজয়ী জাতির প্রভাবের ছাপ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, এ যেন দাসত্বের তিলক। যেমন মোগল পাঠান উত্তর ভারতে হিন্দুর উপর এবং ইংরাজ-রাজ সমগ্র ভারতবাসীর উপর তাঁহাদের অমিত-প্রভাবের একটা ছাপ দিয়াছেন, এখানেও বাঙ্গালীশাসনের চিহ্ন আজ পর্য্যন্তও ইঁহাদের ভাষা, বেশ ও কৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে দেদীপ্যমান।* যদিও সিংহলী ভাষা সংস্কৃত, পালি ও তামিল সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তথাপি শতকরা ২৫টী শব্দ এখনও বাংলা। বাঙ্গালীর চেহারার সঙ্গে সিংহলীদের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সিংহলীরা বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। বঙ্গের বাহিরে সিংহলই বাঙ্গালীর একমাত্র পরদেশ বিজয়ের গৌরব-স্মৃতি।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ২২ মাইল পক্-প্রণালী পার হইয়া সিংহল। ইহার পরিমাণ ২৫৩৩২ বর্গমাইল। উত্তর দক্ষিণে ২৭০ মাইল লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিম ১৪০ মাইল পাশে। লোক সংখ্যা প্রায় ৫॥০ লক্ষ। নারিকেল, চা ও রবার প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই দ্বীপের সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানেই বিরাট নারিকেল বাগান, কোন কোনটী ২।৩ মাইল লম্বা। কলম্বোর নিকটবর্ত্তী স্থানে পর্ব্বত গাত্রেও অসংখ্য নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। ইহার তিন চতুর্থাংশ স্থান এখনও ভীষণ অরণ্য সমাকুল। সিংহলের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া চা ও রবারের চাষ হয়, মালিক সব ইংরাজ কোম্পানী। ব্যবসা-বাণিজ্য এক কলম্বো ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্র "মুর" নামক সিংহলী মুসলমান এবং কতকটা সিংহলী বৌদ্ধদের দ্বারা পরিচালিত।

বিজয় সিংহ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ শতাব্দীতে এই দ্বীপে পদার্পণ করেন এবং তাঁহার বংশধর পাণ্ডু বাসুদেব অভয়া, পাণ্ডুক অভয়া ও মোটাশিব প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৩৬৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এখানকার ১৫৫ জন রাজার মধ্যে মাত্র ১৫ জন তামিল ছিলেন। বাকী সব সিংহলী রাজা। ১০০৫ সালে পর্ত্তুগিজরা এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। পর্ত্তুগিজ, ডাচ ও সিংহলী সংমিশ্রণে বারগার নামক একটী জাতি সৃষ্ট হইয়াছে, ইঁহারা সকলেই ইউরোপীয় ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং সকলেই খৃষ্টান। ১৬৫৮ সালে ইহা পর্ত্তুগিজ উপনিবেশে এবং ১৭৯৮ সালে ইংরাজ রাজকীয় উপনিবেশে পরিণত হয়। ডাচরা এ দ্বীপে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন।

সিংহলের অধিবাসীর ¼ অংশ তামিল হিন্দু। হিন্দুরা সব দক্ষিণ ভারত হইতে এখানে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। ধর্ম্মমতে সব হিন্দুই শৈব-সিদ্ধান্তবাদী এবং প্রসিদ্ধ শৈব সাধু মাণিক্য বাসগর, সুন্দর মূর্ত্তি, আপ্পার স্বামী এবং

ত্রিরুজ্ঞান সম্বন্ধের ভক্ত। জাফনা, ব্যাট্রিক্যালো ও ট্রিনকোমালী জেলা হিন্দু-প্রধান। সমগ্র দ্বীপে হিন্দুদের প্রায় দুই হাজার ধর্ম্ম মন্দির আছে; সব মন্দিরেই পিলেয়ার বা গণেশ অথবা কন্দস্বামী বা কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি পূজিত হয়। হিন্দুরা শৈব-সিদ্ধান্তবাদী হইলেও ভারতের ন্যায় এখানে শিব বা বাণলিঙ্গ মূর্ত্তি বিশেষ দেখা যায় না। সিংহলের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে কাথরগামা নামক স্থানে কন্দস্বামীর বিখ্যাত এক মন্দির আছে। বৌদ্ধ গয়ার মন্দির যেমন হিন্দুদের অধীনে, এই হিন্দু-মন্দিরও তেমনি বৌদ্ধদের অধীনে। এই দ্বীপের প্রাচীন রাজধানী কান্দীতেও বিষ্ণু, পত্তীদেবী, সুমনাদেবী এবং সুব্রামনিয়াম্ নামক হিন্দু মন্দির বৌদ্ধদের অধীনে রক্ষিত। কাথরগামা কন্দবাসী, চিলাও মুনিশ্বর এবং ট্রিনকোমালী কোণিশ্বরের মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের তীর্থস্থান।

হিন্দুরা মেয়ে পুরুষ বালকবৃদ্ধ সকলেই কপালে বিভূতি ধারণ করিয়া থাকেন। ঘরের বাহির হইতেই পোষাক-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি সঙ্গে ধারণ এদেশে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। শৈব-সিদ্ধান্তই এখানকার হিন্দুদের হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে এবং দিনে মন্দিরে যাইয়া নারিকেল ভাঙ্গা, বিভূতি ও চন্দন ধারণ এবং থেবারম্ (তামিল স্তোত্র) পাঠ করা এখানে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। বড় বড় মন্দিরে নিত্য নহবৎ বাজান হয়, ভোগরাগ ও আরত্রিক বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হয়। অনেকে কর্পূর সঙ্গে করিয়া আনিয়া মন্দিরে পোড়াইয়া থাকেন। কার্য্যোদ্ধারের জন্য দেবতার নিকট কর্পূর মানত করা হয়। মন্দিরে আসিয়া অনেকে দিনগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ গণ্ডে চপটাঘাত এবং কেহ কেহ নিজ কর্ণ মর্দ্দন করেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বিগ্রহকে কাঠের অশ্ব, হস্তী বা দোলায় চড়াইয়া বাদ্যভাণ্ডসহ ভ্রমণ করান হয়। ভোগরাগ সব নিরামিষ এবং নারিকেল প্রধান। অধিকাংশ খাবারই নারিকেল বা উহার রসে প্রস্তুত। নারিকেল তৈল ব্যবহার সাধারণ। এখানে হিন্দুরা পেঁয়াজ, মাছ, মাংস সব খান। বাংলা দেশের মত মুরগী এখানে হিন্দুধর্ম্ম নাশক নহেন। এখানে হিন্দুরা প্রায় সকলেই বাড়ীতে মুরগী পালেন। সকরী বা এঁটো জ্ঞান এদেশে নাই বলিলেই চলে। নিরামিষাশীকে ইঁহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। সিংহলী হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বাংলা দেশের মত হিন্দুনারী-ধর্ষণ এখানে শোনা যায় না।

অধিকাংশ স্থানেই মন্দির লইয়া হিন্দুদের মধ্যে ভীষণ দলাদলী, ফলে এক একটী গ্রামে বহুমন্দির। কিছু দিন হয় পেরিয়াকালার নামক একটী গ্রামে মন্দির লইয়া উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া প্রায় তিন শত নিম্নশ্রেণীর লোক ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের আশ্রয় লইয়াছেন। সুযোগ পাইয়া তাঁহারাও মতলব আঁটিতেছেন, জানিনা অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। জাতিভেদ বা উচ্চনীচ ভেদ এই দ্বীপে হিন্দুদের মধ্যে তেমন তীব্র নহে, কিন্তু তথাপি স্থানীয় মুসলমানদের মত তাঁহাদের একতার একান্ত অভাব। এই পাপেই হিন্দু সর্ব্বত্র ডুবিতেছে। ভদ্রশ্রেণীর হিন্দুদের উপজীবিকা চাকুরী এবং অল্প সংখ্যক লোকের জমিজমাও আছে; নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা প্রায় সবই কৃষি ও মৎস্য জীবী।

লঙ্কার ⅔ অংশ অধিবাসী সিংহলী এবং ধর্ম্মমতে প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। এই দ্বীপে দশ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ছয় হাজার বৌদ্ধ-বিহার আছে। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। সিংহলের বিখ্যাত আদম পিক্ সমুদ্রের ৭৩০০ ফিট উচ্চে; বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই ইহাকে আপন আপন তীর্থস্থান

মনে করেন। সিংহল হইতে বৌদ্ধ "হীনযান-" মত শ্যাম, ব্রহ্ম ও কাম্বোডিয়ায় প্রচারিত হইয়াছে। ডাম্বুলা সাইগিরিয়া অনুরাধাপুরা পলন্নারুয়া ও কান্দী সিংহলী বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র। কান্দীর দন্তমন্দির বৌদ্ধ জগৎ-বিখ্যাত। এই মন্দিরে ভগবান শ্রীবুদ্ধের দন্ত পূজিত হয়। ডাম্বুলা ও সাইগিরিয়ার বৌদ্ধ "পর্ব্বত-মন্দির" অনুরাধাপুরের রোয়াংভেলী ছেয়া বা মহাস্তূপ (ইহার অভ্যন্তরে ভগবান শ্রীবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র আছে) এবং পলন্নারুয়ার সিংহলী রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও উহাদের অপূর্ব্ব স্থপতি-ভাস্কর্য্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। কান্দীর প্রকাণ্ড বৌদ্ধবিহার এবং বোটানিকাল গার্ডেন দর্শনীয়। সিংহলী বৌদ্ধেরা আয়ুর্ব্বেদ পছন্দ করেন। কলম্বোতে একটী বড় আয়ুর্ব্বেদ কলেজ আছে। বৌদ্ধ বিহারে পালীর সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা হয়। ভিক্ষুদের শিক্ষার জন্য একটী কলেজ আছে, নাম, The "Oriental Buddhists College" এখানে সংস্কৃত, পালী ও সিংহলী ভাষা সহায়ে বৌদ্ধদর্শন পড়ান হয়। বিশুদ্ধি মার্গের রচয়িতা বৌদ্ধঘোষ পালী ট্রিপিটক প্রণয়ন করেন। সিংহলী সঙ্গীত হিন্দু সঙ্গীতের অনুকরণ। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পুত্র (কেহ কেহ বলেন ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং বিদুষী কন্যা সঙ্ঘমিত্রা খৃঃ পূঃ ৩ শতাব্দীতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়া মিহিন্টেল নামক স্থানে অবস্থান করেন। এই স্থান এখন প্রধান বৌদ্ধতীর্থে পরিগণিত। সঙ্ঘমিত্রা ছিলেন একটী বিরাট ভিক্ষুনী মঠের অধ্যক্ষা। তিনি বৌদ্ধগয়াস্থিত বিখ্যাত বোধিদ্রুমের যে একটী শাখা লইয়া গিয়া অনুরাধাপুরায় রোপন করিয়াছিলেন, উহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছে। এই দ্বীপের সর্ব্বত্র বৌদ্ধমন্দিরের সঙ্গে এক একটী স্তূপ এবং অন্ততঃ একটী বটবৃক্ষ বর্ত্তমান। অনেক স্থানে মন্দিরের গাত্রে জাতকের ছবি এবং উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশেও সর্ব্বত্র ইহা দেখা যায়। মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির নিকট রোজই আহার্য্যের অগ্রভাগ দেওয়া হয়। পুষ্প ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া সকালে সন্ধ্যায় মোমবাতি, কর্পূর, দীপ ও ধূপকাঠি জ্বালান হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে পাড়াগাঁয়েও প্যাগোডায় বিদ্যুৎবাতি সারারাত্রি জ্বলে। অধিকাংশ বৌদ্ধগৃহস্থ বাড়ীতেও বুদ্ধদেবের ছবি বা একটী ক্ষুদ্রাকৃতি প্যাগোডাকে এইভাবে পূজা করা হয়। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়, তথাপি ভগবান শ্রীবুদ্ধই ব্রহ্ম ও সিংহল উভয় দেশে সাধারণ লোক দ্বারা ঈশ্বর বলিয়া পূজিত। যেমন আমরা "হরিবোল" বলি, তেমনি সিংহলী বৌদ্ধগণ ভগবান শ্রীবুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া "সাধু" "সাধু" বলিয়া সমবেত জয়ধ্বনি করেন। ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধদের মত সিংহলী বৌদ্ধেরাও হিন্দু সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করেন।

সাধারণ সিংহলী পুরুষরা তপন ও সার্ট-কোট পরিধান করেন। কেহ কেহ মাথায় চুল রাখেন এবং একপ্রকার অর্দ্ধগোলাকৃতি বড় চিরুণী ব্যবহার করেন। মেয়েরা তপন পরেন এবং বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এক প্রকার ক্ষুদ্র জামা প্রায় সকলেই ব্যবহার করেন। অনেকে বাঙ্গালী মেয়েদের মত কাপড় পরেন; পল্লীগ্রামে বৌদ্ধ সিংহলী ও মুর জাতীয় মুসলমান সিংহলী মেয়েদের মধ্যে ইহার চলন খুব বেশী। ভাত, মাছ ও মাংস সিংহলীদের প্রধান খাদ্য। ধর্ম্ম বা সমাজের দিক দিয়া খাওয়া ও স্পর্শে হিন্দুদের মত ইঁহাদের মধ্যে কোন বিধি-নিষেধ নাই।

সিংহলের বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো সহরে পদার্পণ করিলেই তামিল, মুর, মালয়ালী, সিংহলী, বার্গার, ইউরেশিয়ান্ (Eurasian) এবং বিভিন্ন

ইউরোপিয়ান্ জাতি দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সহরের ব্যবসাকেন্দ্রে প্রবেশ করিলে শুভ্র হ্যাট ও সিল্কী যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। সহরের প্রায় চৌদ্দ আনা ভদ্রলোকের বেশ, ভাষা ঘরবাড়ী আসবাব পত্র, দোকানপশারী এবং হোটেল রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি পুরা-দস্তুর সাহেবী। স্থানে স্থানে ছোট বড় গীর্জ্জার অভাব নাই, সুতরাং ইহাকে প্রায় সব বিষয়ে ইউরোপীয় সহরের একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। এদেশে এক শ্রেণীর নিকট এই দ্বীপের নাম "ক্ষুদ্র ইংলণ্ড" (Little England)। ধন্য ইংরাজ রাজের প্রভাব! কলম্বো হারবার জগৎবিখ্যাত। ভারতের দিক হইতে যে সব জাহাজ ইউরোপ বা আমেরিক যায় বা ঐ স্থান সমূহ হইতে আসে উহাদের প্রায় প্রত্যেকটীই এখানে নজর করে। শত শত যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ এই বন্দরে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। এখানকার কাষ্টমহাউসের (Customs House) ব্যবস্থা দেখিবার যোগ্য। ৮০ ফিট গভীর সমুদ্রের প্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া ২০।২৫ হাত প্রস্থে পাথরের দেয়াল গাঁথিয়া এই হারবার প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভারতমহাসাগরের বিক্ষুব্ধ উত্তালতরঙ্গরাশি সর্ব্বদা এই দেয়ালকে ভীষণাঘাতে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। লঞ্চ বা নৌকায় চড়িয়া এই তরঙ্গহীন সদাশান্ত হারবায় ভ্রমণ—সবিশেষ ইহার এই দেয়ালের উপর দিয়া বেড়াইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন বিশেষ উপভোগ্য। হারবারের পরই বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান কলম্বোর "গল ফেস্" (Galleface)। সমুদ্রের তীরে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া দেয়াল গাঁথিয়া একটী সুদৃশ্য পরিষ্কার 'প্রান্তর' প্রস্তুত করা হইয়াছে। অপরাহ্নে জগতের বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য লোক এখানে বায়ু সেবনার্থ আগমন করিয়া সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের অপরূপ শোভা দর্শন করেন।

কলম্বো হইতে নিউরেলিয়া, কান্দী, হাপুতালা, দিয়াতালা, বাণ্ডারোয়ালা ও ব্যাডুলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য সহর রেল বা বাস্‌যোগে ভ্রমণ করিলে এই দ্বীপের পার্ব্বত্য স্থানসমূহের মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করা যায়। নিউরেলিয়া ও কান্দী সিংহলের বর্ত্তমান সিমলা। কলম্বো বা ব্যাঙ্গিগ্যালোর গরম হইতে আসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সব স্থানে উত্তর ভারতের মাঘের শৈত্য অনুভব করা যায়। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত চলিয়াছে, যেন ইহার অন্ত নাই—শেষ নাই। স্থানে স্থানে পর্ব্বতরাশি এমন সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট যে সে দৃশ্য মনকে মাতাইয়া তোলে। অনেক পর্ব্বত গাত্রে খণ্ড খণ্ড মেঘ লাগিয়া এবং চলাফেরা করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও বা পর্ব্বতের পাদদেশে, কোথাও বা শীর্ষে এবং কোথাও বা গাত্রে সুদৃশ্য বাড়ী ঘর, ছোট ছোট গ্রাম ও সহরের দৃশ্য মনোরম। হৃষিকেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কেদারনাথ বদরিনারায়ণের রাস্তার কতকটা দূর পর্য্যন্ত হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, এই স্থানও উহার একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ। শত শত মাইল পর্ব্বতের পর পর্ব্বত বেষ্টিত অসংখ্য ইংরাজ কোম্পানীর অগণিত চা ও রবারের বাগান। মাঝে মাঝে ঝরণা ও পার্ব্বত্য নদী, পর্ব্বত গাত্রে পিচ্ ঢালা পাকা রাস্তা, মোটরবাস ও লরীর যাতায়াত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চায়ের কারখানা, স্থানে স্থানে ভারতীয় কুলীবসতি ও সিংহলী গ্রামের দৃশ্য চমৎকার। হাপুতালা ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যদের স্বাস্থ্য নিবাস। স্বাস্থ্য এ সব স্থানের চমৎকার। বাণ্ডারোয়ালা সহর হইতে তিন মাইল দূরে একটী পার্ব্বত্য বৌদ্ধ মন্দির আছে। পর্ব্বত কাটিয়া একটী বিরাট গুহার মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহার পার্শ্ব-দেশ দিয়া একটী প্রকাণ্ড ঝরণা প্রবাহিতা। এখানে ভগবান বুদ্ধের শায়িত মূর্ত্তি এবং বিষ্ণু মূর্ত্তি আছে।

ট্রিন্‌কোমালী ব্রিটিশ যুদ্ধ-নৌবহরের আড্ডা (Naval-base) বলিয়া জগৎ প্রসিদ্ধ। সমুদ্রে এরূপ পর্ব্বত বেষ্টিত প্রাকৃতিক হারবার এশিয়ায় আর নাই। সিঙ্গাপুরের পরই ট্রিন্‌কোমালী ব্রিটিশ নৌবহরের ঘাঁটি। এখানকার "স্বামী-পর্ব্বত" সুদৃশ্য স্থান এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের তীর্থ, ইহাকে "দক্ষিণের কৈলাস" বলা হয়। এখানকার "পর্ব্বত-মন্দির" ভারত মহাসাগরের কুক্ষিগত। পর্ব্বতের গাত্রে মন্দিরের চিহ্ন আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে একটী কেল্লা ছিল। এখান হইতে ভারত মহাসাগরের দৃশ্য চমৎকার। এমন সাধন-ভজন যোগ্য স্থান এই দ্বীপে খুব কমই দেখা যায়। ট্রিনকো সহর হইতে আট মাইল দূরে কেনিয়া নামক ভীষণ অরণ্য-সমাকুল জায়গায় গরম জলের ফোয়ারা আছে, একটী অল্প পরিসর জায়গায় বিভিন্ন স্থান হইতে পাঁচপ্রকার বিভিন্ন রকমের জল উঠিতেছে।

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি সিংহলের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই অসাধারণ। এই দ্বীপের স্কুলগুলি অধিকাংশই তাঁহাদের করতলগত। এখানে এমন গ্রাম খুব কম দেখা যায় যেখানে 'গির্জ্জা' নাই। সর্ব্বত্রই মিশনারীদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কনভেণ্ট (convent), স্কুল, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি রহিয়াছে। স্কুলগুলি ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কেন্দ্রশক্তি। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর হিন্দু সর্ব্বত্র খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং করিতেছে। চাকুরী ও অন্যান্য সুবিধার লোভে ভদ্রশ্রেণীর অসংখ্য হিন্দু খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রতিক্রিয়া-মূলক কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। এখানে হিন্দুরা এ বিষয়ে নির্ব্বেদ। ব্যাটিক্যালো সহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ খৃষ্টান। এখানকার লেগুনে (lake) মৎস্যের সঙ্গীত গভীর নিশিথে উপভোগ্য। এরূপ সঙ্গীতকারী মৎস্য (Singing fish) মাত্র আমেরিকায় একটী স্থানে আছে বলিয়া শোনা যায়।

ট্রিন্‌কোমালী, কালমুনা, দিয়াতালা ও হাপুতালা প্রভৃতি সহরে অসাধারণ খৃষ্টান প্রভাব। এই দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের গ্রামগুলি প্রায় সব খৃষ্টান। অনেক সিংহলী বৌদ্ধও খৃষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে।

এই দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৩টী স্কুল আছে। ট্রিনকো সহরে একটী হিন্দু কলেজ (Senior Cambridge) এবং একটি তামিল স্কুল আছে। জাফনায় একটী ইংরাজী স্কুল এবং ব্যাটিক্যালো জেলায় বিভিন্ন স্থানে একটী ইংরাজী ও নয়টী তামিল স্কুল আছে। তামিল স্কুলে বালক-বালিকা একসঙ্গে পড়ে। এই সব স্কুলে ছাত্র সংখ্যা আড়াই হাজার এবং বার্ষিক খরচ ৩৪ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া মিশনের অধীনে কালাডি উপড়ে নামক স্থানে একটী অনাথ আশ্রমে ২৭টী বালক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী বিপুলানন্দজী এই দ্বীপের অধিবাসী এবং চিদাম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল অধ্যাপক ছিলেন; প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এই স্কুলগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

বিদেশী বণিকদের প্রতিযোগিতার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য করা এ দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হইতেছে না, কোন চেষ্টাও নাই; বর্ত্তমানে চাকুরীও দুষ্প্রাপ্য সুতরাং বেকার সমস্যা এখানেও ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

রামায়ণ যুগের উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমানে লঙ্কা দ্বীপে দেখা যায় না। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস "মহাবংশ" এবং "দ্বীপবংশেও" ইহা উল্লেখ নাই। তবে রামায়ণের স্মৃতি এখানে কয়েকটী স্থানের সঙ্গে জড়িত আছে। নিউরেলিয়ার নিকট সীতাওয়াকা বলিয়া একটী ছোট পার্ব্বত্য

গ্রাম আছে; এখানে অশোক-বনে সীতাকে, রাখা হইয়াছিল। সীতাদেবী ইহার পার্শ্বদেশে প্রবাহিতা যে নদীতে স্নান করিতেন উহাকে সীতাওয়াকা গঙ্গা বলে। এই দ্বীপের ৫টী নদীর সঙ্গে "গঙ্গা" নাম জড়িত, যথা,—কালু গঙ্গা, কালানী গঙ্গা, মহয়ালী গঙ্গা, মানিকাঙ্গিন গঙ্গা এবং ওয়ালাউএ গঙ্গা নোগাতালোয়া নামক স্থানে বটবৃক্ষের নিয়ে সীতা তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে শপথ করিয়াছিলেন। এখানে একটী মন্দিরে লক্ষ্মণ ও সীতামূর্ত্তি অদ্যাবধি হিন্দু ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত। হাগ্‌গলা নামক স্থানে রাবণের সৈন্যগণ শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। উভা পাহাড় নামক স্থানের অধিবাসীরা সীতা, রাম লক্ষ্মণ এখনও ঐ স্থানে আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্যাডুলা নামক পার্ব্বত্য জেলার দুইটী পর্ব্বতের শীর্ষদেশকে সীতারামের মূর্ত্তি মনে করা হয়। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। অনুরগলি রামাংগম মন্দিরে গণেশ মূর্ত্তি পূজিত। এখানে যে একটী জলাশয় আছে উহা হনুমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে বৎসরে একটি মেলা হয়। বর্ত্তমান এই দ্বীপের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণ দক্ষিণ প্রান্তে হাম্বানটোলার নিকট যে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত পর্ব্বতের চিহ্ন দেখা যায় ঐ স্থানে রাবণের রাজধানী ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

দেশাত্মবোধ এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। স্বাধীনতা, দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া খাটিবার মত 'মহাপ্রাণ' এ দ্বীপে এ পর্য্যন্ত তেমন কেহ একটীও জন্মেন নাই। তবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সর্ব্বতোমুখী নবজাগরণের প্রভাব এ দেশবাসীর মধ্যে কিছু কিছু স্পন্দন আনিতেছে।

স্বামী সুন্দরানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশ্রীহরিমহারাজ বলিতেছেন—স্বামিজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভিড়ে দুই তিন জায়গায় দেখা হইল না। G. C. (গিরিশবাবু) কে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। বলিলেন, 'উহাতে আমার অকল্যাণ হবে।' মাষ্টার মহাশয়ের দাড়ী নাড়িয়া দিলেন।

কত সময় বলিয়াছেন, "এমন সব ভাব দিয়া গেলাম যাহাতে দুশো বৎসরের মধ্যে আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল দাগা বুলাইয়া গেলেই চলিবে।"

অনেক সময় বলিতেন, "এত খেটে খুটে মন প্রস্তুত হোল, কিন্তু মা কেবল বলছেন, 'চলে আয়—চলে আয়।' কাজের কিছুই করা হল না।

'—মহাশয় প্রভৃতি চিকাগো ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামিজী বলিতেন, "ও সব কিছুনা—কিছুনা। যা কিছু ব্যাপার হবে তা কেবল (নিজের বুকে আঙুল রাখিয়া) ইহার জন্য।"

'স্বামিজী, ঠাকুরকে আপনার মা ভাইয়ের জীবিকার ব্যবস্থা করিবার জন্য, মা কালীকে, অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর

কহিতেছেন, "বলিস্ কি, আমার, এসব কথা, মাকে বলতে নেই।" বড়ই পীড়াপীড়ি করায় কহিলেন, "যা তুই ঘরে গিয়া প্রার্থনা কর, যা চাইবি,তাই পাবি। নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন—বড়ই উদ্বেগ, নরেন কি চায়—অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামিজী বাহির হইয়া আসিতেছেন। "কিরে কাঁদিস্ কেন? চেয়েছিস্ ত? কি চাইলি, বল্ দেখি?"—ক্রোরুদ্যমান স্বামিজী বলিলেন, "আর কিছু চাইতে পারলাম না,—বললাম, মা, জ্ঞান দাও, বিবেকদাও, ভক্তি দাও।" ঠাকুর শুনিয়াই স্বামিজীকে দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করিলেন—অতিশয় খুসী হইলেন। এরপরে, ঠাকুর আমাদের নিকট বলিতেছেন, "দেখ্ দেখি কি অধিকারী পুরুষ! আর কিছুই চাইতে পারল না।" ভিতরে গলদ নাই—বাহিরে গলদ কোথা হইতে আসিবে?

'দেখ, স্বামিজী কতটা মহাপ্রাণ ছিলেন। ঠাকুর একব্যক্তির চরিত্রে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সকলকে, তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিতে নিষেধ করেন। অপরের নিকট হইতে উহা অবগত হইয়া, তিনি দুইজন গুরু ভাইকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সকল ব্যাপার ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর মহাক্রুদ্ধ হইলেন—স্বামিজী কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন ঐ ব্যক্তিকে (?) ঠাকুরের নিকট আনিয়া, "উহার উন্নতি হউক—ধর্মজীবন এই জীবনেই লাভ হউক", এরূপ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর বলিলেন, "এ জন্মে হবে না।" পুনরায় ধরপাকড়—স্বামিজী বলিতেছেন, "আপনি না করিয়া দিলে এখানে কোথায়?"—ঠাকুর—"কি করব, বলছি হবে না।" পুনরায় অনুরোধ—পীড়াপীড়ি। "আপনি ছাড়িলে ও দাঁড়ায় কোথায়?" ঠাকুর তখন বলিতেছেন, "যা, যা, এখন যা" তারপর বলিলেন, "যা, মৃত্যুকালে মুক্তি লাভ হবে।"

'স্বামিজীর ধ্যান ধারণার ফল করায়ত্ত হইতেছে না দেখিয়া একদিন ঠাকুরকে অনুযোগ করিতেছেন, 'কিছু হইতেছে না, কি করি" ইত্যাদি। তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে, আমি তোকে ভাল মনে করতাম। খানদানি চাষা যে, সে হাজাশুকো মানে না। তার স্বভাবই চাষ করা, তা জল হক বা না হক, ফসল হবার নিশ্চিত আশা থাকুক বা না থাকুক—সে চাষকার্য্য ছেড়ে অন্য কিছুই করিতে পারে না।"

'স্বামিজী তামাক খান, নিরামিষাশী নহেন এজন্য আমাদের মধ্যেই একজন স্বামিজীকে বলিয়াছিল, "দেখ, তোমার অভ্যাসগুলি শোধ্রান দরকার, নতুবা আমাকে তোমার জন্য অনেক লোকের নিকট জবাবদিহি হইতে হয়।" সে মনে করিয়াছিল, স্বামিজী খুব খুসী হইয়া, উহাতে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন, কিন্তু তিনি অতিশয় শান্ত ভাবে বলিলেন, "তুই তোর কাজ কর্। আমাকে defend (সমর্থন) করিবার কোন আবশ্যক নাই।" স্বামিজী কেমন স্বস্থ—খাড়া হইয়া রহিয়াছেন। কাহারও উপর ঠেস্ দেওয়া, কাহারও recommendation এর (সমর্থন) উপর আপনাকে জিয়াইয়া রাখা তাঁহার ধাতে ছিলনা।

কোন একটা ষ্টেশনে যখন ষ্টেশন মাষ্টার কয়েক জন সাহেবের জায়গা করে দেবার জন্য স্বামিজীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামাবার চেষ্টা করে ছিল, তখন স্বামিজী তাকে বলেছিলেন, "আমাকে নাবিয়ে দিতে তোমার লজ্জা হয় না —আমি বিবেকানন্দ। ওদের নাবিয়ে দাও।" বেচারা ষ্টেশন মাষ্টার সেই ধমকের ফলে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইল।'

একবার প্লেগের আক্রমণ খুব বেশী হইয়াছিল। মঠ বাড়ী ও জায়গা প্রভৃতি বিক্রয় পূর্ব্বক রোগীর পরিচর্য্যার জন্য অর্থদানে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞাপনাদি দেওয়া হইয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "আমরা ত গাছতলায় থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, পুনরায় গাছতলায় থাকিব।"

'বৃন্দাবনে, পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামিজী, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি কুটীরে প্রবেশ করিলেন। অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। মনটা খুব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ কুটীরে কোন সাধু অবস্থান করিতেন। স্বামিজী দেখিলেন, দেওয়ালের গায় কয়লা দিয়া লেখা আছে—

চাহ চামারি চুহারি অতি নীচন কি নীচ্
ম্যায় তো ব্রহ্ম হুঁ যদি তু ন হোতে বীচ্।

অর্থাৎ হে বাসনা (চাহ্) তুই চামারণী—মেথ্রাণী (চুহারি), তুই অতি অধমেরও অধম। তুই যদি আমার মধ্যে আসিয়া না পড়িতিস্, তা হইলে আমি ত ব্রহ্মই ছিলাম।

এই লেখা পড়িয়া স্বামিজীর খুব উৎসাহ হইয়াছিল।

একদিন হরিমহারাজ, কেন দ্রুত উন্নতি হয় না, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

'রসবোধ জন্মিলেই, উন্নতির জন্য আর চিন্তিত হইবার কারণ থাকে না। যতদিন কাজে রসবোধ জন্মে না, ততদিনই ব্যাগার ঠ্যালার মত সব করিতে হয়। যাহার কাজে রসবোধ জন্মে নাই, তাহাকে পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হয়, কালে রসবোধ জন্মে। কি কুস্তিগিরি, কি রোগীর সেবা, কি ব্রহ্মচর্য্য—যতদিন রসবোধ না জন্মে ততদিনই drudgery (ব্যাগার ঠ্যালাঠেলি)।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিতেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনাম চরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা,
পিত্তোপতপ্ত রসনস্য ন রোচকায়।
কিন্ত্বাদরাৎ অনুদিনং সেবয়ৈব
স্বাদ্বীপুনর্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

'কোন রকমে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হয়। কালে তাঁহাকে পাওয়া যায়। সকাম হইয়াও তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে নিষ্কাম হওয়া যায়—উদাহরণ ধ্রুব। আলমোরার এক সাধু আমাদিগকে বলিতেন, "আমি কোন সময়ে ঠাকুরের ঝাড়ুদার কিম্বা কিছু ছিলাম, তাহারই ফলে আপনাদের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছি।" ভগবানের জন্য কোন কিছু করিবার অভ্যাস আবশ্যক। একজনের রোগি-শুশ্রূষার কথা জানি। সে বলিয়াছিল, "রক্তমাখা শরীর পরিষ্কার করিতে করিতে এমন এক আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব!" রোগী শুশ্রূষায় রসবোধ এই প্রকারের।

'ঠাকুর বলিতেন, "উকীল, দালাল ও ডাক্তারের ধর্ম্ম নাই। —বু ক্ষেত্রীর মহারাজের নিকট হইতে ব্যয় লইয়া, ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত গিয়াছেন। স্বামিজী তখন সেখানে। উঁহাকে কিছুতেই উকীল হইতে দিলেন না—পত্রদ্বারা ব্যয়পাঠান বন্ধ করাইলেন। —বুও খুব ছোক্‌রা —একগুঁয়ে। অন্য কিছু না পাওয়ায়, নানাদেশ পরিভ্রমণের পর বাড়ী ফিরিলেন। ইতিপূর্ব্বে, সংসারের অভাব অনটনের বিষয় স্বামিজীকে জানাইতে বরাহনগর মঠে গেলে, স্বামিজী —বুকে গালি কটূক্তি করিয়া বিদায় করিলেন। আমাদের বলিলেন,—'না খাইয়ে না খেয়ে মরে সেও স্বীকার, দেখি ঠাকুরের পথে চলতে পারি কিনা।'

হরিমহারাজের জিজ্ঞাসুকে উৎসাহিত করিবার ভঙ্গি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন রকমের ছিল।

একজনকে বলিতেছেন, 'তোমার ভাবনা কি? তুমি বিবাহ না করিয়া (সম্মুখের দিকে ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারিত করিয়া) ঐ উচ্চে অবস্থান করিতেছ।' অপর একজন বিবাহ করিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহাকে বলিতেছেন, 'আবার কার দাস হইতে চলিতেছ? ভগবান্ ভিন্ন অপরের দাস কেন হইব?'

হরিমহারাজের বাল্যে ও যৌবনকালে উত্তম স্বাস্থ্য ছিল। ইহা বার্দ্ধক্যেও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা যাইত। শেষ জীবনে তিনি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কেন এইরূপ হইল জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমেরিকায় থাকার সময় (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দৃঢ়ভাবে খাড়া করিয়া) এইভাবে থাকিতে হইয়াছিল, তাই শরীরটা ভাঙ্গিয়া গেল।'

একবার ঠাকুরের জন্মতিথির দিন (১৩২০ সাল) কাশীতে হরিমহারাজকে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করায় কহিয়াছিলেন, 'আমিও স্বামিজীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "ঠাকুরের কথা আর কি বলিব? তিনি L, O, V, E, personified." ঠাকুর নিজের কথা নিজে বলিতেন, "আমি কর্ম্মনাশা," "আমি ফরাস ডাঙ্গা"।

কর্ম্মনাশা অর্থাৎ ঠাকুর, ভক্তের কর্ম্মক্ষয় করিয়া তাহাকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া দেন। ফরাস ডাঙ্গা—কোন ইংরেজ প্রজা, অপরাধ করিয়া যদি ফরাসী সাম্রাজ্য ফরাস ডাঙ্গার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে, ইংরেজ পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে না— সে সেখানে নিরাপদ্। ঠাকুরকে আশ্রয় করিলে শত অপরাধ শত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

বিবাহাদি না করিয়াও কেমন সংসার করা যায় ইহার উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, 'ঐ দেখ— বাবু বিবাহাদি করেন নাই, সংভাবেই জীবন কাটাইতেছেন, কিন্তু নিরন্তর ছাত্রদিগকে লইয়া তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া এক সংসার পাতাইয়া কাল কাটাইতেছেন।'

অসুস্থ শরীর লইয়া অনেক সাধক বিব্রত হইয়া পড়েন। এ সম্বন্ধে হরিমহারাজের উপদেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিভিন্ন লোকের নিকট লিখিতেছেন—

(১) 'তোমার শরীর ভাল থাকে না জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। খুব ভজন করে যাও। মার কৃপায় সব উপদ্রব কাটিয়া যাইতে পারে। ভজন করা চাই। শরীর সুস্থ থাকুক আর অসুস্থই থাকুক ভজন বন্ধ করিবে না। পরে দেখিতে পাইবে, সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গিয়াছে। চেপে কিছুদিন ভজন কর দেখি, শরীর টরীর সব ভাল হইয়া যাইবে। মন শুদ্ধ হইলেই, শরীরও নীরোগ হইয়া যায়। ভজনেই কেবল মন শুদ্ধ করিতে পারে। ভজন কর, ভজন কর। নিষ্কাম ভজনই ভজনের সার। তাঁহাতে প্রীতি ভালবাসা ভক্তি করিতে হইবে, তাহা হলেই সব জিনিষ থেকে মন আপনিই উঠিয়া যাইবে। শরীরের জন্ম তখন আর তত চিন্তা থাকিবে না। মার চিন্তাই কেবল প্রবল থাকিবে। আর তাহা হইলেই আনন্দ।'

(২) অন্যত্র লিখিতেছেন, 'ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, বলিতেছেন—'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাক' অর্থাৎ হে মন, শরীরের অসুখাদির জন্ম যদি কষ্ট হয়, তাহাতে তুমি অধীর হইও না; যে শরীরের যেমন ভোগ তেমনিই হইবে, তুমি আনন্দে অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানে চিত্ত সমাধান কর, শরীরের জন্ম ভাবিও না। শরীরের যাহা হয় হউক, তুমি তাহার জন্ম যেন ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইও না।'

(৩) 'আমার ডাক্তার বন্ধুরা পরামর্শ

দিতেছেন—আফিং সেবন করিলে শরীরের উপকার হইতে পারে। আমি কিন্তু—আফিমের বশবর্ত্তী হইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। শরীর চিরস্থায়ী নয়, অকারণ কেন একটি কুৎসিৎ অভ্যাসের প্রশ্রয় দিব।'

(৪) সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য মহাপুণ্যফলে লাভ হয়।

'রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।

আত্মাপরাধ-বৃক্ষাণাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

'এই শাস্ত্র-কথা। তবে ভগবানের শরণাগত হয়ে "দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো" বলে তুড়ি দিতে পারলে অনেকটা বেঁচে যাওয়া যেতে পারে। কারণ হা হুতাশ করে ত কোন ফল হয় না, কেবল কষ্ট ভোগই সার, আর পরমার্থ ভুলিয়ে দেয় এই উপরিলাভ। ভোগের ইচ্ছা ভিতরে থাকলেই শরীর ভাল না থাকলে বড়ই কষ্টবোধ, নচেৎ ভজনের জন্য মন ভাল থাকবার প্রয়োজন, শরীর ভালর তত দরকার নেই। মন দিয়ে ভজন করতে হয়। যদি শুদ্ধ কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলেই মন ভাল থাকে। তা শরীর যেমনই থাকুক না। সেইজন্য কর্ম্ম যাতে শুদ্ধ থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখাব প্রয়োজন। শরীর ত একটু একটু করে রোজই নাশের দিকে চলেছে, তা ত আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু মন অনন্তকাল স্থায়ী অর্থাৎ শরীর কত যাবে, হবে, মন কিন্তু যতদিন পূর্ণজ্ঞান না হচ্ছে, ততদিন থাকবে আর বারম্বার শরীর ধারণ করাবে। অতএব মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করাই হচ্চে আসল কাজ।

হরিমহারাজ ঋষিদিগকে কেন 'তপোধন' বলে তাহা বুঝাইতেছেন। কাহারও বিদ্যা, কাহারও কুলশীল, কাহারও অর্থ বা ভূসম্পত্তি, কাহারও রূপ ধন-স্বরূপ অর্থাৎ ঐ সকল বিষয়ই তাহাদের জীবন-যাত্রার সম্বল স্বরূপ। সাধু সজ্জনের সেইরূপ, তপস্যাই একমাত্র সম্বল।

ভৃত্যেরা প্রায়ই ফাঁকি দেয়। এই প্রসঙ্গে হরিমহারাজ বলরাম বাবুর প্রসঙ্গ করিতেছেন—'আমরা কয়েকজন বলরাম বাবুর বাড়ীতেই অনেকদিন আছি। চাকর বাকর মনোযোগ-পূর্ব্বক কাজ করে না, তারপর অনবরতই চুরি করে দেখিয়া আমি বিরক্তি প্রকাশ করায় বলরাম বাবু বলিয়াছিলেন, 'এখন আমি পরমহংস চাকর কোথায় পাব?'

হরিমহারাজ উপনিষদের 'ধীর' শব্দটির উপর খুব জোর দিতেন। উপনিষদে অনেকবার ঐ কথাটার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

'মহাপুরুষের কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়। নারদ ভক্তিসূত্রে আছে "মহৎকৃপয়া ভগবৎ-কৃপা-লেশাৎ বা"।'

আমাদের সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বভূতে একত্বানুভূতি।

গীতায় আছে—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥'

(৬।৩২)

নানারূপ উপাদেয় কাহিনী ও সত্য ঘটনা সর্ব্বদাই হরিমহারাজের নিকট শোনা যাইত। তিনি বলিতেছেন এক সাধু গঙ্গায় সন্ধ্যা করিতেছেন—একটা বৃশ্চিক ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া উহা সযত্নে হাতে তুলিবা মাত্র কামড়াইয়া দিল। সাধু উহাকে ডাঙ্গায় উঠাইয়া দিলেন। পুনরায় ভাসিয়া যাওয়ায় উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় উঠাইয়া দিলেন। সেবারও বৃশ্চিক কামড় দিল। তিনবার এইরূপ চলিল। সাধু বেদনা সহ্য করিয়া সন্ধ্যা করিয়া যাইতেছেন, আমি ঐ ব্যাপার দেখিয়া বলিলাম, 'কেন পুনঃ পুনঃ উহাকে বাঁচাইতে গিয়া কষ্ট পাইতেছেন?'—উত্তরে সাধু বলিলেন, 'আমি আমার ধর্ম্ম পালন করিতেছি, ও উহার ধর্ম্ম পালন করিতেছে'—

হামারা বৃত্তি তো এহি হায়—উস্‌কা বৃত্তি ও কর্‌তাহায়"।

লাক্ষ্ণৌয়ে অবস্থান কালীন হরিমহারাজ একদিন অতি প্রত্যুষে শৌচ করিতে গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'একখানি পাথরের উপর বসিয়াছি—এমন সময় দেখি খুব বড একটা বাঘ একটু উঁচুতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতেছে। তাহার দৃষ্টি এবং চাল চলন এমনই বীরত্ব ব্যঞ্জক যেন সে তুনিয়ার কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছে না'—এই পর্য্যন্ত বলিতেই শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ' আপনার ভয় হইয়াছিল না?'—'ভয়, কি হে, আমি মুগ্ধ হইয়া তাহার দৃপ্ত তেজঃ দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখোচোখি হইবা মাত্র সে কাল বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।'

পাহাড়ে তপস্যা কালে হরিমহারাজ যে সকল সাধু দেখিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে তিনজন সাধুর খুব প্রশংসা করিতেন—উঁহাদের নাম রামাশ্রম, কেবলাশ্রম ও বিজ্ঞানানন্দ। শেষোক্ত সাধু কৌপীন মাত্র সম্বল হইয়া যথেচ্ছ বেড়াইতেন অথচ তাঁহার ষডদর্শন সম্যক্‌ আয়ত্ত ছিল। উপনিষদ্‌, বেদান্তসূত্র ও গীতার শাঙ্করভাষ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোথায়ও পুস্তক দেখিতে হইত না। অনর্গল সংস্কৃত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলিতে পারিতেন। ভ্রমণ কালে যখন যেথানে থাকিতেন, সাধুরা সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। ইনি টিহিরী রাজার গুরু ছিলেন, কিন্তু বহু অনুরোধ সত্বেও কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।'

শিব সুন্দর

হে তরুণ শিব সুন্দর হে মোর আরাধ্য ধ্যেয়,
তোমারি মাঝারে রয়েছে আমার, সকল সিদ্ধি শ্রেয়?
তুমিই আমার সন্ধ্যাশ্যামল,
রবিকর রাঙা রক্ত কমল,
শুশ্রূষার অরুণ লালিমা চন্দ্রমা সুধাধারা,
তোমারি মাঝারে যা আছে আমার হতে চায় আমাহারা।

রক্ত কিরণ জড়ায়ে তপন ডুবিছে অস্তাচলে,
তোমারে খুঁজিয়া নয়ন ফিরিছে দূর দিগন্ত তলে,
শান্ত সন্ধ্যা আঁচল ভরিয়া
পুষ্প পরাগ এনেছে তুলিয়া,
উজলে লক্ষ লক্ষ দীপালী সুনীল আকাশ পুর,
আসিবে না তুমি বক্ষে আমার হবে না আঁধার দূর?

শ্রীমনোরমা দেবী

শ্রাবণের সুরে

ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্
শ্রাবণের সুরে—
স্পন্দিয়া উঠে প্রাণ
হৃদয়ের পুরে !

বিদ্যুৎ-জ্যোতি ওই
আঁধারের বুকে
ক্ষণেকের প্রভা কেন ?
সুখ চিরদুখে ?

কে যেন আসিতে ছিল
আসে নাই আজো
শ্রাবণের সেই সুর
তারি লাগি বাজে।

আমার হৃদয় ছায়া
আকাশের মাঝে।
তাই শুনি সেই সুর
শ্রাবণের সাঁঝে !

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্
সারা দিন রাতি।
জ্বলিয়া নিভিয়া যায়
হৃদয়ের বাতি।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজে
ফিরিয়া ফিরিয়া
সারা মন প্রাণ কাণ
হৃদয় চিরিয়া।

আরো কত দেরী ওগো
আরো কত দিন
কবে শোধ হবে হায়
অশ্রুর ঋণ ?

ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্
নূপুরের সুর
অনাহত ঝঙ্কার
কই কত দূর ?

ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্
অশ্রুর সুর
কাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন
আরো কত দূর ?

ঝর ঝর ঝর ঝর
ঝম্ ঝম্ ঝম্
থর থর থর থর
থম্ থম থম্।

আকাশে সজল কালো
কুণ্ডলী মেঘ
সহসা ফুলিয়া উঠে
বাড়ে বায়ু বেগ।

থামিতে না পারে ওগো
থামিতে না চায়।
অঝোরে ঝরার ধারা
ঝরিয়া সে যায়।

আপনারে উজাড়িয়া
ঢালিতে সে চায়
নিঃশেষে সবটুকু
ডালি দিয়া যায়।

ঝর্ ঝর্ ঝম্ ঝম্
শ্রাবণের সুর
সারা মন প্রাণকাণ
করে ভরপুর।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীম—স্মৃতিকথা

শ্রীলাবণ্য কুমার চক্রবর্ত্তী, সাহিত্য-বিশারদ, অধ্যক্ষ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, শ্রীহট্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ সাবিত্রী অমাবস্যা তিথি, যে তিথিতে ভারতেরই মা—সাবিত্রী মৃত পতিকে যমের কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আপন পাতিব্রত্যে, আপন সাধনায় স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি করাইয়াছিলেন, সেই তিথিতে—মহারাজের তাড়া খাইয়া ক্রম প্রকাশিত শ্রীম—(স্মৃতি কথা) লিখিতে বসিলাম।

প্রণাম করিলাম সেই চরণ যুগলে যা হয়ত কত কাল—কে জানে কত কাল—দর্শন স্পর্শনের জন্য লালায়িত ছিলাম বা মা আমায় লালায়িত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। প্রণামান্তে মায়ের শ্রীমুখের দিকে তাকাইলাম, জোর করিয়া নহে, সসঙ্কোচে নহে, সম্পূর্ণ সহজভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে। প্রায় ২৩।২৪ বৎসরের কথা—তাই ঠিক মনে পড়িতেছে না—কিছু বলিতে পারিয়া ছিলাম কি না; তবে মার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী যা জানিয়া ছিলাম তাহা সুস্পষ্টই মনে আছে। আজও যেন কানে বাজে। "বাবা কলকাতায় তোমার হবে, এ স্থান অন্নপূর্ণা—বিশ্বেশ্বরের, আর কারো অধিকার নেই!" হবে তো?

এতেই যেন সারাটা প্রাণ এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল. আর কিছু জানিবার বা বলিবার প্রত্যাশা রহিল না। শুধু বলিলাম, "আচ্ছা মা"।

ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া চলিয়াছি। প্রাণ আনন্দে ভরপুর। হঠাৎ যেন একটা খট্‌কা বাধিল, কি বোকা আমি? জোর করিয়া ধরিলে বা হয়ত আবার বলিলেই মা "কলকাতায় হবে" বলিতেন না। মন কেমন একটা হর্ষ-বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের গলিতে পৌঁছিয়াছি। মাষ্টার মহাশয়, "এই যে", বলিয়া সস্নেহে কাঁধে হাত রাখিলেন। বলিলেন, "গিয়েছিলেন মাকে দর্শন করতে?" আমি উত্তরে শুধু ছোট্ট একটী "হাঁ" বলিলাম। "দর্শন হয়েছে ত?" "হয়েছে মাষ্টার মশায়"। "কিন্তু মনটা অমন দেখাচ্ছে কেন, রাজ রাজেশ্বরীর শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করে এলেন তবুও অমন কেন?" সত্য সত্যই আমার চোখে জল আসিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলাম, "মাষ্টার মশায়! কি বোকা আমি! মা বল্লেন, 'কলকাতায় হবে', আর আমি অমনি ঠাণ্ডা!" মাষ্টার মহাশয় মৃদু হাসিলেন। একটুখানি নীরব থাকিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "চন্দ্র সূর্য্য রসাতলে যাবে, পৃথিবী উল্টে যাবে তবুও মা-র বাক্য ব্যর্থ হবে না। হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে, ধন্য আপনি!" আর সঙ্গে সঙ্গে আমি গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলাম। কি বাক্য! কি স্পর্শ! আর কি মন! আবার যেন এক লাফে আমার মনটি নিরানন্দের মাঝখান হইতে আনন্দের উঁচু ধাপে উঠিয়া পড়িল। তারপর গল্প করিয়া করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিলাম। কি ভাবে মাকে দেখিলাম ইত্যাদি সব বলিলাম। মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "দেখলেন ত? কালকের দেখা আর আজকের দেখা?" "হাঁ মাষ্টার মশায়, দেখলাম আরো কিছু যেন বুঝলাম। তারপর বলিলাম, "সেই 'ভক্ত কাহিনীটী মনে পড়ছে মাষ্টার মশায়,

'দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন। কয়েকজন তপস্বী নারদের মারফৎ তাঁদের আর কত দিন বাকী—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন। নারদ ঘুরে এসেছেন, যাঁর যাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁদের বলছেন—তোমার এত বছর, তোমার এত বছর, তোমার এত বছর ইত্যাদি। সব একে একে শুনছেন আর মুখ ভার করছেন। কেউ কেউ বা বিরক্তি প্রকাশ করছেন। এত কঠোর তপস্যা করলুম, তবুও এতটা বাকী? তারপর সর্ব্ব শেষ যিনি—তিনি একটী তেঁতুল গাছের তলায় বসে তপস্যা করছিলেন। দেবর্ষি তাঁকে জানালেন এই তেঁতুল গাছে যতটী পাতা তত বছর পরে তোমার হবে। যেই শুনা অমনি ভক্তটী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, আর বলতে লাগলেন,—'শান্তিরাম তুই বগল বাজা, বৈকুণ্ঠে তোর ভিজলো গাঁজা'।"

মাষ্টার মহাশয় আমার দুই বাহু তাঁহার দুই হাত দিয়া ধরিয়া আমার মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন, আমি মাথা নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেই তা করিতে না দিয়া (ইহা তাহার চিরন্তন স্বভাব ছিল) বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিলেন। ভাব প্রবণ আমি—বেশ একটু কাঁদিলাম।

সে দিন রাস পূর্ণিমা। অদ্বৈতাশ্রমে কৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন হইবে—রাত্রে। পূর্ব্বাহ্নেই মাষ্টার মহাশয় আমাকে উপস্থিত থাকিতে বলিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরাত্রিক দর্শনের পর অদ্বৈতাশ্রমে চলিয়া গিয়াছি। এই দিন আমার পূজনীয় বড় কাকা এবং কাশীধামে সমাগত আমারই একটী শিক্ষক বন্ধুকে সঙ্গী নিয়াছি। হিন্দুস্থানী দলের দ্বারা হিন্দিতে লীলা কীর্ত্তন হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় আমাকে টানিয়া নিয়া তাঁহার কাছেই বসাইয়া ছিলেন। হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে তখন আমার জ্ঞান চমৎকার? কিছু কিছু বুঝি, "হামকো মারা, আমার ভাইকেও ঠেলে ফেলে দিলে", এই গোছের। যাক্—

শ্রীমতী বৃন্দাকে বলিতেছেন "রে সখি রে সখি (এখনও বেশ মনে পড়িতেছে) ইত্যাদি কিছু কিছু বুঝিতেছি আর ভাব ভঙ্গীতে বাকীটুকু "অনুমানেন সিদ্ধতি"। মাষ্টার মহাশয় আমার দুরবস্থা বুঝিয়া সহাস্যে প্রত্যেক বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। অটুট ধৈর্য্যের সহিত অভিনয় দর্শন করিয়া বাসায় গভীর রাত্রে ফিরিলাম। মাষ্টার মহাশয় ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া গেলেন। কাকাকে ও বন্ধুকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিলেন। মাষ্টার মহাশয় ফিরিতেই দুইজনে সমস্বরে বলিলেন—"আহা কি চমৎকার লোক!"

কলিকাতা। মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী। অপরাহ্ণ ৫টা সাড়ে পাঁচটা। মাস ঠিক মনে নাই। আরো জন কয়েক ভক্ত সহ মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি। খবর পাইলাম, তিনি ছাদের উপর আছেন। গিয়া দেখিলাম আরও কয়েক জন ভক্ত সঙ্গে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া আছেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ চলিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়াই সাদরে আহ্বান। প্রণাম করিতে যাইতেছি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "এখানে এরকম করলেই হয়" বলিয়া সহাস্য বদনে কর মর্দ্দন করিলেন। আমরাও হাসিয়া বসিয়া পড়িলাম। কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'দেখছেন, এখান থেকে কলকাতাকে আর এক রকম দেখায়। আবিলতার ঊর্দ্ধে যেন সব—অনাবিল। স্বচ্ছ আকাশতল অদূরে ঐ মা ভাগীরথী। বেশ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই মহারথ ভগীরথের কথা মনে পড়ে। কি বলেন? পতিত উদ্ধারের জন্য মা গঙ্গাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসেন। আর ওর পেছনে কি কঠোর তপস্যা রয়েছে—কি বলেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, মাষ্টার মশায়'।

সে কি পবিত্র কাহিনী! তার পর ঠাকুর, স্বামিজী মা, গীতা ভাগবতাদি সম্বন্ধে কত কথা হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই গানের ভক্ত বন্ধুটির কথা হইল। বলিলেন, 'আপনারা দুটী ভাই প্রথম দেখাতেই মনে জেগেছিল! হাঁ, আর এ ঠিক তাই। শুধু এজন্মে নয়, বার বার। বাহিরের চেহারাতেও কি অপূর্ব্ব মিল'; ইত্যাদি। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে যতবার আমরা তাঁর কাছে গিয়াছি বা আমাদের এ অঞ্চলের কেউ গিয়াছেন প্রায় ততবারই তিনি আমাদের এই ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। সন্ধ্যা হইল। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে কেউ কেউ দুই একটী ভজন গাহিলেন। কথামৃত লেখক কর্ত্তৃক কথামৃত খানিকটা পাঠ হইল। আনুষঙ্গিক অনেক জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্তের দৃশ্যও বলার সঙ্গেসঙ্গে মানস-পটে অঙ্কিত হইল। ঠাকুর দেখিতে কেমন ছিলেন? ফটো দেখিয়া কি ঠিক বুঝি? আপনি একটু বর্ণনা করুন?—জিজ্ঞাসা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় একটু অস্বাভাবিক গম্ভীর হইলেন। আমাদেরও কেমন একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল এবং একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরমুহূর্ত্তে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, —'সাধ্যাতীত', তারপর আবার বলিলেন—'রাজা—মহারাজ, রামলাল দাকে দর্শন করেছেন ত?' উত্তরে 'হাঁ' শুনিয়া বলিলেন, 'তবে তাঁর কিরূপ ছিলেন তার আভাস পেয়েছেন। ধ্যান করুন, জানতে পারবেন। আর তাঁর সকল ভক্তের চোখে মুখেই তাঁর ছাপ একটু আধটু আছে, "তদ্ভাব ভাবিত, তদাকারকারিত" কিনা? কি বলেন?'

আমরা আর কি বলিব? এ ভাবের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তারপর ফিরিমুখ করিয়া বাসায় ফিরিতে হইল।

বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব। আজ মহাষ্টমী। প্রসাদ গ্রহণান্তর বিকালের দিকে হেলান বেঞ্চে বসিয়া আছি। মহাপুরুষ মহারাজ ও মাষ্টার মহাশয় কাছেই বসিয়া আছেন। এ কথা সে কথা চলিতেছে। বাবুরাম মহারাজ; তারপর শরৎ মহারাজ—একে একে আসিয়া বসিয়া আছেন। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহী-ভক্ত অনেক আসিয়া জুটিলেন। আপ্‌না আপ্‌নি যেন একটী আলোচনা সভার মত দাঁড়াইল।

অন্য সম্প্রদায়ের একটী মাদ্রাজী ভক্তের কথা হইতেছে। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, লোকটার কি আচার—নিষ্ঠা। এরূপ বহিরাচারকে "ছুঁৎমার্গ রোগ বলা যায় না। ওর সব ঠিক ঠিক, খাঁটী! সরল বিশ্বাস আছে। তাই ওর হয়ে যাবে। তা না হলে বলতুম নিষ্ঠা নয় বিষ্ঠা।" মহাপুরুষ মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গেসঙ্গে আমরাও খুব হাসিলাম। বাবুরাম মহারাজ একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "আমাদের বাবা ও সব নিষ্ঠা ফিষ্ঠা চুলোয় গ্যাছে, ঠাকুর আছেন, মা আছেন বাস্"—বলিয়া একটু খানি গম্ভীর থাকিয়া মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর ওঁরইত কৃপায় সব। ইনিই ত ঠাকুরের কাছে ধরে নিলেন তাই—" মাষ্টার মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "শুদ্ধ সত্ত্ব আধার! তাঁর সঙ্গে করে আনা! আমি আবার কে? আমাকে কেন অপরাধী করা হচ্ছে?" বাবুরাম মহারাজ একটুও দমিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ আগে আপ্‌নার কৃপা, তারপর ঠাকুরের। আর শুধু কি কৃপা করে ধরে নিয়ে ছিলেন? মাঝে মাঝে স্কুল হতে ঠাকুরের কাছে পালিয়ে যাবার সুযোগটী কি দেন্ নি? নিজেও সঙ্গে করে কি পালিয়ে নেন্ নি?" মাষ্টার মহাশয় এবার খুব হাসিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

আমরাও সকলে খুব প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া নিলাম এবং খুব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম।

শ্রোতাদের মাঝখান হইতে কে একজন বলিয়া উঠিয়া ছিলেন—ঠিক মনে পড়িতেছে না, 'তাইত নাম হয়েছে "ছেলে ধরা মাষ্টার"।' আবার উচ্চ হাসি উঠিল। শরৎ মহারাজও মৃদু মৃদু হাসিতে ছিলেন। সে সব দৃশ্য এবং সে সব কথা এখনও চোখে ভাসিতেছে, কাণে বাজিতেছে। আহা! কি আনন্দের দিনই না গিয়াছে। এখন এ সকল আমাদের ধ্যানের বস্তু।

ভক্ত পাঠক-পাঠিকা কি বলেন? আজ এই পর্য্যন্ত—তাঁর ইচ্ছা থাকেত আরো লিখাইতে পারেন।

কবি তাইমনুভার

That in its infinite fulness of
loving grace,
Foldeth the worlds that are
all things,
Grace that graciousness willeth
all life to lie,
In Him the life of life's essence——……

—যাঁহার পরিপূর্ণ অনন্ত প্রেম ও কৃপায় নিখিল বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্য উদ্ভূত হইয়াছে এবং করুণার মহিমাগুণে স্থিত রহিয়াছে তিনিই একমাত্র প্রাণের প্রাণ ও জীবন সত্তার মূলখনি।

—তাইমনুভার

দাক্ষিণাত্যের তামিল মহাপুরুষগণের মধ্যে তাইমনুভার একাধিক কারণে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। ভগবৎ সাধনা অনেকেই করেন—অনুভূতি সম্পন্ন মহাত্মাও অনেক মিলে কিন্তু সেই সাধনা ও অনুভূতির প্রকৃতি ও প্রখরতার উপর নির্ভর করে অপর একটী জিনিষ যাহা সকল সাধকে—সকল সিদ্ধে মিলে না—উহা হইতেছে তাঁহাদের অমানুষিক ব্যক্তিত্ব। তাইমনুভারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এইরূপ এক দৈব-ব্যক্তিত্ব যাহা সাধারণ সাধু মহাপুরুষ হইতে তাঁহাকে স্পষ্টতঃ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই অলৌকিক ব্যক্তিত্বটীর মূল অন্বেষণ করিলে তাইমনুভারের সাধনা ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্যকেই দায়ী করিতে হয়। সে সাধনায় ছিল আরাধ্যের প্রতি এমন একটা সহজ অথচ তীব্র আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এমন একটা দৃঢ়তা, অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা সেই দৃঢ়তায় কোন অস্বাভাবিকতা নাই, কোন গুপ্ত রহস্য নাই—যাহা স্বতঃই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। আবার এই সহজ সাধনা হইতে যে অনুভূতির বিকাশ হইল তাহাও তাহার স্বকীয় মাধুর্য্যে অনুপম। বাংলায় রামপ্রসাদ, জয়দেব উত্তর ভারতের তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈএর যে অনুভূতি দক্ষিণ ভারতের এই আড়ম্বরহীন আধ্যাত্মিক জীবনটীতে সেই ধরণেরই অনুভূতি—সেই আপন ভাষায় সুললিত গীতি ছন্দে অন্তরের উদ্বেলিত ভাব প্রকাশ—সেই আত্মহারা ভালবাসায় প্রিয়ের সহিত নিশিদিন একাত্মতা—কখনও অশ্রুজলে, কখনও উচ্ছ্বসিত হাস্যে—আবার কখনও বা উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আস্বাদন।

তাইমনুভার ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা মাদুরার রাজার প্রধান

মন্ত্রিরূপে প্রায় ২৭ বৎসর কাল কাজ করেন। সে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। কথিত আছে তিনি তাঁহার প্রথম পুত্রকে অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পোষ্যপুত্ররূপে দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়ায়, ত্রিচিনাপলীর নিকটবর্ত্তী 'তাইমনুভার' নামক মন্দিরে যাইয়া সেই দেবতার নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। দেবতা তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। অচিরে যে পুত্র সন্তান জন্মিল তিনিই আমাদের কবি তাইমনুভার। বলা বাহুল্য ইষ্টদেবতার নামানুসারেই পিতামাতা পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন।

তাইমনুভার বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণে সকলের অতি আদরের পাত্র হইয়া উঠেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার খুবই মনোযোগ ছিল। ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মে। এই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে মাদুরার রাজা বিশেষ সন্তপ্ত হন এবং তরুণ তাইমনুভারকেই তাঁহার পিতার শূন্যস্থানে মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। ১৪।১৫ বৎসরের বালকের উপর রাজত্ব পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত হইল—তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিতই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু অন্তরের রুদ্ধ আধ্যাত্মিক আবেগ তাঁহাকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে কতক্ষণ থাকিতে দিবে? ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল—তাইমনু তীর্থ ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ লাভ করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

যে ভগবানকে আন্তরিক ভাবে লাভ করিতে চায় ভগবান তাহার পথের বাধা সব দূর করিয়া দেন। তাই সিদ্ধগুরুর কৃপালাভ বুঝি তাইমনুর পক্ষে সহজেই হইল। তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে তাইমনুভার মৌনগুরু নামে খ্যাত জনৈক যোগীর সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। গুরু উপযুক্ত শিষ্যকে নিজের কাছে রাখিয়া অশেষ যত্নে ভগবৎ সাধনা অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, গুরু তাঁহাকে পুনরায় গৃহে যাইয়া আরও কিছুদিন রাজমন্ত্রির কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন! যাইবার সময় একটী ক্ষুদ্র উপদেশ "চুম্মা ইরু"—"স্থির হও" শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তবীরের অনাবিল চিত্তে ঐ দুটী শব্দ বিশাল আধ্যাত্মিক ভাব আনয়ন করিয়া প্রচ্ছন্ন জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বালিত করিল। তাঁহার পিতৃনিবাস মাদুরার কাছে এক নির্জ্জন পল্লীতে তাইমনুভার সাধন ভজনে ডুবিয়া গেলেন। সিদ্ধগুরুর তপোবিশুদ্ধ বাণী হইতে যে চেতনমন্ত্র তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞান দূর করিয়া জগৎ রহস্য একদিন তাঁহার নিকট প্রকাশিত করিয়া দিল। অনন্ত বিরাট পরমেশ্বরকে, এই সান্তপ্রকৃতির প্রতি অণুপরমাণুতে প্রেমসত্তারূপে যে অনুভব, পরে তাঁর কবিতার ছন্দে ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সমারম্ভ বুঝি এই পল্লীকুটীরেই হইয়াছিল।

এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল।

যে রাজার মন্ত্রিরূপে তিনি কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইল। রাজমহিষী অনেককাল হইতেই তাইমনুভারের অতুল কমনীয়রূপে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন—কিন্তু তাহা প্রকাশের অবসর হইয়া উঠিতেছিল না। এখন রাজার মৃত্যুতে রাজমহিষী তাঁহাকে রাজ্যের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করেন ও তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু তাইমনুর হৃদয়ে যে উন্নত ভগবৎপ্রেম বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্থিরচিত্তকে রাজমহিষীর এই পার্থিব প্রলোভনে বিন্দুমাত্রও

বিচলিত হইতে দিল না। পরন্তু রাণী ধর্ম্মজীবনের সারবত্তা অনুভব করিয়া নিজের দুর্ব্বলতায় বিশেষ লজ্জিতা হইলেন এবং তাইমনুর নির্দ্দেশানুযায়ী বিশেষ আগ্রহে ভগবদ্‌ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই ঘটনা তাঁহার সংসার-বিরাগকে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিল। তিনি পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। শ্রীরামেশ্বর ধামে কিছুকাল সাধুসঙ্গ ও ভজনে অতিবাহিত করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। দৈবের লিখনে এই সময়ে তাঁহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইল। কিন্তু সংসার তাঁহার জন্য ত নহে, তাই দেখিতে পাই বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি গুরুর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। এবার গুরু আর গৃহে ফিরিতে বলিলেন না—তাইমনুভাবের চিরঈপ্সিত সন্ন্যাসধর্ম্মে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন।

তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের ইতিবৃত্ত ভাল পাওয়া যায় না।

সাধক জীবনের ঘটনাবলী বিশদ লিপিবদ্ধ না থাকিলেও তাঁহার প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কঠোর সাধনের ফলে কিরূপে তাঁহার ভগবদ্‌রস পিপাসু হৃদয়কে অভিন্ন প্রীতিতে একীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সঙ্গীত তামিল ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিতেছি।

I neared the grace of God its vastness
Its stretches of unending bliss,
And lo my darkness far was driven
I saw His beauty, only His—

করুণা তাঁহার বিরাট, অশেষ
ছড়ায়ে রয়েছে অসীম বিশ্বে—
জীবনের যত কাল ঘন মেঘ,
সহসা কাটিল তাহার স্পর্শে।
সহসা খুলিল মম জ্ঞান আঁখি
চাহিয়া দেখিনু তাঁহার কান্তি
ঝলকি উঠিছে যত মাধুরিমা
যত আনন্দ, যতেক শান্তি।

As I from self detatched was growing
My love for Him began to grow
And He, one day in joyous silence
Made me with him oneness to know

অহমিকা, মোহ রেখেছিল বেঁধে
মোর চিত্তরে জগৎ প্রতি—
যাহা একদিন দিলেম ছাড়িয়ে
হৃদে দেখা দিল তাঁহার প্রীতি।
একদা তখন সুগভীর ধ্যানে
বাজিল হৃদয়ে জ্ঞানের ছন্দঃ—
তাঁহাতে আমাতে নাহি কোন ভেদ
চির-মিলনের মহা আনন্দ।

শৈব পরিবারের মধ্যে তাইমনুর জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা। কিন্তু যে কোন দেবদেবীকে তাঁহারই ইষ্টের প্রকাশ বলিয়া উপাসনা করিতে তাঁহার উদার হৃদয় কখনও সঙ্কুচিত হয় নাই। এক মহা সমন্বয়ের ভাব তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকটী কবিতায় ইহা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে।

Thou art of three-fold form unfading,
O Form that form hast none,
Thou art the splendour of all wisdom,
And Thou, Oh wisest one,
Hast in "the six great faiths" unfolded—
Thyself its God to each

"তুমি অরূপ আবার কখন কখন স্বরূপ। প্রসিদ্ধ যে তিনটী মূর্ত্তিতে ভক্তেরা উপাসনা করেন, সেই মূর্ত্তিত্রয় তুমিই ধরিয়াছ। তুমি সকল জ্ঞানের খনি, জ্ঞানময় পরমপুরুষ, প্রসিদ্ধ ষড়্‌-ধর্ম্মমতের প্রত্যেকটীতে তুমিই একমাত্র উপাস্য।"

According unto each man's seeking
That thou becomest unto each
So wide thy grace, oh, gracious Father
Which he in worship thinks of thee

"যিনি যে ভাবে তোমাকে পাইতে চান তুমি সেই ভাবেই তাহার নিকট প্রকাশিত হও। হে করুণাময় পিতঃ! তোমার একি অপরিসীম কৃপা নতুবা সাধকের পূজাধ্যানানুরূপ কেন তুমি মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে?"

এই পদগুলির সহিত গীতার "যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত" ইত্যাদি শ্লোকের ভাবের কি সুন্দর সামঞ্জস্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "উপর থেকে দেখলে মাঠের আল নজরে পড়েনা—সব ক্ষেত একাকার মনে হয়—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে শিব বিষ্ণু প্রভৃতিতে পার্থক্য বুদ্ধি তিরোহিত হয়।" দাক্ষিণাত্যের এই ভক্তকবিতে সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্যক স্ফুরিত হইয়াছিল—তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। শৈব, বৈষ্ণব, মাধ্ব, রামানুজী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতির মধ্যে নিত্য কলহ বিদ্বেষে পরিপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে কি এই উদার মহাপুরুষের জীবনাদর্শ ও বাণী সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে সক্ষম হইবে না?

তাইমনুভারের সঙ্গীতাবলী তামিল সাহিত্যে অমর। কাব্যের সরসতার সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের এরূপ সংযোগ খুব কম কবিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকের হৃদয়ে জাগ্রত করে, তাহারা এক অননুভূতপূর্ব্ব ভগবদনুরাগ, যাহা—তাঁহার নিজের জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ, সরল হইয়া গিয়াছিল। নিজের এই জাগ্রত অনুভূতি দিয়াই বুঝি তিনি তাঁহার কবিতার অমর-ছন্দঃ রচনা করিয়াছিলেন—সেই জন্যই বুঝি উহারা এত প্রাণস্পর্শী, এত দিব্যপ্রেরণার দ্যোতক।

অমোহানন্দ

স্বামী যোগানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গত আশ্বিন মাসের পর হইতে)

অতিসামান্য খুঁটী নাটী কাজেতেও ঠাকুরের কিরূপ প্রখর দৃষ্টি ছিল—তাহা স্বামী যোগানন্দ সম্পর্কিত আরও দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে বুঝা যাইবে।

যোগেন মহারাজ প্রথম প্রথম খাওয়া দাওয়ায় বিশেষ নিষ্ঠাবান ছিলেন। এমন কি কাহারও বাটীতে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। ঠাকুরও তাঁহার এইরূপ আচারের কথা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যোগেন মহারাজের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। মাত্র জলযোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহার আচার নিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় উত্থাপন করেন নাই। সেইজন্য বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন—"ওগো, এর (যোগেনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয় নি,

একে কিছু খেতে দাও।" ঠাকুর জানিতেন— পরম ভক্ত বলরাম বাবুর বাড়ীতে ফলমূল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে যোগেন মহারাজ আপত্তি করেন না। বলরাম বাবু ঠাকুরের কথায় যোগেন মহারাজকে সাদরে জল যোগ করাইলেন। ঠাকুর কাহারও স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না—এইটিই ছিল তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

আর একবার স্বামী যোগানন্দ—'কাম কি করে যায়',—এই প্রশ্ন ঠাকুরকে করেন। উত্তরে ঠাকুর কি ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ হইতে দেওয়া গেল— "স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্প দিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহারেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছেন। যোগেন স্বামিজী বলিতেন যে তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—ঐ সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামিজী বলিতেন—'ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লেন—'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা আমার একটুও মনের মত হল না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া টিয়া জানেন না কি-না, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরি নাম করলে আবার কাম যায়—তা হলে এত লোক ত কচ্চে, যাচ্চে না কেন? তার পর একদিন কালী বাড়ির বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বল্‌তে লাগলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের ওপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না'। আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বল্‌ছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা— কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি। আমি তাঁর কাছে আসি বা নাই আসি, তাতে তাঁর যে কিছু লাভ লোকসান নেই—একথা মনেও এল না। এমন পাজি সন্দিগ্ধ মন ছিল। ঠাকুরের কৃপার শেষ নেই, তাই এত সব অন্যায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম— উনি যা বলেছেন তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে এক মনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্প দিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।"

ঠাকুরের শিক্ষা পদ্ধতির আর একটী ঘটনা

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ মন্দির হইতে পূজার প্রসাদের কিছু অংশ ঠাকুরের নিকট আসিত। একবার ফলহারিণী পূজার পর দিন সেই প্রসাদ ঠাকুরের নিকট না আসাতে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল—

"প্রায় বেলা ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে,

তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা এখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—'সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তর খানায় খাজাঞ্চি মহাশয়ের নিকট যথা-রীতি প্রেরিত হইয়াছে, সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে, কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্ম এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।' রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন। এই রূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না, তখন চটি জুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'হ্যাগা, ও ঘরে (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হলো নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে—বড় অন্যায় কথা। খাজাঞ্চি মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'এখনও আপনার ওখানে পৌঁছায় নি? বড় অন্যায় কথা। আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।'

"স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সৎকুলে বনেদি সাবর্ণি চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুর বাড়ীর খাজাঞ্চি, কর্ম্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং রাসমণির বাগানের এক প্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ী বলিলেও চলে; কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া আসার বেশ সুবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুর বাড়ীর লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে? অতএব 'প্রসাদী ফল-মূলাদি কেন আসিল না' বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন—'তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জিনিষ! আপনার তো ও সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই ত খান না—তখন নাই বা দিলে?' আবার ঠাকুর যখন তাঁহার ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরে নিজে খাজাঞ্চিকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগেন ভাবিতে লাগিলেন—'কি আশ্চর্য্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টান্নের জন্ম এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হতে দেখিনি তাঁর আজ এ ভাব কেন?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—'বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন আর যত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি। বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে ত! তাই আর কি! বড় বড় বিষয়ে ব্যস্ত না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্ম ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তা নইলে নিজে ওসব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগ্‌বে না, তবু তার জন্ম এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস।'

"যোগেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'কি জানিস্, রাসমণি, দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদী জিনিষ আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়; ঈশ্বরকে

জানবে বলে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্ম দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তারপর ওরা (ঠাকুরবাড়ীর বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয় ? চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যে জন্ম দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।'

"সামান্য একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে এতটা গভীর রহস্য! মুগ্ধ হইয়া যোগেন মহারাজ ভাবিলেন—'ঠাকুরকে বুঝা দায়'।"

এই ভাবে যোগেন মহারাজ দক্ষিণেশ্বরের সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া, নিত্য নূতন জিনিষ ঠাকুরের নিকট হইতে শিখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে এবং তৎপরে কাশীপুরের বাগানে নীত হইলেন। এই সময় ঠাকুরের শিষ্যেরা যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়াছে। কয়েকজন মাত্র যুবক আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। কঠোর পরিশ্রম করিয়া যোগেন মহারাজের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। ঠাকুরের সেবাই তখন অতি কষ্টে চলিতেছে। যোগেন মহারাজের সেবা করিবে কে ?

ঠাকুরের শরীর ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। চিকিৎসায় কোন উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মহাসমাধির ৮।৯ দিন পূর্বে একদিন হঠাৎ ঠাকুর যোগেন মহারাজকে পঞ্জিকা আনিয়া ২৫শে শ্রাবণ হইতে প্রতি দিনের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। যোগেন মহারাজ ২৫শে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্যান্ত সব দিনের বিশেষ বিবরণী পড়িয়া শুনাইলেন। ১লা ভাদ্রের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি শুনিয়াই ইঙ্গিতে ঠাকুর পঞ্জিকা রাখিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই এই সঙ্কেতের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন! সত্য সত্যই ১লা ভাদ্র (১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬ খৃঃ) ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহ রাখিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শেষদিন পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ঠাকুরের অভাবে একেবারেই শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। সেই জন্য যোগেন মহারাজ, লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রায় এক বৎসর বাস করেন। শ্রীশ্রীমা জপ-ধ্যানে প্রায়ই বিভোর, যোগেন মহারাজ অহর্নিশ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং নিজেও এই সময় কঠোর তপস্যা করেন।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে লইয়া বেলুড় ঘেয়াঘাটের নিকটে ছোট একটী বাড়ীতে থাকেন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার কিছুদিন পরে বরাহ নগরে মঠ স্থাপিত হয়। সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই একজন সন্ন্যাসী আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য যোগেন মহারাজকে সাহায্য করিতেন। কিছুদিন পর শ্রীশ্রীমা জয়রাম বাটী ফিরিয়া যান।

ইহার পরে আনুমানিক ১৮৯১ খৃঃ যোগানন্দ ৺কাশীতে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। সেখানে যে ভাবে কঠোর সাধনা করেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। নির্জ্জন একটি বাগানে, দিনের পর দিন, জপধ্যানে বেহুঁস হইয়া থাকিতেন। খাবারও সময়টুকু পর্য্যন্ত দিতে চাহিতেন না। একদিন ভিক্ষা করিয়া শুকনো রুটী রাখিয়া দিতেন এবং উহাই জলে ভিজাইয়া কোনরূপে দু-তিন দিন ক্ষুধার জ্বালা মিটাইতেন। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের তখন দৈনন্দিন আহারও যেন একটি বাজে কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। শরীরের দিকে একেবারেই নজর রহিল না। কঠোর তপস্যায় শরীর বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমাশয় প্রভৃতি নানাবিধ পেটের অসুখে এই সময় হইতেই ভুগিতে আরম্ভ করেন।

(ক্রমশঃ) বামদেবানন্দ

উত্তর কাশীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আহারের পর বিশ্রামান্তে আমরা দর্শনাদি করিতে বাহির হইলাম। ৺বিশ্বনাথ, ৺অন্নপূর্ণা, ৺কেদারনাথ ও অন্যান্য দেববিগ্রহ দর্শন করিয়া আমরা উজালিতে গমন করিলাম। সেখানে আমাদের সংঘের দুইজন সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত ছিলেন। অনেক বৎসর পর অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সপ্রেম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন একটি কুটিয়ায় এবং আর একজন দেবীগিরিজীর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথম জনের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সাদরে নিজ কুটিয়ার অভ্যন্তরে নিয়া আমাদিগকে বসাইলেন। দ্বিতীয় জন সংবাদ পাইবামাত্র আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। কুটিয়াটি যেমন নীচু, তেমন ছোট, একটি গুহা-বিশেষ বলিলেও হয়। উহার মধ্যে এক দিকে শোবার কম্বল, অপর দিকে ধ্যানের আসন ও নিত্য পাঠের জন্য কতকগুলি বেদান্ত গ্রন্থ ছিল। প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে এমন ভাবে রক্ষিত ছিল যেন ব্যবহার কালে কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে।

সন্ন্যাস-জীবনের শান্তি ও আনন্দ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। বৈরাগ্যের কঠিন আবরণের মধ্যে অন্তরে যে সরস প্রফুল্লতা বিরাজ করে তাহার তুলনা কোথায়? বিষয়চিন্তা হইতে উপরত আত্মস্থ পুরুষের চিত্ত কি পবিত্র প্রেমের উচ্ছ্বাসেই না পূর্ণ থাকে! তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন, সমস্ত সংসার-সুখ তাতে তুচ্ছ, অতি হেয় বোধ হয়। আত্মজ্ঞানের উন্মেষমাত্রে মানুষ নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ জানিয়া সমস্ত বন্ধনের অতীত হইয়া যায়। এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। অবশেষে আমাদের একজন তাঁহার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন কঠোরতা করে আপনার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, এইবার চলুন কাশীতে। সেখানে আশ্রমে থেকে সাধন ভজন করবেন। কি হবে শরীরটাকে কষ্ট দিয়ে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "এখানে আর কোন কষ্ট নেই, কেবল শীতকালে বরফের মধ্য দিয়ে দু মাইল হেঁটে প্রত্যহ সত্রে গিয়ে ভিক্ষা আন্‌তেই মন নারাজ হয়। আর বর্ষাকালে কাদাবালি মিশ্রিত গঙ্গাজলে তৈরী ডাল রুটি হজম করা বড় শক্ত। তবু, দাদা, এখানে যে আনন্দ পাচ্ছি সে আনন্দ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। এরূপ আনন্দ জীবনে আর কখনও পাই নি।" সংসারের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যরহিত হিমাচলের বিজন পাষাণ অঙ্কে ভিক্ষান্নমাত্রে জীবন ধারণ করিয়াও বিমল আনন্দ উপভোগ প্রকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। একমাত্র আত্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান্‌ই ত্যাগের নীরস কঠোর জীবনে শান্ত স্নিগ্ধ সুখ আস্বাদনে সমর্থ। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন :—

> অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
> ত্যজত্যন্তর্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া।
> বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ
> বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥
>
> (৩৭২।৩৭৩ শ্লোক)

কথা বলিতে বলিতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। আমরা তখন এক সঙ্গে দেবী গিরিজীর দর্শনার্থ গমন করিলাম। দেবী গিরিজী প্রাচীন সাধু। বয়স

৭০।৭৫ বৎসর হইবে। পক্ক কেশ ও বিলম্বিত পক্ক শ্মশ্রু তাঁহার রমণীয় সৌম্য মুখখানি প্রবীনতায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি প্রায় 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল উত্তর কাশীতেই আত্মধ্যানে নিরত থাকিয়া নানাভাবে সাধুসজ্জনের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আশ্রমে প্রায় পনর জন সাধু নিয়মিতভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেছেন। আমাদের দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ভ্রাতাটি তাঁহাদের অন্যতম। সেখানে তিনি কিছু অধ্যাপনার কাজও করিয়া থাকেন। উত্তর কাশীর দারুণ শীতে ঝড়বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে প্রত্যহ সত্র হইতে ভিক্ষা নিয়া আসা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া শীতের কয়েক মাস এই আশ্রমেই রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা হয়। দেবীগিরিজীর ঐকান্তিকতা, উদারতা ও সুগভীর তত্ত্বদৃষ্টির জন্য উত্তর কাশীর সাধুবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আসন হইতে উঠিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থিত করিলেন। আমরাও যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। "সাধুগণ জঙ্গম তীর্থ। তাঁহাদের শুভ সমাগমে স্থাবর তীর্থের মালিন্য দূর হয়। 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি, সুকর্ম্ম কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্র শাস্ত্রাণি' ইত্যাদি। উত্তর কাশীতে বাস সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের উল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। গঙ্গার স্রোতে কাঠ ভাসিয়া আসে। গঙ্গার প্রবল বেগে কাঠ কখনও পাথারে ঘা খায়, কখনও চড়ায় গিয়া পড়ে, কখনও ভাসিয়া চলে। ভাসিতে ভাসিতে আবার কোথায়ও অবরুদ্ধ হয়, কখনও বা সুদূরে চালিত হয়। সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহ, সম্পদ্, বিপদ, সুখ দুঃখ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে, কখনও লোকালয়ে, কখনও অরণ্যে, কখনও সমুদ্র-তীরে, কখনও গিরিগুহায়, কখনও বা তীর্থস্থানে নীত হইতেছে।" বলা বাহুল্য, প্রারব্ধ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য জীবন্মুক্তের গতিবিধি সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

দেবী গিরিজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা ৺লক্ষেশ্বর শিব দর্শন পূর্ব্বক বৃদ্ধ সৎগুরুজীর সমীপে গমন করিলাম। তাঁহার বয়স অন্যূন ৮০ আশী বৎসর হইবে। কিন্তু এখনও লাঠির সাহায্য বিনা চলা ফেরা করিতে পারেন। শরীর গৌর, নাতিস্থূল নাতিদীর্ঘ। মস্তকোপরি শুভ্র কেশ ঈষৎ উদ্গত। ললাট দেশ মসৃণ। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আদর করিয়া আমাদিগকে পাশে বসাইলেন এবং আমাদের আগমনে যেন নিজেই কৃতার্থ হইয়াছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু। সাধারণের নিকট 'হরিদাস' নামে পরিচিত। পূর্ব্বে হৃষিকেশে থাকিতেন। এক সময়ে কনখলস্থ চেতনদেবের কুটীয়ার মোহান্তের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মহাত্যাগ, দীনতা ও বিনম্র মধুর ব্যবহার সাধু সমাজের আদর্শ স্থল। কিছুক্ষণ আলাপের পর আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা চলিয়া না আসা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষেশ্বরে সেই সময় আর একজন প্রবীণ মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার নাম 'শ্রান্ত আশ্রম'। তিনি তখন মৌন অবস্থায় ছিলেন বলিয়া আলাপাদির সুযোগ হয় নাই। গঙ্গোত্তরী হইতে উত্তর

কাশীতে ফিরিয়া আমরা কেবলাশ্রমকে দর্শন করিয়াছিলাম। জ্ঞানছতে তাঁহার আশ্রম আছে। আমাদের সংঘের জনৈক সাধু এক সময়ে তাঁহার আশ্রমে ছিলেন। তিনি আমাদের পরিচয় জানিবা মাত্র অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘর দেখাইয়া পুনরায় আসিয়া থাকিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বার বার বলিলেন। কেবলাশ্রমের বয়স ৭৫ বৎসর হইবে। তিনি অত্যন্ত প্রেমী সাধু বলিয়া মনে হইল। দীর্ঘকাল উত্তর কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যোগাভ্যাস করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ত্যাগী, সাধনশীল, শাস্ত্রানুরাগী সাধু বলিয়া পরিগণিত।

উত্তর কাশীর আশ্রম সমূহের মধ্যে কৈলাস-মঠই সমধিক প্রসিদ্ধ। সেখানে ১৫।২০ জন সাধুর অশন বসন ও শাস্ত্রচর্চ্চার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আচার্য্য শঙ্করের একটি শ্বেত মর্ম্মর মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছি।

(ক্রমশঃ) সৎপ্রকাশানন্দ

"মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ"

'মরণের প্রশ্ন করিয়ো না। অপর যাহা কিছু ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর সাধ্য মত জবাব দিব, যাহা কিছু ইচ্ছা প্রার্থনা কর—পূরণ করিব—কেবল মরণের কথা জানিতে চাহিয়ো না। মরণের রহস্য আমার গুহ্যতম, অন্তরতম তত্ত্ব—অমূল্য সম্পদ্;—উহা যখন তখন যেমন তেমন ভাবে, যাহার তাহার কাছে বিলাই না। অতিকষ্টে—জন্মজন্মান্তরের তপস্যায় এ প্রশ্নের উত্তর অধিগত করিয়াছি—কৃপণের ধনের ন্যায় উহাতে আমার একান্ত মায়া। তুমি বিদ্বান,বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, ধীর, বিনয়ী, কিন্তু তবুও মরণের প্রশ্নের উত্তর তোমায় বলিতে প্রাণ চাহে না, আর অনুরোধ করিয়ো না—এই প্রশ্ন ত্যাগ কর, "নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ"--নচিকেত, তুমি মরণকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না।

'ধনজনপূর্ণা বিপুল পৃথ্বীর আধিপত্য দিব, অতুল রূপযৌবনসম্পন্না ললনাকুলের ভতৃত্ব দিব, যুগ-যুগ প্রসারিত দীর্ঘ জরামরণহীন সুখকর পরমায়ু দিব—দিবনা শুধু মৃত্যুরহস্যের উত্তর।'

কঠশ্রুতিতে মৃত্যু নায়ক যমরাজের মরণরহস্য-উদ্ঘাটনে এইরূপ সতর্কতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয় ইহাই ছিল নচিকেতার প্রশ্ন। যমরাজ উত্তরও দিয়াছিলেন কঠোপনিষদের অমর ছন্দে—কিন্তু সহজে দেন নাই; জিজ্ঞাসুর চিত্তের ঐকান্তিকতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া—ধন, জন, যৌবনের চূড়ান্ত ভোগকে উপেক্ষা করিবার মত দৃঢ়তা তাহার তরুণ, ধবল চিত্তে উদ্বুদ্ধ করিয়া—তাহার পর।

যম নচিকেতা সংবাদে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জীবন মরণের রহস্যজ্ঞানা সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ইহলোক, পরলোকের কোন বস্তু দ্বারাই ইহার মূল্য নিরূপিত হয় না—এ বিদ্যা অনতি-সাধারণ—অমূল্য।

জীবনের বাঁধা-ধরা দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে এমন লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট, মরণ বিশেষ কোন অভিনব জিজ্ঞাসা আনিয়া উপস্থিত করে না। মানুষ জন্মাইতেছে, যতদিন বাঁচিবার বাঁচিয়া সংসার করিতেছে, আবার

মরিয়া যাইতেছে—ইহার ভিতর রহস্য আর কি? ইহা ত নিত্যকার ঘটনা—ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে? মরণ রহস্য এই সকল প্রবাহের নরনারীর জন্য নয়।

এই প্রবাহের জনসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলে এমন এক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যাঁহাদের নিকট এই জন্মান ও মরিয়া যাওয়া ব্যাপারটী খুব সাধারণ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা ইহার মধ্যে চিন্তা করিবার অনেক তথ্য দেখিতে পান। এই জন্য মৃত্যুরহস্য লইয়া তাঁহারা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া যান—এই রহস্য ভেদকরাই তাঁহাদের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়—যতদিন না ওই রহস্য সহজ হয়, ততদিন জীবন তাঁহাদের নিকট শূন্য ও অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। অসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে তাঁহারা এই রহস্য ভেদ করিতে সচেষ্ট হন এবং অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া এক অলৌকিক দিব্য জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী হইয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন।

ধর্ম্মের আরম্ভ নচিকেতার 'যেয়ংপ্রেতে বিচিকিৎসা'* এই প্রশ্নে এবং শেষ উহার সমাধানে।

বর্ত্তমান জীবনের গণ্ডিটুকুর মধ্যে আমাদের যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, দর্শন, শ্রবণ, কল্পনা, অনুভূতির বিকাশের সম্ভাবনা আছে তাহাতে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বাণিজ্যকুশলী অথবা রাজনীতিকের তৃপ্তি মিলিতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম-সাধকের তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটে না। তিনি চান মরণের অতীতে এক অনন্ত জীবনের আস্বাদন। এই ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডি তাঁহার নিকট অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়—ইহা তাঁহার বিশাল আকাঙ্ক্ষাকে মিটাইতে একান্ত অনুপযোগী। তাই মৃত্যুর দরজায় তিনি আঘাত করিয়া সেই রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে ঈপ্সীত অনন্ত জীবনের অন্বেষণ আরম্ভ করেন।

দৈনন্দিন জীবনের শতমুখী ব্যস্ততা প্রতিনিয়ত মানুষকে যমরাজের নিষেধ শুনাইতেছে "মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ"—মরণকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না—করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই ত জীবনের স্বাস্থ্য, সম্পদ্, আত্মীয়, পরিবার; জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সমৃদ্ধি - ইহারাই ত তোমার জীবনকে সচেষ্ট, সানন্দ রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত—আবার কেন কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি? তাই মরণকে জিজ্ঞাসা করিবার অবসর মানুষের হইয়া উঠে না। বর্ত্তমান জীবনের দৃষ্টি লইয়া তাহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর সময় সংশয় উঠে—জিতিলাম কি ঠকিলাম?

মনুষ্যত্বের সীমানা পার হইয়া যাঁহারা অতি-মানবত্ব লাভে প্রয়াসী তাঁহাদের কিন্তু "মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ"—নিষেধ দৃঢ়তা সহকারে অগ্রাহ্য করিতে হয়—নচিকেতার ন্যায় তাঁহাদিগকে বলিয়া উঠিতে হয়—"বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।" ওই প্রশ্নতেই এখন আমার একমাত্র কৌতূহল, অপর কোন জিজ্ঞাসাতে আর অভিরুচি নাই। মরণ-রহস্য সমাধানের উপর এই যে ঐকান্তিক প্রীতি, ইহাই ওই সমাধানের প্রধানতম উপায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—যাঁহারা ওই তত্ত্বকে বরণ করেন অর্থাৎ একান্ত ভালবাসেন

---

* যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ কঠ উপনিষৎ, ১।১।২০

যমনচিকেতাকে তিনটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা প্রার্থনা করিতেছেন—মানুষ মরিয়া গেলে তাহার সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। কেহ কেহ বলে মৃত্যুর পরও সে থাকে, আবার কাহারও মতে স্থূলদেহের—মৃত্যুই মানুষের শেষ। এই বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তাঁহাদের নিকটই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। অজ্ঞাত, অতীন্দ্রিয় রহস্যকে জানিবার দুর্নিবার ইচ্ছা—যখন মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয় তখনই মানুষ ঠিক্ ঠিক্ বিরাগী। বর্ত্তমান গণ্ডিবদ্ধ জীবনের উপর প্রবল বিরক্তি এবং বর্ত্তমানাতীত এক অজ্ঞাত আনন্দময় ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের নামই বৈরাগ্য। এই উদ্বুদ্ধ বৈরাগ্য-বলে মানুষ একদিন ঘোষণা করিতে সমর্থ হয়—"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ." "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র বিশ্বেদেবগণ! আমার আত্মস্তুতি শ্রবণ কর," "মরণের অন্ধকারের অতীতে এক জ্যোতির্ম্ময় সত্যবস্তুকে আমি জানিয়াছি।"

মরণের তত্ত্ব যতদিন না জানা যায় ততদিন মানুষ অন্ধকারে দিগ্‌বিভ্রান্ত হইয়া মরে। মরণকে জানিবার পর আর অন্ধকার থাকে না, জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত সবটা বুঝা যায় ভবিষ্যৎ অজ্ঞানের ভীতি আর মানুষকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না—নূতন বলে, নূতন জ্ঞানে, নূতন আনন্দে জীবন তাহার ভরপুর হয়।

মরণকে জানার অর্থ কি? আমার মরণ নাই—এইটী জানা। মৃত্যুরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনাটী জগতে আছে বটে কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া উহা ঘটে সে আমি নই—সে আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আমার দেহ। নিজের স্বরূপের জ্ঞানই মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন। জীবনমরণ প্রবাহ অনাদি অনন্তরূপে চলিয়াছে—যখন স্বরূপের জ্ঞান হয় নাই তখন এই প্রবাহের মধ্যে ভ্রমে নিজকে ফেলিয়াছিলাম—ফেলিয়া অবিচ্ছিন্ন দুঃখরাশি ভোগ করিতেছিলাম। যখন মৃত্যুকে জানিলাম—জানিলাম যে ওই প্রবাহের সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, কোন কালেই ছিল না—কি একটা দুর্ব্বোধ্য ভ্রমে যেন সম্বন্ধ বোধ হইতেছিল—তখন আমার দুঃখরাশির অবসান হইল—আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া স্বমাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। দেখিলাম যে আমার জন্ম কখনও হয় নাই—মৃত্যুও কখনও হইবে না—অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া আমি বর্ত্তমান—অনন্তকাল ধরিয়া আমি থাকিব—আমার দুঃখ নাই, শোক নাই, মলিনতা নাই—আমি চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, চিরানন্দময়।

মরণকে জানিতেই হইবে। চরমশ্রেয়ের আর অপর কোন পথ নাই। সকল আকাঙ্ক্ষাকে ধীরে ধীরে প্রত্যাখ্যান করিয়া মরণ জিজ্ঞাসাকে পুষ্ট হইতে পুষ্টতর করিয়া তুলিতে হইবে। যখন নচিকেতার মত বলিতে পারিব—"বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব" তখন জ্ঞানগুরু যমরাজও আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া কাঠক ছন্দঃ শুনাইবেন—আমরাও নচিকেতার ন্যায় "ব্রহ্মপ্রাপ্ত, বিরজ ও বিমৃত্যু" হইয়া মানবদেহ ধারণ সার্থক করিব।

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

মাধুকরী

(বাংলা ভাষার কুলুজী)
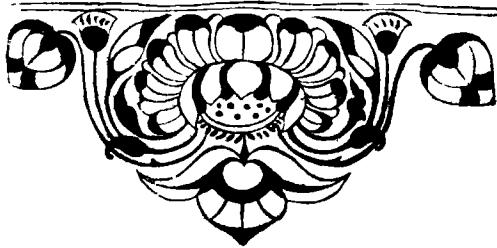
[১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক এক পুস্তক লিখেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে এবং তিনি বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইলছোবা নামক যে উপন্যাস লিখেন, সে সম্বন্ধে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় মন্তব্য করেন,—"যিনি বস্তুতত্ত্ববিৎ, ইতিবৃত্ত লেখক, বৈয়াকরণ, নাটককার, কাদম্বরীর ধরণের উপন্যাস রচয়িতা, তিনি একখানা ইংরাজী ধরণের নভেল লিখিবেন বিচিত্র নহে।" উপর্যুক্ত পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সমালোচনা লেখেন তাহা পাঠ করিলে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা সুবিশেষ ধারণা হয়। তজ্জন্য উহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করা গেল।]

ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কুলুজি প্রস্তুত করিয়া তাহার অজ্ঞাতকুলশীলত্বের নিন্দা ঘুচাইয়া, অনাদৃত ভাষার বর্দ্ধন ও সাহিত্য-সমাজে তাহার উচ্চাসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরও একটা কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন।

জন্মের তারিখ ও লগ্ন লইয়া জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করাই চিরন্তন প্রচলিত প্রথা। লগ্ন তারিখের অভাবে জন্ম-পত্র প্রস্তুত হয় না, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অভাব সত্ত্বেও করকোষ্ঠী দেখিয়া জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—এইটুকুই তাঁহার অভিনবত্ব।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির একটা সুন্দর চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। তাঁহার পরে গঙ্গাচরণ সরকার পদ্মনাভ ঘোষাল, মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, রমেশ চন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক মহাশয়ই একাধো হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু সকলেরই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে" বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের চিত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আদ্যকাল, মধ্যকাল ও ইদানীন্তন কালের ভাষাকে তিনি পর্য্যায়ক্রমে বাংলা ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় চিত্রিত করিয়াছেন। অনির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিকাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্যন্ত (১৮৮৫ খৃঃ) আদ্যকাল এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসকে আদ্যকালের লেখক ও বাঙ্গালা ভাষার সেবকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদ্যকালের শিশু বাঙ্গালা ভাষা ঐ সকল সেবকের পরিচর্য্যাধীনে থাকিয়া কিরূপে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য অথচ শ্রবণ মধুর অস্পষ্ট-জড়িত ভাষায় কথা কহিয়া বাল্য ক্রীড়ায় দিনপাত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরে চৈতন্যদেবের সময় হইতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

সময়কে বাঙ্গালা ভাষার মধ্য বা যৌবনকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যৌবন কালে বাঙ্গালা ভাষা মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের সহিত কিরূপ কেলিতে দিনযাপন করিয়াছে এবং ইদানীন্তন, বাঙ্গালা ভাষা প্রৌঢ়াবস্থার সীমায় পদার্পণ করিয়া যৌবন-সুলভ আড়ম্বর প্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে এবং কিরূপে তাহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে, স্তরে স্তরে একটীর পর একটী আবরণ উঠাইয়া তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। * * * *

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগেব সময় হইতেই বাঙ্গলা সহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম-ঠাকুরের মহাত্ম্য প্রচারই সেই সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। গানের পালা সাজাইয়া সেই গান গাহিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইত। যোগিপাল, মহীপাল, গোপীপাল, মাণিকচাঁদ, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম, রামনারায়ণ, রামচন্দ্র, শ্যামপণ্ডিত, রামদাস মোদক প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মের গানের পালাকর্ত্তা ছিলেন। তদ্ব্যতীত ডাকপুরুষের কথা খনার বচন, সাহিত্য আকারে লোক-শিক্ষার বেশ দুইটী বিস্তৃত সোপান ছিল। ডাকপুরুষের কথা, খনার বচন ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গানের পালা নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজ বোধগম্য ভাষায় পদ্যে রচিত ছোট ছোট ছড়া। তাহাতে রাজনীতি, বাণিজ্য নীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইঁহাদের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার উপযুক্ত উপকরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সময়ে ছিল না। তবে তিনি যতটুকু করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

অনেক সময় অমঙ্গল-নিদান হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বিশ্বাসের মতভেদ হইতে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাজনক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করণোদ্দেশে সাহিত্যের আদিভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাঁচালী ও কথকতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধমতের খরস্রোতকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচারিত ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণে আবৃত করিয়া নূতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ-দাস কবিরত্ন শিবায়ণ রচনা করিলেন। পরে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রামরায় ও শ্যামরায় 'মৃগব্যাধ-সংবাদ', রতিদেব 'মৃগলুব্ধক', রঘুরাম রায় 'শিব-চতুর্দ্দশী', ভগীরথ 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য', হরিহরসুত 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্ম্মের গানের মত গীত ও শ্রুত হইয়া শৈব মতটা এক প্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্ম্মবিবাদ সকলদেশে সকল সময়েই আছে। ইউরোপে এই ধর্ম্ম বিবাদ উপলক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। সুখের বিষয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহে শোণিত প্রবাহ না বহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে।

শৈবমত প্রচারিত ও বেশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শাক্ত সম্প্রদায় মাথা নাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ্য করিয়া শীতলা-দেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা অর্চ্চনার জন্য শীতলা মঙ্গল বা শীতলা গানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শাক্ত সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বিস্তৃত

হইয়া পড়িল এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য—ইঁহারা 'শীতলা-মঙ্গল' বা শীতলা মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। কিছুদিন পরেই হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, অনুপচন্দ্র, আদিত্য দাস, কমললোচন, ক্ষেমানন্দ, শ্রীরাম-জীবন ইত্যাদি প্রায় ৬০ জন পালাকর্ত্তা মনসা দেবীকে সর্প-ভয়-নিবারিণী রূপে খাড়া করিয়া মনসা মহাত্ম্য বর্ণনা ছলে বিষহরির গান বা 'পদ্মপুরাণ' নামে "মনসা-মঙ্গল" রচনা করেন। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে নারায়ণ-দেব-রচিত চাঁদ সদাগর ও বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী বিশেষ-রূপে বিদিত।

মনসা মঙ্গলের পরেই মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডী-মঙ্গল নামে খ্যাত শুভচণ্ডীর গান বা সুবচনীর কথা প্রচলিত হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন, মাণিক দত্ত, দ্বিজ রঘুনাথ, মদন দত্ত, মুক্তারাম সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, জয় নারায়ণ সেন, শিবচরণ, কবি কঙ্কন বলরাম, ভবানী শঙ্কর, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা; তন্মধ্যে দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, মুক্তারাম সেনের 'সারদা মঙ্গল' ও কবি কঙ্কণ মুকুন্দরামের 'জাগরণ' বা অষ্টমঙ্গল বিশেষ রূপে খ্যাত।

চণ্ডী মঙ্গলের পরই কালিকামঙ্গল বা বিদ্যা-সুন্দর কথা। নায়ক-নায়িকার উপাখ্যান ছলে আদ্যাশক্তি মহাকালীর মহাত্ম্য বর্ণনাই কালিকা-মঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরামদাস, ক্ষেপানন্দ দাস, মধুসূদন কবীন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, দ্বিজদুর্গারাম, অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ, রূপনারায়ণ ঘোষ, নিধিরাম কবিরত্ন, দ্বিজরাম নারায়ণ, প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা দ্বিজরামচন্দ্র, মুক্তারাম নাগ, দ্বিজ দুর্গারাম প্রভৃতি অনেকেই কালিকা-মঙ্গলের রচয়িতা। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের বিদ্যাসুন্দর কথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর; ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুর্গামঙ্গল বা গৌরীবিলাস, মুক্তারাম নাগের দুর্গা পুরাণ ও কালী-পুরাণ, দ্বিজ দুর্গারামের কালিকা-পুরাণ ও দ্বিজ রামনারায়ণের শক্তি-লীলামৃত বিশেষরূপে পরিচিত।

বহু শক্তিরূপিনী আদ্যাশক্তি মহামায়ার ধাত্রীরূপকে ষষ্ঠীদেবী-রূপে কল্পনা পূর্ব্বক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়া ষষ্ঠী-মাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠীপূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই গুণরাজ খান্, শিবানন্দ কর, মাধবাচার্য্য, ভরত পণ্ডিত, পরশুরাম, দ্বিজ অভিরাম, জগমোহন মিত্র, রণজিৎরাম দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলা-মঙ্গল বা লক্ষ্মী-চরিত্র রচনা করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অমনি দয়ারাম দাস ও গণেশ মোহন সারদা-মঙ্গল বা সরস্বতী-মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হইলেন। কমলা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে জগমোহন মিত্র ও সারদা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডী-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গা-মঙ্গলই বাকী থাকে কেন। মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলা কান্ত, জয়রাম দাস, দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গল কর্ত্তৃগণ গঙ্গা-মঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গা-মঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিনী', সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌর সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন. দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ 'সূর্য্যের পাঁচালী' লিখিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত যাহা উল্লিখিত হইল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি ও মধ্য এই উভয় কালের অন্তর্গত। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান এই তিন যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আদি যুগের অনেক সাহিত্য-সেবীকে তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে স্থান দেন নাই। তবে ভবিষ্যৎ সংস্করণে বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় সে অভাব পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

ধর্ম্ম বিবাদের ন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাহিত্যোৎকর্ষ সাধন-পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানেরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ না ঘটিয়া যাহাতে একটা প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয়, সে জন্য মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার ও হিন্দুশাস্ত্র এবং ধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্য্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের উপযুক্ত লোক দ্বারা অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ শাখার আরম্ভ হইল।

কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, ফকিররাম কবিভূষণ, কবিচন্দ্র, ভবানী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ দাস, ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, জগৎবল্লভ, ভিষকৃশুক্ল দাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ, দ্বিজ দয়ারাম, রামমোহন ও রঘুনন্দন গোস্বামী রামায়ণ অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসই সর্ব্বজন বিদিত এবং তাঁহার অনূদিত রামায়ণই বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় রামায়ণ অনুবাদকের মধ্যে যেমন কেবল কৃত্তিবাসেরই উল্লেখ করিয়াছেন তেমনই আবার বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্ত মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র খাঁন্, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, দ্বিজ নন্দরাম, ঘনশ্যাম দাস, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, নিমাই পণ্ডিত, মধুসূদন নাপিত প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মহাভারতের অনুবাদ বা ভারত বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহাভারতকারের মধ্যে কেবল কাশীরামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি মহাভারত মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীনত্বের গৌরব করিতে পারে। সুলতান আলাদ্দিন হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের "বিজয়-পাণ্ডব-কথা" বা "ভারত পাঁচালী" প্রণীত হয়।

রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা দ্বারা অনেকে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণরাজ খাঁ মালাধর বসু একজন। তাঁহার অনুবাদের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা গোবিন্দ বিজয়। গুণরাজ খাঁর পর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-

তরঙ্গিণী"। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ "হরিবংশ" এবং সঞ্জয় ও বিদ্যাবাগীশ ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন। সাহিত্য গ্রন্থে ইঁহাদেরও নাম উল্লেখ যোগ্য।

কেবল গীত রচনা দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়া সাহিত্য জগতে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয় শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাসরথি রায়, রামদুলাল সরকার, কালী মির্জ্জা, মির্জ্জা হোসেন আলি, সৈয়দ জাফর খাঁ, প্রভৃতি বিখ্যাত। বর্ত্তমান গ্রন্থে ইঁহাদের বিষয়েও কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, সকলেই সাহিত্য সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের লালন-কার্য্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি দিলেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেকগুলি শাখা। ১। **পদশাখা**—অনন্ত দাস, অনন্ত আচার্য্য, আকবর আলী, আত্মারাম দাস, উদ্ধব দাস, কুবির, কানাই দাস, কৃষ্ণদাস, গতি গোবিন্দ, গোবিন্দদাস, ঘনরাম দাস, ঘনশ্যাম দাস, চণ্ডীদাস, চম্পতি ঠাকুর, চৈতন্য দাস, জগন্নাথ দাস, জ্ঞান দাস, প্রসাদ দাস, প্রেমদাস, বলাই দাস, বিদ্যাপতি, বৃন্দাবন দাস, তুলসী দাস, দীন হীন দাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস, ধরণী দাস, নরসিংহ দাস, হরহরি দাস, নরোত্তম দাস, নসির মামুদ, পরমানন্দ দাস, পীতাম্বর দাস, মথুর দাস, মধুসূদন দাস, মুরারি গুপ্ত, যশোরাজ খান, যাদবেন্দ্র, রসিক দাস, রামানন্দ দাস, লোচন দাস, লক্ষ্মীকান্ত দাস, শিবানন্দ, শ্রীনিবাস, সুন্দর দাস, সুবল, সেখ জালাল, সেখ ভিক, সেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিদাস, হরিবল্লভ প্রভৃতি ১৬৬ জন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

২। **চরিত্র-শাখা**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন বৃত্তান্তই এই শাখার প্রধান অবলম্বন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত এই শাখার প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত অন্য ক্ষুদ্র গ্রন্থও আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের 'কড়চা' ও শ্যামদাস প্রণীত 'অদ্বৈত মঙ্গল', শ্রীখণ্ড নিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত।

৩। **অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা**—সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পৌরাণিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। অকিঞ্চন দাস, রসকদম্ব রচয়িতা কবিবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস রচয়িতা কৃষ্ণ দাস বা কৃষ্ণকিঙ্কর, জগৎ-মঙ্গল রচয়িতা গদাধর দাস, জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদক গিরিধর, চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদক গোপীচরণ দাস, গোবিন্দ রতি মঞ্জরীর অনুবাদক ঘনশ্যাম দাস, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার অনুবাদক দীনহীন দাস, ভ্রমর গীতার অনুবাদক দেব নাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদূত-অনুবাদক নরসিংহ দাস, উদ্ধব-সংবাদের ভাগবত-অনুবাদক নরসিংহ দ্বিজ, মুক্তা-চরিত্র গ্রন্থের পদ্যানুবাদক নারায়ণ দাস, মনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদক প্রেমদাস, গীতগোবিন্দের অপর পদ্যানুবাদক ভগবান দাস, উদ্ধব সংবাদের অপর অনুবাদক মাধব গুণাকর, জগন্নাথ-মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা মুকুন্দ দ্বিজ, কর্ণামৃতানুবাদক যদুনন্দন দাস, রঘুনাথ দাস, রাধা বল্লভ দাস, রূপ নাথ দাস ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস এই শাখান্তর্ভুক্ত গ্রন্থকার।

৪। ভজন-শাখা—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভজনা প্রণালী এই শাখান্তর্গত। এই শাখান্তর্গত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস, ২। গোপীভক্ত রসগীত—অচ্যুত দাস, ৩। রস-সুধার্ণব—আনন্দ দাস, ৪। ভজন মালিকা—কৃষ্ণ-রাম দাস, ৫। স্মরণ-মঙ্গল—গিরিধর দাস, ৬। প্রেমভক্তিসার—গুরুদাস বসু, ৭। গোলক বর্ণন—গোপাল ভট্ট, ৮। হরিরাম কবচ—গোপী কৃষ্ণ দাস, ৯। সিদ্ধসার—গোপী নাথ দাস, ১০। নিগম—গোবিন্দ দাস, ১১। রসভক্তি-চন্দ্রিকা—চৈতন্ত দাস, ১২। রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস, ১৩। সহজ রসামৃত—দুঃখী কৃষ্ণদাস, ১৪। বৈষ্ণবামৃত—দীন ভক্ত দাস, ১৫। দর্পণ চন্দ্রিকা—নরসিংহ দাস, ১৬। প্রার্থনা ও প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস, ১৭। রাগময়ী কণা ও রসকল্পসার—নিত্যানন্দ দাস, ১৮। উপা-সনা পটল ও আনন্দভৈরব—প্রেমদাস। ১৯। মনঃশিক্ষা—প্রেমানন্দ। ২০। আনন্দ লহরী—মথুরা দাস।

৫। বিবিধ শাখা—ইহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্বে ঈশান চন্দ্র দের কৃষ্ণলীলা, গোপাল দাসের কর্ণা-নন্দ, নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবন লীলামৃত ও রস-পুষ্প-কলিকা, ভক্তরামের গোকুল মঙ্গল প্রভৃতি উপাদেয় বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে।

মুসলমানের মধ্যেও অনেক বৈষ্ণব ছিলেন। করম আলী একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত রাধার বিরহ সূচক পদাবলী অনেক পাওয়া যায়। মুসলমান কবিগণ পণ্ডিতদিগকে মহা-ভারতাদি অনুবাদে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি এই :—

১। জ্ঞান প্রদীপ—সৈয়দ সুলতান। ২। তত্ত্ব সাধন—সৈয়দ সুলতান। ৩। তউফা—কবি আলোয়াল। ৪। মুর্সিদের বার মাস—মহম্মদ আলী। ৫। জ্ঞানসাগর—কানুফকির ৬। সিরাজ কুলুপ—ফকির আলিরাজা। ৭। মুছার ছোয়াল—কবি নসরল্লা। ৮। জ্ঞান চৌতিশা—সৈয়দ সুলতান। ৯। হানিফার পত্র—মহম্মদ খাঁ। ১০। মুক্তাল হোছেন—মহম্মদ খাঁ। ১১। ইমাম চুরি—মহম্মদ খাঁ। ১২। সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রাণী—দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সাহেব। ১৩। পদ্মাবতী—আলাওল। ১৪। রাগনামা। ১৫। তালনামা ১৬। সৃষ্টি পত্তন। ১৭। ধ্যানমালা।*

সত্যনারায়ণের কথা, কবির লড়াই ইত্যাদিতে ও মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, এণ্টুনি সাহেব ইঁহারা সকলেই কবিওয়ালা, সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে ইঁহারাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যাত্রা ও কথকতাদ্বারাও সাহিত্যের কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্টিসাধন হইয়াছে। সাহিত্য আলোচ্য গ্রন্থে ইহাদেরও অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে।

---

* শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী আবিষ্কৃত, আবদুল শুকুর মহম্মদ বিরচিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ও 'কান্ত নামা' নামক দুই খানি পুঁথি দেখা যায়। উঃ সঃ

যাদুকর

আমার জীবন হ'তে লয়েছ আমারে তুমি দূরে
স্বপনের সীমা শীর্ষে হিল্লোলিত মেঘাভ্রের সুরে
অকুণ্ঠ আনন্দ-গানে। নীলাঞ্জনে বাঁধা তব বীণ
অলক্ষ্য অঙ্গুলি ঘায় বেজে যায় রিন্ ঝিন্ ঝিন্ ··
কাঁপে বারি—দুলে মেঘ—নেচে উঠে ময়ূর-পেখম—
বাতায়নে বিরহিনী বেখে যায় নিশ্বাস-ভরম।—
বাতাসে বেদনা ছুটে—চাতকের দিক্‌ভাঙা সুর
করুণ কাকুতিছন্দে ঝরে জ্বালা দীর্ঘ প্রেমাশ্রুর!
সে কাহিনী ভেসে যায়—কেঁপে উঠে অসীমের তারা!
নিশান্তের স্নিগ্ধ-দীপ্তি-স্নান-শেষে হয়ে যায় সারা।
জাগায় সোনার পদ্ম প্রভাতের প্রশান্ত অরুণ,—
দিবসের তপ্ত ভালে ছোঁয়া দেয় তিলক তরুণ।
মহান্ মহিমা আসে—দিনে ভাসে অজানার রঙ্—
পাখীর অশান্ত কণ্ঠে বাজিতেছে বিদায়-সাংঙ্!
মন্দিরে জ্বলিছে দীপ—দিক ছাপি' নামি আসে কালো
বধূর পাবন-সন্ধ্যা পূর্ণ করে প্রণতির আলো!
মরম-বন্ধন টুটী দণ্ডে দণ্ডে ছুটে রূপান্তর—
আমারে ধরায়ে বীণা বাজিতেছ তুমি যাদুকর!

—শ্রীশিবশম্ভু সরকার

ভারতে বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
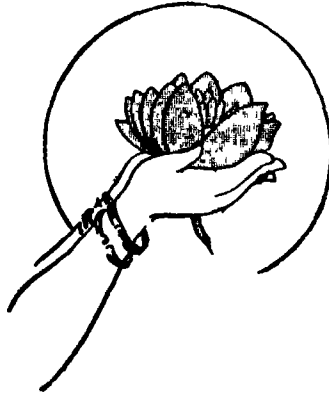
শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল

এই বীর্য্য লাভের প্রথম উপায় উপনিষদ্ বাক্যে, "তত্ত্বমসি"—এই মহাবাক্যে বিশ্বাসী হওয়া। বিশ্বাস করা,—"আমি আত্মা", ... "আমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমি সর্ব্বজ্ঞ।" আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন, —ইহা বিশ্বাস কর, নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক; তাহা হইলে তোমাদের প্রত্যেকেই অমিত বল, অসীম মনীষাসম্পন্ন বীর-কেশরীর ন্যায় সমুদায় বিশ্বকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে পরিচালিত করিতে পারিবে, প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বর তুল্য হইবে।" (Vedanta in its Application to Indian life নামক বক্তৃতার অংশের অনুবাদ)।

" * * আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যখন তোমরা অন্যের জন্য কর্ম্ম কর তখনই তোমাদের কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। সমুদ্রের অপর পারে বিদেশীয় ভাষায় তোমাদের চিন্তা-সম্পদ্ যখন বিস্তারিত হয়, তখনই তোমাদের স্বদেশের কার্য্যও সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান সভাই সপ্রমাণ করিতেছে, বিদেশকে তোমাদের জ্ঞানালোক দান করিলে তোমাদের স্বদেশই তদ্দ্বারা কিরূপে উপকৃত হয়। যদি আমি আমার প্রচার-কার্য্য ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতাম তাহা হইলে আমার ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যাওয়ার দরুণ যে সুফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশও উৎপন্ন হইত না। ভারতবর্ষের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী-জয়,—এতদপেক্ষা কম নহে,—ইহাই তোমাদের মহান্ আদর্শ হউক, ইহার জন্য তোমরা প্রত্যেকেই প্রস্তুত হও। নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর। বিদেশীয়গণ এদেশে আসিয়া সমস্ত দেশকে সৈন্যপ্রবাহে প্লাবিত করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিও না। ওঠ, ভারত, তোমার আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা জগৎকে জয় কর। হাঁ, প্রেম দ্বারাই দ্বেষকে জয় করা যায়, বিদ্বেষ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা অসম্ভব,—এই সত্য এদেশেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। জড়বাদ এবং তদানুসঙ্গিক দুঃখ-দুর্গতি জড়বাদ কিম্বা ইন্দ্রিয়ভোগ দ্বারা দূরীভূত হইবে না। একদল সৈন্য অন্য সৈন্যদলকে যখন যুদ্ধে পরাজয় করিতে চায়, তখন কেবল দুই দিকে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ফলে সমস্ত মানবজাতি পশুতে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পাশ্চাত্যভূমিকে জয় করিতে হইবে। পাশ্চাত্যগণ নিজেরা ক্রমশঃ বুঝিতেছেন, 'ধর্ম্মই' মাত্র তাহাদিগকে জাতি হিসাবে রক্ষা করিতে পারিবে। * * আজ সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ যেন ধূমায়মান আগ্নেয়-গিরির শিখরদেশে দণ্ডায়মান,—হয়ত কল্যই সেই আগ্নেয়গিরি, অগ্নি-প্রবাহ উদ্গীর্ণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। * এক্ষণই কাজের উপযুক্ত সময়, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তারাশি পাশ্চাত্য সমাজের অন্তর্দ্দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। অতএব, হে মাদ্রাজ-বাসী যুবকবৃন্দ, আমি বিশিষ্টরূপে এই কথা স্মরণ

করিতে তোমাদিগকে বলিতেছি। আমাদিগকে বিদেশে গমন করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও দার্শনিক-তত্ত্ব দ্বারা জগৎকে জয় করিতে হইবে। আমাদিগকে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ভারতের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত, সতেজ করিবার একমাত্র উপায়, এদেশের চিন্তা-সম্পদ্ দ্বারা বিশ্বজয়।" [The Work Before Us-শীর্ষক বক্তৃতাংশের অনুবাদ]

"রাষ্ট্রনীতি যে-সকল জাতির মেরুদণ্ড সেই সকল জাতি আত্ম-রক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হয় তখন তাহারা বৈদেশিক জাতির সঙ্গে বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহ-বিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে, কিন্তু ইহা থামাইবার কোনও বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের সত্য প্রচারই আমাদের বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে এক অখণ্ড-জাতিরূপে মিলিত করিবে তাহার কি আর প্রমাণান্তর চাও? * * ভারতের পতন ও দুঃখ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ এই যে, তিনি নিজ কার্য্য ক্ষেত্র সংকোচ করিয়াছিলেন,—শামুকের মত দরজায় খিল্ দিয়া বসিয়াছিলেন,—আর্য্যেতর অন্যান্য সত্য-পিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্ন-ভাণ্ডার, জীবন-প্রদ সত্য-রত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেন নাই। * * আর, তোমরা সকলেই জান, যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে আজ ভারতের সর্ব্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন-সঞ্চার অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। * *

"আর, আদান প্রদানই অভ্যুদয়ের মূল। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যগণের পদতলে বসিয়া সব জিনিস, এমন কি ধর্ম্মও শিখিব? অবশ্য উহাদের নিকট আমরা কল্-কব্জা শিখিতে পারি, আরও অনেক জিনিস শিখিতে পারি. কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে। * * জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। * * চৈতন্য রাজ্যের অপূর্ব্ব তত্ত্ব সমূহের বিনিময়ে আমরা জড়-রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করিব। চিরকাল ধরিয়া আমাদিগকে শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। * * * এখনও শত শত শতাব্দী জগৎকে শিক্ষা দিবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। তাহাই এক্ষণে করিতে হইবে। * *

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"—কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ। কারণ, শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। * * সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবান্‌কে 'অভীঃ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ', 'নির্ভীক' হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব। *" —[Vivekananda's Reply to the Address presented in Calcutta]

বিবেকানন্দের প্রচার সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় আছে যাহা ভারতবাসীর কল্যাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। একটি, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা,—প্রত্যেক নারীতে ব্রহ্মশক্তি-রূপিণী জগন্মাতার জীবন্তচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা। যেমন রামকৃষ্ণদেব, তেমনি বিবেকানন্দও প্রত্যেক নারীতে ভগবতীকে প্রত্যক্ষ করিতেন। আর পাশ্চাত্যদেশেও ঐ নারী শক্তির পূজা দেখিয়া, পাশ্চাত্য নারীর মহিমায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎপ্রতি ভারতীয় যুবকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :—

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—না শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * *

আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না। আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখ্ ছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?"—['বিবেকানন্দের পত্রাবলী', ৩য় ভাগ, ১৪৫ পৃষ্ঠা]।

আবার স্বামিজী ১৮৯৪ খৃঃ অঃ ১৯শে মার্চ্চ তারিখে লিখিত এক পত্রে নারীশক্তির মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের ভাষা ব্যবহার করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন:—"এদেশের (আমেরিকার) মেয়েদের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি, সব তাদের ভেতর। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে লক্ষ্মী স্বরূপিণী), তিনি এদেশে, আর, "পাপাত্মানাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ (পাপাত্মাদের হৃদয়ে অলক্ষ্মী রূপিণী) আমাদের দেশে। * * হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেলগুড়ুম, —ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ"। * * "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" (যথানে স্ত্রীলোকেরা আনন্দে থাকেন দেবতারাও তথায় আনন্দিত হন), বুড় মনু বলেছেন।"

আধুনিক সুশিক্ষিতা ভারত-নারীর শক্তির উপর বিবেকানন্দের কিরূপ আস্থা, তাঁহার নিকট হইতে স্বামিজী কত প্রত্যাশা করেন, "ভারতী"—পত্রের সম্পাদিকার নিকট লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তার পরিচয় পাওয়া যায়:—"আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর বিলাস ধর্ম্ম-বৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণ নেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে। এই সময় পরোপকারের * *। পাশ্চাত্য দেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী, বিদুষী, বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী, ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। * * * এদেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষি-মুখাগত ধর্ম্ম-প্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এই মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী, উভয়-ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন * *।"—["পত্রাবলী", ১ম ভাগ, ১০৩ পৃষ্ঠা]।
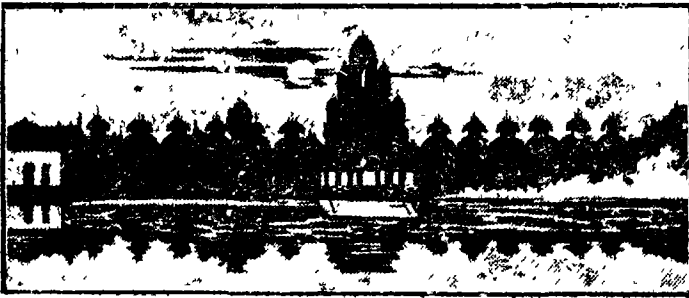
পুঁথি ও পত্র

গায়ত্রী—পাবনার দুর্গাদাস দর্শন টোলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺রায় প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত গায়ত্রীর শাংকরভাষ্য ও সায়ণভাষ্য ও উহাদের বঙ্গানুবাদ। মূ , চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং শ্রীসতীশ নারায়ণ চৌধুরী, পাবনা। লেখক শাংকর ভাষ্যের উপরই গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই জন্য অদ্বৈতবাদ সাধারণের নিকট সুগম করিবার জন্য ভূমিকায় সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। গায়ত্রীর পূর্ব্বে যে বৈদিক প্রাণায়ামে ব্যবহৃত, ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং—এই সপ্ত ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর পর যে গায়ত্রী-শিরঃ, ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্—এই উভয়ের প্রামাণ্যও তিনি গোভিল সূত্র হইতে দেখাইয়াছেন—ভূর্ভুবঃ স্বর্জনঃ মহস্তপঃ সত্যমিতি সপ্তব্যাহৃতয়ঃ প্রতিপ্রতীকং প্রণবাদ্যা গায়ত্র্যাপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি শিরঃ, দশপ্রণবযুক্তস্ত্রিরভ্যস্ত পূরক-কুম্ভক-রেচকাখ্যঃ প্রাণায়াম ইতি।" গায়ত্রীর চতুষ্পাদ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে এবং ত্রিপাদ ও চতুর্থ দর্শত-পদ এবং মুখ ও উপস্থান (নমস্কার) সম্বন্ধে তথ্য আমরা বৃহদারণ্যকে প্রাপ্ত হই; ঋগ্বেদের ৩ মণ্ডলের, ৬২ সূক্তের ১০ম ঋকে আমরা গায়ত্রীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক সায়ণভাষ্য এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩ অধ্যায়ের ৩৫ মন্ত্রে গায়ত্রীর উবটাচার্য্য এবং মহীধর ভাষ্য এবং "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামকগ্রন্থ হইতে আমরা হলায়ুধের ব্যাখ্যাও প্রাপ্ত হই; কিন্তু গায়ত্রীর শাংকর-ভাষ্য আমরা অদ্যাবধি কোথায়ও পাই নাই। গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন, "এই শংকরভাষ্য সাধারণের নিকট সুপরিচিত নহে।" তিনি উহার স্থান নির্দ্দেশ করিলে, সকলের সন্দেহ ভঞ্জন হইত। তবে এই শাংকর-ভাষ্যের উপর, তন্ত্রে যে গায়ত্রীকে অপর (সগুণ ব্রহ্ম), পর (নির্গুণ ব্রহ্ম) ও মহাপ্রণব (উভয়ব্রহ্ম) রূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ভাবনার উপদেশ আছে, তাহা প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রে 'তৎ' হইতে 'প্রচোদয়াৎ' পর্য্যন্ত শুদ্ধগায়ত্রীকে পর বা নির্গুণ প্রণব বলা হইয়াছে। উক্ত শাংকরভাষ্যে আমরা উহার নির্গুণ অর্থ প্রাপ্ত হই, যাহা সায়ণ, উবট, মহীধর বা হলায়ুধে আমরা প্রাপ্ত হই না।

ব্রহ্মচর্য্য—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

মানবের জীবনীশক্তি ব্রহ্মচর্য্যেই নিহিত। যে সময় হইতে আমাদের দেহবুদ্ধি বিকশিত হয় তখন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষদিন পর্য্যন্তই ইহার প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যদি আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় তবে উহা পালনের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যকে ভিত্তি না করিয়া যদি কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠে তাহা হইলে, উহা স্থায়ী হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত মতিবাবু উল্লিখিত বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তবে ব্রহ্মচর্য্য পালনে কি ভাবে মানুষ সমর্থ হইতে পারে সে বিষয়ের আলোচনা এই পুস্তকে পর্য্যাপ্ত নহে; এমন কি কোন কোন আলোচনা সুস্পষ্ট না হওয়াতে পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হয়। আলোচিত ভাষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইলেও আলোচ্য বিষয়ের মূল্য আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য গ্রন্থকারের সাধু প্রচেষ্টা এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার সদিচ্ছার প্রশংসা করি।

সংঘ ও বার্ত্তা

১। **শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির**—গত বৈশাখ সংখ্যার উদ্বোধনে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মাণ সম্পর্কে আমরা লিখিয়াছিলাম যে গর্ভ-মন্দিরটি মার্কিন দেশীয়া জনৈকা ভক্ত মহিলার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইতেছে। সম্প্রতি আমরা সংবাদ পাইলাম যে উক্ত গর্ভ-মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে দুইজন মার্কিন ভক্ত মহিলা ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উভয়কেই আমাদের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

২। কোয়েটায় ভূমিকম্প

ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে কোয়েটায় গত ৩১শে মে শুক্রবার রাত্রি ৩টা ৭ মিনিটের সময় এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পন মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল, কিন্তু উহার ফলেই যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে লোকমুখে প্রকাশ—এরূপ ভূমিকম্প নাকি পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। সিমলার এক সরকারী সংবাদে জানা যায় বেহারের তুলনায় কোয়েটায় প্রায় সিকি পরিমিত স্থানে বেহার হইতে পাঁচগুণ অধিক লোকক্ষয় হইয়াছে। বেহারের ভূমিকম্পের ভীষণতা যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন কোয়েটায় কি রকম সাজ্যাতিক কম্পন হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—কোয়েটা সহর সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতিক রঙ্গশালায় সহরটী একটী বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। শেষ রাত্রে আকস্মিক প্রবল-ভাবে কম্পনের ফলে কোয়েটা অঞ্চলের ৫০ হাজার লোক গৃহচাপে পড়িয়া মারা গিয়াছেন এবং বহু সহস্র লোক আহত হইয়া হাঁসপাতালে স্থান লইয়াছেন ও স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। ভগ্নস্তূপ খনন করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হাজার হাজার লোককে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করা হইয়াছে এবং আরও সহস্র সহস্র হতভাগ্য লোক ধ্বংসস্তূপের নিম্নে চাপা থাকিয়া অবর্ণনীয় নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া সরকারী সংবাদে প্রকাশ। সহরের পুলিশ বাহিনী একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং বাহির হইতে পুলিশ আনিয়া কাজ চালান হইতেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে প্রকাশ—কোয়েটায় এখনও রাত্রে বেশ শীত, কাজেই রাত্রির শেষের দিকে এই দুর্ঘটনার সময় সকলেই গৃহের অভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। বাত্যা-তাড়িত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ গভীর সমুদ্রে যেমন জাহাজ এদিক ওদিক আন্দোলিত হয়, ঠিক তেমনি অকস্মাৎ বসুন্ধরা প্রবলভাবে কম্পিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সহরটির সমস্ত পাকা বাড়ীঘর ভীষণ শব্দে ভূমিসাৎ হয়। কম্পনের সঙ্গে এমন ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল যে উহার ফলেও অনেক লোক মারা গিয়াছে বলিয়া লোকমুখে প্রকাশ। এই প্রলয়কাণ্ড এত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইয়াছে যে পনর আনা লোক ঘরের বাহির হইয়া আত্মরক্ষা করিবার সময় পর্য্যন্ত পান নাই।

ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই সহরের তিনটি স্থানে আগুন লাগিয়াছিল এবং বায়ুও উহার অনুকূল ছিল। কিন্তু সৈন্যদলের চেষ্টায় উহা নির্ব্বাপিত হয়। সহরের ক্যান্টনমেণ্টের দিকে কম্পনের বেগ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল, কাজেই সৈন্যদলের

মধ্যে হতাহতের সংখ্যা খুব কম হইয়াছে। রাত্রি ৫—৩০ মিনিটের সময় জেনারেল অফিসারের আদেশে একদল সৈন্য রিলিফের কাজ আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিয়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যস্থিত মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিগণের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঘটনার রাত্রেই প্রায় ৩ হাজার আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করত "ভারতীয় সৈনিক হাসপাতালে" ভর্ত্তি করিয়া দেন। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা যায়—এ পর্য্যন্ত ছয় হাজার আহত ব্যক্তি এই হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং ১৫ শত আহত ব্যক্তি বর্ত্তমানে উহাতে আছেন। এক কোয়েটা সহরেই ৩০ হাজার ভারতীয় এই দুর্ঘটনায় জীবন হারাইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—দুই হাজারের অধিক ব্রিটিশ এই আকস্মিক বিপদে পড়িয়া হতাহত হইয়াছেন এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের মধ্যে ৭ শত বিটিশকে করাচি হইতে জাহাজে ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকাংশ আহত ও অনাহত ব্যক্তি সহর ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে ঘোড়দৌড়ের বিস্তীর্ণ মাঠে আশ্রয় লইয়াছেন। আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১৫ শত করাচি হাঁসপাতাল ও দুই হাজারের বেশী লোক লাহোর হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছেন।

লারকনো, শুক্কর ও শিকারপুর প্রভৃতি উত্তর সিন্ধুর সমগ্র সমতলেই কোয়েটা ভূমিকম্পের প্রবল কম্পন অনুভূত এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের অন্যতম প্রধান সহর কালাত অঞ্চলে ৬২ মাইল ব্যাপী কম্পন হইয়াছিল। কালাতের দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২৯ শত নিহত এবং ৫ হাজার আহত হইয়াছে। কালাতের খাঁ সাহেবের বিখ্যাত মীরের প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়াছে। কোয়েটা রেসিডেন্সীতে সংবাদ আসিয়াছে যে চারিদিকের ৮ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিতে পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে, তথায় ১৬ শত লোক বিধ্বংসিত গৃহের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে এবং ৭ শত লোক আহত হইয়াছে। মাষ্টুং অঞ্চলে ২ হাজার লোক স্তূপের নিম্নে সমাধি লাভ করিয়াছে এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। কোয়েটা ও তৎপার্শ্বর্ত্তী বহু স্থানে বড় বড় গর্ত্ত এবং ফাটল হইয়া উহা হইতে কর্দ্দমাক্ত জল বাহির হইতেছে। মফঃস্বলের গ্রামগুলির দুরাবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করা এ পর্য্যন্তও সম্ভব হয় নাই।

কোয়েটায় শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জন সিন্ধী নিহত হইয়াছে। নিহত ৯ হাজার সিন্ধীর মধ্যে শিকারপুরী ব্যবসায়ী সিন্ধীই ৪ হাজার। ইঁহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ দেড় কোটি টাকা অনুমান করা যায়। এই অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনার ফলে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নগদ টাকা ও অস্থাবর সম্পত্তি ভগ্ন-স্তূপের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে লোকজন ও সৈন্যদলের সাহায্যে এই বিপুল সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে বলিয়া সরকারী বিবরণে প্রকাশ। ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত গলিত শবপূর্ণ ধ্বংসস্তূপ হইতে টাকা পয়সা সোনারূপা ও অন্যান্য মূল্যবান মালপত্র উদ্ধারের জন্য সেনাদল দূষিত গ্যাস নিবারক মুখোস পরিয়া কাজ করিতেছেন। এই ভূমিকম্পের ফলে রেল কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ টাকা।

কোয়েটা হইতে লোক স্থানান্তরিত এবং পীড়িতের জন্য লাহোর ও করাচি প্রভৃতি স্থান হইতে ঔষধ পথ্য ও খাদ্যাদি আমদানী করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বিমান পোত এবং স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোয়েটায় সরকারের তত্ত্বাবধানে ছয় শত কুলী ও আর একটী বড় সৈন্যদল দ্বারা একটী রিলিফ পার্টি গঠন করিয়া

সহর ও মফঃস্বলে রিলিফের কার্য্য চালান হইতেছে বলিয়া সরকারী সংবাদে প্রকাশ। এতদ্ব্যতীত লাহোর হইতে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পাঞ্জাব সরকারের উদ্যোগে রিলিফের কার্য্যভার লইয়া বিমানযোগে কোয়েটা রওনা হইয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে উল্লেখিত হইয়াছিল। লাহোর হইতে একটা রিলিফ ট্রেণে বহু নার্স, ডাক্তার, এম্বুলেন্স, প্রভৃতি কোয়েটা গিয়াছেন। সহরে লুঠ্ নিবারণের জন্য সামরিক আইনজারী করা হইয়াছে। সমগ্র সহরটী এখন সৈন্যদের অধীনে। বাহির হইতে কোন লোকের সহরে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সরকারী রিলিফের কার্য্য ভিন্ন কেবল রেড ক্রস্ সোসাইটী রিলিফের কার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। এই প্রাকৃতিক দুর্ব্বিপাকে বিধ্বংসিত কোয়েটা, কালং ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ধনবান ও নির্ধন সকলেই সমানভাবে বিপন্ন হইয়াছেন।

প্রভিডেন্স (আমেরিকা) বেদান্ত কেন্দ্র ২২০, য়্যান্জেল্ ষ্ট্রীট—

প্রভিডেন্স বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী বিগত ২১শে এপ্রিল ইষ্টার উৎসব উপলক্ষে আহূত একটি বিরাট জনসভায় বলিয়াছেন,—

"বসন্ত ঋতু যেমন প্রকৃতির বাহ্য পদার্থ সমূহকে নবজীবন দান করে, তেমনি ইষ্টার উৎসব মানুষের অভ্যন্তরকে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। যেমন শীতঋতু তড়িৎ গতিতে অন্তর্হিত হইয়া সুখময় বসন্তকে তার স্থানে বসাইয়া থাকে, তেমনি আসুরিক শক্তিকে তার আসন হইতে চ্যুত করিয়া সার্ব্বজনীন প্রীতি, প্রেম ও সহানুভূতি প্রভৃতি দেবসুলভ গুণরাশিকে সে স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"আমাদের কর্ম্মজগতের পরিচালকবৃন্দ অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার বিষময়ফল নিবারণের চেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতে ব্যস্ত; কিন্তু ধর্ম্মজগতের লোকোত্তর মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জীবন ও শিক্ষা দ্বার বারংবার প্রমাণ করিয়াছেন যে বাহ্যিক জড়শক্তি সত্ত্ব-সংযমিত না হইলে জগতে দুঃখ-দুর্দ্দশাই কেবল বৃদ্ধি করে।

"ঈশদূত যীশুখৃষ্ট প্রত্যেক বৎসরই এই উৎসবের ভিতর দিয়া আত্ম-শক্তি এবং প্রীতির জন্যই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন। আত্মিক শক্তি ব্যক্ত করিয়া মানুষ তার অভ্যন্তরস্থিত শক্তিরই যথার্থ বিকাশ করে। জগতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রীতি ও শান্তি রাজত্ব করুক ইহাই আমার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে একমাত্র প্রার্থনা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

উপলক্ষে ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রধান কার্য্যালয় বেলুড় মঠে প্রাপ্ত দান।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিবৃন্দ ২০০০৲। শ্রীযুত শিউদয়াল দ্বারকা প্রসাদ, কলিকাতা ২০১৲। শ্রীযুত শিউরতন মুন্ধ্রা, কলিকাতা ২০০৲। শ্রীযুত ভোলারাম মুর্দ্দি, কলিকাতা ১০০৲। শ্রীযুত রামচন্দ্র শেঠ, কলিকাতা ৪৮৲। মেজর এস্ নাগ, আই-এম্-এস্, ময়মনসিংহ ১১৲। শ্রীযুত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত মণিকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত দুর্গানাথ দে, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। এন্, খান্, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত বিভূতি মজুমদার, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এ,এন্ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত নীরেন্দ্রলাল দত্ত, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত জে, সি, দাস কলিকাতা ১০০৲। শ্রীযুত জে, সি, ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত ক্ষেত্রদাস গাঙ্গুলী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এস্, কে, বাগ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত বি, বি, সেন, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত আশুতোষ বসু, নয়াদিল্লী ৫৲। শ্রীযুত বসন্তকুমাব বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত পরেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা ৫৲। চ, ছ, জ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত হবিচব শেঠ, চন্দননগর ৫৲। শ্রীযুত শবৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ৫৲।

শ্রীযুক্ত বি, এম্, থারয়ার, কলিকাতা ১০০১৲। শ্রীযুক্ত জীবনরাম গঙ্গাবাম, কলিকাতা ২০১৲। মোঃ সফী, কলিকাতা ১০০৲। শ্রীযুত রোহিতরাম, কলিকাতা ৫১৲। শ্রীযুত কিবণ চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ২৫৲। জনৈক বন্ধু (শ্রীযুত বিভূতি মজুমদাব মাবফৎ) কলিকাতা ১৫৲। জনৈকবন্ধু, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত অনাদিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত বিজয়নাথ দত্ত, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। আগা আক্রাণী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত অনিলকুমার ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। মিঃ স্যামুয়েল বোস, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত করুণাময় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঢাকা ৫৲। শ্রীযুত কে, কে, মেনন, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত বি, বক্সিত, কলিকাতা ৫৲। ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সীতেশচন্দ্র বিশ্বাস, কলিকাতা ৫৲। মিঃ এ নসিম, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সুধীবকুমার ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মন্মথকুমাব সেন, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত জগৎনাথ বসুবায়, ভোলা ১০৲। জিয়ালাল ভাবদ্বাজ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ঘাটাইল ৫৲। শ্রীযুত কানাইলাল মিত্র, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সুবেন্দ্রনাথ বল, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত ডি, পি, খৈতান, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত পি, এন্, ঘটক, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র পাল, চন্দননগব ৫৲। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ৫৲। (ক্রমশঃ)

ভাদ্র—১৩৪২

বাস্তবিকই কি ভারত মৃত্যুমুখ? তা যদি হয়, তা হলে বুঝতে হবে জগতে আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু থাকবে না, নীতির সম্পূর্ণতা বলে কিছু থাকবে না, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতি বলে কিছু থাকবে না, আদর্শ প্রীতি বলে কিছু থাকবে না—সব ধ্বংস হয়ে, কাম ও বিলাসিতা, এই দুই পুং ও স্ত্রী দেবতা-উপাসনার দ্বৈতবাদ মাত্র জগতে রাজ্য করবে। তার পুরোহিত হবে কাঞ্চন,—উৎসব হবে, প্রতারণা—বল প্রয়োগ, প্রতিযোগিতা এবং দুর্ব্বল প্রাণী হবে তার বলি স্বরূপে কল্পনা। এমন কখনই হোতে পারে না। দুঃখ সহনশক্তি প্রতিকারশক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠা—ঘৃণা অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে শক্তিমতী। যাঁরা মনে করেন যে বর্ত্তমান ভারতের পুনরুজ্জীবন মাত্র একটা স্বাদেশিকতার উত্তেজনা—তাঁরা ভ্রান্ত।

—বিবেকানন্দ

রাখাল

কে তুমি রাখাল গগনে গগনে গ্রহতারা ধেনু চরাও নিত্য
মহাব্যোম্ পথে বাঁশরী বাজায়ে মাতাও নিখিল রাধার চিত্ত।
'পুরুষ' তোমার গোপরাজ পিতা, বিশ্ব "প্রকৃতি" যশোদা জননী
প্রলয় ক্ষুধায় জঠর পূরায়, প্রদানি' ত্রিলোক ক্ষীর নবনী
ভকত হৃদয় শ্যামল বনানী সর্ব্বদা তব প্রেমের কুঞ্জ
ভকতি তটিনী যমুনা তোমার বিরহ বরষা অশ্রু পুঞ্জ॥
আকাশে সাগরে তোমারি বরণ প্রতিভাত সদা সুনীল বর্ণে
তারার মেখলা শোভে কটিদেশে কুণ্ডল রবি তোমার কর্ণে,
মুরলীতে তব প্রণব মন্ত্র উঠিছে নিত্য বিরাট বিশ্বে
সসীমের বুকে অসীমের সুরে, মুক্তির বাণী দিতেছ নিঃস্বে।

জ্যোতিঃ সমুদ্র উচ্ছ্বাসে গগনে নাচিছ হে কৃষ্ণ! মধুর রঙ্গে
গাঢ় অনুরাগে অযুত বিশ্ব গোপিনীরা মিলে তোমার সঙ্গে।
তব মহারাসে অম্বরকূলে ক্ষিতি কোটি তারকা করিছে নৃত্য
যে শুনেছে তব নূপুরের ধ্বনি প্রেমে উন্মাদ তাহার চিত্ত।
কে বুঝিবে প্রভু কত মধুময় পরার্থ তব প্রেমের তত্ত্ব
কাঞ্চন ফেলি' কাচ লয়ে মিতি, মূঢ় জন রহে কামনা মত্ত।
প্রকৃতির বুকে ঘূর্ণিত সদা, বিষ্ণু! তোমার কালের চক্র
মুগ্ধ মানবে ভুলায়েছ কবি সাধনার পথ কুটিল বক্র।
মেঘে মেঘে উঠে অশনি নিনাদ নির্ঘোষে তব পাঞ্চজন্য
পাপ তাপ ভয় কংসে বিনাশি' ত্রিভুবন সদা করিছ ধন্য।
মহাকাল মহাবীর "হলায়ুধ" জ্যেষ্ঠ তোমার তেজের অংশ
পলকে বিরাট বিশাল ভুবন হলাকর্ষণে করিছে ধ্বংস।
প্রকাশ, বিলয়, সৃষ্টি ও লয় হে অরূপ তব বিরাট কর্ম্ম
দুর্জ্ঞেয় তব জ্ঞানের সাধনা বিমোহিত তাই মানব মর্ম্ম॥
মায়ামোহময় কালীয় নাগের কালকূটে আজি জীবন পূর্ণ
হৃদি যমুনায় ঝাঁপ দিয়া প্রভু করহে তাহার গরব চূর্ণ
চরাচর ভরি' অণু পরমাণু জেগে উঠে তব চরণ স্পর্শে
দূর্ব্বাদলের শিহরণ উঠে ধরার অঙ্গে বিপুল হর্ষে।
অনাদি হইতে অভিসার তব, অন্ত বিহীন অশেষ বক্ষে
ত্রিকাল ধরিয়া ত্রিলোক ভরিয়া, নিদ্রানাহিক অযুত চক্ষে।
তব করুণার জাহ্নবী ধারা ঝরিছে নিয়ত বিপুল মর্ত্ত্যে
ইন্দ্রিয় কুল আঁধার গোকুলে তবুও কাঁদিছে মোহের গর্ত্তে।
বাক্য মনের অতীত হে দেব! নাই নাই তব পূজার মন্ত্র,
তাই নিশিদিন বিরাম বিহীন বাজে বেদনায় হৃদয় যন্ত্র।
প্রকট মূরতি নিরখি তোমার ধরণীর রূপে রসে ও গন্ধে
অরূপ তোমার অনুভূতি জাগে মর্ম্ম মাঝারে গানের ছন্দে।
নয়নে নয়নে অশ্রু সিনানে ভকতের চিতে দিতেছ ভক্তি
মর্ম্ম কাননে বাঁশরী বাজায়ে ভরে দাও কালা প্রেমানুরক্তি
ওগো প্রেমময় অনাম রাখাল! দাও গো আশীষ, হে চির! সর্ব্ব
কূলের মাঝারে গভীর তিমিরে আপনারে যেন না করি খর্ব্ব।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা

২৩-১১-২৭ (কাশীধামে)

অদ্য বেলা ৮-৩০ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী মহারাজ মধুপুর হইতে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌছিলেন। অদ্বৈতাশ্রমের মণ্ডপঘরে (নীচের হলঘরে) একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া মধুপুর হইতে হঠাৎ এখানে (৺কাশীতে) আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন।

মহাপুরুষ মঃ।—কি আর বলব; রবিবারও স্থির ছিল না যে আমি ৺কাশীতে আসব। বিশ্বনাথের কি কৃপা, তিনি হঠাৎ এখানে টেনে আনলেন। এমন ভাবে টেনে আনলেন যে আর একদিনও দেরী করবার উপায় ছিলনা,—যেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। জয় বিশ্বনাথ। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পুনঃ সেই Hall ঘরে আসিয়া বসিলেন। দুই আশ্রমের অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী এবং বাহির হইতে গৃহিভক্তগণের আগমনে ঘরটী পূর্ণ হইয়া গেল। বালিয়াটীর জনৈক ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলে পূঃ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী তাঁহার ও বাটীর অন্যান্য সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিতে লাগিলেন :—

"গুরু আর কে? এক ভগবানই গুরু। আমরা ত শুধু তাঁর নামই দিচ্ছি। ঠাকুর 'গুরু, কর্ত্তা, বাবা' এসব কথায় বড় চটে যেতেন। তিনি মোটেই ইহা পছন্দ করতেন না। এক ভগবানই সব; তাঁর ইচ্ছা হলেই সব হয়। ঠাকুর মাকে সঙ্গে করে এবার এসেছেন। আবহমানকাল থেকে তীর্থাদি ও বেদপুরাণ শাস্ত্রাদি সবই ত রয়েছে। কিন্তু কালে মানুষের বুদ্ধির বিপর্য্যয়ের সঙ্গে ও মনের মালিন্যের জন্য শাস্ত্রাদির মর্ম্ম মানুষ ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে না। তাই দেশে অনাচার, ব্যাভিচার প্রভৃতি হতে থাকে। ভগবান তাই নররূপে অবতীর্ণ হন। নররূপ না ধারণ করলে মানুষ তাঁকে বুঝবে কি করে,—কেহ কি ভগবানকে ধারণা করতে পারে? এই সব, মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই শুধু জাগ্রত হয়। এই ত কাশী রয়েছে, বিশ্বনাথ রয়েছেন, প্রয়াগাদি তীর্থস্থান রয়েছে। ভগবান নররূপে এসে এসবই জাগ্রত করে তোলেন,—তবেই ত সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। তখন শাস্ত্রাদির মর্ম্মও লোকে বোঝে। ঠাকুর এবার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছেন,—স্বামিজী, মহারাজ, এঁদের কথা ভাব দেখি! স্বামিজীর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে মঠে একদিন ধ্যানের পর স্বামিজী নীচে নেবে এসে আমাদের বল্লেন—'ভাখো, এবার যে ভারতে স্রোত বইছে এ সাত আটশো বছর অপ্রতিহত বেগে চলবে। ঠাকুরের ভাব প্রচারের জন্য কত এসেছে, আরও কত আসবে তার কি ঠিক আছে।' স্বামিজী তখন খুব ধ্যান করতেন,—তাঁর শরীর যাবার সময় হয়েছিল কি না, তাই। তিনি অতি জোরের সহিত ঐ কথা কয়টী বল্লেন।

"দেখ, কাহারও ভাব নষ্ট করতে নেই। দেখছি, অনেকে কুলগুরুর নিকট দীক্ষাদি নিয়ে তারপর পুনঃ আমাদের কাছে আসে। কেও বা কৃষ্ণের ভক্ত, কেও বা শিবকে ভজনা করে। তাঁর ভাব রক্ষা করে সেইভাবেই

তাকে থাকতে বলা হয়। ঠাকুর ত এসব ছাড়া আর কিছু নন। তিনি হলেন সব—তাঁর ভিতর সব ভাবই আছে। যে যে ভাবে থাকতে চায় থাকুক না। তার ভাব নষ্ট করে শুধু ঠাকুরের নাম দেব কেন? এত ক্ষুদ্র গণ্ডি করা অত্যন্ত খারাপ।"

২৪-১১-২৭। পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও সন্ধ্যারতির পর ঘরটী সাধু, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তগণদ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ সকলকে নীরব দেখিয়া বলিলেন—"চুপ চাপ বসে থেকে লাভ কি? কিছু ভগবৎ চর্চ্চা কর। কিছু জিজ্ঞাসা কর,—আর না হয় আমি ঘরে যাই।"

সঃ মঃ—মহারাজ, ধ্যানজপের সময় যদি মন ঠিক ঠিক ভাবে সংযত করে না রাখতে পারি, তবে শুধু জপে কোন ফল হবে কি?

মহাপুরুষ মঃ।—মনকে ধ্যানের সময় খুব করে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। তবে শুধু জপেও ফল হয় বৈ কি? জপ করতে করতে হঠাৎ একবার লেগেও যায়,—ইহা আমি নিজেও দেখেছি। মনটা কি রকম জান? ঠিক দুষ্ট ছেলের মত। সে যেমন পড়তে আরম্ভ কোরে একবার এদিক একবার ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়ায়, পড়ায় মোটেই মনোযোগ দেয় না, কিন্তু পণ্ডিতের বেত্রাঘাত ও শাসনে পুনঃ মন সংযোগ করে পড়তে আরম্ভ করে, আমাদের মনও ঠিক তেমনি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে; তবে যখন বুঝবে যে ঐরূপ ছুটোছুটি করছে তখনই পণ্ডিতের মত শাসাতে আরম্ভ করবে,—বলবে, 'মন, কেন তুমি ওরূপ, চঞ্চল হচ্ছ। তুমি ত ভগবানের ধ্যান করতে বসেছ; এখন এত বাজে চিন্তা কেন?—এমনি করে মনকে চাবুক কস্‌তে হয়। তারপর ঠিক লেগে যায়। প্রথমতঃ ঠিক ঠিক ধ্যান না হলেও জপ ছাড়তে নেই।

সঃ মঃ।—মহারাজ, আমরা যে ঠিক সাধন ভজনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি তা কি করে বুঝবো?

মহাপুরুষ মঃ।—তোমার মনই বুঝিয়ে দেবে। **ভেতরে দিন দিন আনন্দ অনুভব করবে। ভগবচ্চিন্তা সর্ব্বদা করতে ইচ্ছা হবে। ভেতরে সকলের প্রতি ভালবাসা, প্রীতি, সহানুভূতি জাগবে।** দরিদ্রনারায়ণের প্রতি ভালবাসা হবে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলি দিন দিন কমে যাবে। এই ত সব tests (লক্ষণ), এছাড়া আর কি tests (লক্ষণ) হবে। সাধন ভজনের দিকে যে যত এগিয়ে যাবে তার ভেতরের সদ্‌গুণগুলি তত বিকাশ পাবে।

সঃ মঃ।—মহারাজ, সাধন ভজনের জন্য কিছুদিন সংঘের সকলের নিকট হতে একটু দূরে সরে নিরালম্বন হয়ে থাকা উচিত কি না?

মহাপুরুষ মঃ।—হাঁ; ভাব দৃঢ় হলে ঐরূপ করা ভাল। যখন সমস্ত দিনরাত ঐ ভাবে মসগুল হয়ে থাকবার ইচ্ছা হবে তখন ঐরূপ ভাবে কিছুদিন বাইরে কাটান ভাল। কখনও ধ্যান জপ, কখনও পাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করে সব সময় ঐরূপ থাকতে পারলে ভাল,—ওতে ভাব পোক্তাই হয়। তবে তোমরা যে সংঘের ভেতর থেকে কাজ করছ, এ তো তাঁরই (ঠাকুরেরই) কাজ। সংসার ছেড়ে যে এখানে এসেছো, তাঁর কাজের জন্যই তো এসেছো। ধ্যান জপের চেয়ে এ কাজ কি কম? 'আমি তাঁরই জন্য কাজ করছি, তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করচি,—এইভাবে যদি কাজ করতে পার তবে ও কি ধ্যান জপের চেয়ে কম হলো? ধ্যান জপই বা আর কি?

এই কাজেই যে তাঁর ধ্যান জপ হয়ে যাবে। পায়খানা সাফ্ থেকে পূজো পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ঠাকুরের কাজ, কোনটাই ছোট নয়। তোমরা ত আর সংসারে মাগ ছেলের জন্য চাকরী করছ না। তাঁর কাজের জন্যই সব ছেড়ে এসেছো। তাঁর কাজ করে যাও, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।

সঃ মঃ।—মহারাজ, এই কাজ কর্ম্ম করতে হলেও সকাল সন্ধ্যায় ধ্যানজপ করা ঠিক নয় কি? নইলে কাজের ঠিক spirit (ভাব) রক্ষা করা যাবে কি?

মহাপুরুষ মঃ।—ধ্যানজপ করতে হবে বৈকি। তা নাহলে কোন ভাব না নিয়ে শুধু রুগীর সেবা করলে কি হবে? ধ্যানজপ করতে হবে, আর কাজও করতে হবে, দুই-ই চাই। তুমি মলমূত্র পরিষ্কার করছ, রুগীর পথ্যাদির ব্যবস্থা করছ, সব রকম শুশ্রূষাই করছ; কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানজপ না থাকে, আর নারায়ণজ্ঞান না থাকে, তবে এ সেবা করে আর কি হবে।

জ্ঞাঃ মঃ।—মহারাজ, যদি কেহ ধ্যান জপ না করে, '**ঠাকুরের কাজ করছি**'—এই ভাবে সর্ব্বক্ষণ কাজ করে যায় তবে সাধন পথে অগ্রসর হতে পারবে কি?

মহাপুরুষ মঃ।—কেন পারবে না? যদি সব সময়ই মনে হয় যে তাঁর কাজই করছি, তবে ঐত ধ্যানজপ হয়ে যাচ্ছে। তখনই ঠিক ঠিক কাজ হলো। Work (কাজ) টাই তখন Worship এ (সাধনায়) দাঁড়ালো। প্রথম অবস্থায় এভাবটী যদি না হয় তবে ধ্যানজপ করতে হবে। পরে এই ভাব দৃঢ় হলে কাজের ভেতরেই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ মনন হতে থাকবে। আর পৃথক ধ্যানজপের প্রয়োজন হয় না।

তাঃ মঃ।—মহারাজ, একজনের কতক্ষণ ধ্যান ভজন করা দরকার?

মহাপুরুষ মঃ।—সে তুমি নিজেই বুঝবে কতক্ষণ করা উচিৎ কি না উচিৎ। তোমার যতক্ষণ ভাল লাগবে ততক্ষণ করবে। যখন ভাল লাগবে না তখন পাঠাদি করবে বা একটু বেড়াবে। কতক্ষণ ধ্যানজপ করা উচিৎ না উচিৎ তা নিজেই বুঝে নেবে।

ভঃ মঃ।—মহারাজ, আমাদের বেদান্ত ক্লাশে অনেকের ভেতরে একটু খট্‌কা লেগেছে যে ভগবান যদি নিগুর্ণ ব্রহ্ম হন তবে তাঁকে সাকার গুণময় ভেবে ভক্তেরা উপাসনা বা ভক্তি করবে কি করে?

মহাপুরুষ মঃ।—কেন, জ্ঞানপথে কি ভক্তি নেই? আত্মার "স্বরূপানুসন্ধান" করতে কি আর "ভক্তি" নেই? তাঁতে নিষ্ঠার নামই ভক্তি। তিনিই আত্মজ্যোতিঃ পরমব্রহ্ম, আবার তিনিই ত সব হয়েছেন। বেদান্ত পড়লে ত ভক্তির হানি হবার কথা নয়, বরং বাড়বে। তাঁকে যে যেভাবে চিন্তা করুক তিনি ত সেই ভাবেই তার নিকট প্রকট হন। চরমে সকলেই এক অবস্থায় এসে পড়বে।

৬ঃ মঃ।—মহারাজ, যাঁদের জ্ঞান হয়, তাঁদের কাছে এ জগৎটা কিরূপ মনে হয়?

মহাপুরুষ মঃ।—সেত জগৎ দেখতেই পায়না, —সবই ব্রহ্মময় দেখবে। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে আর বাহ্যজগৎ তার কাছে ভাসে না,—সর্ব্বত্র সেই একত্বানুভূতি হবে।

মঃ দত্ত।—মহারাজ, আমাদের সংসারী জীবের উপায় কি? আমরা ত আর ঘর সংসার ছেড়ে আসতে পারি নি।

মহাপুরুষ মঃ।—তাতে কি হয়েছে? তিনি ত সব জায়গায়ই আছেন। তবে সংসারে থেকেও সর্ব্বক্ষণ তাঁর কাজ করছি এই ভাবটা রাখতে পারলে খুব ভাল। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় বাড়ীর সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর চিন্তা করতে

পারলে আর ভয় থাকে না। যারা সংসারে থেকেও তাঁর স্মরণ মনন করে তারা খুব ভাল সংসারী; আর যারা রাতদিন টাকা পয়সা হিসেব নিকেশ, মাগছেলে, মামলা মোকদ্দমা নিয়ে মজে থাকে, তারা ভাল লোক নয়, আর ভগবানের দিকে এগুতেও পারে না। এরা (সন্ন্যাসীরা), যেমন সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরই কাজ কচ্ছে আপনারাও সংসারে থেকে তাঁরই কাজ করছেন মনে করে এবং সকাল সন্ধ্যায় একটু বিশেষভাবে স্মরণমনন করে চললে তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। এতে কল্যাণ হবে।

জ্ঞাঃ মঃ।—মহারাজ, স্বপ্ন কি? অনেক সময় খুব ভাল স্বপ্ন দেখে বা দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করে মনে খুব আনন্দ হয়। এসব স্বপ্ন কি ঠিক ঠিক হয়, না মনের ভ্রম?

মহাপুরুষ মঃ।—স্বপ্ন, স্বপ্নই। জাগলে কি আর দেখতে পাও। তবে ভাল স্বপ্ন দেখা ত খুব ভাল। মনে যে স্বপ্নে আনন্দ দেয়, সে স্বপ্ন হতে তো দোষ নেই, বরং সহায়তাই করে। তবে যদি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখা যায়—কাহাকেও খুন করছি বা অন্য কোন দোষ করছি—সে সব স্বপ্ন অবশ্য খুব খারাপ।

রাঃ মঃ।—মহারাজ, যদি স্বপ্নে দেখি যে কোন মহাপুরুষ আমাকে কিছু করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, তাহলে সেই উপদেশ মত কাজ করব কি? যদি সেই উপদেশ আমার নিজ গুরুর আদেশের বিপরীত হয়, তাহলেও তা পালন করা উচিত কিনা?

মহাপুরুষ মঃ।—স্বপ্নে যদি প্রকৃত মহাপুরুষেরই দর্শন হয়, তবে তাঁর উপদেশ পালন করতে দোষ কি? যে প্রকৃত মহাপুরুষ তিনি স্বপ্নেও কখনও অন্যায় আদেশ করেন না। যদি করেন, তবে বুঝবে যে তিনি মহাপুরুষ নন। প্রকৃত মহাপুরুষদের আদেশ স্বপ্নেও কখনও নিজগুরুর আদেশ বা উপদেশের বিরুদ্ধে হয় না।

ব্রঃ মঃ।—মহারাজ, দর্শনাদি না হলে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি তা বুঝবো কি করে?

মঃ মঃ।—"দর্শন কি যার তার হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ও hallucination এ (মাথার খেয়ালে) দাঁড়ায়। সকলের মেধা, brain ত (মস্তিষ্ক) আর সমান নয়। তবেই দর্শন ঠিক বলে বুঝবো যার ব্যবহারিক জীবনেও সাত্ত্বিক ভাব দেখতে পাব তার চরিত্রে কোন গলদ দেখবো না। নম্র, বিনয়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান যদি তিনি হন এবং তাঁর দর্শনাদি যদি কিছু হয় তবে তাহা ঠিক বলে ধরা যেতে পারে। নইলে কতজনে কত মাথার খেয়ালে কত কি দেখে ওগুলো ত আর দর্শন নয়,—বরং hallucination।"

যো মঃ।—নির্ব্বিকল্প সমাধির দিকে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি milestones (মাইলের সীমা নির্দ্দেশ চিহ্ন) চাই যা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা ঠিক ঠিকভাবেই চলেছি এবং জীবনপথে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমাদের জীবনে ত তা দেখতে পাচ্ছি না।

মহাপুরুষ মঃ।—তোমরা যে ঘর সংসার ছেড়ে সাধুর জীবন যাপন করছো, এই জীবনে স্বাদ না পেলে কি আর এতদিন থাকতে পারতে? যদি ভাল না লাগে সংসারে ফিরে যাও না? তা যদি যেতে ইচ্ছে না হয় তবে বুঝবে এই সন্ন্যাসজীবনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছ। উপলব্ধি কি আর সকলেরই সমান হয়? তবে ত্যাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, চরিত্রবল যত বাড়বে ততই বুঝবে যে ঠিক ঠিক সাধনপথে এগিয়ে যাচ্ছ।"

২৫-১১-২৭

প্রাতঃকাল; বেলা ৭৷৷০টা বাজিয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার শয়নঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া—

মহাপুরুষ মঃ।—ভাখো, ঠাকুর যাকে দিয়ে যা করাতে ইচ্ছা করেন তাকে তাই করতে হয়। আমি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে যেতুম তখন অন্য লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশতুম না,—কারণ, লোকের সংস্রব মোটেই ভাল লাগত না। কিছুদিন রামবাবুর বাড়ীতে থাকতুম। ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্য রামবাবুর মনে একটা খুব ঝোঁক্ এসেছে। তিনি যেখানে যান সেখানেই ঠাকুরের কথা বলে বেড়াতেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে ঐরূপ না করাতে তিনি একটু বিরক্ত হয়ে ঠাকুরের নিকট আমার সম্বন্ধে সব বল্লেন। ঠাকুর চুপ করে থেকে পরে বল্লেন—"ওদের কথা আলাদা; যখন সময় হবে তখন সবই করবে।" ঠাকুর তাঁর কাজ যে কি ভাবে করাবেন তা কি বোঝা যায়? আমরা যখন ঠাকুরের কাছে ছিলুম তখন মনে করতুম আমরাই শুধু তাঁর কাজের জন্য এসেছি। এখন দেখছি কত ভাল ভাল বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ত্যাগী ছেলেরা আসছে। দেখনা, কত ছেলে আসছে। আরও কত আসবে। এমনও আছে যারা এখনও জন্মায় নি। স্বামিজী একদিন মঠে ভোরে ধ্যান করে ভাবস্থ হয়ে যে আমগাছটী কেটে ফেলা হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে জোর করে বলেছিলেন—"দেখ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে স্রোত চলেছে তা ৭।৮ শো বৎসর ধরে চলবে, কে ও থামাতে পারবে না।" ঠাকুর এযুগে জগতের দুর্দ্দশা দেখেই এসেছিলেন। কোন অবতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রকৃতি তমঃ আচ্ছন্ন হয়। সর্ব্বত্রই এক তমের লীলা দেখতে পাওয়া যায়। অবতার পুরুষ সেই তমঃ নাশের জন্যই সাধন করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তমের আবরণ প্রকৃতির উপর হতে সরে যায়,—রজঃ ও সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়। সত্ত্বের রজঃ দ্বারা কাজ চলে। তাই ঠাকুর সাধনা করে প্রকৃতির তমঃ নাশ করে লীলাপ্রকট করেছেন। যা দেখছো তা তাঁরই ইচ্ছায়ই হচ্ছে।"

২৯-১১-২৭

ভোর ৮ টার সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার শয়নঘরে বসিয়া আছেন। অনেক সাধু ব্রহ্মচারীতে ঘরটী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে উত্তরপাড়া নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর শ্রীচরণ দর্শনে আসিলেন। পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার কুশলাদি প্রশ্নের পর বলিলেন :—

"আপনার শরীর বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে। আপনারা কে কে ৺কাশীতে থাকেন?

বৃদ্ধ।—আমি ও আমার স্ত্রী কয়েক বৎসর যাবত কাশীবাস করছি। আমার ছেলেপিলে নেই। এখন pension (অবসর বৃত্তি) পাচ্ছি।

মহাপুরুষ মঃ।—বা! এই বয়সে কাশীবাস করছেন,—এত পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগবানের ধ্যান, ধারণা, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, নিত্যগঙ্গাস্নান ৺বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন—এই ত চাই।"

বৃদ্ধ।—এখানে শরীরটা বেশ থাকে, মহারাজ। আয়ুটাও বেড়ে যায় বলে মনে হয়।

মহাপুরুষ মঃ।—হাঁ। ৺কাশীতে কি যেন কি একটা আছে। প্রায়ই দেখা যায় বৃদ্ধ বয়সে অনেকেরই কাশীবাসকালীন শরীর বেশ সুস্থ হয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। তবে আয়ুবৃদ্ধি বুঝিনা। যার যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তাকে তখন যেতেই হবে, এদিক ওদিক করবার জো নেই। অদৃষ্ট মানতে হয়। আর আয়ু ২।১ বছর বেড়েই কি লাভ? ভগবানে যদি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা না হলো তবে এ দেহ ধারণে ফল কি? চাই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য;—মানুষের যে কর্ত্তব্য তা যদি সে না করে, তবে শরীরের সুস্থতাই বলুন বা আয়ুর বৃদ্ধিই বলুন, কিছুতেই কিছু হয় না।

এমন সময় নেঃ মঃ একতোড়া ফুল একটী ফুলদানিতে সাজিয়ে এনে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। তা দেখে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বল্লেন :—

"হলদে ফুলটাই সব মাত করেছে; কি চমৎকার গন্ধ। মানুষের মধ্যে যে ভগবদ্‌প্রেমিক সে সকলকে মাতিয়ে রাখে। গ্রামে বা সহরে যেখানেই হোক একজন লোকও যদি বৈরাগ্যবান, ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে চারদিগের সকলেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়।"

কথা প্রসঙ্গে

(মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধি)

জীবনের ধাক্কা জিনিষটা যে কি তা আমরা সকলেই বুঝি। ফুটবল খেলা, কুস্তি বা মুষ্টি যুদ্ধে একজন হয়ত এমন আঘাত পেলে যে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ভূয়েঁ লুটিয়ে পড়লো। সকলে ধরাধরি করে তাকে ক্ষেত্রের বার করে নিয়ে এলো—দেহ তখনো মরার মত অচল হয়ে রয়েচে। খেলয়াড়দের দিক থেকে এটা খুব অপমানের ব্যাপার বটে, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে, এটা একটা জীবন রক্ষার উদ্যোগ। অনন্ত স্নেহশীলা ও জ্ঞানময়ী প্রকৃতি যখন দেখেন যে তার শরীর অতি-পরিশ্রম সহনে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, মূর্খতা বশতঃ ওর অধিক কৃচ্ছ্রতা করলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন তিনি তার অন্তরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বহিরাঙ্গের ক্রিয়াগুলি নিস্তেজ করে দেন। তখন সে বিশ্রাম লাভ কোরে পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে। এ যেন ঠিক একটা দুষ্টু ছেলে রদ্দুরে দৌড়োদৌড়ি করচে, সর্দ্দিগর্ম্মির ভয়ে মা যেমন তাকে বলপূর্ব্বক একটা শীতল কক্ষে অবরুদ্ধ করে ঘুম পাড়ান। বালক ভাবে, 'মা কত নিষ্ঠুর', সে বোঝে না ঐ ঘুমটা তার স্বাস্থ্যের একটা মস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

ঠিক তেমনি যখন আমরা অন্তঃকরণ বা ব্যক্তিত্বে আঘাত পাই, তখনই আমাদের সমস্ত স্নায়ু এবং শরীর-সঙ্ঘ এমন বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে যে বাহিরের লোকের সাহায্য আমাদের একান্ত দরকার হয়। এরূপ আঘাতও করুণাময়ী প্রকৃতির সতর্ক বাণী ছাড়া আর কিছু নয়। খেলতে গিয়ে শারীরিক ধাক্কায় অজ্ঞান হওয়া মানে যে, প্রকৃতি সতর্ক করছেন, এর অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং কষ্ট সহ্য করলে আমাদের মরতে হবে; ঠিক তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত হেতু যখন আমাদের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এসে উপস্থিত হয়, তখন সেটাকে প্রকৃতির সতর্ক-বাণী বলেই বুঝে নিতে হবে, যে আমরা, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও মনের যে একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম, নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সামর্থ্য আছে, সেটা কোনও অতিরিক্ত সৎ বা অসৎ কর্ম্মের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছি। বাসনার আবেগে অতি-কর্ম্মীর মনে হয়, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু জীবন তার বৃথায় গেল, কিন্তু সেই অকর্ম্মণ্যতার ভেতরও চেতনাময়ী প্রকৃতি তার দেহের বিশ্রাম ও কার্য্যের বিচারের অবসর দিচ্ছেন, এটা তারা ঐ খেলোয়াড়েরই মত ভুলে যায়।

খেলার যে ধাক্কা আমরা পাই তার দুটো কারণ —হয় খেলতে জানি না, নয় যার বা যাদের সঙ্গে খেলচি তারা আমার চাইতে অত্যন্ত প্রবল। ঠিক আমাদের যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এসে উপস্থিত হয় তারও দুটো কারণ—হয় আমরা দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি জানি না, অথবা ঘটনাচক্রে পড়ে এমন দুর্ব্বিসহ কর্ম্ম বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েচে যে আমাদের দেহ ও মনের ওপর, প্রতিক্রিয়া হেতু, একটা মস্ত দুর্ব্বলতা এসে পড়েচে। বাস্তবিক, স্নায়বিক দুর্ব্বলতাটা যে দেহের ও মনের দুর্ব্বলতা থেকে উপস্থিত হয়, তা নয়। অনেক সময় দেখা যায় একটা ক্ষীণ লোক কখন স্নায়বিক দুর্ব্বলতার অনুভব সারা জীবনে করলো না—কারণ তাকে

কখনও জীবনের কোনও উদ্বেগকর সমস্যা, দুর্ঘটনা বা অনাহার, অনিদ্রা, কঠোর পরিশ্রমের সম্মুখীন হতে হয় নি—সচ্ছলতা, সুযোগ এবং সুখকর ও প্রিয় কর্ম্মের ভেতর দিয়েই জীবনটা বেশ চলে এসেচে। পরন্তু একজন বলবানকেও দশ জনে মিলে আঘাত দিতে পারে—বুদ্ধিমান এবং সরলও "দশচক্রে ভগবান ভূত" হয়ে পড়ে। কাজেকাজেই স্নায়বিক-দুর্ব্বলতার একটা কারণ হতে পারে স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী না জানা, আর দ্বিতীয়, ব্যক্তিত্বে আঘাত হেতু যে দুর্ব্বলতা, তার কারণ হচ্ছে মনের অত্যধিক কৃচ্ছ্রতা, যা আমাদের সহ্য করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার একটা তাৎপর্য্য আছে, এর ভেতর দিয়ে প্রকৃতি আমাদের মানসিক ও স্নায়বিক শক্তি সংগ্রহে অবসর দিচ্চেন।

আমরা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই গ্রহে বাস করচি—পশুরা আমাদের আগেও এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েচে—প্রথম জীবাণুর সৃষ্টি যে কত কত নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে তার ইয়ত্তা করা কঠিন। জীবাণু দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত এবং ঐ সব জীবাণু সেই আদিম 'এক-জীবাণু' (unicellular) সমূহের অনুরূপ; অর্থাৎ আদিম সৃষ্টির একটি জীবাণুই একটি জীব, পরন্তু আমাদের একটি শরীর সেই এক-জীবাণুর মত অসংখ্য জীবাণুর একটি জটিল-সঙ্ঘ (অযুতসিদ্ধ অবয়ব)। আদিম এক-জীবাণুজীবসমূহ হতেই পৃথিবীর যাবতীয় স্থূল প্রাণিশরীরের আবির্ভাব। প্রথম জীবাণু হতে মনুষ্য জীবাণুর ক্রমবিকাশ পথে তাদের কর্ম্ম-ক্ষমতারও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা যায়।* তাদের ভেতর যে প্রকৃতির কি চৈতন্য ক্রীড়া চলেচে, এখনও তা আমাদের জ্ঞানের অতীত। এই সব জীবাণুর মাত্র যতটুকু কার্য্য ক্ষমতা আমরা জানতে পেরেছি, সেটুকু দিয়ে তারা কয়েক মিনিটও বাঁচতে পারে না। আমরা জীবন পথে যখনই কোনও অন্তর্নিহিত গুপ্ত বীজাণু-শক্তির কার্য্যপদ্ধতির বিপরীতাচরণ করি তখনই তারা দেহের একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি কোরে, তাদের বিষয় কিছু দেহীকে অবগত করিয়ে দেয়। ধরুন একটা ছেলে খুব কতকগুলো কাঁচা পেয়ারা খেলো—এতে স্বাস্থ্যের আইন ভঙ্গ হওয়ার একটা পাপ হলো। হিন্দু মতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আইন ভঙ্গের মত স্বাস্থ্যের আইন ভাঙাও একটা পাপ। দেহের কর্ম্মী জীবাণুরা তৎক্ষণাৎ শিশু মানবকে পেটে একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে সতর্ক করলে যে কাঁচা পেয়ারায় এমন একটা বিষাক্ত পদার্থ আছে যা পাকস্থলীর পক্ষে অনিষ্টকর। আমরা শিশুর যন্ত্রণায় জন্য সহানুভূতি দেখালুম ওষুধের ব্যবস্থা করে, যাতে তার পাকস্থলীর সে বিষটা নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, শিশুর তার দেহের স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সম্বন্ধে, যা জীবাণুর কর্ম্মশক্তিতে সুগুপ্ত, একটা বিশেষ জ্ঞান হলো। এই সতর্ক-বাণী সত্ত্বেও যদি পুনরায় সে একই পাপাচরণ করে তবে তার ফল দেহ-বিনাশের সম্ভাবনা। মানসিক ও নৈতিক অতিচার হেতু যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঐ একই রকম।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পাপাচরণের অর্থও

* Its earliest forms were specks of protoplasmic jelly floating about in the scum which the tides left as they receded from the shores of the world's first seas There were amœbas and there were jelly fish, the earth grew cooler, life left the waters and proliferated into enormous reptile like creatures, the dinosaurs and gigantosaurs of the mesozoic age, cooler still, and there were birds and mammals. Among them was a small lemur like creature, a comparatively late comer, whose descendants split into two branches · the one developed into the anthropoid apes, the other culminated in man. *Future of life P. 2, by Joad.*

আমরা এমন কোনও অনিয়ম করেছি, যার জন্য আমাদের আত্মিক অজ্ঞান ও মানসিক অশান্তি এসে উপস্থিত হয়েচে। হিন্দু দার্শনিকদের মতে মন হচ্চে ভূতসূক্ষ্ম বা অতি সূক্ষ্ম জড়। আমাদের বিচিত্র আচরণ—অর্থাৎ বাহ্য বিষয় ও অন্তঃকরণের মধ্যে ইন্দ্রিয় সাহায্যে যে আদান প্রদান—তাতে ঐ সূক্ষ্মভূতে কম্পন সৃষ্টি ও তা জীব কর্তৃক অনুভূত হয়। একেই আমরা সুখ দুঃখ বা শান্তি অশান্তি রূপে আখ্যান দিয়ে থাকি। এমন কতকগুলো কাজ আছে যা থেকে মনের সাম্য নষ্ট হয়ে জীবের অশান্তি বা দুঃখের অনুভূতি হয়। পরে মানুষ অভ্যাস, ঝোঁক বা রোখের মাথায় দুঃখাশান্তিকর কার্য্য করায়, তার দৈহিক ফলের পূর্ব্বে তাকে আরও অনেকগুলো নরক-সদৃশ মানসিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, যেমন—ভয়, হতাশা, উদ্বেগ—যা থেকে স্নায়বিক দুর্ব্বলতার সৃষ্টি। এগুলো নৈতিক স্বাস্থ্যের অনিয়ম হেতু উদরের যন্ত্রণার মত। দৈহিক জীবাণুর ন্যায় মানসিক ভূতসূক্ষ্মের গোপনীয় কর্ম্মক্ষমতা আমাদের নিকট প্রায় অপ্রকাশিত; মাঝে মাঝে এই অনিয়ম বা অন্য কোনও রূপ বিশিষ্ট আবরণের মধ্য দিয়ে তার কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান মানুষ লাভ কোরে উত্তরোত্তর সামাজিক আইনের সৃষ্টি করেচে। সেই জন্য ভয়, হতাশা, উদ্বেগাদি হেয় হলেও, অন্তর রাজ্যের জ্ঞানের হেতু বলে প্রেয়ও বটে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতাটা একটা ব্যাধি হলেও—এর ভেতর দিয়ে মানুষ তার আত্মিক ব্যয়ের ক্ষতিপূরণের অবসর পেতে পারে।

পাশ্চাত্যেরা আগে বিশ্বাস করত যে ব্যক্তিত্ব জিনিষটা দু-ভাগে বিভক্ত—দেহ ও আত্মা। বর্ত্তমান জড-বিজ্ঞান বলেন, 'আত্মা বলে কিছু নেই, দেহ ও আত্মা একটা জড়েরই দুটো দিক।' কিন্তু বেদান্ত বলেন, 'মানুষের তিনটে দিক্,—প্রথম আত্মা তিনি অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ—এ স্বরূপতঃ নিরুপাধিক, কাজেকাজেই অনাদি অনন্ত। এঁরই কল্পনা শক্তি হতে ভূতসূক্ষ্মের উৎপত্তি হয়েচে। এই ভূত-সূক্ষ্ম কল্পনা হলেও সত্যেরই মত। এই ভূত-সূক্ষ্ম দিয়ে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্তের সৃষ্টি হয়। সত্য-জ্ঞান-আনন্দ স্বরূপ এক-রস আত্মা যখন খণ্ডিত বিচিত্র অন্তঃকরণে প্রতিভাত হন, তখন এক একটি মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তের গণ্ডিতে বিচিত্র সংকল্প-বিকল্প, নিশ্চয়, অহং-নাহং এবং চিত্তরূপ অবচেতন-ভূমিতে সমগ্র প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত সংস্কার পুঞ্জীভূত এবং প্রয়োজন কালে স্মরণ হতে থাকে। কিন্তু এই অন্তঃকরণের কার্য্য আবার দেহ সাপেক্ষ। অন্তঃকরণ ও দেহ একই ভূতসূক্ষ্মে তৈরী, কেবল প্রথমটা সূক্ষ্ম এবং শেষেরটা স্থূল। এ হিসাবে বিজ্ঞান সত্য। অন্তঃকরণ ও দেহ যেন ধান গাছের মাজ ও পাতার মত। অন্তঃকরণের স্পন্দনে দেহের স্পন্দন এবং দেহের স্পন্দনে তদনুরূপ অন্তঃকরণে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। দেহ ও অন্তঃকরণের সম্বন্ধ স্থাপক হচ্চে ইন্দ্রিয়, এও ভূত-সূক্ষ্ম দিয়ে তৈরী। অন্তঃকরণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক সর্ব্ববিধ ভূতসূক্ষ্ম দিয়ে তৈরী। কিন্তু বিভিন্ন ভূত-সূক্ষ্ম দিয়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়েচে, যেমন শব্দ দিয়ে কর্ণ, স্পর্শ দিয়ে দিয়ে ত্বক্, রূপ দিয়ে চক্ষু, রস দিয়ে জিহ্বা এবং গন্ধ দিয়ে নাসিকা। বাহ্য বিভিন্ন ভূত-সূক্ষ্ম বিভিন্ন স্পন্দন সৃষ্টি করে, যা সেই ভূত সূক্ষ্ম দিয়ে তৈরী যন্ত্র ছাড়া প্রতি স্পন্দনের সৃষ্টি করবে না—তাই ফুলের রূপের স্পন্দন চক্ষে স্পন্দন সৃষ্টি করে—নাসিকায় নয়, তার গন্ধ নাসিকায় স্পন্দন সৃষ্টি করে—চক্ষে নয়। কিন্তু এইরূপে তার বিভিন্ন সূক্ষ্মভূত স্পন্দন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে গিয়ে সমষ্টির জ্ঞান হয় তার

অন্তঃকরণে, কারণ অন্তঃকরণের উপাদান সর্ব্ববিধ ভূত-সূক্ষ্মের সমষ্টি বলে সর্ব্ববিধ স্পন্দনেরই সৃষ্টি করে। আবার এই ভূত-সূক্ষ্মের সমষ্টির বৈচিত্র্যে সেই একই অন্তঃকরণে একই আত্মালোকে অহংকার, নিশ্চয়, সংকল্প-বিকল্প, বিস্মৃত সংস্কারের স্মৃতি এবং পরে এদের সহযোগে চিন্তা, ভাব, কর্ম্মেচ্ছা রূপে চিত্তবৃত্তি প্রতিভাত হয়। যেমন কাচ ও একটা আলোক, কাচের বৈচিত্র্যে ঐ আলোকের বৈচিত্র্য ঘটে। এই জ্ঞানালোক সংযুক্ত অন্তঃকরণের আর একটা স্বভাব হচ্ছে প্রাণ শক্তি। এই প্রাণশক্তিই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ শক্তিরূপে প্রতিভাত হচ্ছে এবং স্থূল ভূতসূক্ষ্মে প্রবিষ্ট হয়ে দেহের উপাদান জীবাণু বা দৈহিক প্রাণকোষের সৃষ্টি করচে। জীবাণু অপেক্ষা দৈহিক-প্রাণকোষই এর উপযুক্ত নাম।

ব্যক্তিত্বের তিনটি দিক্—দেহ, অন্তঃকরণ ও আত্মা। জাগ্রৎ ভূমিতে দেহ ব্যতিরিক্ত অন্তঃকরণের কর্ম্ম আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, অবশ্য স্বপ্নাবস্থায় দেহ জ্ঞান থাকে না। বেদান্তী বলেন, 'দেহ নাশের পর জাগ্রৎ ভূমিতে কর্ম্মের জন্য অন্তঃকরণ তার প্রাণ শক্তির সাহায্যে অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে।' এইরূপ গতাগতি চলতে থাকবে যতদিন না এই কল্পনা প্রসূত ভূত-সূক্ষ্মোপাদান আত্মার অন্তঃকরণোপাধি আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট না হয়—তখন একমাত্র নিরুপাধিক নিরঞ্জন চিৎসদানন্দ আত্মাই বর্ত্তমান থাকবেন। জীবের অবিবেক বশতঃ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি বশতঃ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব।

যা হোক, আমাদের যখন সব সময় এই ব্যক্তিত্ব নিয়েই কারবার, ও তপ্ত গোলকের (১) উত্তাপ, (২) পরমাণু ও (৩) স্থূল গোলকের ন্যায় যখন (১) চৈতন্য, (২) সূক্ষ্ম শরীর ও (৩) স্থূল শরীর পরস্পর এরূপ নিবিড় ভাবে জড়িত যে একটিকে অপরটি হতে বিশ্লিষ্ট করা যোগ অথবা কল্পনা সহায় ছাড়া অন্য উপায় নেই এবং যখন দেহ বা মনের বিকারে আমরা নানাবিধ কষ্ট পাচ্ছি, তখন তার মধ্যে দেহের আঘাত হেতু মানসিক এবং মনের আঘাত হেতু স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বিষয়ে আমরা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বৈদ্যকশাস্ত্রের সাহায্যে আলোচনা করব। *

সকলেরই ইচ্ছা যে আমরা আনন্দে, নিরাপদে ও সচ্ছলতার মধ্যে বাস করি। কিন্তু তথাপি আমার আবেষ্টনীর প্রাকৃত-নিয়ম গুলি ভঙ্গ করে প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান হতে যাই কেন? প্রকৃতির নিয়মের ওপর জয়লাভ করেচেন তাঁরা, যাঁরা পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞানী, অথবা কিছু কিছু নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন সেই ভারতীয় হঠ যোগীরা। কিন্তু সকলেই ত আর ভারতীয় হঠ-যোগী নয় যে বিষ, কাচ খেয়ে হজম করবে। আমরা বাস করচি পৃথিবীর ওপর। এ গ্রহের উত্তাপ শীতল হয়ে ওপরে যে ছ সাত মাইল ব্যাপী সরের মত স্তর পড়েচে, সেইটে হচ্ছে আমাদের মাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি। এর ওপর একটা বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডলের চাপ, আবহাওয়া, দেহের রাসায়নিক সংযোগ ও বিভাগ, প্রাণবৃদ্ধির পরিচয়, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা আছে। এ সব বিশিষ্টতা আবার কালের অপ্রতিহত গতির সহিত বদলাচ্চে। ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যে, আমাদের মত অবস্থাপন্ন জীবদের পক্ষে বর্ত্তমানই অতি প্রবল। বর্ত্তমানে অতীতের স্মৃতি আছে, ভবিষ্যতের আশা বা ভীতি আছে, কিন্তু বর্ত্তমানকে আশ্রয় করেই আমাদের চলতে হয়। অনেক সময় আমাদের অতীতের স্মৃতি এমন প্রবল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কখন তীব্র দুঃখময়

* এই প্রবন্ধে Nervous Breakdown, by W. B. Wolfe, M. D. পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অথবা অতীব সুখকর বলে বোধ হয়, যে বর্ত্তমানটা আমাদের একেবারেই ভাল লাগে না এবং তার জন্য স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হেতু আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠি। এটা সাধারণতঃ অধিক বয়সদের অল্প বয়সদের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধেও উপেক্ষারূপে দেখা দেয়। ভবিষ্যতের ভীতি হতেও স্নায়বিক দুঃখ ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতের অত্যধিক আশার স্বপ্নও অনেক আত্মনাস্কার-যুবকদের কর্ম্ম-ক্ষমতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু, একেবারে নষ্ট করে দেয়। তার ওপর আবার বর্ত্তমানের যে সব সামাজিক আইন-কানুন পাহাড়ের মত আমাদের ঘিরে আছে, বৃথা তাতে আঘাত করে নিজে আহত না হয়ে, জলের মত ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে স্বীয়োদ্দেশ্যে গমন করা উচিত। ঐতিহাসিক প্রবল-ব্যক্তিত্বদের কথা বাদ দিয়ে, আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিত্বদের তড়িৎ ঘড়িৎ কিছু করতে গেলেই ইংরেজী মনবৈজ্ঞক শাস্ত্রে যাকে "nervous break down" "psychological knock-out" বলে অর্থাৎ আমরা চলতি ভাষায় যাকে "দেহ মন ভেঙে যাওয়া" বলি, তা ভোগ করতেই হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে যদি আমরা একটু মনোযোগ দেই, তা হলে, হতাশা, চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ধ্বংস বা পতন ভীতি, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ অত্যাচার প্রভৃতি বহু মানসিক বিকার হেতু স্নায়বিক অক্ষমতা হতে বেঁচে যেতে পারি।—

(১) বাঁচতে গেলে আহার চাই। আহারের সংস্থান করতে গেলে কাজ করতে হবে। কাজ না করে আহার প্রায় কারও ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। যাদের আহার পূর্ব্ব হতেই সঞ্চিত আছে, তাদের পক্ষেও বিনা চেষ্টায় বসে বসে খাওয়া একটা মস্ত এক ঘেঁয়ে ব্যাপার—এরও ফল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। এর ওপর সঞ্চিত-অন্ন ব্যক্তিদের যদি দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কলা রাজনীতি প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে বৃত্তি না থাকে, তা হলে তাঁদের ইন্দ্রিয়শক্তির বশবর্ত্তী হতেই হবে, কারণ একটা উদ্দীপনা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

(২) পৃথিবীতে কোনও মানুষই একলা থাকতে পারে না। সকলকেই অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সেই জন্য প্রত্যেকের ব্যবহার যেন অপর কারও ক্ষতিকর না হয়। প্রত্যেক লোক যদি স্বার্থপর হয়ে নিজেতেই সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে তার আত্মার প্রসার, জ্ঞানের বিবৃদ্ধি, ভুল ভ্রান্তির সংশোধন কিছুই হয় না এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন সমাজের অঙ্গ, তখন গুটি পোকার মত থাকা মানে নিজের আত্মিক-মৃত্যু এবং সমাজের ক্ষতি। সেই জন্য এও এক প্রকার প্রাকৃত নিয়ম ভঙ্গ করা এবং এর ফলে বাহিরের তীব্র সমালোচনার ক্ষত-হেতু স্নায়বিক দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে।

(৩) যাঁদের ভেতর সন্ন্যাসবৃত্তি নেই, অথচ অসচ্ছলতা বা অন্য কোনও কারণে অবিবাহিত জীবন যাপন করেন, এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য যে কর্ম্মচেষ্ট, অবসর কালের সদ্ ব্যবহার, সামাজিক ব্যাপারে সময় নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য উপেক্ষা করে যদি অতি-সাহিত্যিক বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েন তা হলে এই স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভোগ করতে হবে। তবে গার্হস্থ্য জীবনেও সাহিত্য বা দর্শনকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না—অবসর কালে কিছু কিছু চর্চ্চা রাখা দরকার এবং ধীরে ধীরে জীবিকাকর্ম্ম হতে অবসর গ্রহণ করে পঞ্চাশ উর্দ্ধে সমগ্র ক্ষমতাই ঐ সব বিষয়ে নিয়োগ করা উচিত। আজকাল আমাদের পরমায়ু এত অল্প যে একটু আগে থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ না করলে আর সময়ই পাওয়া

যায় না। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁরা অতিবিক্ত দারিদ্র্য, নিরন্তর ব্যাধি-হেতু জীবনে উচ্চ চিন্তার অবসরই পেয়ে ওঠেন না। আবার যাদের "প্রথম মনুষ্য জন্ম" অর্থাৎ অত্যন্ত জড়স্বভাব তাঁদেব জ্ঞানভূমিতে উচ্চ চিন্তা বিষয়ক কোনও সমস্যা, কোনও অপূর্ব্ব ভাব বা জীবনের শংকার সমাধান সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই ওঠে না—তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগ ও ভোগোপকবণ অর্থ সঞ্চয়েই ব্যস্ত।

(৪) শৈশব কাল হতেই মানুষের হীনতা-বোধ জাগে—কারণ শিশু দুর্ব্বল ও অসহায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিব সহিত দৈহিক ও মানসিক বলের সাহায্যে যখন সে নিরাপদত্ব, প্রভুত্ব এবং সচ্ছলতা প্রাপ্ত হয়, তখন ধীবে ধীরে তাব ঐ হীনতা-বোধ কেটে যায়। কিন্তু কার্য্যতৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর একটা বিপদ আসতে পারে,—সর্ব্ববিষয়েই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ এবং এব জন্য মানুষ এমন এক একটা অসম্ভব কার্য্যে ব্যস্ত হয় যে যার জন্য তাকে সাবা জীবন স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভোগ, এমন কি পাগল পর্য্যন্ত হতে হয়। পক্ষান্তরে মানুষ দশচক্রে পড়ে হীনাবস্থায় থাকতে থাকতে তার আত্মনিষ্ঠা একেবারে চলে যায় এবং যার জন্য সে প্রত্যেক কাজেই স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু মনঃকষ্ট পেয়ে থাকে।

এখন আমাদেব শাস্ত্র এই মানসিক চাঞ্চল্য এবং অবসাদ হেতু যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য তার প্রতিষেধের উপায় কি বলছেন দেখা যাক। ভারত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কুরুবংশের ধ্বংস অনুমান হেতু ধৃতরাষ্ট্র খুব মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। তখন বিদুরের গুরু সনৎ সুজাত চিত্ত উপশান্তি সম্বন্ধে তাঁকে উপদেশ করেন। ক্রোধাদি দ্বাদশ এবং নৃশংসত্বাদি সপ্ত দোষ তপস্যার বা সর্ব্ববিধ মহদুদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় এবং সাধনজাত দ্বাদশটি গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ক্রোধাদি দ্বাদশ—(১) বাসনার প্রতিঘাত হেতু যা থেকে তাড়ন, আক্রোশনাদি বৃত্তির উদ্ভব হয় এবং যার দৈহিক চিহ্ন হচ্ছে স্বেদ, কম্পনাদি, তাকে ক্রোধ বলে। (২) কাম—বিলাস দ্রব্যে অভিলাষ। (৩) লোভ—পর দ্রব্যেচ্ছা এবং ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের তীর্থাদি সৎকার্য্যে ব্যবহার না কবে সঞ্চয় কবা। (৪) মোহ—কৃত্যাকৃত্য বিবেক-শূন্যতা। (৫) বিধিৎসা—অতিরিক্ত বিষয়-রসাস্বাদেচ্ছা। (৬) অকৃপা—নিষ্ঠুরতা। (৭) অসূয়া—যে কোনও গুণে দোষাবিষ্কার অর্থাৎ কারও গুণ সহ্য করতে না পারা। (৮) মান—নিজেকে খুব বড় মনে করা। (৯) শোক—ইষ্টবিয়োগ হেতু বোদন, চিন্তা এবং অনিষ্টের প্রতিকার না করে চুপ কবে থাকা। (১০) স্পৃহা—নিত্য নূতন বিষয়-ভোগেচ্ছা। (১১) ঈর্ষ্যা—পরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে অনিচ্ছা। (১২) জুগুপ্সা—পরের নিন্দা করে বেড়ান।—এ সকলের ফল বিষম আঘাত প্রাপ্তি। প্রত্যেক কার্য্যই তার কারণকে প্রাপ্ত হবেই, তাই প্রত্যেক অনিষ্টাচরণ আচরণকারীর নিকট ফিবে যেতে বাধ্য।

নৃশংস সপ্ত—(১) সংভোগ সংবিৎ—ভোগ্য-বস্তুব তারতম্য ও উপায় কৌশলী। (২) বিষম—পবের প্রতি উপদ্রব সৃষ্টি করে নিজে বর্দ্ধমান হওয়া। (৩) দত্তানুতাপী—দান করে যে অনুতাপ করে। (৪) কৃপণ—সামান্য অর্থ লাভের জন্য যে কোনও প্রকার অবমাননা সহ্য করা। (৫) অবল—দৈহিক ও মানসিক বলহীন। (৬) বর্গ প্রশংসী—ইন্দ্রিয় সুখেব প্রশংসা। (৭) স্ত্রীদ্বেষী—যারা নারীকে জগদম্বার অংশসংভূতা না দেখে ঘৃণা বা পশুবৎ ব্যবহার করে।—এই সকল নরপশুরা জোর করে ধর্ম্মাভ্যাস করতে গিয়ে মানসিক জড়ত্ব প্রাপ্তি হয়।

দ্বাদশ গুণ—(১) জ্ঞান—আত্মা, মন, দেহ ও জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনা। (২) সত্য—সকলের কল্যাণকর যথার্থ ভাষণ—অপ্রিয় সত্য নয়। (৩)

দম—মনস্থির করা। (৪) শ্রুত—অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ। (৫) অমাৎসর্য্য—সর্ব্বভূতের দোষ ও গুণ সহ্য করা। (৬) হ্রীঃ—অকার্য্যকরণে লজ্জা। (৭) অনসূয়া—পরের দোষাবিষ্কার না করা। (৮) তিতিক্ষা—চিন্তা বিলাপ বর্জ্জিত, সামর্থ্য সত্ত্বেও অপ্রতিকার পূর্ব্বক, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। (৯) যজ্ঞ—উপাসনা। (১০) দান—উপযুক্ত দেশ কাল ও পাত্রে ধনাদি পরিত্যাগ। (১১) ধৃতি—অতি লোভনীয় বিষয় হতেও ইন্দ্রিয়-সংযম-সামর্থ্য। (১২) শম—মনকে লোভনীয় বিষয় হতে উপরত করা।—এই দ্বাদশটি গুণ সম্পন্ন যাঁরা তাদের কখন মানসিক বা স্নায়বিক চাঞ্চল্য ভোগ করতে হয় না।

তৃতীয় গুণটি সব চাইতে কঠিন। যে মনস্থির করতে পেরেচে তার অসাধ্য কর্ম্ম নেই—সে দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ ব্যাধির যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়েচে। এখন সুজাত এই মনস্থিরের প্রতি-বন্ধক আঠারটি দোষের উল্লেখ করচেন। এ দোষ-গুলির আচরণ করলেই, তার ফলস্বরূপে মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভীতি, অপব কর্ত্তৃক শত্রুতা, অনিদ্রা, মর্ম্মদাহ, প্রলাপ এবং এই সকলের ফলস্বরূপ দেহ ও মনের ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ভোগ করতে হবেই।

(১) অনৃত—স্বার্থসিদ্ধি, কৌতুক ও জ্বালাতন করবার জন্ম মিথ্যা কথা সত্যেরই মত নিঃশঙ্কভাবে ব্যবহার। (২) পৈশুন—কাহারও অভ্যুদয় দর্শনে তাহার চরিত্রে গোপনে দোষারোপ। (৩) তৃষ্ণা—নিরন্তর বিলাস, যশঃ অথবা শক্তি-পিপাসা। (৪) প্রাতিকূল্য—ভাল কথারও প্রতিবাদ করা। (৫) তমঃ—উচ্চ চিন্তা না করা। (৬) অরতি—যথোপযুক্ত লাভ হলেও তাতে অসন্তুষ্টি। (৭) লোকদ্বেষ—অনর্থক পর-পীড়ন। (৮) অভিমান—সত্য ও প্রতিভার কাছেও মাথা অবনত না করা, ইংরেজী মনস্তত্ত্বে একে superiority complex বলে। (৯) বিবাদ—ঝগড়াটে স্বভাব। (১০) প্রাণী পীড়ন—স্বার্থ বা হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে প্রাণিপীড়ন। (১১) পরিবাদ—লোকের মুখের ওপর কড়া কথা শোনান। (১২) অতিবাদ—নিরর্থক বক্ বক্ করা—এতে মিথ্যা ও অপ্রিয় বাক্য বেরিয়ে পড়ে। (১৩) পরিতাপ—অতীত দুঃখের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা। (১৪) অক্ষমা—নিজের দোষ আমরা যেমন ক্ষমা করি, পরের দোষ তেমনি ভাবে ক্ষমা না করা। (১৫) অধৃতি—প্রলোভনের বস্তু হতে ইন্দ্রিয় সকলকে ধারণ না করা। (১৬) অসিদ্ধি—ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় সিদ্ধির চেষ্টা না করা।

[ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁর সাংখ্য কারিকায় (৫১) আট প্রকার সিদ্ধি বলেচেন—(১) আধ্যাত্মিক বা দেহ মনের দুঃখ জয়; (২) আধি দৈবিক—গ্রহপীড়াদি দুঃখ জয়, (৩) আধি ভৌতিক—চৌর ব্যাঘ্রাদি দুঃখ জয়, (৪) অধ্যয়ন—বিধিবৎ গুরুমুখ হতে অধ্যাত্মবিদ্যা-সকলের অক্ষর-স্বরূপ গ্রহণ, (৫) শব্দ—প্রতিশব্দজনিত অর্থজ্ঞান, (৬) উহ—বেদের অবিরোধী ন্যায়ের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষরূপে বেদবাক্যের পরীক্ষা—এর অপর নাম মনন, (৭) সুহৃৎ-প্রাপ্তি—নিজ জ্ঞানকে অপরের নিকট উপস্থাপিত করে মেলাবার জন্য গুরু, শিষ্য ও বন্ধুবর্গপ্রাপ্তি; (৮) দান—বিবেক বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি (✓দৈপ্-শোধনে)। যোগশাস্ত্রে এই অষ্টসিদ্ধির অপব নাম—প্রমোদ, মুদিত, মোদমান, তাব, সুতার, তারতার, রম্যক এবং সদামুদিত। (তত্ত্বকৌমুদী—বাচস্পতি মিশ্র)।]

(১৭) পাপকৃত্য—সামাজিক বিধি নিষেধ ব্যক্তিগত ভাবে ভঙ্গ;—কোনও পরিবর্ত্তন আনতে গেলে সমবেত ভাবেই ভাল। সামাজিক কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান পাপকৃত্য নহে। স্বীয় দুর্ব্বলতা হেতু সামাজিক আইনের বিরুদ্ধাচরণই পাপকৃত্য। (১৮) হিংসা—বৃথা প্রাণিবধ। কিন্তু

এটা ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য এবং রাজনীতির দিক থেকে 'বৃথা প্রাণিবধ না করা' ঠিক। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন —যজ্ঞে প্রাণী বধ করা যেতে পারে; স্বাস্থ্যনীতি বলেন—দেহের পুষ্টির নিমিত্ত প্রাণী বধকরা যেতে পারে; এবং রাজনীতি বলেন—চোর ডাকাত প্রভৃতি আততায়ীদের বধ করা যেতে পারে। কিন্তু পাতঞ্জলাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র লোভ, ক্রোধ, মোহ হেতু, মৃদু, মধ্য, তীব্র এবং শাস্ত্র-সিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার হিংসাকেই পরিত্যাগ করতে বলেচেন।

জগতে অসংখ্য অসুখী লোক রয়েচে। অধিকাংশ দুঃখই তারা অকারণ ভোগ করে। সেগুলোকে একটু চেষ্টা করলেই ত্যাগ করা যায়। প্রত্যেক লোকই মনে করে যে তার আচরণ এবং প্রতিভা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু সমাজ তা স্বীকার করে না—সমাজ চায় সকলের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তার কাজে সকলে সাহচর্য্য করুক। পক্ষান্তরে সমাজ গুটিকতক স্বার্থপর লোকের হাতে পড়লে, প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত নির্য্যাতন উপস্থিত হবেই। অত্যধিক আত্মতৃপ্ত হলেই সামাজিক আঘাত আসবে। বহুর সঙ্গে একলা লড়াই করা চলে না—সেই জন্য অভিমানীরা নিরন্তর হীনতা বোধ (inferiority complex) হেতু মর্ম্মদাহ প্রাপ্ত হয়। এই হীনতা বোধ থেকেই মানুষ অনর্থক পরপীড়ক, কলহ-প্রিয়, দুর্ম্মুখ, কুচক্রী, সহানুভূতিহীন, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দৈহিক ব্যাধি ভোগ করে। সেই জন্য একটু চিন্তাশীল হয়ে অবিদ্যা, (Ignorance), অস্মিতা (Egoism), অসামাজিকতা (Isolation) যথাযোগ্য ত্যাগ করা উচিত। আধ্যাত্মিক (Spiritual) ও আধিভৌতিক (Scientific) জ্ঞানীরাও অরণ্যে, পুস্তকাগারে বা ল্যাবরেটারীতে নিজেদের নিমজ্জিত করলেও কতকটা সামাজিকতা তাঁদেরও রক্ষা করে চলতে হয়।

স্বামী যোগানন্দ

(সমাপ্ত)

যোগেন মহারাজ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন বরাহ নগর মঠে বাস করেন। শরীর খারাপ। মুখখানি কিন্তু সদাই উজ্জ্বল। তপস্যায় শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মনের স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ,—লাটু মহারাজ নিরঞ্জন মহারাজের সঙ্গে এই সময়, কত হাসি তামাসা, আনন্দ করিতেন।

১৮৯২ খৃঃ শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলেন, তখন স্বামী যোগানন্দ বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে মার সেবায় পুনরায় নিযুক্ত হইলেন । এইখানে মা প্রায় একবৎসর থাকেন। ১৮৯৩ সালের ৺জগদ্ধাত্রী পূজার কিছু পূর্ব্বে মা জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন। ইহার পরের বৎসর তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া কৈলওয়ারে বেড়াইতে যান।

ইহার পর হইতেই সাধারণতঃ তিনি বলরাম মন্দিরেই থাকিতেন। পেটরোগা মানুষ। ঝোল ভাত ব্যতীত আর কিছুই হজম হয় না। নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও যে বিশেষ কোন কাজ করিতে পারিতেন তাহা নহে। কিন্তু ঐ রোগা মানুষটীর মধ্যে এমন একটী আকর্ষণীশক্তি ছিল যে বহুলোক তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হইয়া থাকিত। সরল

ব্যবহার, শান্ত প্রকৃতি, সকলের সঙ্গে প্রাণখোলা মেশামিশি—এইসব অভাবনীয় গুণগুলি বড় সহজে অপরকে আপনার করিয়া ফেলিত। এই সময়ে খুব ঘনিষ্টভাবে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—তাঁহাদের অনেকেই পরবর্ত্তী জীবনে রামকৃষ্ণ-মিশনে যোগদান করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃঃ দক্ষিণেশ্বরে বেশ বড় করিয়া ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব হয়। স্বামী যোগানন্দ এই বৎসরের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আজকালকার মত ঠাকুরের নাম এতটা জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। বর্ত্তমান কলিকাতা সহরও তথনকার সহরের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। সুতরাং ঐরূপ একটা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মত স্থানে এত বড একটী উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যে কিরূপ পরিশ্রমের কাজ, তাহা আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে অনুমান করাও কঠিন। স্বামী যোগানন্দের আকর্ষণে আহিরীটোলার অনেক স্বেচ্ছা সেবক উৎসবে অনেক সাহায্য করিতেন। আজ যে বেলুড় মঠে ঠাকুরের বিরাট জন্মোৎসব হয়—ইহার আদিতে রহিয়াছেন স্বামী যোগানন্দ—একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাঁহারই প্রথম চেষ্টা ও প্রেরণায় এই উৎসব আরম্ভ হয়।

১৮৯৬ সালে স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে লইয়া আসেন এবং ৫৯নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে তাঁহার থাকিবার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। যথনই মা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিতেন—স্বামী যোগানন্দ তাঁহার যাবতীয় সেবার ভার লইতেন। তথনও তিনি পেটের অসুখে খুব ভুগিতেছিলেন। শরীর রুগ্ন। কিন্তু মায়ের সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়—তাহার জন্য সদাই শঙ্কিত।

কিছুদিন পর শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর মা যথন পুনরায় কলিকাতা আসিলেন—তথন গঙ্গার ধারে দোতালা একটী বাড়ী ভাড়া নেওয়া হইল। সেথানে স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় বিকাল বেলা গিরীশবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই সৎ প্রসঙ্গাদি হইত। স্বামী যোগানন্দ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মধুর ভাষায় নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিতেন।

গঙ্গার ধারের ঐ বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা ছয় মাস খুব আনন্দের সহিত বাস করিয়া জয়রামবাটী ফিরিয়া যান। ইহার ২।৩ দিন পরই হরিদ্বারের সন্ন্যাসী কালী কমলিওয়ালা তাঁহার শিষ্য-সমেত ঐ ভাড়াটে বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন। স্বামী যোগানন্দ তাঁহাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করেন।

১৮৯৭ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ডায়মণ্ডহারবার হইতে স্পেশাল ট্রেণে শিয়ালদহ আসেন। এই সময় স্বামিজীর অভ্যর্থনার যাবতীয় ব্যবস্থা স্বামী যোগানন্দই করেন। সেইবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। স্বামিজীর আগমনে, যোগীন মহারাজ দ্বিগুণ উৎসাহে এই উৎসবের আয়োজন এবং স্বামিজীও ঠাকুরের নামে এত লোক আসিতেছে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই সময় স্বামিজী—"রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘ ব্যতীত কোন বড কাজ হয় না—সেইজন্য তিনি মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়—তাহার ব্যবস্থা করেন। স্বামী যোগানন্দ প্রথমে ইহাতে একটু আপত্তি করেন। ইহার বিবরণ স্বামিশিষ্য সংবাদ হইতে নিম্নে দেওয়া গেল—

যোগানন্দ—তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?

স্বামিজী—তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।······ইত্যাদি।

যোগানন্দ—তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী, ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এসব করচেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্চি। তবু কি জান মধ্যে মধ্যে কেমন খট্‌কা আসে। ঠাকুরের কার্য্য প্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। তাই মনে হয় আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছি না তো? তাই তোমায় অনুরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

স্বামিজী—কি জানিস্? সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্ত ভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপা কটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে, ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্চেন তা আমি কি করবো বল।

এই বলিয়া স্বামিজী কার্য্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—"আহা! নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের কৃপা কটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হোত ধন্য হতুম।"

শিষ্য—মহাশয় স্বামিজী সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন?

যোগানন্দ—'এমন আধার এযুগে জগতে আর কখনও আসে নি।' কখনও বলতেন, 'নরেন্ পুরুষ—তিনি প্রকৃতি'—নরেন্ তাঁর শ্বশুর ঘর।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের থাক্'। কখনও বলতেন—'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী সকল ব্রহ্ম হোতে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নি, লীন হয়ে গেছেন—সাতজন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি। নরেন্ তাদেরই একজনের অংশাবতার'। কখন বলতেন—'জগতপালক নারায়ণ, নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন্ সেই নরঋষির অবতার'। কখনো বল্‌তেন—'শুকদেবের মত, মায়া স্পর্শ করতে পারে নি'।'

শিষ্য—ঐ কথাগুলি কি সত্য? না ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

যোগানন্দ—তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।

শিষ্য—তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ—তুই বুঝতে পারিস্ নি। নরেন্‌কে ঐ সকলের সমষ্টি প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়া-রাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস্ না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানাভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন—সব সত্য।"

উপরের কয়েকটী কথা হইতে বুঝা যায় স্বামী যোগানন্দ স্বামিজীকে কি ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন।

১৮৯৮ সালে স্বামিজী যোগীন মহারাজকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়া গমন করেন। কিন্তু তথায় যোগীন মহারাজের পুনরায় পেটের অসুখ আরম্ভ হয়। ১০।১৫ দিন থাকিয়াই তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা

আসিয়া রহিয়াছেন। বাগবাজারে (গিরীশবাবুর বাটীর সম্মুখে) একটী বাটী ভাড়া নেওয়া হইয়াছে। যোগীন মহারাজ সেই বাড়ীতে থাকিয়াই মায়ের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পেটের অসুখে তাঁহার নিজের শরীর ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এইজন্য জনৈক ব্রহ্মচারী এই সময় থাকিয়াই যোগীন মহারাজকে নানা কাজকর্ম্মে সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বামিজীও এই সময় কলিকাতায় রহিয়াছেন। একদিন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া যোগীন মহারাজকে বলিলেন—"দেখ, এইখানে বুড়োরা থাকবে।" কারণ শ্রীশ্রীমার নিকট তখন বহু মেয়ে ভক্ত যাতায়াত করিত। সেইজন্য কোন যুবক সেখানে থাকে এটা স্বামিজী পছন্দ করিতেন না। যোগীন মহারাজ তখন বলিলেন যে তাঁহার নিজের শরীর খারাপ, সুতরাং কাজকর্ম্মের জন্য কোন যুবক না থাকিলে চলে না। স্বামিজী তখন উপরোক্ত যুবক ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া বলিলেন—"এ যদি এখানে থেকে খারাপ হয়ে যায় তবে এরজন্য দায়ী হবে কে?" এই কথা শুনিয়া যোগীন মহারাজ গম্ভীরভাবে নিজের বুকের উপর হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—"আমি!" অর্থাৎ ইহার সম্পূর্ণ ভার লইলেন তিনি স্বয়ং। কতখানি ভালবাসা হৃদয়ে থাকিলে এইভাবে অপরের ভার লওয়া যায়—উহা আমাদের মত সাধারণ মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

১৮৯৮ খৃঃ ঠাকুরের জন্মোৎসব নানা কারণে দক্ষিণেশ্বরে হইল না। সেইজন্য যোগীন মহারাজ গঙ্গাতীরে দাঁয়েদের ঠাকুর বাড়ীতে সেই বৎসরের জন্য উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন।

ইহার পর হইতেই তাঁহার শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনেক চিকিৎসাদি সত্ত্বেও উন্নতির কোন চিহ্নই দেখা গেল না। পাথুরীয়া ঘাটার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিতাইচরণ হালদার অনেকদিন ধরিয়া তাঁহার চিকিৎসা করেন।

তখন বেলুড়মঠের নূতন জমি কেনা হইয়াছে। ঠাকুরের জন্মোৎসব নূতন জমিতে ১৮৯৯ খৃঃ প্রথম হইল। এ যাবৎ এই উৎসবের সকল ব্যবস্থাই স্বামী যোগানন্দই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি শয্যাশায়ী—উৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না। বিছানায় শুইয়া শুইয়া শুধু উৎসবের বিবরণ শুনিলেন এবং মঠ হইতে আনীত প্রসাদ ধারণ করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রায়ই যাইতেন। একটু সুস্থ হইলেই তাহাকে মঠে লইয়া যাইবেন—ইহাই স্বামিজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শরীর আর সুস্থ হইল না।

১৮৯৯ খৃঃ, ১৫ই চৈত্র, স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অভয়পদে মিলিত হইলেন। বাগবাজারের কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে যথাসময়ে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করা হয়। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেহত্যাগ করেন।

এই সময় স্বামিজী বলিয়াছিলেন—"কড়ি খসলো। এবার ধীরে ধীরে বর্গাসবও খসে পড়বে।"

বামদেবানন্দ

কংস-বসুদেব-সংবাদ

কংস—

শুনিয়াছ বসুদেব, কী কহিল অশরীরী বাণী ?
এখনো কি চাহ তুমি কহিবারে, 'সত্য-সন্ধ আমি' ?
অসি মোর ঝলসিয়া উঠেছিল উল্লাসে যে দিন
বধিতে প্রিয়ারে তব, কোরেছিলে প্রতিজ্ঞা সে দিন।
কী প্রতিজ্ঞা, মনে পড়ে আজি কি তা,' কহ, সত্য বাক্ ?
আনক-দুন্দুভি তুমি, তব নামে স্বর্গে বাজে ঢাক্ !
সত্য-ধ্বজ নাম তব এতদিনে মানিনু সার্থক।
সত্যবাদী বলি তব তবু গর্ব্ব ? ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক !

বসুদেব—

মিথ্যা তব তিরস্কার ! নহি দুই মনে আর মুখে।
উচ্চশিরঃ স্ফীত বক্ষঃ—দাঁড়াইয়া বিশ্বের সম্মুখে,
সত্য সন্ধ বলি মোর হে রাজেন্দ্র, গর্ব্ব করিবার
অসংশয়ে জানিও, আজিও আছে পূর্ণ অধিকার।
সত্যবাদী সত্যব্রত সত্যজাত সত্য কুলোদ্ভব—
স্থির জেনো, মিথ্যাভাষী নহি কভু আমি রে যাদব।
সাক্ষ্য তার দিবে তব লৌহের এ শৃঙ্খল ভীষণ—
নিঠুর নিয়তি-সম অচ্ছেদ্য সে অটুট বন্ধন।
সাক্ষ্য তার দিবে তব কারাগৃহ পাষাণ-প্রাচীর—
দুর্ভেদ্য সে অন্ধগর্ত্ত রুদ্ধ-দ্বার পাতাল-পুরীর।
সাক্ষ্য তার দিবে পুনঃ বক্ষের এ কঠিন প্রস্তর,
গুরু যাহার ভারে যায় চূর্ণ মোর এ অস্থি পঞ্জর !
সাক্ষ্য আরো দিবে তব নির্মম সে প্রহরি-নিচয়,—
দিছিল কি খুলি তারা হস্তের শৃঙ্খল লৌহময় ?
বক্ষের পাষাণ-ভার দিছিল কি নামাইয়া তা'রা ?
দ্বার খুলি কহ, আর্য্য ! দিছিল কি মুক্ত করি কারা ?
কহ, কহ তবে শুনি, কে করিল মুক্ত সে দুয়ার ?
নামাইল কে দুর্মতি বক্ষের সে গুরু গিরি-ভার ?
কে কহ, সে অন্ধকারে দেখাইল গোকুলের পথ ?
ভাদ্রের যমুনা-জলে কার গতি বল, মনোরথ ?

বিশ্বাস কি হয় তব, বসুদেব—এই ক্ষুদ্র নর
রাতারাতি ফিরিল যে ভেটিয়া সে গোকুল নগর,—
দ্বার খুলি দিয়াছিল প্রহরীরা তারে? হে ধীমন্!
বিশ্বাস কি হয় তব মথুরাতে আছে হেন জন?
কংসের আরক্ত আঁখি নাহি ডরে কে সে দুষ্টাশয়?
যেই হোক্, বসুদেব নহে কভু, অন্য সে নিশ্চয়!
অন্য কেহ দেহ তার হে মর্ম্মজ্ঞ! করিয়া আশ্রয়,
অঘটন সংঘটন কোরেছিল হেন মনে লয়।
অথবা, সে অশরীরী আত্মা তার' অসাধ্য সাধন
কোরেছিল নিশীথে 'নিশিতে'-পাওয়া ব্যক্তির মতন
যন্ত্র চালিতের প্রায়। সত্য কিম্বা স্বপ্ন সে আমার,
নাহি তা' প্রত্যয় মোর। মনে 'ঘোর' কুয়াসা অপার!
হে রাজেন্দ্র! দেবকীর গর্ভজাত, নহে সে কুমার,
সত্য কহি, অসম্ভব মোর বীর্য্যে জনম তাহার।
মনে লয়, জন্মে নি সে, অজ নিত্য অচিন্ত্য অরূপ—
কন্যা কিম্বা পুত্র সে, তা' নাহি জানি—কিবা তার রূপ!
মনে হয়, পুত্র যেন অঙ্কে মোর নেহারিনু তা'য়,
কিন্তু আর্য্য! কী আশ্চর্য্য, তব করে কন্যা পুনঃ হায়!
হেরি তারে সে দিবস হতবুদ্ধি মানিনু বিস্ময়!
অলীক এ স্বপ্ন-কথা কেবা বল, করিবে প্রত্যয়?
তথাপি সত্য এ কথা। হে বরেণ্য। নতুবা যে জন
ছয় পুত্র একে একে তব পদে দিল বিসর্জ্জন,
একটি কেন সে বল, ছলনায় রাখিবে গোপনে?
হে রাজন্য! তুমি যারে শত্রু ভাবি শিহরিছ মনে,
শত্রু তার তুমি নহ, বড় শত্রু আমি ছিনু তা'র—
সত্য-বদ্ধ পিতৃ-রূপী নৃশংস এ রাক্ষস দুর্বার!
অস্ফুট মধুর হাসি—সৃষ্টির সে প্রথম প্রকাশ—
ছয়টি দেবতা-শিশু পায় নি ক কভু অবকাশ
টলাইতে বজ্র-সম সুকঠিন যাহার এ মন,
বন্ধুরূপী শত্রুরে সে কেমনে যে করিল হনন,
ভাবিয়া না পাই কূল, বুদ্ধি-হীন আমি অভাজন!
কী কহিছ, রে দুর্বৃত্ত! মোর বাক্যে না কর প্রত্যয়?
আপন মনের ফাঁকি দেখেছ কি বুঝি, দুষ্টাশয়?
গর্ব্ব তোর রে দাম্ভিক!—বধো নি ক প্রিয়ারে, আমায়!

হাসি পায়, করিয়া প্রত্যয় শুধু আমারি কথায়।
হাসি পায়, এসংসারে মূর্ত্তিমান্ সংশয় যে জন,
নিঃস্ব বসুদেব-বাক্যে সে করিল বিশ্বাস-স্থাপন?
অরে মিথ্যা প্রবঞ্চক! দেখ্ বুঝি মনে আপনার,
আমার প্রিয়ারে নয়, বধো নি ক ভগ্নীরে তোমার!
মায়া-মুগ্ধ রে কৃপণ! এ কার্পণ্য সুন্দর মহান,
বিশাল মরুভূ-বক্ষে স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র যেন মরূদ্যান।

কংস—

জন্মদান করে পিতা আত্ম-তৃপ্তি করিতে সাধন,
রূপ দেয় মাতা তাঁ'র নিজ রক্ত করিয়া মোক্ষণ!
প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা! কেবা তা'র কহ, সমতুল?
ভাই বোন, দু'টি যেন এক বৃন্তে ফোটা দু'টি ফুল!
মাতৃ-গর্ভ-সিন্ধু-ইন্দু ভগিনী সে সুধার আকর!
রাখিয়াছি প্রাণ তা'র! কীর্ত্তি মোর র'বে নিরন্তর!
নিজ প্রাণ-বিনিময়ে মিথ্যাবাদী কোরেছি তোমায়,
চূর্ণীকৃত গর্ব্ব তব,—এ আনন্দ ধরে না হিয়ায়!

বসুদেব—

ধন্য তব ভগ্নী প্রীতি, হে ভূপতে! কৃপায় যাহার,
মৃত্যুর অধিক দুঃখ-ভাগিনী সে ভগিনী তোমার!
হে খেয়ালী! হে কৃপণ! অকরুণ হে করুণাময়!
নিষ্ঠুর তোমার দয়া, ক্রূরতার অধিক নির্দ্দয়।
তৃষ্ণায় দিয়াছ জল, বদ্ধ হস্ত,—নাহি হয় পান,
অদ্ভুত ভগিনী-প্রীতি হেরি, মোর বিস্ময় মহান্।

কংস—

বসুদেব! মূর্খ সে, তোমারে করে প্রত্যয় যে জন!
শক্তি কত তোমাদের দেবতার, প্রত্যক্ষ দর্শন
করিতে তা' রক্ষিয়াছি হেলায় সে দেবকীর প্রাণ!
নিজ প্রাণ বিনিময়ে চাহিয়াছি প্রত্যক্ষ প্রমাণ—
দেব কিম্বা নর শক্তি, দুইটির কোন্‌টি প্রধান?
মূর্খ! বুঝেছ কি, কেন রক্ষিনু সে দেবকীর প্রাণ?

বসুদেব—

দেবশক্তি, নরশক্তি এ জগতে ভিন্ন কভু নয়,
মানব দেবতা হয় কর্ম্মগুণে, জানিও নিশ্চয়।
কিন্তু মূঢ়! তুমি চাহ আসুরিক শক্তিতে তোমার,
জিনিবারে, দেবতারে। মৃত্যু তব কে রুধিবে আর?
মূর্খ! ব্যর্থ করি তাই শত কূট কৌশল তোমার,
গোকুলে বাড়িছে আজি, বধিবে যে তোমারে এবার।

শ্রীসাহাজী

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়

শ্রীরমণী কুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

নমঃ পরমকল্যাণ। নমঃ পরমমঙ্গল!
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১০ম স্কঃ। ১০ম অঃ।৩৮

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

যাঁহার পবিত্র ও সুমধুর নাম সমগ্রহিন্দুজাতির আবালবৃদ্ধ বণিতা দিবসের সর্ব্বক্ষণ—শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতাবস্থায়, কর্ম্মে-অকর্ম্মে, সুখ দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, পূজা-পার্ব্বণে, উৎসবে-ব্যসনে, সন্ধি-বিগ্রহে, জয় পরাজয়ে, বিবাহ-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, জন্ম-মৃত্যুতে—পরমভক্তির সহিত উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যাঁহার বাল্যলীলার সুমধুর কাহিনী ভারতের নিরক্ষর সরল গ্রাম্য কৃষকগণ কর্ত্তৃক আজিও সঙ্গীতাকারে গীত হইয়া থাকে, যিনি বিগত তিনসহস্র বৎসর যাবৎ সমগ্রহিন্দুজাতির হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন, এক কথায়, যিনি ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতারূপে সম্পূজিত হইতেছেন, সেই লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব। ভারতের জাতীয় জীবনের একমহাসন্ধিক্ষণে—দ্বাপরের শেষভাগে, কলিযুগপ্রারম্ভের পূর্ব্বে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন শ্রীভগবান্ স্বীয়প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়াশক্তির দ্বারা ত্রিতাপদগ্ধজীবের দুঃখে কাতর হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য—এক কথায়, লোককল্যাণ সাধনের জন্য, বসুদেব গৃহে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জন্মোৎসব সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা

লোকোত্তর মহাপুরুষগণের, বিশেষতঃ অবতার পুরুষগণের স্মরণ, মনন ও পূজা চিরদিন ভারতে চলিয়া আসিতেছে। যুগপ্রবর্ত্তক অবতার পুরুষগণ জীবন্ত ঈশ্বর। অবতার পুরুষের জন্মতিথি-উৎসব-সম্পাদনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ॥ ৩৬
শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১ স্ক। ১১অ

অর্থাৎ, আমার জন্ম ও লীলাসম্বন্ধীয় আলাপ, আমার (জন্মাষ্টমী প্রভৃতি) পর্ব্বসমূহের অনুষ্ঠান বা ঐ ঐ পর্ব্ব উপলক্ষে ব্রতধারণাদি এবং আত্মীয় বন্ধুগণ মিলিত হইয়া আমার মন্দিরে নৃত্যগীত বাদ্যাদির অনুষ্ঠান—এগুলিও আমাকে লাভ করিবার সাধনস্বরূপ। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেও উক্ত আছে,

জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে॥ ৯
শ্রীমদ্ভাগবতম্—১ম স্কঃ, ৩য় অঃ।

অর্থাৎ, ভগবানের এই রহস্য জন্মবৃত্তান্ত যে মানব প্রযত হইয়া সায়ং এবং প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, দুঃখসমূহরূপ সংসার হইতে তাঁহার পরিত্রাণ হয়।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিৎ, সমাজবিধানকর্ত্তা, কর্ম্মযোগী, বীর, প্রাচীন ভারতের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক ও রাজন্যবর্গের ভাগ্যনিয়ন্তা, ধর্মসমন্বয়াচার্য্য এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন, অপর দিকে আবার তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকই শ্রীকৃষ্ণকে অবতারশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করেন। মধ্বাচার্য্য, চৈতন্য, রামানুজ এবং শঙ্কর প্রভৃতি দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী সকলেই একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভাগবতকার তাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১ম স্কঃ, ৩য় অঃ, ২৬—২৮

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য, কত বলিব? যেমন উপক্ষয়-শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে। সেই ভগবানের বিভূতির কথাই বা কত কহিব? মহাপ্রভাব দেব, ঋষি, মনু, মনুপুত্র এবং প্রজাপতি প্রভৃতি যত দেখিতে পান, ইঁহারা সকলেই তাঁহারই অংশ। হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যগণে উপদ্রুত হইলে যুগে যুগে ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশ পূর্ব্বক লোক সকলকে নিরুপদ্রব ও সুখী করেন।

শ্রীভগবানের বসুদেব গৃহে আবির্ভাব ব্যাপার শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥১৬
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ॥ ১৭
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কঃ, ২য় অঃ।

অর্থাৎ, ভক্তজনের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি পরিপূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব ঐ প্রকারে শ্রীমূর্ত্তি মনোমধ্যে ধারণবশতঃ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বভূতের অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। তদনন্তর পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে সেইরূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদদীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতের অংশ সদৃশ যে অংশ তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিলেন। ভগবানের ঐ অংশ সর্ব্বাত্মা, অতএব অগ্রেও দেবকীর আত্মাতে বর্ত্তমান্ ছিলেন।

এমন কি যাহাকে বধ করিবার জন্য শ্রীহরির আবির্ভাব হইবে, সেই দুষ্টমতি কংসও বিশুদ্ধ-হাস্যমুখী দীপ্তিশালিনী দেবকীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, "এই দীপ্তিশালী ব্যক্তি নিশ্চয় হরি, আমার প্রাণবধ করিবার জন্য দেবকীর গর্ভরূপ গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কারণ দেবকীকে পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু সে অগ্রে ঈদৃশী দীপ্তিমতী ছিলনা"।

তমোময় নিশীথে ভগবান্ জনার্দ্দনের জন্ম পরিগ্রহ করিবার সময় সমুপস্থিত হইল। প্রতি সাগরে জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই সময় পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ

পায়, তাহার স্থায় দেবতারূপিনী দেবকীর গর্ভে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরি ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন,—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং
শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভি-কৌস্তুভং পীতাম্বরং
সান্দ্রপয়োদসৌভগং॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা
পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব
ঐক্ষত॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কঃ, ৩অঃ, ৯-১০

অর্থাৎ, সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত, তাঁহার পদ্মপলাশ তুল্য লোচন, চারিহস্ত, শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন বিরাজমান, গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভমান। তাঁহার পরিধান পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুভগ, মহামূল্য বৈদূর্য্যমুকুট এবং কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান, আর তিনি অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ, এবং কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি পাইতেছেন।

ভগবান্ শ্রীহরিকে উক্তরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিবামাত্র যদিও বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল, তথাপি পুত্রমুখ দর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। তৎপর শুদ্ধবুদ্ধি বসুদেব ঐ পুত্রকে পরম পুরুষ অবধারণ করিয়া প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন,—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥ ১৩॥
স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকং।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ১৪॥

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে
গুণৈঃ॥ ১৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কঃ, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ, অহো! আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পরপুরুষ, কি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইলেন, ভগবন্! কেবল অনুভব ও আনন্দই আপনার স্বরূপ এবং আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী, এতদ্রূপ কোন ব্যক্তি কখন কাহারও দৃষ্ট হন নাই, ইহাতেই প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য মানিতেছি। ভগবন্! আপনার স্বরূপ এই প্রকারই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আপনি দেবকীজঠর-প্রবিষ্ট নহেন। নিজমায়ায় এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষ্য হইতেছেন। হে বিভো! তত্ত্বদর্শীরা বলেন, 'আপনা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে। অথচ আপনি নির্গুণ, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। ভগবন্! যদিও নিষ্ক্রিয়ের কর্তৃত্ব ও অবিকারিত্ব বিরুদ্ধ, তথাচ আপনি ঈশ্বর ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনাতে অকর্তৃত্ব ও অধিকারিত্ব বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

আবার কংসভীতা দেবকীও নিজজঠরসম্ভূত সেই সন্তানটীকে মহাপুরুষ লক্ষণান্বিত দেখিয়া বিস্মিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন,—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং
নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং
সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ২৪॥
বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ
পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য
বিড়ম্বনং হি তৎ॥ ৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কঃ, ৩য় অঃ।

অর্থাৎ ভগবন্, বেদসকল যাঁহাকে নিরীহ, নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ-জ্যোতিঃস্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি করণসমূহের প্রকাশক। ভগবন্! আপনি পরমপুরুষ, প্রলয়াবসানে স্বীয় শরীরে চরাচর বিশ্বধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার দেহে জগৎ অসঙ্কোচে ছিল, কোন পদার্থের স্থান সঙ্কীর্ণ হয় নাই, সেই আপনি আমার গর্ভে জন্মিয়াছেন, ইহা মনুষ্যলোকের এক প্রকার বিড়ম্বনা, আপনার এই অদ্ভুতরূপ সম্বরণ করুন।

ইহা শুনিয়া ভগবান্ আপনার চতুর্ভুজরূপে অবতারের কারণ ব্যক্ত করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং
পরাং॥ ১০।৩।৪৫॥

অর্থাৎ তোমরা দুইজনে আমাকে স্নেহ করিয়া পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া, অতঃপর আমার পরাগতি প্রাপ্ত হইবে।

তৎপর ভগবান্ হরিদর্শনকারী পিতামাতার সমক্ষে নিজমায়াযোগে প্রাকৃত বালক হইলেন।

নন্দগোপগৃহে একদিন মাতা যশোদা বালককে স্তনপান করাইবার সময় বালক একবার জৃম্ভত্যাগ করাতে তাঁহার মনোহর হাস্যযুক্ত মুখমধ্যে যশোদা দেখিতে পাইলেন—আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য এবং স্থাবরজঙ্গম ও সমুদয় ভূত দেদীপ্যমান। কিন্তু বেদসকল ইন্দ্রাদি বলিয়া, উপনিষৎ সকল ব্রহ্ম বলিয়া সাংখ্য পুরুষ বলিয়া, যোগশাস্ত্র পরমাত্মা বলিয়া, এবং সাত্বতগণ ভগবান বলিয়া যাঁহার মাহাত্ম্য গান করিতেছেন সেই শ্রীহরিকে নন্দ ও যশোদা বাৎসল্যভাবের প্রেরণায় পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং॥৪৫॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্—১০ম স্কঃ, ৮ম অঃ।

পুতনাবধ, শকটোৎক্ষেপণ, তৃণাবর্ত্তকে অধঃ-ক্ষেপণ, বকাসুর কংসাসুর বধ, যমলার্জ্জুনপাত প্রভৃতি অতিলৌকিক ও অমানুষিক বাল্য ও কৈশোর লীলায়, আবার মথুরা ও দ্বারকার অনন্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যমলার্জ্জুন উন্মূলিত হইয়া পতিত হইবা মাত্র সেই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ দুইটি সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা
বিদুঃ॥ ২৯॥
ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥৩০॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃ সত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥৩১॥
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৩॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কঃ, ১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! আপনি অচিন্ত্যপ্রভাব, আপনি বালক নহেন পরমপুরুষ, যেহেতু সকলের কারণ। ভগবন্! আপনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বলেন স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রকাশমান এই বিশ্ব আপনার রূপ, অতএব এই বিশ্বের উপাদান কারণও আপনি। হে বিভো! এক আপনিই সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়-সকলের ঈশ্বর। হে দেব! যে হেতু আপনি ঈশ্বর অব্যয় বিষ্ণু—অতএব কাল আপনার লীলামাত্র। হে প্রভো! আপনি মহান্, আপনি সত্ত্ব, রজঃ, তমোময়ী, সূক্ষ্মা প্রকৃতি। আপনিই পুরুষ, আপনিই সর্ব্বক্ষেত্রের অধ্যক্ষ অর্থাৎ বাল্যাদি

বিকার অবস্থার জ্ঞাতা, অতএব আপনি সর্ব্বস্বরূপ। প্রভো! আপনিই সেই ভগবান্ বাসুদেব, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মণ! মেঘদ্বারা যেরূপ সূর্য্যের তেজোরাশি আচ্ছন্ন বোধ হয়, সেইরূপ যে সকল গুণের স্বতঃ প্রকাশ হয়, সেই সমস্ত গুণদ্বারা আপনার মহিমা আচ্ছন্ন রহিয়াছে আপনাকে নমস্কার করি।

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই কথা পার্থসারথি নিজেই গীতার দশম অধ্যায়ে তাঁহার পরমসখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
অহংসর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
গীতা—১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ যিনি জানেন যে আমার জন্ম নাই, আদি নাই এবং আমি সকল লোকের ঈশ্বর, তিনিই মর্ত্ত্যলোকে মোহবর্জ্জিত এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি কারণ, আমা হইতেই সমুদয় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিবেকিগণ ইহা জানিয়া আমার প্রতি প্রেমবান্ হইয়া আমার সেবা করেন ॥ ৮ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত যে প্রত্যগ্ চৈতন্য তাহা আমিই। আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ ॥ ২০ ॥

হে অর্জ্জুন! যে চৈতন্য সর্ব্বভূতের বীজ বা উৎপত্তি কারণ তাহা আমিই। আমা ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এরূপ ভূত নাই ॥ ৩৯ ॥

আবার অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের, অক্ষয় মাহাত্ম্য শ্রবণেও তৃপ্ত না হইয়া সেই পুরুষোত্তমের ঐশরূপ দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই অবিনাশী আত্মরূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন অর্জ্জুন দিব্যচক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে নানাভাগে বিভক্ত একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং নারায়ণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥
—গীতা—১১শ অধ্যায়।

হে পুরুষোত্তম! তুমি ক্ষয়হীন পরব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য, এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয় তুমি, তুমি অব্যয় ও সনাতন ধর্ম্মের পালয়িতা, তুমি চিরন্তন পুরুষ আমি জানি ॥ ১৮ ॥

তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরুষ, তুমিই চিরন্তন অনাদি। এই জগতের অন্তিমের আশ্রয় তুমিই। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়-বস্তুজাত, তুমিই পরমধাম। হে অনন্তরূপ! তুমিই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান।

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত আছে, ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "কৃষ্ণের স্বরূপ" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্;
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্ব কারণ প্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার।

সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
সর্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়ও এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৫ ॥ ১

অর্থাৎ কৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য ঈশ্বর ; তাঁহার রূপ সচ্চিদানন্দময় ; তাঁহার আদি নাই কিন্তু তিনি সকলেরই আদি, তিনি বিশ্বসংসার সকলই জানিতেছেন এই হেতু তিনি গোবিন্দ ; এবং তিনি সকল কারণের মূল কারণ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়

ভাগবত, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিলে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্—লোক কল্যাণসাধনের জন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আমরা পাইলাম। এখন তাঁহাকে পাইবার উপায় কি ? তাঁহাকে পাইবার উপায় সম্বন্ধে তিনি নিজেই গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ ॥

অর্থাৎ, হে পার্থ, যাহারা আমাকে **যে ভাবেই** উপাসনা করে আমি তাহাদিগকে **সেই ভাবেই** অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানাপ্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যায়, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—ইহাদের যে কোন পথ অবলম্বন করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। গীতায় এই চারিমার্গের কথাই বিস্তৃতরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। দেশকাল-পাত্র-বিবেচনায় ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের অকীর্ত্তিকর, অস্বর্গ্য, অনার্য্যজুষ্ট মোহ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে কর্ম্মযোগ উপদেশ করিলেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয় এবং সহজসাধ্য উহাই বিবেচনার বিষয়। ফলাকাঙ্ক্ষা ও 'অহং কর্ত্তা' এই অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্মকরা কর্ম্মযোগীর আদর্শ। কর্ম্ম করিতে গেলেই কোথা হইতে অলক্ষ্যে আসক্তি ও অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয় বুঝা যায় না ; কাজেই অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মকরা সহজব্যাপার নয়। আবার নেতি, নেতি বিচার—যেমন আমি শরীর নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—শরীর নাশ হইলে আমি নাশ হইনা। সুখ, দুঃখ সব মনের ধর্ম্ম, আমার নয়। আমি অবাঙ্‌মনসগোচর, পরিপূর্ণ, আত্মা, এক, দ্বিতীয় রহিত। এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি করিতে পারিলে তবে ঠিক ঠিক জ্ঞানযোগী হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পথ। জ্ঞানযোগী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতিকষ্টে অব্যক্ত (নিগুর্ণব্রহ্ম) বিষয়িনী নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। অষ্টাঙ্গযুক্ত রাজযোগও জ্ঞানযোগের তুল্য কঠিন সাধন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ সাধন নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা অন্নগত প্রাণ জীবের পক্ষে যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার সহজেই অনুমেয়। অধিকাংশ লোকের পক্ষে যে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই অধিক সহজসাধ্য ও আশু ফলপ্রদ তৎসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যোগের উপদেশ দিবার সময় বেশ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং
শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি
কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ২০ অঃ।৬।৭।৮

অর্থাৎ মনুষ্যের কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া আমি জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিন প্রকার যোগ উপদেশ করিয়াছি। যাহাদের মন বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হয়। আর যাহাদের চিত্ত বিষয়ে লিপ্ত, তাহাদের জন্য কর্ম্মযোগ প্রয়োজন। আর যাহারা বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত নহে অথচ ভগবৎ কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা আছে বলিয়া বিষয়ে অতিশয় আসক্তিও নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। অতএব দেখা যায়, বিষয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক নয়। সুতরাং জ্ঞান-যোগের অধিকারী বড়ই কম। অত্যন্ত বিষয়পরায়ণ যাহারা তাহাদের কর্ম্ম না করিলে চলিতেই পারে না—এবং কর্ম্ম করিতে গেলেই ফলের আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব যাহারা মধ্যপন্থী অর্থাৎ একেবারে বিরক্ত নহে কিম্বা খুব বিষয়ে লিপ্তও নহে অথচ ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্রই অভীষ্ট লাভ হয়। এই মধ্যপন্থীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে নারদীয়া ভক্তির অনুষ্ঠান ও তৎসঙ্গে সদসৎ বিচার (জ্ঞানমিশ্রাভক্তি) অধিক সহজসাধ্য ও আশু ফলপ্রদ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভু রায় রামানন্দ-সংবাদে এই ভক্তি বা প্রেম সম্বন্ধে উক্ত আছে—

প্রভু কহে "কোন্ বিদ্যা? বিদ্যা মধ্যে সার;"
রায় কহে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"
"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?"
"কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি।"
—মধ্যলীলা

বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেও ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বিভিন্ন স্থানে সখা অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
১২ অঃ॥ ২

অর্থাৎ, আমাতে মন নিবিষ্ট (একাগ্র) করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্তভাবে যাহারা আমার উপাসনা করে তাহারাই আমার মতে যুক্ততম।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
১২ অঃ॥ ৮

অর্থাৎ আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবেশ কর, দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
১১ অঃ॥ ৫৪

অর্থাৎ হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্যা ভক্তির দ্বারা দিব্যরূপধারী আমাকে শাস্ত্রমত জানিতে পারে, আমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারে।

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু
চাপ্যহম্" —৯ অঃ॥ ২৯॥

অর্থাৎ যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা

করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥
—৯ অঃ ॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; ইহা তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ॥
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষসি ॥
১৮ অঃ ॥ ৫৮ ॥

অর্থাৎ, মচ্চিত্তঃ হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয় সুদুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবে; যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি আমার বাক্য না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ১৮ অঃ ॥ ৬৫

অর্থাৎ, তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত, ও আমারই উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে; ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা আমরা যেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অনন্যাভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

গোমুখী যাত্রা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গঙ্গোত্তরীর পথে

উত্তর কাশীতে রাত্রিবাস সম্পূর্ণ না হইতেই গঙ্গোত্তরীর উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল। যেহেতু আমাদের দলের অগ্রণী সূর্য্যোদয়ের আড়াই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাড়া দিয়া আর সকলকে উঠাইয়া দিলেন। নিদ্রাদেবীর সহিত তাঁহার প্রীতির অভাব আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ যাত্রার সময় হইল কিনা জানিবার জন্য তিনি নিদ্রাভঙ্গে ঘড়ি খুলিয়া কোন কোন দিন দেখিয়াছেন, সবে রাত্রি সাড়ে বারটা। তাড়াতাড়ি বিছানা পত্র গুটাইয়া বোঝা কুলীর পীঠে চাপান হইল। এদিকে বাহির হইতে যাইয়া দেখি ধর্ম্মশালার সদর ফটক বন্ধ। অনেক হাঁকডাকের পর একজন খর্ব্বাকৃতি পাহাড়ী একটি প্রকাণ্ড চাবী হাতে আসিয়া অতিকষ্টে ফটক খুলিয়া দিল। অপর যাত্রিগণ কেবল জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, সহরের ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলের তুলনায় নিশীথের নীরব নিশ্চেষ্টতা অতি অদ্ভুত মনে হইল, যেন ঘুমন্ত স্বপ্নপুরীর মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উজালি ও লক্ষেশ্বরের নিভৃত কুটির গুলিতে এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। মানুষের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ধ্যানমগ্ন যোগিগণের শান্ত প্রভাবে প্রকৃতি দেবীও যেন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বৃক্ষলতা আকাশ বাতাসে কোনরূপ চাঞ্চল্য অনুভূত হইল না। আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি স্বতঃই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনে মনে বিশ্বনাথকে ভাবিতে ভাবিতে নির্ব্বাক চলচ্চিত্রের মত অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

অসীর ক্ষীণধারা অতিক্রম করিয়া উত্তর কাশীর সীমার বাহিরে গৈরিকধারী দুই চারিটি সন্ন্যাসিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহাদের বাম হস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু; দক্ষিণ হস্তে দন্তকাষ্ঠ। তাঁহারা শৌচাদির উদ্দেশ্যে দূর বিজন স্থানে আসিয়াছেন। বাক্যালাপ বিনা কেবল ইঙ্গিতে তাঁহাদের সহিত অভিবাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সহসা একটি পক্ষীর উদাত্ত স্বরে বৃক্ষপত্র ঝঙ্কৃত হইল। ক্রমে আর দুই চারিটি পাখী আপন স্বরে আপন মনে গান ধরিল। এদিকে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ঊষার ভালে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। মৃদু মন্দ বায়ুভরে ঊষার নীলাম্বর ঈষৎ দুলিতে লাগিল।

অসীনদী উত্তর কাশীর উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত। উত্তর কাশী সহর হইতে ইহা দুই মাইল। গঙ্গা-অসী-সঙ্গমে দুই জন বাঙ্গালী সাধু ১৫।১৬ বৎসর যাবত একটি আশ্রম করিয়া সাধন ভজনে রত আছেন। উত্তর কাশীর বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বরুণা। নকুড়ি হইতে উত্তর কাশী আসিবার পথে আমাদিগকে বরুণা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বরুণা সঙ্গমেও নানা সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক হিন্দুস্থানি সাধু একটি আশ্রম করিয়া ২২।২৩ বৎসর কাল ভজন সাধন করিতেছেন।

প্রায় চারি মাইল পথ চলার পর মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। অদূরে গোঁয়ার গ্রাম। গ্রামের উপকণ্ঠে পথিপার্শ্বে একটি নবনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা কোন সদাশয়া রমণীর পুণ্য কীর্ত্তিরূপে বিরাজমান। আর বিশ মাইল দূরে নিতালি নামক স্থানে একটি চটি দেখা গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হইল যমুনোত্তরী অঞ্চলের চটির তুলনায় ইহা অনেক উৎকৃষ্ট। কৌতূহলবশে অভ্যন্তর দেশ দেখিবার জন্য চটির সমীপস্থ হইবামাত্র যোগাসনে সমাসীন তিন জন যোগী পুরুষ সম্মুখে পড়িল। এক একজন এক এক প্রকার আসনে সিদ্ধ। তিন জনেরই পরিধানে কৌপীন, অঙ্গে ভস্মরাগ, মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষ পিঙ্গল কেশ। দুই জন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ আর একজন অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে জগৎ স্বপ্নবৎ দেখিতেছেন। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইল নবীন যোগী। তিন জনই রাস্তার উপরে চটির সম্মুখের বারান্দায় প্রকাশ্য দিবালোকে একান্তে যোগাভ্যাসে নিরত। হিমালয়ে যোগসাধনার এতদপেক্ষা অনুকূল স্থান তাঁহারা বুঝি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহাদের অদ্ভুত অবয়ব সংস্থান ও যৌগিক প্রক্রিয়া দর্শনে কয়েকজন ভক্তও আকৃষ্ট হইয়াছে। দুই চারিটি পয়সাও পড়িতেছিল; কিছু আটা গুড়েরও আমদানী হইল। ধীরে ধীরে একজনের সমাধি ভঙ্গ হইল। তাঁহার আরক্ত চক্ষু আমাদের উপর নিপতিত হইবামাত্র তিনি পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ছায়া সম দৃশ্য প্রপঞ্চের চকিতে উদয় চকিতে বিলয় হইয়া গেল। আমাদের মত অরসিকের অবস্থান যোগিগণের অভিপ্রেত নয় বুঝিয়া আমরা অবিলম্বে সরিয়া পড়িলাম। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের ভণ্ডামও ভাল।

ধরাসু হইতে গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত গঙ্গোত্তরীর পথে প্রতি ৯।১০ মাইল অন্তর কালিকমলি বাবার ধর্ম্মশালা আছে,—দুই একটি স্থান ভিন্ন। তা ছাড়া মাঝে মাঝে চটি ও ছোট ধর্ম্মশালা অনেক রহিয়াছে। চটিগুলি প্রায়ই সুনির্ম্মিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যমুনোত্তরী অঞ্চলের চটির মত অপকৃষ্ট নহে। ঝড় বৃষ্টির সময় এই সকল চটিতে আত্মরক্ষা করা চলে। গঙ্গোত্তরীর রাস্তাও যমুনোত্তরীর রাস্তার তুলনায় সুগম। ইহ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সুগঠিত,—চড়াই উত্তরাইর মাত্রা কম। যাত্রিসংখ্যাও এই পথে অধিক।

নিতালি অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই রৌদ্রের উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। শরীর ক্লান্ত হওয়ায় তখন ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের

সহিত খাদ্য দ্রব্যের পাত্রটি ছিল, তাঁহারা দুইজন আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অনেক দূর লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহাদের অবিবেচনার জন্য রাগ হইল। কি করি! রাস্তার নীচে একটি গোশালা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম এবং গরম দুধ পান করিয়া ক্ষুধার জ্বালা দূর করিলাম। গোশালা না বলিয়া ইহাকে মহিষশালা বলাই সঙ্গত, কারণ গরু ইহাতে আদপেই ছিল না। সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া রাস্তার দিকে চলিতে চলিতে শুনিতে পাইলাম কে দূর হইতে ডাকিতেছে। দেখিলাম আমাদেরই দুইজন রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। বুঝিলাম তাঁহারা প্রাতরাশের জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তখন অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের জন্য দুধ আনিতে ছুটিলাম। রাস্তা ধরিয়া চলিলে আমরা অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাদের দেখা পাইতাম।

আর সাড়ে তিন মাইল চলিয়া মনেরীতে পৌছিলাম। মনেরীতে কালিকমলি বাবার ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিবামাত্র যাত্রীদের মুখে শুনিতে পাইলাম আধ মাইল দূরে পাঞ্জাবী সত্র হইতে সাধুদিগকে সদাব্রত দেওয়া হয়। সেখানেই অবস্থান করিব মনে করিয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু বাড়ীটির অবস্থা দেখিয়া আর তথায় থাকিতে প্রবৃত্তি হইল না। একটি বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন বাটি যত্নের অভাবে কি হীন দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে! একটু শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিলে এখনও ইহা দ্বারা যাত্রীদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এ দিকে কর্ত্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি নাই। একজন বেতন ভোগী কর্ম্মচারী গতানুগতিক ভাবে সত্রের কার্য্য সমাধা করিতেছে। আমরা চারিজনের সদাব্রত নিয়া কালিকমলি বাবার ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। রাস্তার একটু উপরে পাহাড়ের গায়ে পরস্পর সংলগ্ন দুইটি সুবৃহৎ পাকা বাড়ী দূর হইতে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়ীর উঠানে জল সরবরাহের জন্য লোহার নল বসান আছে। নিকটবর্ত্তী কোন নির্ঝরের নির্ম্মল জল সেই নলের মুখ হইতে নিরন্তর নির্গত হইতেছে।

এই সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধ সাধু ডাণ্ডিতে করিয়া ধর্ম্মশালায় আসিলেন। একটি প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সন্ন্যাসিনীকে তাঁহার শিষ্যা বলিয়া মনে হইল। কারণ তিনি অতি বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত বৃদ্ধের সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধটি কোন অখ্যাত মন্দিরের মোহন্ত হইবেন। সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে দেখিয়া আমরা আর সে দিকে ঘেঁসিলাম না।

আমাদের বোঝওয়ালা এতক্ষণেও আসিল না দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন। ধর্ম্মশালা হইতে বাসন পত্র নিয়া নিজেরাই জল আনিয়া রান্না আরম্ভ করিলাম। কুলীর আসিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারা গেল, আমাদের মধ্যে একজন দয়া পরবশ হইয়া পূর্ব্বদিন উত্তর কাশীতে তাহাকে একজোড়া জুতা কিনিয়া দিয়াছিলেন। "বেচারা নূতন জুতা পরিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে," এই বলিয়া একজন দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর একজন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "দেরী হচ্ছে কি সাধে? আমি লক্ষ্য করেছি সে এক পা এগুচ্ছে আর নিজের পায়ের দিকে দেখছে, জুতো জোড়া কেমন মানিয়েছে। অমন ভাল জুতো কুলীমজুরকে দিতে আছে? কুলীকে ভদ্রলোক বনালে তার দ্বারা মোট বহান যায় না।" "তা নয়, তা নয়," বলিয়া অপর একজন ভিন্নমত প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "ব্যাটা আজ ইচ্ছা করে দেরী করছে। কয়েক দিনের রাস্তা খারাপ হওয়ায় তার বোঝা হাল্‌কা করার জন্য আমরা নিজেরাই কম্বল কাপড় খানিও ঘাড়ে করে চলেছিলাম, এই আমাদের অপরাধ। এখন সে সুবিধে পেয়েছে। আমাদের ওপর বোঝা চাপাতে চায়। আমরাও ছাড়ছি না। এখন থেকে আমাদের দুঘন্টা পূর্ব্বে তাকে রওয়ানা করে দিতে হবে।"

যাহার সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণা চলিতেছিল এদিকে সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বোঝা ঘাড়ে আসিয়া উপস্থিত। কোন কথা না বলিয়া পিঠের বোঝা নামাইতে নামাইতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার রৌদ্র সন্তপ্ত পরিশ্রান্ত নির্ব্বাক মূর্ত্তি দেখিয়া আর কাহারও কিছু বলিবার রহিল না।

(ক্রমশঃ)

সৎপ্রকাশানন্দ

সার্ব্বজনীন আদর্শ

অসংখ্য বিরুদ্ধ প্রকৃতির ভেতর মানবের কর্ম্ম-প্রবাহ চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের নিত্য সহচর চিন্তা প্রবাহ তো আছেই। প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট ভাব থাকবেই তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। দীর্ঘ কালের ভাবকে অনেক সময় বিশ্লেষণ করাও শক্ত—ভাল মন্দ উভয়কেই। সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র যেমন সামান্য প্রচেষ্টাতেই কর্ম্মশীল হয়ে ওঠে, তেমনি কর্ম্মঠ মানুষ সামান্য উৎসাহে ও উত্তেজনাতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বিজ্ঞানের যুগে দেখা যায়, বিরাট তড়িৎ প্রবাহের সামান্য সংযোগেই বিশাল কারখানা থেকে আরম্ভ করে সামান্য আলো ও পাখা পর্য্যন্ত চলতে থাকে। তড়িৎ প্রবাহ যোগে বিরাট কারখানা চলছে বলে কারখানার কোন বাহাদুরী যেমন নেই, তেমনি সামান্য আলো বা পাখার সামর্থ্য কম বলে তাদের-ও কোন অপরাধ আছে বলা যায় না। সকল গৌরব সেই বিরাট তড়িতের, কারণ, তার অস্তিত্ব ছাড়া সকলই যে অচল। ইলেকট্রিক বাল্বের শক্তি যত বেশীই থাকুক না কেন বৈদ্যুতিক তারের অভাবে তা দিয়ে কোন কাজই চলতে পারে না। আবার প্রত্যেক যন্ত্রের মূল্য প্রত্যেকের নিকট বিভিন্ন। যিনি সেলাই জানেন না তাঁর নিকট তার কোন সার্থকতা নেই। অসাবধানতা বশতঃ ও নিয়ে নাড়া চাড়া করলে হাতে ছুঁচ বিঁধবারই আশঙ্কা কিংবা কলটি নষ্ট করবারই ভয়। আবার সীবণ নিপুণ ব্যক্তির ও চালনোই হয়তো একমাত্র জীবনোপায়। এয়ারোপ্লেন চালকের নিকট তার প্রত্যেকটি যন্ত্রই অতি আদরের—অপর পক্ষে সাধারণের নিকট ঐ যন্ত্রের অংশ বিশেষ কোন কাজেই আসবে না। এই ভাবেই জগতের যাবতীয় কার্য্য প্রণালী চলছে। একজনের পরম আদরের ধন অপরের ঘৃণার বা ভীতির কারণ। কোন জিনিষের বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে কি করে আমরা তার সামর্থ্য নিরূপণ করতে পারি। আজ যে জিনিষটি আমাদের আদরের—এমন কি অত্যাবশ্যকীয়, কিছুকাল পরে হয়তো সেই জিনিষটি ব্যবহার ক্রটীতেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক বিকল হয়ে গেল তখন তার মূল্য অন্য প্রকার হয়ে যায়। আজ যে যন্ত্র নূতনতম আবিষ্কারের গৌরব লাভ করলে হয়ত স্বল্পকাল পরে উন্নততর যন্ত্রের আবিষ্কার হেতু পূর্ব্বের গৌরব ম্লান হয়ে গেল। এই ত প্রত্যেক বিষয়ের স্বাভাবিক পরিণাম, ভাবলে কি যার ব্যবহার আমরা জানি না কিংবা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের নিকট যা অকেজো তার কোন সার্থকতা জগতে নেই বলব? আমরা, যে জিনিষটি একদা বৈশিষ্ট্যের সম্মান পেয়েছে, তার মর্য্যাদা রক্ষা না করে তাকে কি হীন করতে চেষ্টা করব?

মানব চরিত্রের বিষয়ও ঠিক এই প্রকার বলা যেতে পারে। আমরা অধিকাংশ সময়ই বিচারের মাপকাটি-রূপ নিজেদের সসীম বুদ্ধিকেই অবলম্বন করি। প্রশ্ন হতে পারে, যার যে প্রকার জ্ঞান সে তো সেই প্রকারেই বিচার করিবে—সে যাকে ভাল বোঝে তাকেই তো সে ভাল বলবে অন্য জিনিষ বা অন্য আদর্শে তার দরকার কি? অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নিয়মই প্রচলিত। আমরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী জগতের বিচার করে থাকি, নিজেদের রুচির বাহিরে যেতে চাই না। যেমন, আইন ব্যবসায়ী তাঁর সহকর্ম্মী ও সেই জাতীয়

লোকদের ভেতর যিনি হয়তো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, মিষ্টভাষী তাঁকেই ঋষি উপাধি দ্বারা আদর্শ করে তুলবেন। মক্কেগণ, যে আইনজ্ঞ ব্যক্তি স্বল্প পারিশ্রমিকে তাঁদের মনোমত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ তাঁরই ওপর দেবতার গুণ আরোপ করবেন। চিকিৎসক, অপেক্ষাকৃত বিদ্বান—যিনি হয়তো ২।১টি নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করলেন, কিংবা যিনি ব্যক্তিগত ভাবে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর চিকিৎসকের নিকট ব্যবসাদি ব্যাপারে সাহায্য পান, তাঁকেই নিজের ইষ্ট দেবতা করে তুলবেন। কবি বা সাহিত্যিক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিককেই ব্যাস-বাল্মীকি বলে মনে করবেন। ব্যবসায়ী ধনকুবেরকেই স্বীয় আদর্শ করে তোলেন।

বিশেষভাবে, এই নিয়ম সুদৃঢ় দেখা যায়, জনপ্রিয় রাজনৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক আন্দোলনে; আজ যিনি নিজ বুদ্ধিবলে কিংবা কৌশল বলে এক দল অনুসরণকারী জোগাড় কোরে কোন বিশেষ দেশ কিংবা সমাজের শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন আনতে পেরেছেন, তিনিই হয়তো লক্ষ লক্ষ মানবের আরাধ্য হয়ে উঠলেন—তা, তাঁর অসাধারণ স্বার্থপরতা, চতুরতা শঠতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ দোষ সমূহ যত বেশীই থাকুক না কেন।

সাধারণ মানুষ যে প্রকার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ভেতর বাস করে, তার আদর্শও সেই প্রকার হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছেলে তার বাপের কাপড় জামা জুতো পরে তাঁর ন্যায় সাজতে চেষ্টা করে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ পিতা বা ভ্রাতাকে আদর্শ করে তোলে। ছোট মেয়ে অনেক সময়ই নিজ মাতা ও ভগ্নিকেই অনুসরণ করে। আবার দেখা যায় পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি যে পথ অনুসরণ করেন তাঁরাও তাঁদের সন্তান ও অনুজগণকে সেই পথেই চালিত করতে চেষ্টা করেন—তা সে যত হীন পথই হোক না কেন? সাধারণ ব্যবসায়ী তরুণ বয়স্ক নিজ সন্তানকেও শিক্ষা দেবে—কি করে স্বল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করা যায়, কি করে কোন্ জিনিষের পরিবর্ত্তে কোন্ জিনিষ চালান যায়। নৈষ্ঠিক পুরোহিত সন্তানের আদর্শ খাদ্য-দ্রব্য-বিচার ও প্রচলিত স্মৃতি-সম্মত গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না। অবশ্য উল্লিখিত অবস্থার যে ব্যতিক্রম সমাজে দেখা যায় না, তা নয়। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাহ্যিক মান সম্ভ্রমের তারতম্যের দরুণ অনেকে নিজ নিজ বংশানুক্রমিক আদর্শও ত্যাগ করেন। যেমন অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের যুবক হয়তো গোঁড়ামির প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এমন কিছু করে ফেল্লেন যা হয়তো পূর্ব্বে কল্পনারই বাইরে ছিল।

এখন প্রশ্ন হতে পারে গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করে চলায় দোষ কি? তাতে কি সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় নি? ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা কি পূর্ব্বোক্ত আদর্শ মেনে চলায় লাভবান হয় নি—তা নইলে এতকাল কি করে আমরা বেঁচে আছি—হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় কৃষ্টি কি ভারতের ইতিহাসে স্থান পায় নি?

হাঁ, ঠিক কথা, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও কৃষ্টির গৌরব করবার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু সে অতীতের কৃষ্টি ও কিছু দিনের পূর্ব্বের গোঁড়ামী সম্পূর্ণ আলাদা।

ভারতীয় আদর্শকেই বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল মনীষিগণ আদর্শ ধরে নিয়েছেন এবং ভারতীয় আদর্শ-চিন্তাপ্রসূত ও উপলব্ধ তত্ত্ব দিয়ে জীবন যাপনে তৎপর হচ্ছেন—যদিও সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নাও হতে পারেন। এই আদর্শই সার্ব্বজনীন এবং ইহা সর্ব্বদা মানব সমাজের একমাত্র অবলম্বন। ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ। তাঁরা দীর্ঘকাল সাধনা করে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন সেই সত্যের ওপর এজাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে আজও বেঁচে আছে। তাঁরা

চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করে সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন শৃঙ্খলার জন্য। মানুষ যখন মানুষের মত বাঁচতে চায়, তখন তার সব জিনিষের দরকার হয়, এমন কি শুধু উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে ডুবে থাকলেও তার খাওয়া পরা চাই। শ্রীভগবান বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল সাধনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মধ্যপন্থা ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। আর নিখিল মানবের তাছাড়াও অনেক কিছুর দরকার হয় ;—সব সময় উচ্চ উচ্চ আদর্শ পর্য্যন্তও ধরে রাখতে পারা যায় না। সে জন্যই জগতে শৃঙ্খলার নিমিত্ত গুণানুযায়ী কার্য্যের বিভাগ হলো—চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হলো। ক্রমে সমাজে বিভিন্ন আচার ব্যবহার নিয়মকানুন গড়ে উঠল। কারণ যাকে যে প্রকার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে হয় তাকে সেই ভাবেই চলতে হয়। কেহ বা বেদাধ্যয়ন বা নির্গুণ ব্রহ্ম চিন্তায় মগ্ন রইলেন, কেহ বা রাজ্যশাসন ও রক্ষণে রত, কেহ বা রাজ্য রক্ষার প্রধান উপকরণ ধন দৌলতের আরাধনা ও খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনে যত্নবান, আবার কেহ অপরের সহায়তা ও সেবায় নিযুক্ত হলেন। দৃশ্যতঃ যদিও এদের আদর্শ পৃথক কিন্তু স্বরূপতঃ তা নয়। অমৃতের সন্তান আর্য্য ঋষি তনয়েরা প্রত্যেকেই সমাজ শৃঙ্খলার জন্য কতকগুলি বাহ্যিক কাজ করে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে "অহং ব্রহ্মাস্মি রূপ" মহা সত্য মনে রাখতেন এবং প্রত্যহ ঐ তত্ত্ব নিয়ে অনেক কাল আলোচনা ও বিচার করে তা অটুট রাখতেন। তাতে একদিকে যেমন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল, অপরদিকে সমাজের প্রাণ ধর্ম্ম সযত্নে রক্ষিত হলো। যে যে কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপন্থী তাই পাপ ও যা ধর্ম্ম লাভের সহায়ক তাই পুণ্য আখ্যা লাভ করলে।

প্রকৃতি চক্রের অব্যাহত আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান বাড়তে লাগ্‌লো আর ভারতের আসল জিনিষটির ওপর আবরণ পড়তে লাগল। ক্রমে মানুষ ভুলে গেল যে সে অমৃতের সন্তান—পশুত্বের আধিপত্য ক্রমে দেবত্বের ক্ষমতাকে ম্লান করতে লাগল—মাত্র মুষ্টিমেয় মানবের নিকট 'সত্য' অব্যাহত রইল ; এবং সৌভাগ্য ক্রমে তাঁদের সযত্নরক্ষিত জ্ঞানাগ্নি পরবর্ত্তী ঋষিগণের সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টায় আজও নির্ব্বাপিত হয় নি। তাঁরাই যুগে যুগে মানব সমাজের কি আদর্শ তা বলে দিচ্ছেন। যখন তাঁদের আধিপত্যও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়, সমাজ যখন কর্ণধার বিহীন তরণীর প্রায় হয়ে ওঠে—তখনই তাঁদের চেয়েও শক্তিশালী মানব অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে জগতে একটা বিরাট শক্তির স্রোত প্রবাহিত করে দিয়ে যান—ইহাই চিরন্তনী প্রথা। তাঁরা এক এক যুগে এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন—কখন একটি প্রদেশ, কখনও বা একটি দেশ আবার কখনও বা নিখিল বিশ্বের জন্য—যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মুশা, জারাথুষ্ট্র, মহম্মদ, শংকর।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে ধর্ম্মকে না মানলেও তো চলতে পারে—ওর তো কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ধর্ম্ম কতকগুলো আদর্শবাদী লোকের কল্পনা বলেই তো মনে হয়।

আচ্ছা, আমরা ধর্ম্মকে বিশ্বাস করি, কি ধর্ম্মের ওপর একেবারে উদাসীন, তাই দেখা যাক। হিন্দুর ত্যাগী সন্ন্যাসী গুরু পুরোহিত, বৌদ্ধের ভিক্ষু, মুসলমানের ফকির, খ্রীষ্টানদের ত্যাগী ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে আমরা সম্মান করি কি অবজ্ঞা করে থাকি? ব্যক্তিগত বা জাতিগত রুচি অনুযায়ী এক একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে এক এক জন না হয় শ্রদ্ধা করেন কিন্তু কোন একটি ত্যাগী সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করাটাই মানবীয় স্বভাব। আবার ত্যাগকে বাদ দিয়ে ত্যাগীকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আর ত্যাগীকে শ্রদ্ধা করা হয় কেন? না, তিনি

ধর্ম্মলাভার্থে এ সংসারের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছেন বলে। কাজেই ধর্ম্মানুসন্ধানকারীকে আমরা সম্মান করি বলেই ধর্ম্মকেও সম্মান করি বলতে হয়। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা বাদ দিলেও বলা যায় হিন্দুর যাবতীয় সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে ধর্ম্ম জড়িত। হিন্দুর বিবাহ হিন্দুর যাবতীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান—ঐহিক পারত্রিক সকল ব্যাপারেই ধর্ম্ম সুসম্বদ্ধ। কোন ব্যাপারেই ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হয়নি। মাত্র দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় বলে সময় সময় আমরা বুঝতে পারি না। এমন কি যাবতীয় সাংসারিক আনন্দ, ভোগ,—সকল ব্যাপারেই আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপের দিকেই যাচ্ছি। অজ্ঞান বশতঃ সমুদ্রের বারিবিন্দুকে খুঁজতে খুঁজতে জ্ঞানোদয়ে দেখা যায় সমুদ্রকেই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। হাতীর লেজ স্পর্শ করলেই হাতীকে স্পর্শ করা হলো বলা যায়, কারণ লেজটা হাতীর অঙ্গ বই আর কিছু নয়। আবার জ্ঞানের পরিণতিতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একীভূত হয়ে যায়।

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা যায় নৈতিক আদর্শ পরস্পর বিভিন্ন হলেও স্থূল ভাবেই হোক আর সূক্ষ্ম ভাবেই হোক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মানুষ ধর্ম্মকেই অবলম্বন করে রয়েছে। আবার ধর্ম্ম অর্থে কতকগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নয়, সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম্ম। তাই ধর্ম্মই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। বহু জন্মের পর যখন স্থূল ভোগের বাসনা মানব মন হতে হ্রাস পেতে থাকে তখন যদি শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভবকারী কোন পুরুষের সংস্রবে এসে মানব যথার্থ শিক্ষালাভ করতে পারে, তবেই তার পক্ষে ধর্ম্মলাভ সহজ ও সুসাধ্য হয়। ভোগবাসনার প্রাবল্যেই, উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব অর্থাৎ যাহা অনুসরণ কোরে আমাদের মন ভগবান্ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে—সেই সকল তত্ত্ব ধারণা করা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। আবার স্নায়ু জগতের এমনি স্বভাব যে আমরা স্নায়ুমণ্ডলীকে যে ভাবে চালিত করি সেটাই ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। কতকগুলি স্থূল জিনিষের বিষয় দিন রাত চিন্তা করলে সেই বিষয়টা চিন্তা করাই আমাদের স্বভাব হয়ে ওঠে। আবার সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনায় অভ্যস্ত হলে মন অন্য দিকে সহজে যেতে চায় না—ক্রমে মন আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। জীবনের প্রথমাবস্থায় যদিও আমাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকে, যদিও আমরা দীর্ঘকালের সংস্কার বশতঃ উচ্চ নীচ নানাপ্রকার সুদৃঢ় গণ্ডির সৃষ্টি করি, সেটা কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

তবে কি আমরা সকলেই ত্যাগের পথই আদর্শ বলে গ্রহণ করে চলব? সকলই যদি ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে তবে তো সমাজের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য এককালে নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু সকলেই কি ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করতে পারে? আর সকলেই কি মনে ভোগবাসনা এলেই ত্যাগ পথ ছেড়ে পালায়? এর সার্ব্বজনীন কোন নিয়ম নেই। স্বভাবতঃ ত্যাগের দিকে যার মন ধাবিত হয়, তার পক্ষেই সংগ্রামে জয়ী হবার সম্ভাবনা অধিক। সাধারণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি যদি বিশেষ চেষ্টা করেন তবে তার পক্ষেও পরিণামে কৃতকার্য্য হবার আশা আছে। আর যার মনে ভোগবাসনা সমধিক বর্ত্তমান তার পক্ষে সামাজিক-নৈতিক পথাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে হয়। ওখানে থেকেই যদি তার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সৎ-সংস্কার ক্রমে বিকশিত হয় তাহলে জীবনে এমন সময় আসতে পারে যখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে জোর করে ত্যাগের চেষ্টা শুধু আদর্শের কল্পনা করেই জীবন কাটিয়ে দেয়—জীবনের সন্ধ্যাতেও হয়তো মন ত্যাগমুখী হয় না—বরং ভোগবাসনা অতৃপ্তই রয়ে যায়। বাসনা

কেবল বেড়েই যায়। কিন্তু এই দুর্লভ মানব জন্ম কোন প্রকার সৎচেষ্টা ব্যতিরেকেই কেটে যাবে, এওতো বড় দুঃখের।

এক্ষেত্রে বলা যায় যাদের ভোগবাসনা কিছুতেই শান্ত হতে চায় না তাদের পক্ষে ক্রমশঃ ত্যাগই সহজ ও শ্রেয়ঃ নচেৎ বিপদেরই আশংকা। তবে ক্রমশঃ ত্যাগ করতে গিয়ে মনুষ্যজীবনের মহান আদর্শকে যেন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী আমরা ছোট করে না বসি। আমরা সাধারণতঃ আপোষে মীমাংসা করি, যখন একপক্ষ দুর্ব্বল ও অপর পক্ষ সবল থাকে। আপোষ মীমাংসায় স্থায়ী শান্তি আসে না; কারণ দুর্ব্বল ও সবলের জিঘাংসা বৃত্তি প্রশমিত না হইয়া সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বই চলে, অধিকাংশ স্থলেই ক্রমে দুর্ব্বল নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে সবলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। আবার কোন কোন স্থলে দেখা যায় দুর্ব্বল ক্রমে জীবনীশক্তি লাভ করে সবলের সঙ্গে লড়াই করেও জয়ী হয়। কিন্তু সে আশা অপেক্ষাকৃত অল্প।

তাই আদর্শের সঙ্গে অপরের মতানুযায়ী মীমাংসা করতে গেলে অনেক সময়ে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ভুলেই যাই এবং তার ফলে ক্রমশঃ মানসিক ও নৈতিক অবনতিই ঘটে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমরণ সংগ্রাম করে যাওয়াই সঙ্গত। অনবরত চেষ্টা দ্বারা শক্তি বর্দ্ধিত হয়ে ক্রমশঃ মানবের ভিতর অসীম ক্ষমতার অস্তিত্ব অনুভূত হতে দেখা যায়। বিনা চেষ্টায় লব্ধ শক্তিও হ্রাস হয়ে ক্রমশঃ মানব জড়ত্ব লাভ করে।

বর্ত্তমানে সমগ্র জগতে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, সকলই নিজেদের ভেতর যথেষ্ট ক্ষমতার অস্তিত্ব বোধ কোরে নানা প্রকার আন্দোলন করছে, কিন্তু সকল আন্দোলনের মূলেই একমাত্র উদ্দেশ্য রয়েছে আত্মবিকাশ। এই আত্মবিকাশ, ভগবান লাভ ও ধর্ম্মলাভ একার্থক। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক মানুষ কিন্তু তাই করছে। উপায়ের পার্থক্য ব্যষ্টি মানবের পক্ষে সর্ব্বদাই স্বাভাবিক কিন্তু চরম উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রকার বৈচিত্র্য নেই। কে কি ভাবে বসবে, কোন দিকে মুখ করে বসলে সুবিধে, কি খেলে কার দেহ ভাল থাকে, কি ভাবে কাপড় পরলে কাকে ভালদেখায়, এ সকল ব্যাপার অতিশয় ব্যক্তিগত—প্রকৃত ধর্ম্মলাভের সঙ্গে এ সকলের সম্বন্ধ খুব অল্প।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অনেকের নানা প্রকার বিকৃত ধারণা থাকতে পারে। অনেকে বলতে পারেন ধর্ম্ম-ভাবের প্রেরণাতেই মানুষের ঐহিক ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয়ে মানব দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তার নৈতিক অবনতি ঘটে ইত্যাদি! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। একটা জাতি যখন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর মন ও চিত্তের দৃঢ়তা, উদারতা, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, প্রীতি, পরদুঃখ সহানুভূতি প্রভৃতি যাবতীয় দৈবীসম্পদ এবং মানসিক মলিনতা যতই হ্রাস পাবে ততই জাতির শিল্প, বাণিজ্য, কৃষ্টি, জ্ঞান, প্রতিভা প্রভৃতি যাবতীয় সমৃদ্ধি ফিরে আসে। কাজেই ধর্ম্মের জন্য ভয় করার কিছু নেই। ঐটির অভাবেই নানা প্রকার দুর্ব্বলতা এসে জাতিকে একেবারে অন্তঃসার শূন্য করে পশুত্বের দিকে নিয়ে যায়।

শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নত জাতি বুঝতে পারে ধর্ম্ম একটা কল্পনা মাত্র নয়—কারো মাথার একটা খেয়াল নয়—সে দেখতে পায় যে ভগবান ছাড়া জগতে আর কিছু নেই—বাকী সব কল্পনা মাত্র—তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' তখন সে বুঝতে পারে যন্ত্রের প্রাণ তড়িতের প্রবাহে নিহিত আবার তড়িতের প্রাণ সেই 'মহতো মহীয়ানের' একটি অণু মাত্র। এই আদর্শ লাভই যে মানব জীবনের একমাত্র

উদ্দেশ্য—জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে যে আমরা সেই দিকেই ধাবিত হচ্ছি তা কাল প্রবাহে আমরা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র জগতে এই সার্ব্বজনীন আদর্শ সেবারার্থ এবং সমগ্র মানব সমাজকে প্রকৃত পথে চালিত করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব! তিনি নিজ জীবন দ্বারা তার অনুভব করে এবং তাঁর যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সেই সত্য প্রচার করে গেলেন। তাঁর সাধনা হতে যে শক্তি তরঙ্গ উঠেচে তার ফলে হয়তো কয়েক শতাব্দীর পর জগৎ হতে দ্বন্দ্ব, কলহ, জঘন্য যুদ্ধবৃত্তি প্রভৃতি মানব মনের নীচ বৃত্তি সমূহ একেবারে তিরোহিত হবে। তখনই সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে বাস্তবিকই সে "অমৃতস্য পুত্রঃ"—অমৃত স্বরূপ!

ব্রহ্মচারী ক্ষীরোদ

নানক-চয়ন

দ্বিতীয় গুচ্ছ

(জপজী হইতে)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

সাচা সাহিবু সাচি নাই ভাখি আ
ভাউ অপারু।

প্রভু সত্য, [তাঁহার] নাম সত্য, [তাঁহার] ভাষা [ও] ভাব অনন্ত (অর্থাৎ অনন্ত ভাবে অনন্ত ভাষায় তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা যায়)।

ফেরি কি আগে রখী এ জিতু দিসৈ দরবারু।

[তিনি রাজরাজেশ্বর] এখন [তাঁহাকে দিবার মত আমার এমন] কি [সামগ্রী আছে যাহা তাঁহার] সামনে [উপঢৌকন স্বরূপ] রাখিলে [তাঁহার] দরবার মূর্তির দর্শন পাইব।

(অর্থাৎ গুরু নানক নিজেকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া ভগবানকে প্রভু রাজরাজেশ্বর রূপে দেখিতে চাহিতেছেন। এখন প্রথা আছে রাজাকে রাজ সভায় দর্শন করিতে হইলে উপঢৌকন দিতে হয়, তাই ভাবিতেছেন কি দিয়া তাঁহার ইষ্টের অভিলষিত রূপ দর্শন করিবেন)।

মুহৌ কি বোলণু বোলিএ জিতু সুণি ধরে পিআরু।

[তিনি প্রেমিক], [এই] মুখে কোন্ ভাষা বলিব যাহা শুনিলে [তিনি আমার প্রতি] প্রেম করিবেন।

(অর্থাৎ গুরুজী নিজেকে ভগবৎ প্রেমের ভিখারী জ্ঞান করিয়া ভাবিতেছেন কিরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে ভগবান তাঁহার প্রেম ভিক্ষা দিবেন)।

অংম্রিত বেলা সচু নাউ বড়িআই বীচারু।

[গুরুজী নিজের মনকে বলিতেছেন যে হে মন], সময়ে অমৃত [মন্ত্র] সত্য [মন্ত্রের] নাম [ও] গুণ বিচার কর [তাহা হইলেই আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে]।

(অর্থাৎ দিবস ও রাত্রির যে সব শুভক্ষণ আছে সেই সব ক্ষণে সত্য স্বরূপ ভগবানের নাম ও লীলা অনুধ্যান করিলে তাঁহার কৃপা লাভ হয়, তখন যে কোন মূর্ত্তি ইচ্ছা দর্শন করা যায় এবং তাঁহার ভালবাসা পাওয়া যায়)।

করমী আবৈ কপড়ো মোখু দুআরু ।

[নূতন নূতন কাপড়ের ন্যায়] কর্ম্ম বশে বহুবার শরীর মিলে [কিন্তু] মুক্তির দ্বার দুর্লভ [তাহা কেবল প্রভুর কৃপাতেই মিলে] ।

(অর্থাৎ মানুষ যেমন জীবদ্দশায় বহুবার বস্ত্র পায় সেইরূপ জীবও বহুবার শরীর লাভ করে, কিন্তু মুক্তিলাভ করে না, তাহা কেবল শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই হয়) ।

নানক এবৈ জানীএ সাভু আপে সাচি আরু ॥৪

হে নানক, জানিয়া রাখ সেই সত্যস্বরূপ স্বয়ংই সর্ব্বময় হইয়া আছেন ।

(অর্থাৎ তাঁহার কৃপা লাভ করা কঠিন নহে, কারণ তিনি সর্ব্বময় রূপে সর্ব্ব স্থানে আছেন, পূর্ব্বোক্ত রূপে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই হইল) ॥৪॥

(৫)

থাপিতআ ন জাই কীতা ন হোই ।

[তাঁহাকে] স্থাপিত করা যায় না, [বা কোন বিশেষ] স্থানে তিনি থাকেন না ।

(অর্থাৎ—পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কোন বিশেষ মূর্ত্তিতে বা কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ হইতে পারেন না, তাই এক স্থানে একটী মাত্র মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়া রাখা যায় না) ।

আপে আপি নিরঞ্জনু সোই ।

তিনি [স্বয়ম্ভু] আপনা হইতেই আপনি [আছেন], তিনি নিষ্কলুষ। (অর্থাৎ জগতের সব বস্তু যেমন অপর বস্তু হইতে উদ্ভব, পরমাত্মার সেরূপ নহে, তিনি আপনা আপনিই বর্ত্তমান, তাঁহার কোন কারণ নাই, জন্ম নাই, কোন কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত, তাই তিনি মুক্তি দিতে পারেন) ।

যিনি সেবি আ তিনি পাইআ মানু ।

যিনি [তাঁহার] সেবা করিয়াছেন, তিনিই সম্মান পাইয়াছেন ।

(অর্থাৎ—শ্রীভগবানের অনুগত সেবক সকলের কাছেই সম্মান পাইয়াছেন) ।

নানক ! গাবীএ গুণী নিধানু ।

হে নানক, গুণ নিধানের গুণগান করিয়া যাও ।

(অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, স্বয়ম্ভু, নিত্যশুদ্ধ, ভগবান মুক্তি ও যশঃ দুইই দিবার অধিকারী, তাই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন'কর, ইষ্টসিদ্ধি হইবে) ।

গাবীএ সুনীএ মনি রখীএ ভাউ ।

[হে নানক, সেই ভগবানের] গুণ গান কর, শ্রবণ কর, [তাঁহার অপূর্ব্ব] ভাব হৃদয়ে ধারণ কর ।

দুখ পরিহরি সুখু ঘরি লৈ জাই ।

[তাহা হইলে] [পরমাত্মা] দুঃখ দূর করিয়া সুখের ঘরে লইয়া যাইবেন ।

(অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম ও গুণ কীর্ত্তন, শ্রবণ ও অনুধ্যান করিলে অশান্তি দূর হইয়া যায় ও শান্তিলাভ হয়) ।

গুরমুখি নাদ গুরমুখি বেদ গুরমুখি রহিআ সমাঈ ।

নাদ [ব্রহ্ম ওঁকার] গুরুমুখী, বেদও গুরুমুখী, গুরুমুখী হইলেই তাহাদের সার্থকতা ।

(অর্থাৎ শ্রীগুরুর রসনায় ভগবান স্বয়ং বিরাজ করেন, তাই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিলেই ওঁকার ও বেদ শক্তি সম্পন্ন হয়, আর তখনই তাহারা সাধককে সহায়তা করেন ।

গুরু ঈসরু গুরু গোরখু বরমা গুরু পার্ব্বতী মাই ।

গুরু শিব, গুরু বিষ্ণু, [গুরু] ব্রহ্মা, গুরু পার্ব্বতী [ও] মা লক্ষ্মী ।

(অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পার্ব্বতী দেবী ও মা লক্ষ্মী সকলই শ্রীগুরু, তিনি সর্ব্ব দেব-দেবী স্বরূপ) ।

যে হউ জানা আখানাহী কহনা কথনু ন জাই ।

যিনি [গুরু কৃপায় ও তাঁহার মন্ত্রশক্তিতে]

[শ্রীভগবানকে] জানিয়াছেন, [তিনি আর তাঁহাকে] ব্যক্ত করিতে পারেন না, [কারণ তাঁহাকে] ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

(অর্থাৎ যদিও শ্রীগুরুর কৃপায় ও তাঁহার মন্ত্রশক্তি প্রভাবে শ্রীভগবানকে জানা যায়, কিন্তু তিনি বাক্য মনাতীত বলিয়া ভাষায় তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না]।

গুরা ইক্ দেহি বুঝাই। সভনা জীআ কা
ইকু দাতা সো মৈ বিসরি ন জাই।

গুরু আমায় একটী [বিষয়] বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সকল জীবের দাতা একজনমাত্র, তাহা যেন আমি ভুলিয়া না যাই।

(অর্থাৎ যদিও শ্রীভগবানের বিষয় কথায় বলা যায় না তবুও গুরুদেব তাঁহার অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে একটী বিষয় বলিয়া বুঝাইয়াছেন—যে শ্রীভগবান ভিন্ন দিবার কর্ত্তা আর কেহই নাই, যাহা কিছু জীব পাইতেছে—সবই সেই ভগবানের দেওয়া) ॥৫

(৬)

তীর্থি নাবাজে তিসু ভাবা
বিণু ভাণে কি নাই করী।

তীর্থে স্নান করিব [যদি] তাঁহার ভাব হয়, যদি না হয় তবে [স্নান] করিব না।

(অর্থাৎ যদি তাঁহার ভাব হৃদয়ে জাগরূক হয়, তবেই তীর্থে স্নানের সার্থকতা, সে ভাব হৃদয়ে না জাগিলে স্নান করিয়া লাভ কি ?

জেতী সিরঠি উপাই বেথা
বিনু কর্ম্মা কি মিলৈ লই।

যত বস্তু সৃষ্টির [মধ্যে] উৎপন্ন দেখিতেছি, [তাহার মধ্যে] কোন্‌টী কর্ম্ম বিনা মিলিবে যে লইতে পারিব ?

(অর্থাৎ এই সংসারে এমন কোন বস্তুই নাই যে কর্ম্ম বিনা পাওয়া যায় ; যখন সামান্য বস্তু সম্বন্ধেই এই, তখন সংসারাতীত বস্তু ভগবানকে সাধন রূপ কর্ম্ম না করিয়া কি করিয়া পাওয়া যাইবে ?-}

মতি বিচি রতন জবাহর মাণিক
জে ইক গুর কী শিখ সুনী।

“যিনি একমাত্র শ্রীগুরুর শিক্ষা শুনিয়া চলেন—তিনি মতি হীরা জহর মাণিক ইত্যাদির অধিকারী হন]।

(অর্থাৎ শ্রীগুরুর শিক্ষা এক মাত্র সম্বল করিয়া চলিলে মানুষ শ্রীভগবানকে লাভ ত করেই, অনন্ত ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী হয়]।

গুরা ইক্ দেহি বুঝাই। সাভনা জীআ কা
ইকু দাতা সো মৈঁ বিসরি ন জাই ॥৬
[ইহার অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে]।

জে জুগ চারে আর জা হোর দসুনী হোই।
নবা খঁড়া বিচি জানীএ নালি চলৈ সভু কোই।
চংগা নাউ রখাই কৈ জসু কীরতি জাগি লেই।
জে তিসু নদরি ন আবই ত বাত ন পুছৈ কে।

যদি মানুষের আয়ু চারযুগব্যাপী বা তাহারও দশগুণ দীর্ঘ হয় ; যদি সকল স্তরের লোক তাহাকে জানে আর তাহাকে দেখিলেই তাহার পাছে পাছে চলে, যদি সংসারের সকলে তাহাকে ভাল বলে আর তাহার যশোগান করে, কিন্তু যদি সে ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারে তবে শেষে তাহার কথা কেহই জানিতে চায় না।

(অর্থাৎ যদি মানুষ দীর্ঘায়ু, সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন ও যশস্বী হয় কিন্তু শ্রীভগবানের প্রেম লাভ করিতে না পারে, তবে পরিশেষে তাহার কথা কেহই জানিতে চায় না—কিন্তু ভগবৎ প্রেমিকগণ জনসমাজে অমর হইয়া থাকেন, অনন্ত কাল ধরিয়া লোকে তাঁহাদের সন্ধান লইয়া থাকেন)।

কীটা অন্দরি কীটু করি দোসী দোসু ধরে।

যাহার ভগবৎ প্রেম নাই [ভক্তেরা] তাহাকে কীটাধম আর মহা অপরাধী জ্ঞান করেন।

নানক ! নিগু'ণি গুণু করে গুণ বন্তিয়া
গুণ দে।

হে নানক, [শ্রীভগবানের প্রেম] নির্গুণকে গুণবান করে, আর গুণীর গুণ অধিক করিয়া দেয়।

তে হা কোই না সুঝাই জি তিসি গুণু কোই করে।

[কিন্তু] এমন কাহাকেও দেখি না যে তাঁহাকে গুণবান করিতে পারে।

(অর্থাৎ শ্রীভগবানকে গুণ মণ্ডিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই]।

(ক্রমশঃ)

অচিন্ত্যানন্দ

বিবেকানন্দ স্বামী

শ্রীগুরু-চরণে অতুল-ভক্তি
হৃদয়ে তোমার বিপুল-শক্তি,
দানিতে ভারতে ভুক্তি, মুক্তি,
ঋষি-লোক হ'তে নামি'
এসেছিলে তুমি বিশ্ব-বিজয়ী
বিবেকানন্দ স্বামী!
মন্থি' বিশাল শাস্ত্র-সিন্ধু
আহরি' আনিলে অমৃত-বিন্দু,
উদিলে গগনে বিমল-ইন্দু,
ভেদিয়া আঁধার যামি;
প্রণমি তোমারে, জ্ঞান-গরিষ্ঠ
বিবেকানন্দ স্বামী!
অমৃতালোকের' হে পরিচায়ক!
দীন-অভাজন মুক্তি-দায়ক,
মৃত্যু-বক্ষে মৃত্যু-গায়ক
তব অমৃত-বাণী,
প্রণমি তোমারে, চির-বরেণ্য
বিবেকানন্দ স্বামী!

রুদ্র-বীণায় বজ্র-তন্ত্রী;—
সঙ্গীতে-সুর মৃত্যু-হন্ত্রী;—
বিশ্ব-জননী তব নিয়ন্ত্রী;
চির-কল্যাণ-কামী,
প্রণমি তোমারে, দীন-শরণ্য
বিবেকানন্দ স্বামী!
প্রণমি তোমারে, ভারতের ঋষি
প্রণমি তোমারে, চির-সন্ন্যাসী!
জ্ঞানী, কর্ম্মী, ত্যাগী, তপস্বী,
রুদ্র-পিণাক-পাণি;
প্রণমি তোমারে, বিশ্ব-পূজ্য
বিবেকানন্দ স্বামী!
জাগে তব বাণী কল্মষ হরা,
তব সৌরভে পূর্ণিত ধরা,
তোমার বিপুল-গৌরবে ভরা
ভারত-বক্ষ-খানি;
প্রণমি তোমারে, ভারতের নিধি
বিবেকানন্দ স্বামী!

শ্রীঅর্পণা দেবী

বেদান্তী ভক্ত অখা

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

গুজরাত-কাঠিয়াবাড় ভক্তি-প্রধান দেশ। প্রাচীন-কালে এদেশে অনেক মহাত্মা ভক্তচূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—বর্ত্তমান শতাব্দীতেও বহু মহাপুরুষ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহাদের কথা কিছুই জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা হইতে যাঁহারা এদেশে দ্বারকা, গীরনার (রৈবতক), প্রভাস, প্রাচী আদি তীর্থ পর্য্যটনে আসেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় তো ভক্ত-শ্রেষ্ঠ নরসী মেহতা, ভক্ত কীকা, পর্ব্বত মেহতা প্রভৃতির নাম শুনিয়া থাকেন, অথবা আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি দয়ানন্দ, কিম্বা বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা গান্ধীর কথা তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হয়,—কিন্তু যাঁহার জীবন-চরিত আজ লিখিতে বসিয়াছি, সেই বেদান্তী ভক্ত "অখার" কথা বোধ হয় কেহই জানিতে পান নাই।

ভক্ত অখা জাতীতে স্বুবর্ণ-বণিক ছিলেন। আহমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী জেতালপুর নামক গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস স্থান ছিল, এরূপ তাঁহার গুজরাতী জীবনী লেখকগণ বলেন। তবে অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি যে আহমেদাবাদের "দেশাইনী পোল", অর্থাৎ দেশাইয়ের গলি নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি তথায় একটী জীর্ণ-গৃহ বিদ্যমান আছে, যাহা লোকে "অখা ভক্তের বাটী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অখার জন্মকাল কেহই সঠিক বলিতে পারেন না। আহমেদাবাদের বাদশাহী রেকর্ডে অনুসন্ধান করিলে হয় তো জানা যাইতে পারে,—কারণ, তিনি বাদশাহের মুদ্রাকর পদে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার "অখে গীতা" বা "অক্ষয় গীতা" নামক লেখার অন্তে এই পদ দেখিতে পাওয়া যায়—

"সংবত সতর পংচোতরো, শুকলপক্ষ চৈত্রমাস,
সোমবার রামনবমী, পূরণ গ্রন্থ প্রকাশ।"

অর্থাৎ—সং ১৭৭৫ (কেহ বলেন ১৭০৫ কিন্তু আমার মনে হয় প্রথমোক্তই ঠিক), শুক্লপক্ষ চৈত্রমাস সোমবার রামনবমীর দিন উক্ত গ্রন্থ পূর্ণ হইয়াছিল। সে সময়ে অখার বয়স কমপক্ষে ৪০।৪৫ হওয়া সম্ভব। এইরূপ ধারণার কারণ এই প্রবন্ধ পাঠে অবগত হইবেন।

অখার মাতার মৃত্যু আহমেদাবাদে আসিবার পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে, কারণ, শুনা যায়—তিনি তাঁহার পিতা ও একমাত্র ভগিনীকে লইয়া তথায় উপার্জ্জনার্থে আসিয়া নিবাস করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সংসারের বোঝা মাথায় লইয়াছিলেন, কারণ, বিংশতি বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা ও ভগিনীর মৃত্যু হয়,—এরূপ শ্রুতিগোচর হয়। বাল্যকালেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহার যুবতী স্ত্রীও ঐকালেই দেহত্যাগ করেন। এরূপে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার আপন বলিতে সংসারে যাঁহারা ছিলেন সকলেই মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হওয়ায় তিনি উদাস মন হইয়া সংসারের অনিত্যতা বিশেষ উপলব্ধি করিতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন, অনেকের অনুরোধে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব-ইচ্ছায় এই দ্বিতীয় স্ত্রীও অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। উভয় স্ত্রী দ্বারাই তাঁহার কোন সন্ততি ছিল না, অতএব,

এখন হইতে তাঁহার চিত্ত "এ সংসার জন্ম-মৃত্যুর আগার, অনিত্য" বোধে ইহার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ম পথ অন্বেষণে তৎপর হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কথিত আছে, তাঁহার এক ধর্ম্ম-ভগিনী ছিলেন তিনি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। সংসারে আর কেহ না থাকায়—ঐ ভগ্নীর উপর অন্তরের সকল স্নেহ-আকর্ষণ যে একত্রিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তিনি অখার নিকট ৩০০৲ শত টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে ঐ টাকা দিয়া একটী সোণার কণ্ঠী গড়িয়া দিবার জন্ম তিনি অখাকে অনুরোধ করেন। সরল স্বভাব অখা পবিত্র স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া উহাতে স্বয়ং ১০০৲ শত টাকা অধিক দিয়া এক সুন্দর সুবর্ণ কণ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দেন। অর্থের প্রমাণে উহার ওজন অধিক দেখিয়া (কারণ, অখা স্বয়ং যে শত টাকা দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলেন নাই) সেই মহিলার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় অন্য কোন সুবর্ণ বণিকের নিকট উহা পরীক্ষা করিবার জন্ম লইয়া যান। পরীক্ষার ফলে—কণ্ঠী বিশুদ্ধ স্বর্ণের তৈয়ারী এবং ৪০০৲ চারি শত টাকার স্বর্ণ তাহাতে আছে জানিতে পারিয়া—অখাকে অবিশ্বাস করার জন্ম তাঁহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। অনুতপ্ত হৃদয়ে ঐ কণ্ঠী অখার নিকটই মেরামৎ করিয়া দিবার জন্ম (কারণ, পরীক্ষা নিমিত্ত উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছিল), তিনি লইয়া গেলেন। প্রথমে তো সত্য ঘটনা বলিবেন—এরূপ নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু পরে সত্য বলিলে অখার মনে বিষম আঘাত লাগিবে—এরূপ বিচার করিয়া "উহা ইন্দুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে"—এরূপ বলিয়া ফেলিলেন। অখা কিন্তু কণ্ঠী দেখিয়াই বুঝিলেন সত্য ব্যাপার কি, এবং ভগিনী যে—পাছে সত্য কথা শুনিলে তাঁহার মনে দুঃখ হয়, সেই ভয়ে ঐ মিথ্যা বাক্য বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকি রহিল না। কিন্তু, এই ঘটনায় তিনি অন্তরে বিষম আঘাত পাইলেন এবং স্বার্থ-পূর্ণ সংসারের বিষ-চিত্র তাঁহার নয়নের সম্মুখে সতত পতিত হওয়ায় এক অজানা বেদনায় সকল মায়িক সম্বন্ধ ছেদন করিয়া প্রেমময় প্রভু জগদীশ্বরের উপাসনায় চিত্ত সমাহিত করিতে তাঁহার মন এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রায় ঐ সময়ে আর একটী ঘটনা এই ইচ্ছা আশু পূর্ণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহা এরূপ :—

অখা আহমেদাবাদের বাদশাহী ট্যাঁকশালের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্বভাব ও সততার খ্যাতিই ঐ দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য-প্রাপ্তির হেতু ছিল। কিন্তু, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ অসৎ উপায়ে যে উপার্জ্জনাদি করিত, তাহা আর করিতে সক্ষম না হওয়ায় বাদশাহের নিকট অখার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ করিতে লাগিল। শেষে অখা হালকা ধাতু মুদ্রায় মিশ্রিত করিয়া বাদশাহকে ঠকাইতেছেন, এরূপ অপবাদ আরোপ করিতেও তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিল না। কিন্তু পবিত্র-স্বভাব অখার উপর বাদশাহের অগাধ বিশ্বাস ইহাতেও টলিল না। তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইলেন এবং অখাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন। পরন্তু এই ঘটনা অখাকে সম্পূর্ণ সংসার-বিরাগী—করিল। এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও দাসত্ব করিতে তাঁহার মন আর রাজী হইল না। স্বয়ং বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি আগ্রহ করিলেও অখা ট্যাঁকশালের অধিপতির কার্য্য এবং নিজ জাতি ব্যবসায় উভয়ই ত্যাগ করিলেন। যে কার্য্যে অপরের সন্দেহ ভাজন হইতে হয়, তাহা করিতে সাধু অখার মন কিছুতেই রাজী হইল না। তিনি যন্ত্র-পাতী সমস্ত কূপে নিক্ষেপ

করিলেন—পরম তত্ত্বের অন্বেষণে সাধুসমাগমে বহির্গত হইলেন। সংসারের আপন জনের বিয়োগ, পরম প্রিয় স্নেহপাত্রদের অবিশ্বাস এবং স্বার্থপূর্ণ জগতের প্রবঞ্চনা-জাল—অখার হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন করিল। তিনি আহমেদাবাদ ত্যাগ করিয়া মহান্ পুরুষদের অন্বেষণে ও তৎসঙ্গ লাভ বাসনায় উত্তর ভারতের তীর্থ সকলে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পথে জয়পুরে গোস্বামিগণের দর্শনে যাইলে ধনবান অখা যথেষ্ট সৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ, "গুরু কিধা মেঁ গোকুলনাথ" ইত্যাদি বাক্যে উহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই দীক্ষা গ্রহণের কারণ,—যেহেতু তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবকুল সম্ভূত ছিলেন এবং গোস্বামী গোকুলনাথ ঐ সময়ে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। শুনা যায়, শাস্ত্র-চর্চ্চাদি নিমিত্ত অখা ঐকালে জয়পুরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, এবং গোস্বামিগণের ভোগ-বিলাসের বাহার দেখিয়া—তথায় তাঁহার কাম্য সত্যের অনুভবালোক প্রাপ্তির আশা বৃথা বুঝিয়া—কাশী যাত্রা করেন। কাম-কাঞ্চনে অনাসক্ত সন্তই যথার্থ সত্যলাভে সমর্থ্য হন,—এই বিশ্বাস অখার মনে দৃঢ় হওয়ায় এখন তিনি উক্ত অঞ্চলের খ্যাতনামা সাধু-মহাত্মাগণের পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। জ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা, বা অর্থাদি অর্পণ বা অন্য নানা প্রকার উপহারাদি দ্বারা পরীক্ষা করা তাঁহার প্রথা ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপে বহু অন্বেষণের পর ৺কাশীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামক কোন সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। স্বামিজী প্রতিরাত্রে তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্যকে নিজ কুঠিরে রাখিয়া বেদান্ত উপদেশ দিতেন। তথায় রাত্রে প্রবেশ অধিকার না থাকায় অখা কুঠিয়ার বাহিরে গোপনে বসিয়া নিত্য বেদান্ত শ্রবণ করিতেন এবং দিনে উক্ত সন্ন্যাসীর নিকট,গিয়া নানাভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিতেন। কিন্তু এই পরম ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহার সকল পরীক্ষার মুখে উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদান্ত-রসে মগ্ন-চিত্ত অখা, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য রাত্রে ঐরূপে কথা শ্রবণ করিলেও দীর্ঘকাল গুরু-শিষ্য—উভয়েই তাহা জানিতে সক্ষম হন নাই। একদিন শ্রমাধিক্য বশতঃ উক্ত শিষ্য কথা শ্রবণকালে নিদ্রার আবেশে অভিভূত হওয়ায় নিত্যকার "হুঁ"কার সময় মত দিতে পারিতেছিল না। শিষ্যের নিদ্রা আসিতেছে জানিতে পারিলে পাছে শ্রীব্রহ্মানন্দজী কথা বন্ধ করেন, এই আশঙ্কায়, অখা বাহির হইতে "হুঁ"কার দিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে বাহির হইতে "হুঁ"কার ধ্বনি আসিতেছে শুনিয়া স্বামিজী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্বয়ং দ্বার খুলিয়া ঐ ব্যক্তি কে তাহা দেখিবার জন্য কুঠিয়ার বাহিরে আসিলেন। তথায় একপার্শ্বে অখাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সাদরে গৃহাভ্যন্তরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন এবং ঐরূপ বসিয়া থাকিবার কারণ তথা তাঁহার জীবনের আত্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া সব অবগত হইয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। অখা সুদীর্ঘকাল ঐরূপে গোপনে বসিয়া প্রত্যহ বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন,—এ কথা শুনিয়া, সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ দুচারিটী প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন, অখা অতি সুন্দররূপে উক্ত কঠিন বিষয় সকল ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে বেদান্তের উত্তম অধিকারী,—এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তদবধি—অখা নিত্য রাত্রে তথায় বেদান্ত অভ্যাস করিতে যাইতেন, আর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গীতা, উপনিষদ, পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ট, আত্মপুরাণাদি গ্রন্থ শ্রবণ

সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এরূপ তাঁহার গুজরাতী জীবনী লেখকগণ বলেন। সে যাহা হউক, তিনি যে বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার লেখা সংগ্রহ পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এরূপে ৺কাশীতে কয়েক বৎসর অবস্থানান্তে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি জন্মভূমি গুজরাত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পুনরায় জয়পুরে গোস্বামী গোকুলনাথের দর্শন নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। আগমন কালে অখা কপর্দ্দক শূন্য ফকির। তাই শুনা যায়, যখন তিনি দ্বারপালকে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গোকুলনাথ গোস্বামিজীকে সংবাদ দিতে বলিলেন, সে বলিল,—"অখা তো এমন ছিলেন না!" সে যাহা হউক, গোস্বামিজী খবর পাইয়া দ্বিতল হইতে দেখিলেন;—অখা আর সে অখা নাই। দীনদরিদ্র দশা তাঁহার;—তিনি আর তাঁহাকে দর্শন লাভ দিতে সম্মত হইলেন না। দ্বারপালকে দিয়া খবর দিলেন—"সময় নাই।" গুরু গোকুলনাথজীর এরূপ ব্যবহারে—অখার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল এবং তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া গুজরাত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সংসারের সকল বন্ধন ছেদন করিলেও অখা যে কোন ভেক্ ধারণ করেন নাই, তাহা তাঁহার কবিতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার মত ছিল;—যেমন প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম হইয়াছে, তেমনি ঈশ্বর প্রাপ্তি বা আত্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কোনও সম্প্রদায়ের অধীন হইয়া রংবেরঙ্গের বেশ-ভূষা বা তিলকাদি চিহ্ন ধারণ করিবার আদৌ দরকার নাই। অখা সৎসঙ্গ-মাহাত্ম্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সাচ্চা সাধু সন্তের উপর তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, ইহা তৎকৃত "অখে গীতা", বা অক্ষয় গীতা নামক লেখা সংগ্রহ পাঠে জানিতে পারা যায়। যথা :—

হরিজন সন্তের মহিমা এত মহান্ যে, ভিন্ন-ভাব (জাতভাব) নষ্ট হইয়া বস্তু প্রাপ্তি হয়—(তাঁহার কৃপায়):—চৈতন্য-সাগর মাঝে মিলিত হয় এবং এ দেহের অধ্যাস নষ্ট হইয়া যায়। এ ভব মাঝে সাধু-জনেরই জীবন অতি শোভা পায় এবং যাহার এই সন্তজনের সহিত প্রীতি তাহার জীবনও সকলের সুখদায়ক হয়। সন্তের প্রীতি এমনই যে, সকলকে নিজের মত করিয়া ফেলেন, যেমন মেঘের রীত কোনরূপ ভেদ (বেহেরো) না করিয়া বৃষ্টি করা (অনুবাদ অখে গীতা)॥

অখাকে কবি বলিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন, কারণ, তাঁহার কবিতায় "পিঙ্গল"-শাস্ত্র প্রমাণে ছন্দঃ-বন্দের ধারা-ধরণের কোন চিহ্ন বিশেষ নাই। তাঁহার যখন যেমন ভাব হইয়াছে, লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জ্ঞানী বলিতে আধুনিক গুজরাতী কবিগণের আপত্তি নাই, কারণ, তাঁহার সমগ্র লেখা অতি গভীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার প্রতি শব্দ, প্রতি দৃষ্টান্ত গুহ্য অর্থ সূচক। গুজরাতী ভাষায় অখার মত স্পষ্ট বক্তা জ্ঞানী কবি আর দ্বিতীয় নাই। অখা কঠোর ভাষায় দোষ দেখাইলেও সত্যান্বেষী মহাপুরুষ,—যথার্থ সাধু-সৎপুরুষের স্তুতি ও সৎসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া অনেক কবিতা-ভজনাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "বাণী" পাঠে উপলব্ধি হয় যে তিনি এক মহান সৎ ও সত্যের পবিত্র পূজারী ছিলেন।

জপানন্দ

ভারতে বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীউপেন্দ্র কুমার কর, বি-এল্

পূর্ব্বে স্বামিজীর প্রচারিত যে দুইটি বিষয়ের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহার অপরটি,— হিন্দুধর্ম্ম এবং ইস্লামধর্ম্মের সমন্বয়ের অত্যাবশকীয়তা। কোনও মুসলমান ভদ্রমহোদয়কে লিখিত পত্রে অদ্বৈত বেদান্ত ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া পরে লিখেন :—"* কিন্তু কর্ম্ম পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানব জাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে। পক্ষান্তরে, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন, ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে এক মাত্র ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান তৎ সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,—এই মাত্র প্রভেদ।

"এই হেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়জনক হউক না কেন, কর্ম্ম পরিণত (Practical) ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক থাকিবে। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেল্‌ও নাই, কোরাণও নাই। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্ম সকল একত্বানুভূতিরূপ এক মাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ অভিব্যক্তি মাত্র, সুতরাং যাঁহার পক্ষে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেই ধর্ম্মপ্রণালীটি বাছিয়া লইতে পারেন।

"আমাদের মাতৃ-ভূমির একমাত্র আশাস্থল,— হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলাম, এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়,— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহের সম্মিলন। আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয় এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হন।"

রামকৃষ্ণের বাণী বিবেকানন্দ কিরূপে প্রচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কতকটা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত বাণীর সংক্ষিপ্তসার স্বামিজীর ১৮৯৫ সনে লিখিত এক পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ের উপসংহার-স্বরূপ তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিব :—"* প্রাচীন-কালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল ;—ভালগুলি রাখ্‌তে হবে। কিন্তু আস্‌ছে যে ভারত— Future India, Ancient Indiaর (ভবিষ্যৎ ভারত, প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যে দিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেই দিন থেকেই Modern Indiaয় (বর্ত্তমান ভারতে)— সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্য-যুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। * যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হয়, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। * তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভেতর ঘোঁড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক তারা বীর,—তাদের মহাশক্তির বিকাশ

হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—দয়া—দীন উপকার, মানুষ—ভগবান্ নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী, পুং, নপুং, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি ভেদ নেই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। * * Every action that helps a being manifest its divine nature is good, every action that retards is evil. The only way of getting over divine nature manifested is by helping others do the same * *

"এই ঘোর বামাচার ছুৎমার্গে-পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি? * * All expansion is life, all contraction is death All love is expansion, all selfishness is contrction Love is therefore the only law of life * * This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম etc. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম কর্ম্ম প্রভৃতির রহস্য)। * *

"সকল (অতীত) অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে (প্রেমের সমান) জ্ঞানের অভাব ছিল। রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম,— অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝ্‌তে পারিস্ নি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ ইহাঁর বিষয় শুনিয়াও ইহাঁকে জানিতে পারেনা)। What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life His life is the living commentary to the Vedas of all the nations (অর্থাৎ সমগ্র হিন্দু জাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমস্ত উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সমস্ত জাতি সকলের শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত ভাষ্য স্বরূপ।" * * (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ১০২-৬ পৃঃ)

এই প্রকারে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের যুগ-বাণী সমগ্র বিশ্ববাসী নরনারীকে শুনাইয়া ভগবন্নির্দ্দিষ্ট জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন দ্বারা নর-লীলা সমাপনান্তে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে নির্ব্বিকল্প মহাসমাধিযোগে ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পাঠক, স্মরণ করুন যে, রামকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, জগন্মাতা তদ্দ্বারা যে-সকল অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পাদিত হইলেই বিবেকানন্দের প্রার্থিত নির্ব্বিকল্প সমাধির ব্রহ্মানন্দে প্রবেশের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন।) এতদিনে সেই প্রতিশ্রুতির পূরণ হইল। * (ক্রমশঃ

---

* পরম বিস্ময়জনক ব্যাপার এই-যে, যে বিবেকানন্দ এতদিন আকণ্ঠ প্রচার কার্য্যে নিমগ্ন থাকিয়া সকলকে নিষ্কাম কর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন, যিনি গুরুভ্রাতাগণকে তাঁহাদের দরিদ্র-সেবা-রূপ কর্ম্মের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বার বার লিখিয়াছেন,—"সাবাস্—আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, হাম আওর কুছ নেহি মাঙ্গতে হেঁ,—কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম, even unto death,"—সেই কর্ম্ম-যোগি-বরিষ্ঠ বিবেকানন্দের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য যতই সুসম্পন্ন হইয়া আসিতে লাগিল ততই-তাঁর কর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল। তাই দেখিতে পাই, ১৯০০ সালে, তাঁহার মহাসমাধির প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণের আহ্বান-বাণী তাঁহার কর্ণে আসিয়া পঁহুছিয়াছে,—তাঁহার ভিতরকার কর্ম্ম সন্ন্যাসী শুষ্ক-জ্ঞানী শুদ্ধ ধ্যানী, শুদ্ধভক্ত বিবেকানন্দ জাগিয়া উঠিয়া সেই মহা সমাধির পরম মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। উক্তসনের ১৮ই এপ্রিল কালিফোর্ণিয়া হইতে তাঁর মার্কীন দেশীয়া অন্তরঙ্গ মহিলা-বন্ধু Miss Josephine Mac Leod-কে এক পত্রে লিখেন :—"* * আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জোসেফাইন্, যেন চিরদিনের তরে আমার কায করা বন্ধ হয়ে যায়, আর আমার সমুদায় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একে বারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। * * লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হলো,— এখন পুটুলি পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তি দাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মোরে নেইয়া,' হে শিব, হে শিব, আমার তরি পারে নিয়ে যাও প্রভু।

"যতই যা হউক, জোসেফাইন্, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাণী অবাক্ হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল স্বভাব,—আর, কায কর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা' ঐ স্বভাবেরই উপরে কিছুকালের জন্যে

মাধুকরী

জাপানে সিঙ্গণ ধর্ম্ম

জাপানের ওসাকা নগরীর অনতিদূরে কাই প্রদেশে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী অবস্থিত। এখানে মাউণ্ট কোঁয়া নামক গভীর অরণ্য সমাকুল একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শীর্ষদেশে প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকার উপর সিঙ্গণ-মন্দির-সম্মিলনীর সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট। সিঙ্গণ-বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ইহা একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু কোবোদৈশী ৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপন করেন। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ এবং মহাত্মা কোবোদৈশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সহস্র সহস্র বৌদ্ধ প্রতিবৎসর এই তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন।

এই সিঙ্গণ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাস্থবীর কোবোদৈশী ৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ধর্ম্মভাবের লক্ষণ তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছিল। যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপুরুষ সাংসারিক ভোগ-বিলাস সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম মতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং চীনদেশের একটী বিখ্যাত বিহারে দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থাদির সঙ্গে "মহাবৈরোচনসূত্র" পাঠ শেষ করিয়া জাপানে আসিয়া সিঙ্গণ-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

সিঙ্গণ শব্দের অর্থ 'সত্য-জগৎ' (True World)। তৎকালীন জাপ-সম্রাট এই নবধর্ম্ম সমর্থন করার ফলে ইহা সাধারণে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্ম প্রচারে ভিক্ষু কোবোদৈশীর অসাধারণ যোগ্যতা ছিল, এতদ্ভিন্ন একাধারে ইনি পণ্ডিত, কবি, ভাস্কর ও চিত্রবিদ্যা বিশারদ বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাপানের ধর্ম্ম, সমাজ ও নৈতিক জীবন গঠনে এই অশেষ গুণালঙ্কৃত মহাপুরুষের অসাধারণ প্রভাব আজও বর্ত্তমান। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জগতের সকল মানবের সর্ব্ববিধ উপকার সাধন করাই এই মহাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল।

সন্ন্যাসী কোবোদৈশী সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল জাপানের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতঃ সিঙ্গণ মত প্রচার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "কয়াসনের মন্দির-সম্মিলনী" জাপানের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এক সময়ে জাপানের সহস্র সহস্র বৌদ্ধ মন্দির ও প্যাগোডা এই সম্মিলনীর অধীনে পরিচালিত হইত এবং দেশের প্রসিদ্ধ মহৎ লোক মাত্রই ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে যদিও কয়ার অমিত শক্তি এখন অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এই অনুষ্ঠানের প্রভাবে জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম আজিও

আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি,—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্চে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে,—কাষ কর্ম্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে!—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে, রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই প্রভু যাই।—* * * * এখন ধীর স্থির ভাবে নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে,প্রভুর ইচ্ছা রূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি। আহা, এ যে-কি আনন্দের অবস্থা তা তোমায় কি বলব। যা কিছু দেখছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বলে বোধ হচ্চে, কেন না, নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সমস্তের ভেতর বড় ছোট, ভাল মন্দ, হেয়-উপাদেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটা এখন কোথায় চলে গেছে! * * ওঁ তৎসৎ।" [মূল ইংরাজীর অনুবাদ]।

সতেজ, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সঞ্জীবিত রহিয়াছে। কয়ায় এখন ১১০টী মন্দির, একটী যাদুঘর, একটী বিরাট পুস্তকালয় এবং কয়েকটী স্কুল কলেজ যুক্ত একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক দেশপূজ্য উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বহু ভিক্ষু এখানে অবস্থান করেন।

একটী মনোরম পুষ্পোদ্যান কয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে আরও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতের শীর্ষদেশস্থ একটি নাতিদীর্ঘ হ্রদের অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন সহাস্য বদনে আগন্তুককে অভিনন্দিত করিতেছে। অপরূপ কারুকার্য্য মণ্ডিত বিরাট স্তম্ভরাজির উপর সুদৃশ্য মন্দির শ্রেণী। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে ভগবান শ্রীবুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ ভিক্ষুদের মর্ম্মর মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। পঁচিশজন বোধিসত্ত্বসহ শ্রীঅমিতাভের একটী বহুমূল্যবান তৈলচিত্র এখানে একটী প্রকাণ্ড হলের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; দর্শক মাত্রই এই চিত্রের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাতে শ্রীবুদ্ধের প্রেমধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য রকমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে প্রায় দেড় ক্রোশব্যাপী একটী সুসজ্জিত সমাধিস্থান; এখানে জাপানের সহস্র সহস্র বিখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সমাহিত দেহ প্রস্তর লিপি-স্মৃতি ধারণ করিয়া যুগযুগান্তর হইতে বিস্ময় বিমুগ্ধ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। একটী সুপ্রশস্ত রাস্তার শেষভাগে অবস্থিত মহাস্থবীর কোবোদৈশীর মর্ম্মর মণ্ডিত সমাধি স্থানে প্রায় রোজই শত শত জাপানী আসিয়া পুষ্পমাল্য এবং ধূপধুনা প্রদান করেন এবং স্তবস্তোত্র পাঠে এই স্থানটী মুখরিত করিয়া রাখেন। সিঙ্গণ মতাবলম্বীদের বিশ্বাস যে মহাত্মা কোবোদৈশী সম্বুদ্ধ হইয়া এইস্থানে অবস্থান করত জগতে ভাবী বুদ্ধের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

বৌদ্ধ জগৎ বিখ্যাত "মহাবৈরোচনসূত্র" সিঙ্গণ সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। এই মতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমপুরুষ (One Absolute Reality) 'মহাবিরোচন' নামে বর্ণিত। মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাতে 'ধর্ম্মকায়' বা বেদান্তোক্ত সংস্কার-শরীরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। সমষ্টি কারণ শরীরকে এই সম্প্রদায় জগতের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই কারণ শরীরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই বুদ্ধত্ব লাভ হয় বলিয়া এ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর ধর্ম্মকায়ের স্থূল অভিব্যক্তি এবং বর্ত্তমান দেহেই ধর্ম্মকায়ের স্বরূপ অবগত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ সম্ভব, ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত। সিঙ্গণ মতই শ্রীবুদ্ধের বিশ্বস্ত মৌখিক উপদেশ এবং পরিনির্ব্বাণ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। সিঙ্গণ সম্প্রদায় বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান ভিক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মূর্খ কৃষক পর্য্যন্ত অবিকল শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মজীবন নিজ নিজ কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়াও যাপন করিতে পারেন। ইদানীং জাপানে এই সিঙ্গণ ধর্ম্ম* পুনঃ মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতেছে।

সুন্দরানন্দ

* জনৈক জাপানী বৌদ্ধভিক্ষুর সৌজন্যে।

পুঁথি ও পত্র

১। **শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা**—সংস্কৃত অর্থ সহ অন্বয়, সরলার্থ ও বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীবলদেব প্রসাদ পাণ্ডেয়োপনামধেয় ব্রহ্মর্ষি সাকেতানন্দ পরমহংসদেব। মূল্য দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান, সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী, ১০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশক ইহার "বঙ্গীয় ভাষা" আখ্যা দিয়াছেন, তিনি বোধ হয় "ভাষা" শব্দের অর্থ জানেন না। যাহা হউক, ব্যাখ্যাগুলি খুব সরল ও সহজ। সাধারণতঃ যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ তাঁহারা অনেক সময় গীতা পড়িতে গিয়া দার্শনিক পরিভাষা এবং ঘনঘন শ্রুতি উদ্ধার দ্বারা বিব্রত হইয়া পড়েন, কিন্তু এই গ্রন্থে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। লেখক নিজের অনুভূতির সাহায্যে সরল ভাবে ব্যাখ্যাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, মাত্র মাঝে মাঝে দুই একটি সহজ সংস্কৃত শাস্ত্র এবং হিন্দী উপদেশাবলী আছে। পড়িয়া সকলে আনন্দ পাইবেন। প্রচ্ছদ-পট সুন্দর, কিন্তু কাগজ তত ভাল নয়।

২। **ঠাকুরের নামামৃত**—শ্রীযোগ বিনোদ আশ্রম, শিমূলতলা (মুঙ্গের)। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক গীত কয়েকটী এবং বীর ভক্ত কালীপদ, গিরীশচন্দ্র, দেবেন্দ্র নাথ প্রভৃতি বিরচিত বহুসংগীত সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত আশ্রম হইতে পুস্তিকা খানি বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

৩। **অনুশীলনী**—শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা। ঈশ্বর প্রীতি এবং দেশ-প্রীতি শিক্ষা দিবার জন্ত এরূপ সুন্দর শিশুশিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তক সাহায্যে শিশুরা অতি সহজে সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, সোণার বাংলা, বিবেকানন্দ, দুর্গাপূজা, শ্রীচৈতন্ত, দোল, রামমোহন, শিবরাত্রি, বঙ্কিমচন্দ্র, গঙ্গা, বিদ্যাসাগর, শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনাথ শিরোমণি, রাণীভবানী সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস এবং তথ্য অবগত হইবে ও শ্রদ্ধালাভ করিবে।

৪। **খাদ্য বিচার**—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংকলিত—প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য ভবন প্রেস, ২৬নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য এক আনা মাত্র। ইহাতে বৈশুব শাস্ত্রীয় খাদ্যাখাদ্য বিচার ও উহাদের গুণাগুণ এবং ঐ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

৫। **সনাতন ধর্ম্ম**—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান, ২৭নং বেনিয়াটোলা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট, কলিকাতা এবং অন্যান্ত প্রধান পুস্তকালয়ে। মূল্য দেড় টাকা। কাগজ ও প্রচ্ছদ পট অতি উত্তম। লেখক সত্যই হিন্দু ধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণে ব্যথিত হইয়াই এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানির ভিতর দিয়া আমরা হিন্দু ধর্ম্মের মূল বিষয় গুলির একটা সুস্পষ্ট ছবি প্রাপ্ত হই, যা ব্যক্তিগত হিসাবে আমাদের সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক বুদ্ধি, আয়াস ও অর্থ সাপেক্ষ হইয়া পড়িত। গ্রন্থের বিষয়গুলি, যথা ব্রহ্ম, বিশ্ব, কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি, বর্ণ, আশ্রম, সংস্কার, শ্রাদ্ধ, শৌচ, আচার, নারীধর্ম্ম প্রভৃতি পাঠ করিলে আমরা নাস্তিক্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি। সূচনাটি পড়িলে আমাদের বেদাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা বেশ সংক্ষিপ্ত ধারণা হয়। সোজা কথায় 'জন্মান্তর বাদ'

চমৎকার, কিন্তু পতঞ্জলী সাহায্যে আর একটু যুক্তি-পর করা উচিত ছিল। গুণ-কর্ম্মানুযায়ী সমাজ বিভাগ না হইলে, মাত্র বংশগত সমাজ বিভাগ বর্ণ-সংকরেরই তুল্য। আধুনিক সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধীয় অধ্যাপক মহাশয়ের মন্তব্যগুলি শ্রুতি কটু হইলেও সত্য। তবে বুদ্ধাদির জীবনী হইতে দেখা যায় সন্ন্যাসীরা চিরকালই নর ও নারীর উপদেষ্টা ও সেবক। সন্ন্যাসীর কামিনীর মুখ দর্শন করা উচিত নয়, কিন্তু তিনি জননীর সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন। যাঁহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আইন একটু কঠোর হওয়াই বিধেয়। বিবাহ সম্বন্ধে নরনারীর স্বাতন্ত্র্য, অভিভাবক তন্ত্র বা উভয়ের সামঞ্জস্য, ইহাদের কোনটি ঠিক একটু আলোচনা করা উচিত ছিল। নারীর ধর্ম্ম "অস্বাতন্ত্র্য" মনু বলিলেও বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদা, বিদ্বৎসভাচারিণী, শিষ্যগণ শিক্ষয়িত্রী, পতিপ্রাণা সাবিত্রীকুলের জীবনীও আলোচনীয়।

৬। **হোম শিখা**—শ্রীরঘুনাথ মাইতি, কাব্যতীর্থ, বৈষ্ণশাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০নং কলেজ স্কোয়ার। ত্যাগের হোম শিখায় আহুতি দিবার জন্য কয়েকটী মন্ত্র ছন্দে রূপায়িত হয়েচে। চিরকালই আমাদের সাহিত্যে এ চিরন্তনীর হয়ে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী পত্র

"বাইবেল ও ভারতবর্ষ" নামক পুস্তকের বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা শ্রীমতী এম্ চোভিন্ শতবার্ষিকীর একজন সভ্য হইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—

"আগত শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"—এম্ চোভিন,

রোমাঁ রোলাঁর বন্ধু এবং প্যারিসের বিখ্যাত সংবাদিক এম্ ফ্রানসিস্ এফ্ রাউয়ানেট্ শতবার্ষিকীর সভ্য পদ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সমিতিতে প্রবেশ করিতে আমি নিজেকে বিশেষ সম্মানিত অনুভব করিতেছি। রোমাঁ রোলাঁকে ধন্যবাদ, কারণ তাঁহারই সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবেশ-পথে আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম আলোকরূপে প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার মহৎ শিষ্যগণের সহিত আমার নামের সংযোগ দেখিলে আমি খুব গর্ব্বানুভব করিব। উহা আমার যোগ্যতার পক্ষে খুব অধিক মনে করি। আগামী বর্ষে আপনারা যে তাঁর স্বর্গীয় বাণী প্রচার করিবেন, তাহার দ্বারা আমি আরও অধিক উপকৃত হইব আশা করি।"

এফ্ রাউয়ানেট্

সংঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য বিবরণী

(১৯৩৪ সন)

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৩৪ সনের সেবাকার্য্যের বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিহারে ভূমিকম্প, আসামে জলপ্লাবন, মালীগ্রামে (মেদিনীপুর) বিসূচিকা এবং শিয়ালী (তাঞ্জোর) তালুকে ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আক্রান্ত দেশবাসীর সেবা করিয়াছেন।

বিহার প্রদেশে ভূমিকম্পের পরেই আলোচ্য বর্ষে জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মিশনের কর্ম্মীরা মজঃফরপুর, সীতামারী, মতিহারী, পাটনা, মুঙ্গের ও জামালপুর প্রভৃতি ১৩টি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৮টি সহরের সমগ্র অংশ এবং হুব

সংখ্যক গ্রামে কৃতিত্বের সহিত সেবাকার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ১২৫৮১ জন দুস্থ ব্যক্তিকে ২৯৭৮/ মণ চাউল ২০২/ মণ অন্যান্য খাদ্য, ১০৮৯৮খানি নূতন বস্ত্র, ১২৬৭৭খানি পুরাণ কাপড় ও জামাদি ১৭১৩খানি লোমের কম্বল, ৭৭০৬ খানি সুতার কম্বল, ১০০টি ছড়ি, ২৫২০০ গজ চট, ৫৪টি ত্রিপল, ৪১টি মশারী, ৫০৩১ খানি বাসন, ৯৩৮টি চুপড়ি ও ১২৪টি লণ্ঠন দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অস্থায়ী কুটির ১৯৩৩টি, কতকটা স্থায়ী কুটির ১১০৪টি, ৯৪৪টি গৃহ নির্ম্মাণের আসবাব বা উহার জন্য অর্থ অথবা উভয় এবং ৩২৪টি টীনের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং ১৯৩টি গৃহ মেরামত এবং ২২২টি কূপ পরিষ্কার বা খনন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে মোট দান পাওয়া গিয়াছে ১১৬৮২৮৮৴১ পাই এবং মোট খরচ ১১৪০২৮।৴৩ পাই।

আলোচ্য বর্ষে জুন মাসে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তি পাহাড়ে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া শ্রীহট্ট, নওগাঁ ও কামরূপ প্রভৃতি জেলা বন্যার জলে প্লাবিত হইয়া কোন কোন স্থানে ১৫ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত জল জমিয়া যায়। ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। এ জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকার্য্য করিবার নিমিত্ত নওগাঁ জিলার ফুলগুড়ি এবং ধারামটুল এবং শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দৌলতপুর ও সুজাতপুর নামক স্থানে সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা হইতে ৭টি সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়। ইহার বিবরণ পৃথক বাহির হইবে। নওগাঁ কেন্দ্র হইতে ৪২৫৩ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১৭৭৭ মণ চাউল, ২৮৫৪ খানি নূতন ও ৬৫৯ খানি পুরাণ কাপড় এবং হবিগঞ্জ কেন্দ্র হইতে ৮৬৬ জনকে ২৫৪/মণ চাউল, ২৯২ খানি নূতন ও ৭২২ খানি পুরান কাপড় এবং বহু সংখ্যক লোককে ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৫৬টি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এ জন্য মোট খরচ হইয়াছে ১১২৪৪।৶৩ পাই এবং মোট দান পাওয়া গিয়াছে ৫৮৩৪৵৬ পাই, বাকী মিশনের স্থায়ী রিলিফ ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জুলাই মাসে মালীগ্রামে (মেদিনীপুর) হঠাৎ বিসূচিকা রোগ ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে। এ জন্য নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মিশন হইতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও কয়েকজন কর্ম্মী প্রেরিত হন। তাঁহারা ২৪শে জুলাই হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক রোগাক্রান্ত বাড়ী ও পুকুর বিশোধিত করেন। এই স্থানে ৪৮টি রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়, তন্মধ্যে ৪০টি আরোগ্য লাভ করে। এ উপলক্ষে ৬১॥৵০ খরচ মিশনের স্থায়ী রিলিফ ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে।

ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে শিয়ালী (তাঞ্জোর) তালুকের ৭৭৩০টী ঘর ভূমিসাৎ হইয়া ১০৯ জন লোক ও ৩৬৫০টী গোমহিষাদি মারা যায়। এজন্য আলোচ্য বর্ষের ১৮ই জানুয়ারী হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত এখানে মিশনের কর্ম্মীরা ইদামনল ও তীরুমুল্লই-ভাসাল নামক স্থানে দুইটি সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ২১টী গ্রামের ১৬৪৭টি কুটির, ২২টি স্কুল, মন্দির ও গির্জ্জা পুনঃ নির্ম্মাণ করেন এবং ৬০৫৪ (মাদ্রাজী) মেসার চাউল বিতরণ করেন। এ জন্য মোট খরচ হইয়াছে ৬২২১৴০ আনা এবং মোট দান পাওয়া গিয়াছে ১৪৫৫৮৶৯ পাই মিশনের স্থায়ী রিলিফ ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে ৪৭৬৫৴৩ পাই।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া ভিজাগাপটম্ সহরে এক জনসভায় অধ্যাপক সার এস্ রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে 'সমন্বয়' এবং মহারাজ কলেজে "আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুইটি

সুচিন্তিত বক্তৃতা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহরমপুর, ভিজিয়ানাগ্রাম, কোকনদ, রাজামুণ্ড্রী, ইলোর এবং গণ্টুর প্রভৃতি সহরে "বর্ত্তমান ধর্ম্ম সমস্যা", "হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ", "হিন্দুর ধর্ম্ম", "শিক্ষা", "শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা", "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ" প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে পনরটি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন।

৩। **বিবেকানন্দ সোসাইটীর** উদ্যোগে স্বামী বাসুদেবানন্দ পোর্টকমিশনারের জেটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ছায়াচিত্রে "হিন্দুধর্ম্মের মহাপুরুষগণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ" এবং থিয়সফিক্যাল হলে, "প্রয়োগিক্ বেদান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪। বিগত ২৭শে জুন বেলুড় মঠে স্বামী শিবেশ্বরানন্দ (ব্রহ্মদাস) শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ হইয়াছিল। তাঁহার দশ বৎসর সাধু জীবনের মধ্যে তিনি সহস্র সহস্র রোগী নারায়ণের সেবা করিয়াছেন।

৫। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামী আত্মানন্দ ঢাকায় যান। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করেন।

৬। বিগত ২৫শে মে স্বামী অশোকানন্দ সানফ্রান্‌সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটী অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন।

৭। **সান্‌ফ্র্যান্‌সিস্কো বেদান্ত সোসাইটী (আমেরিকা)**—

সান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ মহারাজের ভারতে আগমনের জন্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে তথাকার বেদান্ত সোসাইটীর উদ্যোগ নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে—

(১) পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা, (২) স্বিরীকৃত আদর্শ (৩) বিশ্বধর্ম্ম, (৪) মায়া-রহস্য, (৫) ভক্তিযোগ, (৬) বেদান্তোক্ত মুক্তি, (৭) আত্মার স্বাধীনতা, (৮) বহুজন কল্যাণ, (৯) ধর্ম্মের অভিব্যক্তি, (১০) মদীয় আচার্য্যদেব, (১১) বিশ্ব ও বিরাট, (১২) ধর্ম্মে প্রতীক, (১৩) শ্রেষ্ঠ কর্ত্তা, (১৪) মানুষের সত্য স্বরূপ, (১৫) আত্মার অমরত্ব, (১৬) আত্মার জাগরণ, (১৭) কর্ম্মযোগ।

৮। **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, (বিহার)**—আমরা দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৩৪ সালের কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী উত্তরোত্তর সব দিক দিয়াই বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯২২ সনে এই বিদ্যালয়টি মাত্র ১২ জন বিদ্যার্থী লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতার ফলে প্রতি বৎসরই ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে হইতে আলোচ্য বর্ষে ১১০ জনে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রগণ সকলেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত বাঙ্গালী। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত এখানে পড়ান হয়। আলোচ্য সনে ৬ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রটির বিশেষত্ব—এখানকার শিক্ষকগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী। ব্রহ্মচর্য্য ভিত্তিতে হস্ত, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমানভাবে সম্যক বিকাশ সাধন করিয়া বিদ্যার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করাই এই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানে নানা প্রকার আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠের সাধারণ ফণ্ডে আয় ৩৩২৪৩৩৭ পাই এবং ব্যয় ২২২০২।৶৬ পাই; গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে আয় ১২৩৩৫৶২ পাই এবং ব্যয় ১১৮৩৮৷৶৩ পাই।

বর্ত্তমান বৎসরে এই বিদ্যাপীঠের ৮ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিল এবং তাহারা সকলেই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে।

৯। **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বালিয়াটি (ঢাকা)**—

গত ১৯শে মে, রবিবার, বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বদিন পাঁচটী দলে বিভক্ত হইয়া সহস্রাধিক লোক নগর কীর্ত্তন করিয়া গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রাতে যথা নিয়মে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি হইলে দুই হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয় এবং অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটী জন সভায় আশ্রমের অবৈতনিক বিদ্যাগারের ছাত্র ও ছাত্রিগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিলে নারায়ণ গঞ্জ মঠের স্বামী করুণানন্দ, ঢাকা মঠের স্বামী সাধনানন্দ ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারী অমূল্য প্রভৃতি সময়োপযোগী বক্তৃতা দানে সকলকে মুগ্ধ করেন। বেলুড় মঠের স্বামী গোপালানন্দ মহারাজ এই উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১০। **বেকার-বান্ধব সমিতি, হাট খোলা, কলিকাতা**—আমরা হাটখোলাস্থিত বেকারবান্ধব সমিতির ১৩৪১ সনের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য কুটির শিল্পের বিস্তার দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার প্রতিকার চেষ্টা। এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানে বেকারদিগকে সাবান, কালী, স্নো, আলতা ও সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। এই সঙ্গে একটী বিদ্যার্থী ভবন ও লাইব্রেরী আছে। দেশের কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ক উন্নতি বিধানও এই সমিতির উদ্দেশ্য। অনেক বেকার যুবক এখানে শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে। আমরা এই সমিতির পরিচালক কর্ম্মিগণের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করি এবং আশা করি,—দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটী আরও উন্নতি লাভ করিবে। এই সমিতির পরিচালকগণ যদি এমন দুই একটী শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহা শিক্ষা করিয়া বঙ্গীয় বেকার যুবকগণ যথার্থই জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। আলোচ্যবর্ষে সমিতির শিল্পবিভাগে লাভ ২২৮৷৶ আনা এবং সমিতির মোট আয় ৫৫০৲১০ ও ব্যয় ৫০৫৷৫ আনা।

১১। **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তমলুক, (মেদিনীপুর)**—আমরা এই আশ্রমের ১৯৩৪ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আশ্রমটী ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের হস্পিটালে ৬টী রোগীর সিট্ আছে এবং আলোচ্যবর্ষে ৫৮ জন ইন্ডোর রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। আউট্ডোর ডিস্পেন্সারী হইতে ৪৪২০ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় আশ্রম কর্ম্মিগণ ২১৩ জন দুঃস্থ রোগীর সেবাশুশ্রূষা এবং ৯৮টি বাড়ী ও ৪৭টী পুষ্করিণী বিশোধিত করিয়াছেন। আশ্রম হইতে ৬০টী দরিদ্র পরিবারকে কম্বল, বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে এবং স্থায়িভাবে ১৪টী দরিদ্র ছাত্র আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়াছে। আশ্রম লাইব্রেরীতে ৭৩৬০ খানি পুস্তক আছে। আশ্রম পরিচালিত অবৈতনিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে বর্ত্তমানে ৪০ জন দরিদ্র ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। আশ্রমের মঠ বিভাগের জন্য তিন হাজার ও রিলিফ্ কার্য্যের জন্য তিন হাজার টাকার দুইটী স্থায়ী ফণ্ড আছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের মঠ মিশন উভয় বিভাগে মোট আয় ৮৫৮১৸/১০ ও ব্যয় ১৯২১৷০ আনা।

১২। **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, সোনারগাঁ (ঢাকা)**—সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের শততিতম জন্মোৎসব গত ৪ই জ্যৈষ্ঠ বিশেষ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন প্রাতে মঠ হইতে একটী বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং অপরাহ্ণে মহামোহপাধ্যায় রেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থ কঠোপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের দিন যথানিয়মে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম ও ভোগাদি অন্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন এম্, এ, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

১৩। **শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটী, রেঙ্গুন** (ব্রহ্মদেশ)—গত ১৯শে মে রবিবার রেঙ্গুণের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটীর উদ্যোগে স্থানীয় বেঙ্গল একাডেমী হলে ভগবান শ্রীবুদ্ধের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; এই উপলক্ষে ভগবান শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তি পত্রপুষ্প দ্বারা সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে মিঃ ইউ, থিন্ মাউং এম্ এ, এল, এল-বি, বার-য়্যাট-ল, এম্-এল-সি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশনে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ইংরাজ বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রজ্ঞানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ মজুমদার মহাশয় ভগবান শ্রীবুদ্ধ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের উপস্থিতিতে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। কুমারী পদ্মাবতী গান্ধী কর্ত্তৃক একটী সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৪। **শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কার্য্যালয়**—এ্যালবার্ট হল, ১৫নং কলেজ-স্কোয়ার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ফোটো যুক্ত এক আনা মূল্যের কুপন বিক্রয় হইতেছে। ইহা ক্রয় করিয়া অতি দরিদ্রেরাও এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবেন।

ডাঃ রবীন্দ্র নাথ, রোমাঁ রোলাঁ, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, মিঃ জয়াকার, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতির স্বাক্ষর যুক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সভ্য হইবার ও অর্থ সাহায্যের জন্য যে আবেদন বাহির হইয়াছিল, তাহার ফলে নিউ ইয়র্কের নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ সভ্য হইয়াছেন—

শ্রীমতী এ্যালিস্, বি, আরমষ্ট্রং, কার্ল নোরবাই, সিসিল হাউটম্যান, কৃশ্চ্যানায়া রোড, ডোনাল ডেভিড্ সন্, ডবোথি ক্রুগার, এলিজাবেথ ক্লিন্-গ্রিজ, গাস্টভ্ রোড, হেলেন ষ্ট্রোবেল, ইডা ই ডুন। জে আর লিলেই, জেন্ ওয়েলস্, জিন পোষ্ট, হারাই গোষ্ট্রাইংভার, উইলিয়াম্ আর সেফার্ড।

শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড, ডেভিড্ সন্, জন্ মোফিট, মরিস্ কোহল, মাইকেল রুবিন, ম্যাক্সো প্লানসো, ষ্ট্যানবারি হ্যাগার, উলফ্রেম্ এইচ্ কোচ।

ভারতীয় মহিলা বিভাগের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন নদীয়ার মহামান্যা মহারাণী এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন শ্রীমতী তটিনী দাস এবং অনুরূপা দেবী। সেক্রেটারী হইয়াছেন ভগ্নি চারুশীলা দেবী এবং শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর প্রাপ্তি স্বীকার

(মে মাস হইতে, প্রধান কার্য্যালয় বেলুড় মঠে প্রাপ্ত)

অধ্যাপক শিশিরকুমার প্রধান, কলিকাতা ৫৲। স্বামী সৌম্যানন্দ, শ্রীহট্ট ৫৲। শ্রীযুত ক্ষেত্র পাল ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসন্ন শূর, ভট্ট, পূর্ণিয়া ৬৲। অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী, মোজাফরপুর ৫৲। শ্রীযুত এম্, এন্, চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত জিতেন্দ্র দত্ত, এম্-এ, হাওড়া ৫৲। শ্রীযুত বিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী, কলিকাতা ৫৲। মিঃ এন, পি, কে, সরকার, হাওড়া ৫৲। শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ গুঁইন, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মন্মথনাথ দত্ত, কাশী ৫৲। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র

দে, কাশী ৫৲। শ্রীযুত শশধর শেঠ, আসানসোল ৫৲। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, জামতাড়া ৫৲। শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা দেবী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত কৃষ্ণনারায়ণ মজুমদার, ঢাকা ৫৲। স্বামী বিশ্বানন্দ, বোম্বাই ৫৲। শ্রীযুত পতিতপাবন ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১৲। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, বেলুড় মঠ ২৲। শ্রীযুত কাশীপতি গাঙ্গুলী, কলিকাতা ৫৲। ডাঃ সুবোধগোবিন্দ চৌধুরী, ডি, এস্ সি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত কে, ভোয়াই স্বামী, মাদ্রাজ ৫৲। শ্রীযুত সিতাংশুশেখর বসু, কলিকাতা ৫৲। ডাঃ জে, মুখার্জ্জি, এম্, বি, রাঁচি ৫৲। শ্রীযুত শৈলপতি চাটার্জ্জি, কলিকাতা ১০০৲। শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল পাকড়াশী, পাবনা ৫৲। শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ধর, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত ক্ষিতিশচন্দ্র গাঙ্গুলী, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত এস্, আর্, সিংহ, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, নৈহাটী ১৲। ইনভেন্স সিণ্ডিকেট, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত অরুণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ; কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, দিল্লী ৫৲। শ্রীযুত হেমচন্দ্র কোণার, ভট্ট, পূর্ণিয়া ৬৲। জনৈক ইংরাজবন্ধু, কলিকাতা ৫৲। অধ্যাপক এইচ্, ডি, ভট্টাচার্য্য, ঢাকা ৫৲। মিঃ টি ওয়ালোনিলাই, সিংহল ১০৲ ডাঃ জে, সি, ঘোষ, ঢাকা ৫৲। শ্রীযুত বি, এন্, সরকার, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত বিদ্যাসরায় জিনোরিয়া কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত হীরালাল বাকটুয়া, কলিকাতা ১১৲। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীহট্ট ৫৲। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এলাহাবাদ ৫৲। শ্রীযুত নিত্যগোপাল চাটার্জ্জি, আসানসোল ৫৲। শ্রীযুত এম্, মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীমতী অণিমা দেবী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীমতী সুনীতি দেবী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার নাগ, কলিকাতা ৫৲। অধ্যাপক মাখনলাল চক্রবর্ত্তী, পাবনা ৫৲। শ্রীযুত রামচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত নরদেব চাটার্জ্জি, শ্রীরামপুর ১৲। শ্রীযুত কুঞ্জলাল বসু, কলিকাতা ৫৲। ডাঃ বি, এন্ ঘোষ, ডি-এস্-সি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল দে, আগ্রা, ৫৲। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এন্, কে, মজুমদার, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত জে, এম্, দত্ত, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এস্, আর, চাকি, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গুহ, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত হীরেন্দ্রকুমার সেন, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত ভোলানাথ ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১৲। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জনৈক কর্ম্মচারী, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত বীরেন্দ্রমোহন চাটার্জ্জি, কলিকাতা ২৲। শ্রীযুত পি, সি, দত্ত, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত ললিতমোহন রায়, কলিকাতা ২৲। ডাঃ পি, গোবিন্দ্ রাজুলুটি, বহরমপুর ৫৲। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ পাত্র, কৃষ্ণনগর ৫৲। শ্রীযুত আশুতোষ দাস, দিনাজপুর ৫৲। রায় নিবারণচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, আসানসোল ৫৲। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, পুরী ৫৲। পণ্ডিত অনুকূল মিশ্র, কটক ৫৲। শ্রীযুত এস্, সি, ঘোষ, ১৲। শ্রীযুত হীরালাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা ১৲। ফেব্রুয়ারী মাসের খুচরা সংগ্রহ ৫৸০। মিঃ এ, এস্ মোগোজ, কলিকাতা ২৫৲। মিঃ এস্, সি, সত্যবাদী, কলিকাতা ৫৲। মিঃ এস্, এন্ শেঠী, কলিকাতা ৫৲। মিঃ এম্, এন্, মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। (দ্বিতীয় দফা) শ্রীযুত গোপেশ্বর মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রমোহন

বল, চট্টগ্রাম ৫৲। শ্রীযুক্ত মহাদেব মুখার্জ্জি, পাটনা ৫৲। শ্রীযুত বটকৃষ্ণ চাটার্জ্জি, দিনাজপুর ৫৲। শ্রীযুত এস্, এম্, দাসগুপ্ত, খড়্গপুর ১৲। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এ, আর্, মজুমদার, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মন্মথনাথ সাহা, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত বসন্তকুমার সাহা, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত মুকুন্দবিহারী সাহা, রামপুরহাট ৫৲। শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র দাসগুপ্ত, বোম্বাই ৫৲। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বসু, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র, মহীশূর ৫৲। রায় ননীলাল পান বাহাদুর, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত এস্, পি, পোদ্দার, কলিকাতা ৫১৲ রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত বি চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ১৲। ডাঃ সুকুমার সরকার, ডি-এস্ সি-কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত রামকুমার দাস, হেতমপুর ৩৲। অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, রংপুর ৫৲। স্বামী নির্ভরানন্দ, কাশী ৫৲। শ্রীযুত বিধুভূষণ পাল, হাওড়া ৫৲। শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত জগন্নাথ মিশ্র, পুরী ৫৲। শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, কলিকাতা ২৫৲। শ্রীযুত বিভূতিভূষণ সিংহ, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত পান্নালাল সাগরমল, কলিকাতা ৫১৲। শ্রীযুক্ত এস্, সি, দাসগুপ্ত, কলিকাতা ৫৲। শ্রীমতী প্রীতিলতা দাসগুপ্তা, কলিকাতা ৫৲। মিঃ ই, রাজারাম রাও, কলিকাতা ৫৲। মিঃ আর, পি, পোদ্দার, কলিকাতা ১০৲। শ্রীযুত ললিত মোহন চাটার্জ্জি, চন্দননগর ৫৲। ডাঃ পি, বি, দত্ত, চট্টগ্রাম ৫৲। শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, পাটনা ৫৲। শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন ব্যানার্জ্জি, বাঁকুড়া ৫৲। শ্রীযুত কে, ডি, জগতপ, অমরাবতী ৫৲। শ্রীযুত উপেন্দ্র মুখার্জ্জি, মাজদিয়া, নদীয়া ৫৲। শ্রীযুত সরসীকুমার ঘোষ, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত লালবিহারী ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর নায়ক, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত দাসরথি ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ২৲। শ্রীযুত ক্ষিতিশচন্দ্র হালদার, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত সীতেশরঞ্জন দাসগুপ্ত, নয়াদিল্লী ৫৲। শ্রীযুত সত্যবান্ মণ্ডল, রামপুরহাট, ৫৲। শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ১৲। শ্রীযুত আশুতোষ মহাপাত্র, হাওড়া ৫৲। শ্রীযুত ডি, এম্ ডাহানুকার, বোম্বাই ২৫৲। ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, কলিকাতা ৫৲। ডাঃ কে, পি, কুণ্ডু, কলিকাতা ৫৲। মিঃ এফ্ বেকার, কলিকাতা ১০৲। অধ্যাপক কে, এস্, কৃষ্ণন্, ডি-এস্ সি, কলিকাতা ৫৲। শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা ১৲। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীদুর্গা

আশ্বিন,—১৩৪২

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

"অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তান-সকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদন বিরহিত, রোগে জর্জ্জরিত, তোমার সন্তান-সকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাত পীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞান-সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চেষ্ট আছ! উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দেশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে—আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ সুখ লইয়া বসিয়া আছ! জগন্মাতা

তোমায় দিবেন কেন? * * ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

"শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্॥
মুক্তকেশীং লোলজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥"

প্রতি কার্য্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন! তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন! দেখিবে, জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি—আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্য্যে তোমার সহায়তা করিবেন।

* * অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম, যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়া ব্যক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর, কতভাবে, কতরূপে, কতই না হইল ও হইতেছে। ইহাই কি শাস্ত্র কথিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব? কোনও কালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোনও কালে কি জগৎ, সত্য, ন্যায় এবং জ্ঞানকে সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য করিবে?—যাঁহার জগৎ, তিনিই বলিতে পারেন! কিন্তু হে ভীরু! এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। হইয়াই বা করিবে কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ ঐ সংগ্রাম। আত্মহিত চাও, উহা করিতে হইবে; পরহিত চাও, উহাই; নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহা না করিলে যথার্থ বিশ্রাম লাভ হইবে না। তবে উঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন।"

—স্বামী সারদানন্দ

শারদীয়া-আগমনী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ভারতে বোধন বাজিল রে ঐ
জাগো জাগো সবে জাগো,
ভকতি কুসুমে অঞ্জলি দিয়া
মায়ের আশীষ মাগো।
ভাঙ্গিয়া মোহের জীর্ণ কপাট
কররে নমিত উচ্চ ললাট,
বল প্রাণ খুলে জয় দশভুজা
সন্তানে পায়ে রাখো।

বলরে মানব এস মহামায়া
এস বরাভয়করা,
দনুজদলনী সিংহবাহিনী---
এস দুর্গতিহরা।
জননী মোদের নহে মৃন্ময়ী
হিমালয়সুতা দেবী চিন্ময়ী,
তাই কৃপা করে আসেন শিবানী—
ধন্য করিতে ধরা।

শারদ স্বচ্ছ নীলাকাশ আজ
তারার মেখলাপরি—
সপ্ত সুরের ঝঙ্কারে গাহে
আগমনী প্রাণ ভরি।
আজি দশদিক উজল করিয়া
কনক কিরণে ভুবন ভরিয়া
আসিবে জননী ঋদ্ধিদায়িনী
দুর্গা মূরতি ধরি।

গাও শুক সারি পিক ও পাপিয়া
বোবনে ধরিয়া তান,
কুলুকুলুনাদে গাহবে তটিনী
মা'র আগমনী গান।
দশভুজা নহে কবি কল্পনা
স্বপনে রচিত মায়া আল্পনা
জননী মোদের চির জাগ্রতা
নিখিল জীবের প্রাণ॥

বনে উপবনে ফুটে উঠ ফুল
সাজাবে অরণ ডালা,
কাশ কুসুমের আলিপনা দাও—
পল্লবে গাঁথি মালা।
শস্য শ্যামলা ধানের ক্ষেতে
চাহবে কৃষক দুই কর পেতে,
বল সকাতরে দাও মা অন্ন
ঘুচায়ে জঠর জ্বালা।

মা এসেছে আজ, এস এস সবে,
ভাই বোনের হাত ধরি,
এস উন্নত—এস অবনত
ভেদাভেদ দূর করি।
এক সুরে আজি ত্রিভুবনময়—
গাহবে মানব জননীর জয়;
শান্তিদায়িনী এসেছে জননী—
দশভুজা রূপ ধরি।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ

প্রশ্ন। জপ কর্‌তে কর্‌তে সব ভুল হয়ে যায় ওটা কি?

শ্রীশ্রীমহারাজ। পতঞ্জলি বলেছেন ওটা বিঘ্ন। ধ্যান মানে তাঁকে ভাবা। উহা পার্‌লে, প্রত্যক্ষ হলে সমাধি। সমাধির পর আনন্দের জের অনেকক্ষণ থাকে। কেউ কেউ বলে চিরকাল থাকে। শুনেছ সুন্দরবনের সমাধিস্থ সাধুকে এনে, তার জিভ টেনে বার করে সমাধি ভাঙ্গালে, খেতে দিলে পরে পেটের অসুখে মর্‌ল। হঠযোগে মন স্থির হয়, আর খাওয়া দাওয়ার ঝঞ্ঝাট থাকে না। চৈতন্যদেব একজন শিষ্যকে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠালেন। তিনি বিলাসী, কিন্তু নামে যেন ভেতর থেকে ফোয়ারা উঠ্‌ল। কথায় বলে, সাধু না হলে, সাধু চিন্‌তে পারে না—যেমন হীরের দাম বেগুনওয়ালা জানে না। একজন সাধন করে উচ্চ অবস্থা পেলে সে নিজে নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারে। ধ্যানের সময় ভাব্‌বে, এ সব বাসনাদি কিছু নয়, অসৎ। ক্রমে impression (ধারণা) হবে। ওগুলি যেমন তাড়াবে অমনি ভাল ভাব ঢুক্‌বে। ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে জ্যোতিঃদর্শন, শব্দ টব্দ শুনলে বুঝ্‌বে ঠিক যাচ্ছি। কিন্তু এ ও কিছু নয়। তবে ও সব লক্ষণ ভাল। নীরব স্থানে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে হয়ত প্রণবধ্বনি, বা ঘণ্টাধ্বনি, বা দূরের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানের পর যে "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী" বলেছিলেন তা লোকশিক্ষার জন্য, বুঝ্‌বে যে সব উপায়েই ভগবান লাভ হয়। একটা লোক খুব ডানপিটে, মৃত্যুর পনর মিনিট আগে বল্‌ছে "চল চল, গঙ্গায় নিয়ে চল। তোরা বুঝি ভেবেছিস্‌ আমি এখানে মর্‌ব।" গঙ্গায় গিয়ে একটু হাস্‌লে ও বল্‌লে "মা তুই ছিলি বলে এত পাপ করেছি। জানি তুই সব ধুয়ে পুঁছে ফেল্‌বি।" ভক্তি, বিশ্বাস এর একটা থাক্‌লেই ভগবান লাভ হয়।

শ—বাবুদের ঘরে হ—বাবু ও দি—বাবু বসিয়াছিলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীমহারাজ আসিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়াই দি—বাবুকে বলিলেন "কেমন আছেন?"

দি—বাবু। মন্দ নয় একরকম চলে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীমহারাজ। মন কেমন বলুন?

দি—বাবু। আজকাল মন্দ নয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ। বেশ বেশ তা হলেই হল। মন ভাল থাকলেই হল। তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মনটা ফেলে রাখ্‌বেন। সংসার ছেড়ে দিন, সংসারে মন দিবেন না। এ অতি জঘন্য স্থান। তবে যেটুকু না কর্‌লে নয় সেটুকু কর্‌বেন। মনটা তাতে ফেলে রাখ্‌বেন। আপনি একটু খাটুন, আপনার ভেতরে আছে। একটু খাটলেই হয়ে যাবে। Struggle, Struggle, you must have to struggle hard (যুদ্ধ করুন, যুদ্ধ করুন, কঠিন সংগ্রাম করতেই হবে)। লেগে যান, খাটুন; খাট্‌লে দেখ্‌তে পাবেন কি আনন্দ, এতে কি মজা। খাটুন খাটুন এই মায়া অতিক্রম করতে হবে। এই জীবনেই এর পারে যেতে হবে। খুব খাটুন, এই মহামায়া অতিক্রম করা কি সহজ? খুব পরিশ্রম করুন। আপনি যদি তার একটুও লাভ করতে পারেন that will

be sufficient for you (তাহাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হবে)। খুব বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাস না হলে হবে না। দৃঢ় বিশ্বাস করুন, একটু সন্দেহের লেশ পর্য্যন্ত থাকবে না—তা হলে হবে। বিশ্বাস না হলে কিছুই হবে না। জোর করে বিশ্বাস কর্‌বেন।

প্রশ্ন। মাঝে মাঝে যদি অবিশ্বাস আসে?

শ্রীশ্রীমহারাজ। কি জানেন, ঠিক পাকা বিশ্বাস যেটা, সেটা realisation (ঈশ্বর প্রত্যক্ষানুভব) না হলে হয় না। যদি একবার ঈশ্বর দর্শন হয়—একবার যদি অনুভূতি হয়, তবে ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্ব্বে বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর করে বিশ্বাস আনতে হয়। বারে বারে একরকম কর্‌তে কর্‌তে তবে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস কর্‌তে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে তখন ভাব্‌তে হয় ভগবান সত্য, তবে আমার অদৃষ্টে নেই, তাই হয়নি, যখন তাঁর কৃপা হবে, তখন হবে, এ মন কি তাঁর ধারণাও করতে পারে? তিনি এই মন বুদ্ধির অনেক দূরে। এই সব সৃষ্টিটা দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এ সব হল মনের রাজত্ব, এর কর্ত্তা হলেন উনি, এই সবই ঐ মনের সৃষ্টি। এর উপরে ওর যাবার যো নেই। তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে আর একটি মন জন্মায়। সে এখনও আছে। ক্ষুদ্র germ (বীজরূপে) যতদিন যায় তত সেই germ develop (বীজ নিজেকে বর্দ্ধিত) করে। এই মন নিয়ে গিয়ে সেইখানে পৌঁছে দেয়। পরে সেই নূতন মন আপনাকে নিয়ে থাকে। তখন সব নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও final (শেষ) নয়। তিনিও পরমাত্মার কাছ-পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন না। তবে অনেকদূর—অনেকদূর উপরে নিয়ে যায় ও নানারকম অনুভূতি হয়। তখন এই সব বাহিরের জগৎ আর ঐ সব—কিছু ভাল লাগে না। কেবল সেই ভাবে বুঁদ হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। তারপরে সমাধি হয়। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। সে অস্তি নাস্তির পার। সেখানে সুখ নাই, দুঃখ নাই, আনন্দ নাই, নিরানন্দ নাই—আলো নাই, অন্ধকার নাই, কি যে আছে তা মুখে বলা যায় না। ত্রিগুণাতীত হতে হবে। গীতায় আছে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"। বেদে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের কথা আছে, কিন্তু তুমি এই তিনগুণের পারে যাও। তমঃ গুণের লক্ষণ হচ্ছে, এই সব মারামারি, কাটাকাটি, দ্বেষ হিংসা অভিমান অহঙ্কার। রজঃ গুণে খানিকটা ধর্ম্ম আছে। কিন্তু নাম যশ এই সব হচ্ছে রজের লক্ষণ। কি রকম জানেন—একজন বসে খানিকক্ষণ ধ্যান করলে, তারপর উঠে চারিদিক দেখে—"এই আধঘণ্টা ধ্যান করলুম কেউ দেখ্‌লে কিনা।" তারপর সত্ত্বগুণ, বেদে এই তিন গুণের কথা আছে। তার ওপারের কথা নাই। বেদের ত পারে যেতে হবে।

একটু থেমে মহারাজ বল্লেন—"তাহলে আমি একটু তামাক খাই কি বলেন?" বলে তামাকে দু একটা টান দিয়ে বল্‌ছেন "দেখুন যদি ইচ্ছে করেন তাহলে দু একটা প্রশ্ন কর্‌তে পারেন, জানা থাকলে বল্‌ব। আর না জানা থাকলে বল্‌ব না।"

প্রশ্ন—এই সংসারে কতকগুলো কায মনে হয় আমাদের কর্ত্তব্য, সেগুলো কি ভাবে করা যায়?

শ্রীশ্রীমহারাজ—আপনি যদি এই ভাবে কর্‌তে পারেন যে এটা ভগবানের সংসার, আমার নয়, তাঁর কায আমায় দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন মাত্র, এ আমার কিছুই নয়—তা হলে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। সংসারে কোনটাই আমার, এ বোধ রাখ্‌বেন না। সবটাই তাঁর, আমিও তাঁর। আমায়

যতদিন তাঁর ইচ্ছা এখানে রেখেছেন। আবার যখন খুসি সরিয়ে দেবেন। সংসারের কায কর্ম্ম কর্‌বার সময় খুব মন দিয়ে কর্‌বেন। কেউ কিছু না বুঝ্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মনে মনে ঠিক থাক্‌বে এসব কিছুই আমার নয়। কোনটার উপরে কোন রকম আসক্তি থাক্‌বে না—থাক্‌লেও ভাল, না থাক্‌লেও ভাল, যা খুসি হোক, আমি আমার কায করে যাচ্ছি। মনে সব সময়ই ঠিক আছে তিনি সব কর্‌ছেন, আমি কিছুই নই।

প্রশ্ন—আচ্ছা এ রকম করে সংসার কর্‌তে যদি এক একবার গুলিয়ে যায়। যেমন হয় ত কোনটায় আমার বোধ হল—কি আসক্তি হল।

শ্রীশ্রীমহারাজ—Don't depress yourself,—never depress yourself (কখনও ভগ্নোৎসাহ হবেন না) এক একবার গুলিয়ে গেলই বা। আবার জোর করে লেগে যেতে হবে, আর না ওরকম গুলিয়ে যায় এই রকম সাবধান থাকতে হবে। যতবার গোল হোক না কেন কিছুতেই depressed (ভগ্নোৎসাহ) হবেন না। Never depress yourself (কখনও ভগ্নোৎসাহ হবেন না)—খুব জোর কর্‌তে হয়। সর্ব্বদা খুব উৎসাহ থাকবে। খুব উদ্যমের সহিত লেগে যান। কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। To do or die let this be your motto (সাধনে সিদ্ধি না হয় শরীর পতন—এই যেন উদ্দেশ্য হয়)। ভগবান লাভ কর্‌তেই হবে। এইবার এই জীবনেই কর্‌তেই হবে। সে যাই হোক্ না কেন। যদি এই দেহে ভগবান লাভ না হল, তবে কায কি এ শরীরে। যদি এ মন দ্বারা তাঁকে লাভ কর্‌তে না পারা যায়, তবে কি হবে এ মন দিয়ে। এ শরীর মন ধ্বংস হবেই। আমার ভগবান লাভ কর্‌তেই হবে—যে রকমেই হোক—তাতে শরীর যাক্ বা থাক।

প্রশ্ন—আচ্ছা এই পূজা প্রভৃতি, নানা রকমের দেবদেবী, এর ভিতরে কি কিছু বিশেষত্ব আছে?

শ্রীশ্রীমহারাজ—ও সব দেবদেবী যা কিছু ও সবই এক। ও যা এই মনেরই সৃষ্টি। শাস্ত্রে চার রকমের সাধন আছে—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥"

সাক্ষাৎ সাধনা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু। সেই পরমাত্মা রয়েছেন। সর্ব্বদা তাঁর সাক্ষাৎ অনুভূতি। তারপর হচ্ছে ধ্যান—সেখানে সেই তিনি আছেন আর আমি আছি, জপ টপ সব বন্ধ। দেখ্‌বে যে খুব যখন ধ্যান জমে, তখন শুধু রূপ—জপ টপ আর চলে না। তার নীচে জপ। জপ করা যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। তারও নীচে এই বাহ্য পূজা। ওসব হচ্ছে different stages of evolution (উন্মেষের বিভিন্ন স্তর)—যার মনের যে রকম অবস্থা সে সেইখান থেকে আরম্ভ করে বরাবর বেড়ে যাবে। ধরুন একজন ordinary man (সাধারণ মানুষ) তাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা, সমাধি ইত্যাদি উপদেশ করা যায়, সে কিছু ধারণাও কর্‌তে পার্‌বে না, তার ভালও লাগ্‌বে না। সে হয়ত ২।১ দিন চেষ্টা করে পার্‌বে না, পরে ছেড়ে দেবে কিন্তু তাকে যদি ফুল বেল পাতা নিয়ে পূজা কর্‌তে বলা যায়, সে দেখ্‌বে একটা কিছু কর্‌লুম। তার মনটাও খানিকক্ষণের জন্যে স্থির হল, সে এতেই মজা পায়। তারপর ক্রমে সে state outgrow (অবস্থা অতিক্রম) করে। মন যত fine (সূক্ষ্ম) হতে থাকে তত gross (স্থূল) জিনিষে সে আর সে রকম রস পায় না। এই ধরুন আপনি প্রথম পূজা আরম্ভ কর্‌লেন, কিছুদিন পরেই দেখ্‌বেন আপনা থেকেই জপ ভাল মনে হবে।

তখন এটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যানটা ভাল। এই রকম। একেই বলে natural growth (স্বাভাবিক বৃদ্ধি)। এই রকম মন যেটুকু লাভ করে সেটুকু আর নষ্ট হয় না। মনে করুন আপনি এই উঠানে আছেন—আপনাকে ছাদে উঠ্‌তে হবে। খুঁজে কোথায় সিঁড়ি আছে দেখে, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠ্‌তে পারেন। না হলে উঠান থেকে আপনাকে যদি কেউ ছুঁড়ে দেয় ত আপনার কত কষ্ট। এই বাইরের জগতে যেমন দেখ্‌ছেন—রাস্তাঘাট, নিয়ম কানুন—ভেতরেও একটা জগৎ আছে—সেটাও ঠিক এই রকম ; এই রকম সব ব্যবস্থা, সব আছে।

বন্দিনীর বেদনা

'জ্যোৎস্না'

সংসার কারায় বন্দিনী আমি
প্রভু তব কৃপা মাগি,
কোন্ দোষে মোরে রুদ্ধ দুয়ারে,
রেখেছ কাহার লাগি।
জাননা কি দেব কত ব্যথা ভরা
আমার এ ক্ষুদ্র হিয়া,
কাতরে অভাগী ডাকিছে তোমায়,
রাখ হে করুণা দিয়া।

প্রতি পলে পলে করি করাঘাত,
তবু নাহি খোল দ্বার,
হৃদয়ের মাঝে তোমার মূরতি,
দেখি আমি বার বার।
তুমি কি গো বঁধু আসিবে না আর,
চাহিবে না মোর পা'ন,
ভক্তি অর্ঘ্য সাজায়ে রেখেছি
ক্ষুদ্র হৃদি সিংহাসনে।

বল দয়াময় এ কোন্ ছলনা—
ছলিছ আমার সনে,
ভব কারাবাসে আর কতদিন
থাকিব হে তোমা বিনে ?

স্বামী সারদানন্দ ও বালকবৃন্দ

স্বামী নির্লেপানন্দ

স্বামী সারদানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধি-উপলব্ধিবান পুরুষপ্রবর ছিলেন। ভ্রম প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া বীরের ন্যায় একহস্তে অশ্রুবারি মোচন ও অপরহস্তে পথভ্রষ্ট পতিতের আত্মসম্বিৎলাভ ও উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অলোকসামান্য সাধু মহাত্মার ক্ষুদ্রতম লোকব্যবহার প্রণিধানের যোগ্য। আদর্শ মানবকে কেমন হইতে হয় তিনি তাহারও দৃষ্টান্তস্থল।

স্বামী সারদানন্দকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের (মিশন উত্তরকালে রেজেষ্টারী হয়) সেক্রেটারী পদে আচার্য্যপাদ বিবেকানন্দ মহারাজ বসাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঐ কঠিন কর্ত্তব্য 'শরীর-বিমোক্ষণ'-ক্ষণ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য পালন করিয়া আজ হইতে আট-বৎসর হইল সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মাথার উপর সর্ব্বদা গুরুদায়িত্ব থাকিলেও এবং বড় বড় "পাব্লিক্" (সর্ব্বসাধারণের) কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও যে সব ছোট ছোট ছেলের ভার শ্রীভগবান তাঁহার উপর দিয়াছিলেন তাহাদের জীবন প্রণালীর অতি ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির উপর মায়ের মতন নজর রাখিতেন। বালকদিগের খুব যত্ন লইলেও তাহাদের সহিত বহু বৎসরের দীর্ঘ আচরণ ব্যবহারে কোনদিন মোহ-ভাবের ছায়ামাত্র তাঁহার ভিতর দেখা যায় নাই। বালকদের ভিতর নারায়ণকে দেখিতে পাওয়া তাঁহার ন্যায় সাধুর পক্ষে অসম্ভব নয়। সর্ব্বদাই মুক্ত পুরুষের, ঈশ্বর-জানিত-জনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সকল প্রকট ছিল। আরও দেখা যাইত অধিনায়ক হইয়াও তিনি আশ্রিতজনের সহিত সমান সমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন। বালকদিগের কাহাকেও বলিতেন—

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

ফিরে, অমুক জায়গায় মিশনের ব্যাঙ্কের খাতাখানি পৌঁছাইয়া দিতে, অমুকের সহিত দেখা করিতে হইবে, তোর সুবিধা হইবে কি? ইস্কুলের ফেরতা আমার এই কাজটা করতে পারবি? ইত্যাদি।

আড়ম্বরে অনেক সময় মানুষ চিনা দায়। লোক-লোচনের সম্পূর্ণভাবে অন্তরালে শ্রীসারদানন্দ চরিত্র দিনের পর দিন কি অপরূপ পরমসুন্দর আকার ধারণ করিত এবং ধীরে ধীরে তিলে তিলে সেই পূর্ব্বতনযুগের তাঁহার শ্মশ্রুবিশিষ্ট আপাত প্রতীয়মান বাহ্যিক সর্ব্বগাম্ভীর্য্যের ভিতর—পুরাতন কবি বর্ণিত মধুঋতুর মত—স্বচ্ছন্দগতি নিঃশব্দ ও স্বাভাবিকভাবে লোকহিত আচরণ করিত—তাহা, দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাততঃ 'ফালতু' বোধ হইলেও বর্ত্তমান ছোট ঘরোয়া চিঠিখানি পাঠ অন্তে পাঠক-পাঠিকা বেশ সুস্পষ্টভাবেই উক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। বিরাটকায় পাহাড়ের ভিতরে যে স্নেহের ঝর্ণাধারা সর্ব্বদা প্রবাহিত ছিল তেইশ বৎসর পূর্ব্বের পত্রে তাহা প্রকট।

তিনি ইদানীং স্থূলকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সেই থপ্‌থপে ঝোলানো স্তন দুটি এরূপ বালকদের কাহারও কাহারও কাছে যে স্বাভাবিকভাবে মাতৃস্তনের সৌসাদৃশ্য নয়নে আনিয়া দিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ যে বালকের কাছে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি লেখা সেই বালকের বয়স তখন বারো। পত্রলেখক স্বামীর বয়স ছেচল্লিশ। বালক ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে সাধকোক্ত সুবর্ণময়ী বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাটে তাহার মাটীর মাকে হারাইয়া অন্ধকার দেখিয়াছিল। হৃদিস্থ সান্ত্বনার পেটিকা লইয়া স্বামী তখন কাশীতেই বালকের অতি নিকটে।

এমনিধারা দেখা গিয়াছে ডাক্তার হারাণবাবুর ছেলে ক্ষিতীশ তখন ছোট। উদ্বোধন মঠের বাহিরে ছোট কামরাটীতে বসিয়া স্বামী কতই না শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নেহভালবাসার সহিত তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার অভিজ্ঞতা অতিশয় আনন্দে শুনিতেছেন। শ্রীশ্রীমার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর বালকটি তাঁহাকে বলিয়াছিল—আমাকে শ্রীমার দর্শন পাইয়ে দিতে পারেন? তিনি তখনই উত্তর দিলেন—আমি পারি না। তুমি ডাকো। ডাকলে তাঁর দেখা পাবে। বালক আরও বলিল—আপনি তাঁকে দেখতে পান?

উত্তর—স্বরূপ মূর্ত্তিতে কখন কখন দেখতে পাই। তবে পটেতে তাঁকে রোজ রোজ দেখতে পাই। তোরা যদি এ সব অবিশ্বাস করবি তো কি হবে? হাজার বছর পরে যারা আসবে এ সব শুনতে শুনতেই তাদের ভেতর শ্রদ্ধার উদয় হবে এবং তারাও দেখা পাবে। তুই ছবি আঁকছিস্ কেমন (বালক আর্টস্কুলে পড়িত)? আমিও ঠাকুরের ছবি মনে মনে আঁকছি।

অপর একটি মনভঙ্গে ভীত বালককে বলিয়াছিলেন—বড় হতে গেলে সংসারে অনেক ঠোক্কর খেতে হয়। বিবাহ কল্লেই কি সব সমস্যা মিটে? সামাজিক নিন্দার হাত থেকে মানুষ বাঁচে বটে, কিন্তু মনের উন্নতি করতে গেলে সংযম একান্ত দরকার। একটা নিয়ম মাফিক্ চলবি। Routine করবি। খুব খানিকটা খেলুম, খুব খানিকটা বেড়ালুম—তাতে হবে না। দুর্ব্বলতা এলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবি। খুব ভগবানকে ডাকবি। আমরা তাঁর সন্তান। আমাদের ভেতর নীচভাব আসবে কেন? তাঁর অংশ। ভগবান লাভের চেয়ে বড় জিনিস নাই। তাঁকে পাবার শক্তি তোমার ভেতরই আছে। আন্তরিক হলে তিনি শোনেন। মানুষ আমরা বড় দুর্ব্বল। গৃহস্থই হও, সাধুই হও, সংযম চাই। আমাদের আশীর্ব্বাদ ত আছে। তবে তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে।

১৯২৬ গ্রীষ্মকাল শেষবার যখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান তখনও শশী নিকেতনের দোতলার বড় গোল বারাণ্ডায় মনে পড়িতেছে একদিন সন্ধ্যায় আরও একটি অতিশয় ক্ষুদ্র সুদর্শন নিতাই নামক

বালকের (ডাঃ দুর্গাবাবুর পুত্র) সহিত তাঁহার সেই সুপ্রশান্ত হাসিমুখে আলাপাদি করিতেছেন। সম্মুখে সম্প্রসারিত নিদাঘের প্রশান্ত সমুদ্র। বেষ্টনী চমৎকার। স্বামীর কাছে একটি ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান ছিল। সেদিনকার সেই ছোট্ট নিতাইটিকে তিনি বলিতেছেন—আচ্ছা, তোদের বাড়ী যদি (ব্রহ্মচারী) মহারাজ যান তুই তাঁকে কি খাওয়াবি? ডাক্তারের ছেলে। অতীব স্বাভাবিকভাবে আধ-আধ-বুলিতে বলিয়া উঠিল—কেন? আমাদের বাড়ীতে অনেক ও—ষু—ধ আছে। তা-ই খেতে দোবো॥

স্বামী ও ব্রহ্মচারী উভয়েই এই কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথিতযশাঃ প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোনের এইরূপ নাতি-পুঁতিদের সঙ্গে রঙ্গরস ও বলখেলার কাহিনী ঠিক্ এমনতরই—শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের আজীবন 'সচিব ও বালক-সংবাদের' ন্যায় চিত্তাকর্ষক। অমুকে আবার কি জানে, তার কথা, তার পরামর্শ আবার কি লইব, অমুক তো কালকের ছেলে—এবম্প্রকার হটকারী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইতে দীর্ঘ একুশ বৎসর দেখার ভিতর কোনদিন তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই।

শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানিতে তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নাই। ইহা শ্রীশ্রীমার কলিকাতা উদ্বোধন বাটী হইতে লেখা, ১৯১২। বালকটি তখন দেওঘরে।

শ্রীমান কা—

তোমার পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম, কিন্তু পূজার ভিড়ে উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি নাকি রোজ ৪।৫টি আতা খাও? দেখো, যেন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর না হয়। সতীশ বাবুর (তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমী তৃতীয় সহোদর ভ্রাতা, ডাক্তার।) ঠিকানা—শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী, কাষ্টর টাউন, দেওঘর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ম-কে চিঠি দিতে বলিবে। ভু—কাশী গিয়াছে (ম ও ভু—তপর দুইটি তদীয় আশ্রিত বালক)। শুনিলাম তুমি মাঝে মাঝে দুষ্টুমি কর ও দিদিদের কথা শুন না। ছিঃ ওরূপ করিতে নাই। কথা শুনিয়া চলিবে। তোমার জ্বর হইয়াছিল। এখন সারিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়। রোজ বেড়াইবে। তোমার দিদিমার (যোগীন মার) আশীর্ব্বাদ জানিবে। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবে। জ্ঞান মহারাজ (ইনি বালক ও যুবক মহলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাব প্রচার বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছেন) কাশীতে ৺দুর্গাপূজা করিয়াছেন। এখানে মণিবাবুর বাড়ীতে জ্ঞান মহারাজের ছেলেরা ঠাকুর গড়িয়া ৺দুর্গাপূজা করিয়াছিল। বালক নারায়ণদের Ice cream দেওয়া হইয়াছিল। আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে এবং ম—প্রভৃতি সকলকে দিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীসারদানন্দ

পুঃ—সতীশ বাবুকে যেদিন দেখিতে যাইবে সেদিন আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। বড়মা (যোগীনমার মা) ভাল আছেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীসারদানন্দ

এই সকল বালকদের লক্ষ্য করিয়া তিনি কাশীতে বুড়ো বাবা সচ্চিদানন্দ স্বামীকে পত্র লিখিতেন—"ছেলেরা ভাল আছে। তুমি তাহাদের প্রণাম জানিবে।" এক সময়ে বলিয়াছিলেন—ঠাকুরের মানস-পুত্র ছিল। আর এরাই আমাদের মানসপুত্র।

স্বামী সারদানন্দের পত্র*

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার ২৭শে মার্চ্চ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। * * সতত আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। উমা (গৌরী) আট বছর বয়সের সময় শিবকে স্বামী রূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই হইতে আমাদের দেশের মেয়েরা শিবের মত স্বামী পাইবার জন্য শিবপূজা করিয়া থাকে। শুদ্ধা ভক্তি লাভের বাসনায়ও শিবপূজা করা যাইতে পারে। যাহার যেমন ভাব সে সেইরূপেই করিবে। শ্রীভগবানের কৃপায় ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে। ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে ভক্তি, বিশ্বাস লাভের জন্য প্রার্থনা করিও। তাঁহার নিকটে যে যাহা চাহিবে তাহাকে তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। সুতরাং প্রেম ভক্তি ছাড়া অন্য কোনও ক্ষুদ্র জিনিষ কেন তাঁহার নিকট চাহিবে? শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন এবং তাঁহার উপযুক্ত কন্যা করিয়া গড়িয়া তুলুন। ইতি

কলিকাতা — শুভানুধ্যায়ী—

১।৪।২৭ — শ্রীসারদানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

পরমকল্যাণীয়াসু

তোমার ৮।১ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে। * * তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর নিম্নে দিতেছি। স্বামিজী Paris Exhibition এ বলেছেন :—

(১) বেদে স্তম্ভের পূজার কথা আছে। উহা হইতে পরে স্তম্ভের পূজা যেমন পুরীতে গরুড়স্তম্ভের পূজা চলিয়াছে। শ্রীভগবান যেন এই পৃথিবীর স্তম্ভস্বরূপ হইয়া সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। পরে উহাই লিঙ্গমূর্ত্তিরূপ শিবের পূজার প্রচলন হইয়াছে। শিবের মূর্ত্তি গড়িয়া যে পূজা হয় না এমন কথা নহে—কোথাও কোথাও মূর্ত্তি পূজাও হইয়া থাকে।

(২) সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ হইতে শিবকালী মূর্ত্তির আবির্ভাব। চৈতন্যকে দাবিয়ে প্রকৃতি বা কালী খেলছেন, পরে সমস্ত ধ্বংস করে শিবকে জ্ঞান দিবেন, ইহারই জন্য মা কালী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

(৩) রজঃগুণের বলিদান, এমন কি রজোগুণী বিষ্ণুপূজায় দৈড়ে ছাগল বলি হয়। সত্ত্বগুণী পূজায় বলি নাই। ঠাকুর বলতেন এমন কালী আছেন যিনি মাছ মাংসের গন্ধ পর্য্যন্ত সইতে পারেন না। আত্মাকে বলি দিয়ে তপস্যা, যেমন রাবণের মাথা কেটে তপস্যা পূর্ব্বে ছিল। তার বদলে পরে পশুবলি হয়েছে। ইহাতে সাধকের এবং পশুর উভয়েরই মুক্তি হইবে, ইহাই ইহার অভিপ্রায়। পশু গায়ত্রী দেওয়া হয় তাদের মুক্তির জন্যই। ইতি

কলিকাতা — শুভানুধ্যায়ী—

২৩।১।২৭ — শ্রীসারদানন্দ

---

* এই পত্র দুইখানি অপর একটি ভক্তকে লিখিত। পূর্ব্ব পত্রের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। উঃ সঃ।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ

মহামিলন

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ভারতের বায়ু শান্তি প্রধান; যবনের (পাশ্চাত্যের) প্রাণ শক্তি প্রধান; একের (প্রাচ্যের) গভীর চিন্তা, অপরের (পাশ্চাত্যের) অদম্য কার্য্যকারিতা, একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, অপরের ভোগ; একের চেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের সর্ব্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত, একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ, একজন নিত্য সুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

ইউরোপ আমেরিকা, যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহে।

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা বন্ধন, সেই উন্নতি তৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

দেখিতেছ না যে সত্বগুণের ধূয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড় বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজমূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্ম্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দ প্যাগোডা] [পাগান

পাগান নগরী

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

পূতসলিলা উচ্ছ্বাসময়ী ইরাবতীর দক্ষিণ তীরে স্বাধীন ব্রহ্মের গৌরবময় ইতিহাসের উজ্জ্বলস্মৃতি বিজড়িত সুবিখ্যাত রাজধানী পাগান নগরী আজও তার ধ্বংসপ্রায় অতীতের স্মৃতি বোঝা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রহ্ম রাজগণের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও বীরত্ব-গরিমায় পাগান ব্রহ্ম-ইতিহাসের এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

ইরাবতী বক্ষে ষ্টীমার হতে এ নগরীর প্রাকৃতিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্যের সাথে অগণিত মন্দিরের স্বর্ণচূড়াগুলি দেখে সবাই মুগ্ধপ্রাণে দেবতাকে স্মরণ করে প্রণতি জানায়। আমিও এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হই নি। বোধ হয় ইং ১৯৩৩ সনের জুন মাসে এখানে এসেছিলাম এ পুণ্য তীর্থ দেখ্‌বার মানসে। ইরাবতীর তীরেই ষ্টীমার হতে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। ওখান হতে বর্ত্তমান পাগানের ক্ষুদ্র পল্লীটীর ভেতর দিয়ে কত শত ভগ্ন মন্দির অতিক্রম করে—এঁকে বেঁকে একটী রাস্তা পাগান বাজারে পৌচেছে। নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদের জন্যই এই ক্ষুদ্র বাজারটীতে মাত্র কয়েকটী দোকান, সকাল হতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত কেনা বেচা হয়। দুইটী ভারতীয় 'কাকা'র দোকান রয়েছে, (এরা হল মাদ্রাজী মুসলমান—কাকা বলেই সম্বোধন করতে হয়) তারাই স্থায়ী দোকানী এবং চা, রুটী, ভাত তরকারী প্রভৃতি আহার্য্য সবই এদের দোকানে পাওয়া যায়, আর সব অস্থায়ী দোকানদার। নদীর ধারে পি, ডব্লিউ, ডি,র একটী ডাকবাংলা রয়েছে কিন্তু তাতে আহারের ব্যবস্থা নেই। নিকটেই বোর্ডের একটী প্রাইমারী স্কুল আছে গ্রাম্য বালকবালিকাদের শিক্ষা দেবার জন্য। এখানে বর্ম্মার বিখ্যাত গালার (Lac) কারখানা। এখানকার গ্রামবাসীরা সেই সব কাজে সুনিপুণ। এখান হতে পাঁচ মাইল দূরে 'নেওগো-এ' এবং অপর দিকে আরো খানিকটা দূরে 'চক্‌' নামক স্থানে মটররাস যায়। ওখানে বি, ও, সি,র তেলের বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ও লোহার কারখানা রয়েছে।

আজ পুণ্য-স্মৃতি জড়িত পাগান নগরীর বক্ষে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ও পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায় কয়েক মাইল ব্যাপী শুধু হাজার হাজার ভগ্ন পুরাতন মন্দির-শীর্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কত

যে রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন কোথায় আজ তাঁরা, কোথায় তাঁদের রাজপ্রাসাদ,—কোথায় তাঁদের বীরত্ব গর্ব্ব, সবই অতীতের সাথে মিশে গেছে কিন্তু আছে শুধু ধ্বংসপ্রায় মন্দিরশ্রেণী যা আজও বক্ষে পূর্ব্বস্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দর্শক ও পথিককে তাদের শীর্ষ-দোলায়িত ঘণ্টার টুং টাং রবে যেন কোন্ অতীতের কাহিনী শোনাচ্ছে, আর তার সাথে দয়াল দেবতার শুভাশীষের স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে,— যে দিকেই চাওয়া যায় এ যে অফুরন্ত, এর সীমা নেই, শুধু মন্দির, মন্দির আর মন্দির। কোনটী ধ্বংস হয়ে মাটীর সাথে মিশে গেছে, কোনটী অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় বনানীর অন্তরালে লুকিয়েছে, আবার কালপ্রবাহে কতক ইরাবতী গ্রাস করেছে, কোনটী অক্ষত দেহে আজও মহাগর্ব্বে অতীত গৌরব ঘোষণা কর্‌ছে। ইংরেজ লেখকগণ এ পাগানকে বলেন "City of ruined Pagodas"

ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় এ পাগান নগরীই ব্রহ্মদেশে সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, এখানেই ব্রহ্মের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশ হয়। ব্রহ্মরাজ পিন্‌বিয়া (Pynbya) খৃষ্টীয় ৮৪৯ সালে প্রোম হতে এসে পাগানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় হতে কোন্ কোন্ রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু খৃষ্টীয় ১০৪৪ সালে অনারথা (Anwarahta) এখানে রাজা হন। এ সময় হতে পাগান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত এখানকার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম হতে বোধ হয় ৫৫ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। ব্রহ্মরাজ অনারথা এই সুবিখ্যাত রাজধানীতে খৃষ্টীয় ১০৪০ হইতে ১০৭৭ সাল পর্য্যন্ত মহা বিক্রমে রাজত্ব করেন। তিনি খুবই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। থাটনের ভারতীয় তেলাঙ্ রাজাকে বিজয় করে তিনি ওখান হতে বৌদ্ধধর্ম্মের হীনযান্ সম্প্রদায়ের কয়েকজন পুরোহিতসহ ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং তিনিই বিদেশীদের সাথে ব্রহ্মের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে একটা অখণ্ড রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই ব্রহ্মদেশ রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সবদিকেই সৌভাগ্যের উন্নতি শিখরে আরোহণ করেছিল। এই রাজাই প্রথম খৃষ্টীয় ১০৫৬ সালে সিন্ আরাহানের (Shin Archan) নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তারপরেই এই ধর্ম্মস্রোত এই দেশকে প্লাবিত করে। রাজাও ধর্ম্ম ব্যাপারে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। বহু অর্থব্যয়ে স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা অনেক মন্দির ও বিহার নির্ম্মাণ করেছিলেন। খৃষ্টীয় ১০৫৯ সালে ইনি বিখ্যাত "সুইজিগণ প্যাগোডা" (Shewzigon Pagoda) নির্ম্মাণ করেন এবং ইহা ১০৮৪ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। এই রাজার সম্বন্ধে একটী গল্প রয়েছে তাতেই বোঝা যায় ভারত ও ব্রহ্মের কত মধুর সম্বন্ধ ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কিছুকাল পর ত্রিহুতের রাজধানী বৈশালী নগরে বৌদ্ধ রাজার নিকট এক দূত পাঠিয়ে তার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে ভারতীয় বৌদ্ধরাজা স্বীকৃত হন এবং কিছুদিন পরে মহা উৎসব আনন্দে লোকজনসহ ত্রিহুত রাজকন্যা আরাকানের পথে পাগানে উপস্থিত হলে ব্রহ্মরাজ যথারীতি তাঁর পাণিগ্রহণ করে তাঁকে প্রধানা মহিষীরূপে বরণ করেন। এই রাণীর গর্ভেই 'কনিষ্ঠের' (Kyansittha) জন্ম হয়। রাজা অনারথার বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সুযোগ্য পুত্র কনিষ্ঠ রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। তিনি বিচক্ষণতা ও সুশাসনে পিতারই অনুবর্ত্তী হয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করেছিলেন। ধর্ম্ম ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, তিনি বহু মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং খৃষ্টীয় ১০৮২ হইতে ১০৯০ মধ্যে অজস্র অর্থব্যয়ে ব্রহ্মের বিখ্যাত 'আনন্দ প্যাগোডা' (Ananda

Pagoda) নির্ম্মাণ করেছিলেন, সে আজ অটুট অবস্থায় ব্রহ্মদেশে ধর্ম্মের গৌরব স্তম্ভ এবং তাঁর রূপ সৌন্দর্য্যে মানুষমাত্রকেই বিমোহিত করছে। ব্রহ্মরাজগণ যে ধর্ম্মের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন তার তুলনা জগতে বিরল, আজও সে দেশবাসী ধর্ম্মব্যাপারে মুক্তহস্ত। খৃষ্টাব্দ ১০৪৪ হইতে পাগান রাজত্বের অবসান হয়। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ জন রাজা সগৌরবে এখানে রাজত্ব করেছেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিজয়চিহ্ন স্বরূপ হাজার হাজার মূর্ত্তি, মন্দির ও বিহার আজ জগতের সমক্ষে তাঁদেরই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের মহিমা ঘোষণা করছে। জগতে বোধ হয় আর কোথাও একস্থানে এত হাজার হাজার মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পাগান রাজধানীর কয়েক মাইল ব্যাপিয়া এই অগণিত মন্দির ও স্তূপ-শ্রেণী স্থাপিত হয়েছিল—যার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা আজও সম্ভব হয় নাই। তবে যে সব মন্দির বা স্তূপ এই দীর্ঘ দিন পরে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে আজও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তার সংখ্যাও চার পাঁচ হাজারের কম হবে না। এই মন্দির-তীর্থ ঘুরে ফিরে দেখ্‌বার জন্য এ দেশীয় 'গাইড' এখানে পাওয়া যায়, এরা নিজেদের ভাষা ব্যতীত ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী জানে, দুচার আনা দিলেই সন্তুষ্ট। আমাকে এ দেশীয় একজন শিক্ষিত ব্যক্তিই অতি যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বাজারটীর অদূরেই ভগ্নপ্রায় পাগান-গেট, এর ভেতর দিয়ে আনন্দ প্যাগোডায় যেতে হয়। এর ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃঢ় ফটক পাগান রাজবাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বার ছিল। এখান হতে রাজবাড়ীর উচ্চ প্রাচীর কত মাইল ঘিরে যে ছিল তা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, আজ শুধু তার ধ্বংসচিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। মাঝে যে বিরাট রাজপ্রাসাদ এবং সুবিশাল দুর্গ ছিল তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, শুধু সেই পুরাণো দিনের ইট আর পাথর মাটির বুক জড়িয়ে পড়ে রয়েছে, জানি না আজও কেন ভগ্নপ্রায় বিরাট ফটক অতীতের স্মৃতি নিয়ে পথ আগ্‌লে রয়েছে। ফটকটীর উভয়পার্শ্বে রক্ষী রূপে দুইটী বৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত, ফটক পার হয়ে পূর্ব্বদিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আনন্দ প্যাগোডার প্রধান তোরণ দ্বার। এই ব্রহ্মবিখ্যাত মন্দিরটী এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ ও সুন্দর এবং বিচিত্র কারুকার্য্য-মণ্ডিত। এর চারিদিকেই প্রবেশ পথ রয়েছে, উভয়পার্শ্বে রক্ষিরূপে দুটী 'ড্রাগন'। উত্তরদিকের সুন্দর তোরণটী প্রধান প্রবেশ দ্বার। এর এক ধারে সৌম্য-শান্তভাবে দণ্ডায়মান এক বুদ্ধমূর্ত্তি, দেখে প্রাণে সত্যিই ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনটী ছোট দুয়ার অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ পথের উভয় দিকে দেয়ালে, উপরের ছাদে, ব্রহ্মচিত্রশিল্পীদের সুন্দর চিত্র-পরিচয় রয়েছে। প্রাচীন রাজগণের জীবনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দান-ধর্ম্ম, বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী ও মানবের পাপের শাস্তির পরিচায়ক কতকগুলি ভীষণ ছবি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দিরের ঠিক মাঝখানে ধ্যান গম্ভীর প্রশান্ত অমিতাভ বুদ্ধের এক বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত। শিল্পী এই মূর্ত্তিটীতে এমনই দেবোপম ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন যা দেখে মানবের মনে শান্তি জাগে, দর্শক ও ভক্তগণ প্রথমে এ মূর্ত্তির নিকট প্রণত হয়ে ভক্তি নিবেদন করেন। এ ছাড়া মন্দিরের গর্ভগাত্র ঘিরে চারদিকে আরো বিরাট চারটী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি। এর দু একটী বিভিন্ন কাষ্ঠে নির্ম্মিত, প্রথম মূর্ত্তিটী ভিক্ষুবেশে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে, তিনি হস্ত দুটী দিয়ে জগতকে বরাভয় দিচ্ছেন। বড়ই শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি। অপর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে যেন বিশ্বজনকে শান্তির বাণী

শোনাচ্ছেন,—এঁর হস্তে একটী মুদ্রা, অন্য দুটী মূর্ত্তিও বিভিন্ন মুদ্রাহস্তে দাঁড়িয়ে থেকে যেন নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করছেন; এবং দ্বিতীয়টী, বুদ্ধত্ব লাভের পর আনন্দের স্বরূপ হয়ে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন। এ মূর্ত্তি কয়টী দর্শনে বিমুগ্ধ প্রাণে মানব মাত্রই অমনি তাঁদের চরণে লুটিয়ে পড়ে শরণ নিতে চায়। এমন নীরব শান্তিময় মন্দিরতলে দয়াল দেবতার সকাশে এসে ক্ষণিকের জন্যও সংসার-তাপিত প্রাণ এত শান্তি অনুভব করে, যে মনে হয় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এখানেই শান্তিময়ের নিকট কাটিয়ে দি,—আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। মন্দির মধ্যে, দেয়াল গাত্রে আশে পাশে আরো অনেক ভাবময় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। প্রস্তরমণ্ডিত বিশাল প্রাঙ্গনের চারদিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তার মাঝখানে এ বিরাট শোভাময় সুন্দর মন্দির স্থাপিত করা হয়েছে। এর ভেতর এবং বাইরের কারুকার্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর, যা আজ ব্রহ্ম-শিল্পচাতুর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পরিচয় দিচ্ছে। বিদেশী পর্য্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল ও সূক্ষ্ম শিল্পকলা দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রাণে কতভাবেই না এর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। মন্দিরের উচ্চতাও নেহাৎ কম নয়, ভূপৃষ্ঠ হতে দুইশত ফিট উচ্চ। শীর্ষ দেশের প্রধান উচ্চ চূড়াটীকে ঘিরে আরো কয়টী উন্নত চূড়া চারদিকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হচ্ছে যে ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় গঠন ভঙ্গিতে সমচতুষ্কোণ আকারে তৈরী, শুনতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে এ মন্দিরের চারদিকে কয়েক হাজার সুন্দর শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তি সাজান ছিল, আজ তার কয়েক শত মাত্র বর্ত্তমান থেকে ঐ প্রবাদের সত্যতার প্রমাণ দিচ্ছে।

আনন্দ প্যাগোডায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি

ইরাবতী বক্ষে ষ্টীমার হতে যখন পাগান নগরীর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তখন এক অপূর্ব্বভাবে দর্শকের প্রাণ বিমোহিত হয়। মন্দিরের প্রধান তোরণের বাইরে এক ধারে বৃটিশ সরকার রক্ষিত এখানকার প্রাপ্ত পুরানো জিনিষের যাদুঘরে প্রবেশ করে অবাক বিস্ময়ে শুধু একটীর পর একটী দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়—ইট, কাঠ পাথরের রুক্ষতার উপর ভগবান তথাগতের বিভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিতে শিল্পীরা বিচিত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছে। কয়েকটী শক্তি মূর্ত্তিও ওখানে আছে, সে সময়ের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য জিনিষও রয়েছে। নানা ভাষায় কয়েকটী শিলালিপিও বর্ত্তমান, তাতে এখানকার রাজাদের ধর্ম্মশাসনবাক্য উল্লিখিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রায় শিলালিপিরই পাঠোদ্ধার করেছেন। আনন্দ প্যাগোডার সামনে মুক্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে শুধু অসংখ্য মন্দিরের রূপসৌন্দর্য্যের সাথে ধ্বংস মন্দির—শ্মশানের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ওখান হতে বেরিয়ে, আশে পাশের শত শত ভগ্ন মন্দিরের পাশ দিয়ে আরো এগুলে নিকটেই "গডাপলিন প্যাগোডা" (Gawdawpalin pagoda), বোধ হয় ১১৯৪ হইতে ১২৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এটী তৈরী হয়েছিল। এই বিরাট সুন্দর মন্দিরটী চতুষ্কোণাকৃতি, বেশ মজবুত, শীর্ষ দেশে ৪০টী কারুকার্য্যময় চূড়া শোভিত, উপরের স্বর্ণ-ছত্রটী উজ্জ্বল চক্‌চক্ করছে। চারদিকে উন্মুক্ত দরজা প্রধান দ্বারে

দুইটী 'ড্রাগন' প্রহরী রূপে রয়েছে, ভেতরে ধ্যানী-বুদ্ধের মূর্ত্তি স্থাপিত। এর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টিত, এই মন্দিরের উৎকৃষ্ট শিল্প নৈপুণ্য দর্শককে মুগ্ধ করে দেয়, উচ্চতাও নেহাৎ কম নয়।

অপর দিকে আনন্দ প্যাগোডার খানিকটা দূরে (Thatbyinnyu Pagoda) 'থাবিনিয়া' প্যাগোডা বোধহয় ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়েছিল, তবু আজও নূতনের মতই রয়েছে। এর গঠনভঙ্গী ও শিল্পচাতুর্য্য এত সুন্দর যে 'আনন্দের' সৌন্দর্য্য হতে মোটেই নিকৃষ্ট নয়; উঁচুও প্রায় একই রকম হবে। চারিদিকেই প্রবেশ পথ, মন্দিরের ভেতরে ও পার্শ্বে তথাগতের বিভিন্ন ভাবের কয়েকটা বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মন্দিরেও একটা নূতনত্ব আছে। প্রথম দুয়ারে প্রবেশ করেই সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে উর্দ্ধে প্রায় ১৫০টী সিঁড়ি পার হয়ে একেবারে গগনস্পর্শী চূড়ার সান্নিধ্যে উঠা যায় এবং ওখান হতে সমগ্র পাগানের শ্মশানক্ষেত্রটী এবং আশ পাশের সবদিকটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের নিকটে আরও কতকগুলি জীর্ণ মন্দির মাথা তুলে রয়েছে। অদূরে দু একটী বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুগণ যেন প্রহরী রূপে বর্ত্তমান।

মহাবোধি, খৃঃ অঃ ১২১৫
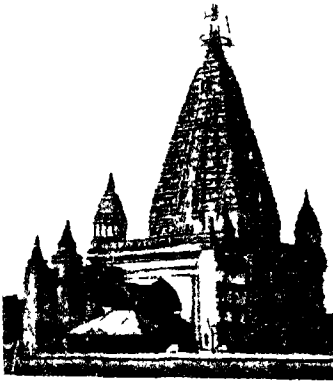
একটু দূরে অপর একটী প্যাগোডা, এর নাম "সোযে-গো-জি" (Shwegagyi Pagoda), ১১৪১ খৃষ্টাব্দে এটী নির্ম্মিত। এ মন্দিরটী পুরাতন হলেও এখনও বিধ্বস্ত বা জীর্ণ হয় নি, সম্পূর্ণ মজবুত আছে, এর গঠনভঙ্গীও পূর্ব্বেকার মতই। পার্শ্বে "টোসো" (Taso) নামক একটী মন্দির ঠিক খৃষ্টীয় চার্চ্চের অনুরূপ তৈরী। অপর দিকে অনেক ভগ্নমন্দিরের মাঝে 'মি মালাং-গাং' (Mimalaung Gyaung) পেগোডা আজও অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে নরপতি সিথু ঐটী নির্ম্মাণ করেন। এর গঠন পদ্ধতি বড়ই সুন্দর। ইরাবতীর অতি নিকটে "মহাবোধি প্যাগোডা" (Mahabodhi Pagoda) নামক অপর একটী প্যাগোডা ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। এই মন্দিরটীর উচ্চ চূড়া দেখ্‌লে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটী ঠিক সেই অনুকরণেই গঠিত।

অদূরে কয়েকটী স্তূপও রয়েছে "না-খোয়ে নাডং (Ngo-koywenaidong) ঠিক সারনাথের ধামেখ্ (Dhamekh) স্তূপের মত। এটী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তৈরী। পডনা (Pawdawna) নামক স্তূপটীও ভারতীয় স্তূপের ধারায় তৈরী এবং পে-বিং-গং (Pebingyang)—স্তূপটী একেবারে সিংহলী স্তূপের অনুরূপ। উপরের ডোমটী কতকটা ঘণ্টাকৃতি, উচ্চতা তত নয়। এই সব স্তূপই দশম শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল।
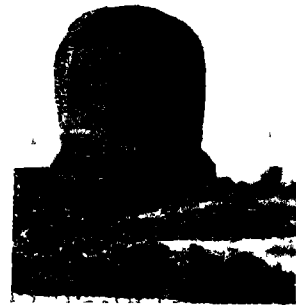
না খোয়ে নাডং, দশম শতাব্দী

একটী গুহামন্দিরও আছে তার নাম কিয়াঞ্জিথা (Kyanzittha's Cave-temple), খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এটী তৈরী হয়েছিল। চূড়াবিশিষ্ট অপূর্ব একটী মন্দির, নাম সান্‌ইয়েট্ (Seinnyet), এটীও ঐ একই সময়ে তৈরী, বেশ সুন্দর। প্রায় দুমাইল দক্ষিণে মনুহে (Manuha temple) মন্দির, এর কাছে একটী সুন্দর ছোট মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম নান্‌পায়া (Nanpaya)। এ মন্দিরের স্তম্ভে ব্রহ্মার মূর্তি অঙ্কিত আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন এটা তেলেগু রাজাদের তৈরী মন্দির ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা অনারথা একটী বৃহৎ গ্রন্থবিহার 'বিদাগট তাইস্' (Bidagat Taish) তৈরী করেছিলেন। এটীও ঠিক মন্দিরের মত, পাঁচতলা উঁচু, বড়ই সুশ্রী। আজও তার অস্তিত্ব রয়েছে। পাপে আলোম—(Alompra)—রাজবংশের রাজা বোডপায়া—(Bodawpaya) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে একবার ইহার মেরামত করেন। শোনা যায়, রাজা অনারথা আটন্ বিজয় করে ত্রিশটী হাতীতে করে বহু বৌদ্ধগ্রন্থসব নিয়ে এসেছিলেন, সে সব গ্রন্থ এখানে রেখেছিলেন। আরও এগিয়ে গেলে সপড়া
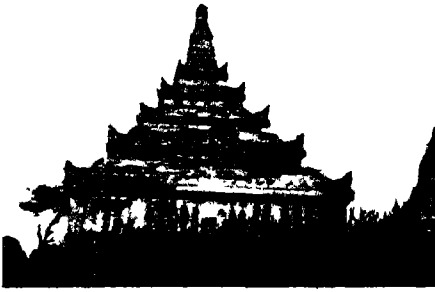
বিদাগট্ তাইস্, গ্রন্থবিহার, একাদশ শতাব্দী

মিংগলা জেডি, পৃঃ অঃ ১২৭৪

প্যাগোডা—(Sapada Pagoda) পাওয়া যায়। এটীও ব্রহ্মের বিশেষ স্মরণীয় মন্দির। বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সপডা নামক এক বর্ম্মী বৌদ্ধভিক্ষু সিংহল থেকে ফিরে এসে সিংহলী নমুনায় এ মন্দিরটী তৈরী করেন। এসময়ই ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম্মের একটা উন্নত যুগ এবং তখন তার সিংহলের সাথেও বেশ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়েছিল।

দূরে নিকটে আরও কত যে মন্দির রয়েছে তার সংখ্যা আজ কে নির্দ্দেশ করবে? আমিও ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ছি, কতকগুলি মন্দির দূর হতেই দেখে এলাম। অপর একটী মন্দির—বোধ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরী, এটী বড়ই সুন্দর। এর ভেতরে জাতকের গল্প মূর্ত্তিতে আঁকা রয়েছে। মন্দিরটীর নাম কণ্ডওয়গী প্যাগোডা (Kondawayi Pagoda)। কাছেই মিংগলা জেডি—(Mingalazedi) প্যাগোডা, এর নির্ম্মাণকাল ১২৭৪ খৃঃ অঃ, এই সমাকার ধর্ম্মমন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ ইহা এখনও দণ্ডায়মান। এর পরে দেখলাম টিলোমিন্‌টো (Tilominto)—প্যাগোডা, এটীও নেহাৎ নগণ্য নয়। এটীও ঐ সময়ে তৈরী। থাট বিন্নু প্যাগোডার কারুকার্য্য দর্শনীয়, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সুদৃশ্য প্যাগোডাটী তৈরী।
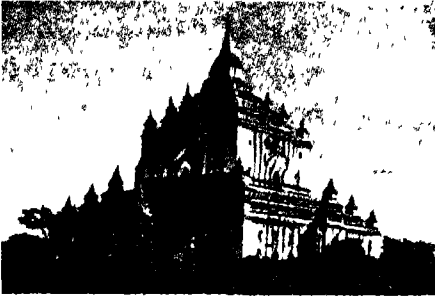
থাট বিন্নু, দ্বাদশ শতাব্দী

এখানকার মন্দিরের কতকগুলি পাথরের, অপর সবই ইঁটের তৈরী। এই মন্দির শ্মশানটী ঘুরে ঘুরে একটী মন্দির দেখে কত কথাই মনে জেগে উঠল। সেটী হল "নাট লং গং" (Nat Hlaung gyaung) মন্দির। পাগানে এই একমাত্র হিন্দু-মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে, এটী হল বিষ্ণু মন্দির। এর ভেতর দশাবতারের মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে, তাতে ভগবান বুদ্ধদেবও আছেন। এর নির্ম্মাণকাল ৯৩১ খৃষ্টাব্দ। পূর্ব্বে অপর এক মন্দিরের স্তম্ভে ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে, তা উল্লেখ করেছি। এ ব্যতীত হিন্দু মন্দিরের চিহ্ন এখানে নেই।

নাট লং গং হিন্দুমন্দির, ৯৩১ খৃঃ অঃ

অতীতের সেই এক অজ্ঞাত দিনে এদেশের করমণ্ডল উপকূলে এসে ভারতীয় তেলাং রাজারা মহা প্রতাপে আটনে রাজত্ব করেছিলেন। এই পাগানেও তাঁদের বিজয় অভিযান এসে পৌঁচেছিল, এখনও তাঁদের কীর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তাঁরা যে শুধু রাজত্বই করেছিলেন, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করতেও বিরত হন নি।

মাত্র কয়টী মন্দির উল্লেখ করা হল। কিন্তু এইরূপ কতশত ভাবের কত যে শিল্প সৌন্দর্য্যে ভূষিত
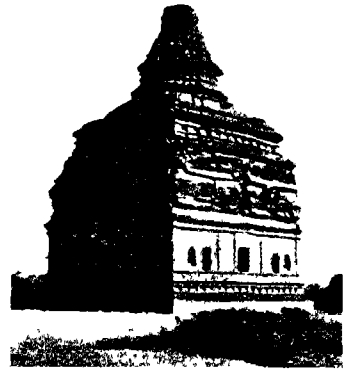
কত সুন্দর মন্দিরবাজি এখানে রয়েছে তা অগণিত। ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে যত মন্দির তৈরী হয়েছে সবই ঘণ্টাকৃতি। কিন্তু এসব মন্দিরের গঠনভঙ্গী অন্যরূপ। রাজা অনারথার সময়ই ভারতীয় বিভিন্ন স্থানের ভাস্কর্য্য-শিল্প পাগানে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই অতীত যুগের তৈরী মন্দিরশ্রেণী আজও একেবারে অটুট দেহে নূতনের মত রয়েছে। এসব তৈরী কর্‌তে অজস্র অর্থব্যয় হয়েছিল, আজও কোন কোন মন্দিরের স্বর্ণছত্র ও শীর্ষদোলায়িত স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরী ঘণ্টাগুলি বর্ত্তমান রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটী মন্দির বর্ত্তমানে সরকার হতে অর্থব্যয়ে রক্ষা করা হচ্ছে।

ঘুরে ফিরে যতই দেখা যায় সেই পুরানো দিনের ব্রহ্মভাস্করদের অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল দেখে আজ শুধু বিস্মিত স্তম্ভিত হতে হয়। এসব মন্দির-নির্ম্মাতা ভাস্করদের সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রয়েছে। সিংহলের কোন কোন মন্দিরের সাথে এখানকার কতক মন্দিরের গঠন প্রণালী অনেকটা একরূপ। তাই কেউ বলেন এসব ভারতীয়দের দ্বারা তৈরী, আবার কেউ বা বলেন ব্রহ্মভাস্করেরাই নির্ম্মাণ করেছে—আজ এ নগরী যতই অনুসন্ধিৎসু হয়ে দর্শন করা যায় ততই যেন সেই ব্রহ্মরাজগণের বীরত্ব ও মহত্ত্ব গৌরবের নির্ব্বাক ইতিহাস এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে সজীব বোধ হয়। স্বাধীন ব্রহ্মের কত কথাই না মনে জেগে ওঠে, ভারতের সাথে যে এ দেশের কত আপনার ভাব ছিল তা এখানকার কীর্ত্তি স্তম্ভ দেখলে স্বতঃই মনে হয়। ভারতের শিক্ষা—ভারতের জ্ঞান—এঁরা যে কি ভাবে আহরণ করেছিলেন, এখানকার রাজগণ যে দানে ধর্ম্মে কত উদার এবং স্বধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর ছিলেন তা ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয়—একদিন এ 'পাগানে' যে ব্রহ্মের শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, তা আজ এখানকার ধ্বংসপ্রায় সৌধাবলীর প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রাণের আবেগে আজ এই ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছা হয়—কোথায় হে বৃটিশ-শাসিত নব্য শিক্ষিত ব্রহ্মবাসী বিদ্বান ও বুদ্ধিমান যুবকগণ, এস—দেখে যাও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ। স্বাধীন ব্রহ্মের উজ্জ্বল গৌরব ও বীরত্বের স্মৃতি নিয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোল—তবেই তুমি প্রকৃত ব্রহ্মবাসী বলে পরিচয় দিতে পারবে। এস—আজ এই ধ্বংস স্তূপকে রক্ষা কর; যেমন খৃষ্টভক্তদের জেরুজালেম, মুসলমানদের মক্কা, হিন্দুদের বারাণসী, সেরূপ তোমারও এ পবিত্র পুণ্যতীর্থ! শুধু ধর্ম্মের নয়—এযে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বীরত্বের স্মৃতিজড়িত পূত পবিত্র ভূমি। এখানে এলেই সন্ধান পাবে ভারত ব্রহ্মের প্রাণ যে একই সূত্রে বাঁধা ছিল। বের কর এখানকার ইতিহাস মাটী খুঁড়ে, আর ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল যুবকদের শোনাও এখানকার রাজগণের বীরত্ব ও মহত্ত্ব গাঁথা—তবেই মানুষ হবে—শীর্ণপ্রাণ-স্রোতে জীবনের জোয়ার ডাকবে।

আজ এখানে আশ পাশে আর কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নেই। শুধু বিধাতার অভিশাপগ্রস্ত জনবিরল দরিদ্র পল্লীগুলো ম্লানমুখে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু শত অভাব অনটনের ভেতরও পল্লীবাসীদের আতিথেয়তার কমতি নেই, মনে হয় 'কোঃ বাথ' পরিবারের আদর আপ্যায়ন।

আজ এ 'পাগান' মিংজাঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী পল্লীমাত্র। কালের কি গতি। এখানে আসতে হলে 'মিংজাঙ্গ' অথবা প্রম পর্য্যন্ত ট্রেণে এসে পরে ষ্টীমারে পৌছিতে হয়।

পূজা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূজা বলিতেই যেন কেমন একটা ভক্তিভাব হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে। যেন কোন একটা কিছু আগে হইতে আমাদের মধ্যে আছে যাহাকে পাওয়ার জন্য আমাদের আমরণ আপ্রাণ চেষ্টা—সেটা যে কি তাহা কেহ সুস্পষ্ট বলিতে পারে না—কেহ বলে আত্মার আকাঙ্ক্ষা, কেহ বলে প্রাণের বাসনা, কেহ বলে নৈসর্গিক অব্যক্ত শক্তির পরিপূর্ণতা। যে নামেই উহা অভিব্যক্ত হউক না কেন, উহা আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল—ঐ যে সংশ্লিষ্ট ভাব উহাই হইল সংস্কারের ধারা। ঐ সংস্কার বশতঃ জীব নানাযোনি ভ্রমণ করে। ঐ সংস্কার যেদিন আর থাকিবে না সেই দিন অহং ভাবের লোপ হইবে—আমি মুক্ত হইয়া তুমি হইব। এই যে তুমি হইবার বা তোমাতে আমার মিলনের প্রয়াস ইহাই পূজার আদি কথা। এইজন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলে লালায়িত—কিসে মুক্ত হইবে, কিসে তার অহং ভাব যাইবে, কিসে সে মুক্তি পাইবে, কিসে সে তাহার মূল সত্তার সন্ধান পাইবে। এই যে অনুচিকীর্ষা, এই যে পাইবার জন্য আকুলি বিকুলি এই ছিল মানবের বন্ধন দশা ছেদনের কারণ—এই খানেই মানব দেবত্ব অমৃতত্ব লাভের অভিলাষী। প্রাণী জন্মায়, প্রাণী মরে। জন্ম মরণ নিত্যসহচর। কিন্তু যখন প্রাণী তার মূল প্রাণ সত্তার সন্ধান পায়, যখন সে যে কি তাহা উপলব্ধি করে, যখন তার আত্মোপলব্ধি অনুভূতিগম্য হয় তখন সে আর সাধারণ মনুষ্য পদবাচ্য নয়—তখন সে কিছু অসাধারণ—তখন তার সংস্কারের খোলস যেন ছাড় ছাড়। খোলস ছাড়িলেই সে মানবের ঊর্দ্ধতন সিড়ির ধাপের উপরে উঠিয়া যায়। এখানে সে অমৃতের বর পুত্র হয়। তার জনম-মরণ-সন্তাপ সব দূর হয়—সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুপম শান্তির সাগরে সদা ভাসিতে থাকে। এই অনুভূতি প্রাপ্তির যে পথ তাহাই পূজা।

এই যে প্রাণের মধ্যে আকুলি বিকুলির অনবরত অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহাই যখন বাহিরে প্রকাশ হয় তখন বাক্যের রূপে মন্ত্রের সৃষ্টি হয়—উহার তেজে তখন মানব-প্রাণ উদ্ভাসিত হয়—যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি এক অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় আমাদের তন্মুহূর্ত্তেই হৃদিগম্য হইয়া যায়। যখন এই অবস্থা হয় তখনই পূজার সার্থকতা—তখনই মানব-জন্মের পূর্ণ সফলতা। যেমন বিদ্যুৎ কোন বস্তু বিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয় সেইরূপ আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি—আমাদের দেহ মন প্রাণ অবলম্বন করিয়া বহিঃপ্রবাহ লইয়া থাকে। তন্ত্রে বা যোগ শাস্ত্রে ঐ যে বিদ্যুতের স্থান উহাকে মূলাধার কহে। ওখান হইতে বিদ্যুতের গতি ক্রমোর্দ্ধ গতি পাইয়া সুষুম্নার মধ্য দিয়া বিম্ব প্রশাখা ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র গ্রন্থি অতিক্রম করতঃ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানব যেন কি এক অলৌকিক বিদ্যুতের তাড়নায় সদাই যুগপৎ তাড়িত হয়—যেন তার স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান থাকিয়াও থাকে না। উহাকে যোগশাস্ত্রে সমাধি অবস্থা বলে। এই জ্ঞানকে অন্য বস্তুতে দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কোন দেবদেবী বা একটা বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। ওখানে ঐ বোধ আরোপিত হইয়া আপনার অস্তিত্বের উপলব্ধি বেশ ভাল করিয়া অনুভূত হয়। তখন উপাস্য ও

উপাসকের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থির হয়। জ্ঞানার্থীরা উঁহাকে অদ্বৈত ভাবে সমাধিযোগ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া আমি ও তোমার শেষ সংমিলন সংসাধন করেন। ভক্তিমার্গীরা তুমি ও আমি পৃথক্ দেখিয়া দ্বৈত ভাবের রসাস্বাদন করিতে করিতে শেষে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত দুই এক হইয়া যান। ক্রিয়া মার্গীরা কর্ম্মী ও শক্তিকে ক্রমে অভিন্ন ভাবে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। যে দেবী বাহিরে সেই দেবী ভিতরে, যাহা অভ্যন্তরে তাহাই বাহিরে, যখন সাধকের এই জ্ঞান হয় তখন তিনি সাধনার শেষ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা যে প্রত্যেকে সেই কোন এক অব্যক্তের অংশ তাহা যখনই হৃদয়ঙ্গম হয় তখনই আমাদের অজ্ঞানান্ধকার সব দূরীভূত হইয়া যায়। তখনই আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হই। আমরা তখন অমৃতের পুত্র—মৃত্যু আমাদিগকে ভীত বা চকিত বা ত্রস্ত করিতে পারে না। এই যে অমৃতের সন্ধান পাওয়ার সাধনা উহাই পূজা।' আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে যাহা জন্মিয়া রহিয়াছে তাহাকে পাওয়াই পূজা। কাল নিত্যবর্ত্তনশীল, কালের বুকে অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় শক্তি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অনন্ত সাগর সঙ্গম—মিলনের দিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ছুটিয়াছে। এই কালস্রোতে স্থিতি লাভ করিয়া সেই অনন্ত স্রোতের সাথে সেই অনন্ত শক্তির লীলার বারণ উপলব্ধি করাই আপনার সত্তাকে জানা—আত্মাকে চেনা—পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ পাওয়া। মানুষের পক্ষে ইহার অপেক্ষা বড় জিনিস কাম্য আর কিছুই নাই। আপনাকে জানা চেনা, আপনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ ভাবে কথা বলা সব চেয়ে শক্ত—সব চেয়ে দুরূহ। অথচ মানবের এই হইল সাধ্য। ইহাই সাধনার বিষয়—সাধ্য সাধনার ক্ষেত্র। মহাকালের বুকে মায়ের পদচিহ্নের দাগ হৃদয়ে অনুভব করাই অমৃতত্বের সোপান—এখানে মানব অমর। যে আপনার শক্তিকে জানিয়াছে তার আর জগতে কি অজানা আছে? কারণ আপন শক্তিই বিশ্ব শক্তি। মহাকালের উপর আদ্যাশক্তির লীলাই আমার আমাকে জানিয়া কল্যাণ পাওয়া। শিব ত শব। শিব যখনই শক্তির সংস্পর্শে আসেন তখনই শব ছাড়িয়া গতিশীল হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন—তখন জগতের প্রকৃত কল্যাণ আরম্ভ হয়। সৃষ্টিই ত কল্যাণ।

এই যে সব পূজার মন্ত্র আছে উহা ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিবার এক একটী সিঁড়ির ধাপ বিশেষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র গ্রন্থীই আমাদের আপনাকে জানার বাধা—ঐখানের দরজা খুলিলেই সব খোলসা হইয়া যায়। ঐ যে সব তান্ত্রিকের হংস, যং বং লং রং শং ষং হং হৌংস মন্ত্র, ওগুলি শক্তিবিকাশের আভ্যন্তরিক এক একটী চিহ্ন মাত্র। উহা যখন সজীব হয় তখন বাক্য ও অগ্নিতে বা তেজে কোন প্রভেদ থাকে না। যা বাক্য তাই যে অগ্নি। অগ্নি যেমন বাহিরের তেজের আকার ধারণ করে, আমাদের মন্ত্রও সেইরূপ অন্তরের তেজের অন্তর বহ্নি সদৃশ। যখন এক একটী মন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রই সেই সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হৃদয়ে বা মানসে প্রস্ফুটিত হন তখনই সেই সেই মন্ত্রের প্রাণ আছে জানা যায়—তখনই মন্ত্র আর দেবতা এক হইয়া যান, তখন মন্ত্র আর নির্জীব প্রাণহীন থাকে না, মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতে থাকে, তখন মন্ত্র চৈতন্য হইয়া দাঁড়ায়। যখন উহার আলোকে সব দিক উদ্ভাসিত হইয়া যায় তখনই আমাদের সত্য পূজা হয়। আমরা তখনই আমাদের অন্তর নিহিত শক্তির যথার্থ বিকাশ দেখিতে বা বুঝিতে পারি, আমরা তখন বাক্‌সিদ্ধ হইয়া যাই। অর্থাৎ আমদের বাক্ যা, আমাদের শক্তিও তা, আমরা তাই ময় হইয়া যাই, তখন অন্তর বাহির সব এক। আমি তুমি বিশ্ব তখন এক সূত্রে গাথা—কারণ তুমি ভিন্ন বিশ্ব থাকিতে পারে না। তুমি আছ

বলিয়াই বিশ্ব আছে—বিশ্ব আছে বলিয়াই আমিও আছি। সুতরাং তুমি ও আমির মাঝখানে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ইহাই আমাদের কল্পনার বাস্তব রাজত্ব—এখানে আমরা আমাদের অস্তিত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি। এই হইল আমাদের স্থিতি ভূমি—এখান থেকেই সব দেখা যায়, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব ভোগ করা যায়। এখানে সেই দুর্জ্ঞেয় শক্তির বিকাশ—তাই এর নাম স্বভাব—এ নিজের ভাবে নিজেই মূর্ত্ত। এই স্বভাবকে পাওয়াও যা শক্তিকে পাওয়াও তাই। উভয়ের সূক্ষ্মতত্ত্বে উভয়ে মিলিত। তত্ত্বের মূল সব স্থানে এক। এই একত্বই বিশ্বের আদি কারণ। উহাই তন্মাত্র। এখানে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, ষড়দর্শন এক। এই এককে বিভিন্ন মুনি ঋষিরা বিভিন্ন অনুভূতির স্তর হইতে বিভিন্ন নাম দিয়াছেন। মূলে সবার তত্ত্বকথা একেরই কথা। কেহ বলিতেছেন জল আদি, কেহ বলিতেছেন তেজ আদি, কেহ বলিতেছেন বায়ু বা শূন্য আদি। কিন্তু ঐ সকলের মূল সূক্ষ্মতত্ত্ব সেই এক অনাদি অনন্ত অজ্ঞেয় শক্তি—যার জন্য এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্ট, স্থিত। উহাকে বোধে বা বেদে অর্থাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার জন্য কেহ ঘট স্থাপনা করেন, কেহ বা পট, কেহ বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। যাহাই হউক না কেন যখন উহাতে মন্ত্রের বলে প্রাণ শক্তি সম্পাদিত হয়, যখন উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে—তখন উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়—তখন আর ঘট, পট বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্জীব থাকেন না—তখন সাধকের বলে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হইয়া যান। তখন মাটির দেবী কথা কন, ভোগ খান, দেখা দেন। এজন্য রামপ্রসাদ মেয়ের রূপে, রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালিরূপে, অন্যান্য অনেক সাধক মাতৃরূপে তাঁর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আমাদের রসিক কবি জয়দেবও "মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পদপল্লবমুদারম্" লেখাইয়া লইয়াছিলেন। যেখানে ভাবের প্রাবল্য সেখানে ভক্তির বন্যা বহিবেই বহিবে। প্রেম যে গলান স্বভাবের ভাব। একারণ হৃদয়ের বল যে মস্তিষ্কের চেয়ে বড় কম নয়। এজন্য হনুমান উদ্ধব নারদ দাস্য ভাবে, সুবল অর্জ্জুন সখ্য ভাবে, শ্রীরাধা গোপীরা প্রিয়ভাবে মধুর রসের আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। সকলেরই—তুমি ও আমির খেলা। মা যশোদাও বাৎসল্য ভাবে ঐ রসেরই স্বাদ পাইয়া ছিলেন। এই যে রসাস্বাদন ইহাই পূজা। নিজেদের অন্তরের রসকে অন্যে আরোপিত করিয়া পাওয়ার নামই পূজা—"রসো বৈ সঃ"। সব যে রসময়। রস পূর্ব্বে জন্মে—উহা অন্য বস্তু ধরিয়া প্রতীকে প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায় যে—আমরা যখন কিছুর জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হই তখনই ঐ আগ্রহ মূর্ত্তি ধরিয়া অন্যের ভিতরে প্রকাশ পায়—তা কি ধর্ম্মে, কি শিল্পে, কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে। কোন কিছুর উৎকট শেষ অবস্থাই শেষ আনিয়া দেয়। একারণ দেখা যায় যে ভোগের শেষ মোক্ষ। ভোগও যে প্রধান পূজা। আত্মতৃপ্তি হইলেই হইল—তা যে ভাবেই হউক। তাই না আমাদের বিশ্বজননী মহামায়ার এক পা পশুরাজ সিংহের উপর—আর এক পা দুর্ব্বার মহিষাসুরের স্কন্ধে। সু ও কু ত মানসিক বিকার। প্রকাণ্ড দস্যু অতি লম্পটও যে শেষে মায়ের কোলে অতি শীঘ্র স্থান পায়—তার উদাহরণ রত্নাকর, বাল্মীকি, ও বিল্বমঙ্গল। প্রাণের যেখানে অতি আবেগ সেইখানেই উহা হৃদয়ের অভ্যন্তরে টগ্‌বগ করে ছুটতে থাকে—আর শেষে উহাই পূজা নাম ধরিয়া কোন প্রতীকে আশ্রয় লাভ করে। এ জন্য আমাদের চাই পূজার মূল বস্তু হৃদয়ের টগ্‌বগান ভাব—যাতে প্রাণ আকুল করে, হৃদয়ে স্পন্দন তোলে—আমাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। মুনি ঋষিদের প্রত্যেক মন্ত্র এইরূপ হৃদয়ের অতি আবেগের উপলব্ধির
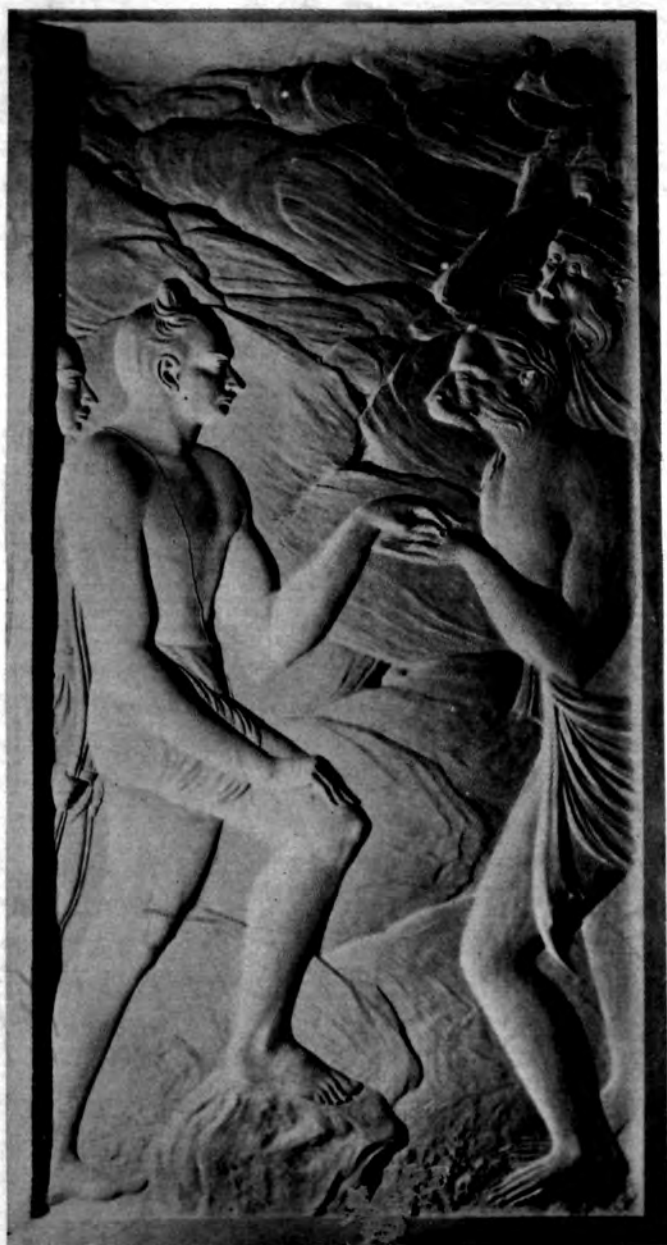
অঙ্গুরী দান

শিল্পী : কে, ভেঙ্কটাপ্পা ।

ফল। উহাতে প্রাণ আছে, উহাতে চৈতন্য আছে—উহা শক্তির আধার। আমরা যেন পূজা করিতে গিয়া মাত্র পুতুল খেলার ন্যায় খেলা করিয়া পৌত্তলিক, কাপালিক সাজিয়া না বসি।

আমাদের প্রত্যেক মন্ত্রোচ্চারণে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। যদি উহাতে মন্ত্র কর্তার প্রাণের যে ছাপ ছিল তাহার সহিত সমান দরদ, শ্রদ্ধা ভক্তি লইয়া উহা উচ্চারিত হয় তাহা হইলেই আমরা আমাদের পূজার সার্থকতা বুঝিতে পারিব—আমরাও ধন্য হইব। আমরা সেই আর্য্য ঋষিদের জলন্ত হৃদয় মাতান প্রাণস্পর্শী পূজার মন্ত্র আবাহন করিতেছি এ যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি। তাহা হইলে আমরা যে ভাবেই পূজা করি না কেন—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য যে মতাবলম্বীই হই না কেন আমরা আমাদের মূল উপাস্যকে ভুলিব না। আমরা অদ্বৈতীই হই, বিশিষ্টাদ্বৈতী হই, আর দ্বৈতাদ্বৈতীই হই, আমরা আমাদের পূজার যে স্থির লক্ষ্য তাহাতে পৌঁছিতে পারিবই পারিব। আমি তোমার, বা তুমি আমার, আমি তুমি এক বা বহু, তোমায় আমায় অভেদ জ্ঞান যে ভাবেই হউক শেষে আসিবেই আসিবে। কেহ বা বুদ্ধির দ্বারা মীমাংসা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা হৃদয়ের আবেগ দ্বারা প্রেমে তাঁকে পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। যিনি যে ভাবেই যাউন না কেন সকলের লক্ষ্য উপরের দিকে—হৃদয় বা মস্তিষ্ক উভয়েই মানবের উর্দ্ধাঙ্গে অবস্থিত। একটী অঙ্কুর হইতে যে দুইটী পাতা উদ্গত হয় তাহারও গতি উর্দ্ধমুখী। কেহ নীচগামী হইতে চায় না। এ কারণ বায়ুর শেষ শূন্য-উর্দ্ধে, জলের জমাট বাধা মেঘ বা বরফ বা তুষার তাহাও হয় নীলাকাশে, নয় উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরে; আলোকাধার সূর্য্য তাও উচ্চে, রসাধার সোমরাজ চন্দ্র তিনিও উপরে থাকিয়া তাঁর সুধাধারা ছড়াইতে থাকেন। একারণ আমাদের স্বভাবে অভাবে স্বতঃই আমরা উপরের দিকে উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকি—যেন আমাদের সব হইতে মহান্, সব হইতে শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু তাহা ঐ ঐ কোন অদৃশ্যে উচ্চে রহিয়াছে। আমরা দেবতার বাসস্থানকে স্বর্গ বলি, তাহাও উপরে, অপ্সরা গন্ধর্ব্ব কিন্নর তাদেরও আবাসস্থান যেন কোন সুদূরে—উপরে—ওই সেই হিমালয়ের পারে। হিমালয়কে আমরা সর্ব্বোচ্চ স্থান বলিয়া মানিয়া লইয়া থাকি, আর কৈলাস, সে হল দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান। উমা—তিনি হলেন মেনকা রাণীর কন্যা হিমালয়ের দুহিতা। যাহা কিছু বড়, যাহা কিছু মহত্তর, যাহা কিছু সত্য ধর্ম্মাবলম্বী সবাই যেন আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে—ভক্তিতে সেখানে আমাদের মস্তক স্বতঃই অবনত হয়। উহাই যেন সত্যের আশ্রয়স্থল—সৎ মানেই ত থাকা। অস্তি মানেই সৎ। একারণ তিনি সৎ তাই আমাদের মন্ত্র তৎ সৎ। এই তৎ-কে বুঝিলেই সৎকে পাওয়া যায়—আবার সৎকে জানিতে পারিলে তৎকে জানা যায়। যা শাক্তের মা তাই শৈবের শিব। যা বৈষ্ণবের কৃষ্ণ তাই অন্যের খৃষ্ট। কৃষ্ণ খৃষ্ট প্রভেদ কোথা? যিনি অম্বা তিনিই বিশ্বজননী অম্বিকা, আবার তিনিই কন্যারূপে অম্বালিকা। তাই আমাদের শাস্ত্রে যে রমণী সেই জননী—সেই দুহিতা—তনয়া। তাই না উমার এত আদর। জনয়িত্রী মা অথবা ধাত্রীরূপে বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী অম্বিকা আবার তিনিই পরিত্রাণকারিণীরূপে ভবভয়হারিণী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, আবার তিনিই ঘোরা—অতি ঘোরা কালী করালী। এই যে আমি, তুমি, বিশ্বজননী—এ সবাই এক। দ্বাণুকে একক। মাত্র দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে প্রসারতা বৃদ্ধি করা। যাদের ধর্ম্মে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই চৈতন্যময় তাদের আবার বিশেষ মূর্ত্তি বা প্রতীকের কি প্রয়োজন? তাদের ফল ফুল লতা পাতা

সকলই যে তাঁরই অংশ। এ কারণ সৃষ্টির শোভা ফুল, গন্ধের সেরা চন্দন, আলোকাধার দীপ, পত্র সুন্দর বিল্বদল, রসাধার ঘৃত দধি ক্ষীর, স্নেহাধার জল পূজার উপকরণ। যাহা পবিত্র, যাহা বিশুদ্ধ, যাহা পূত তাহাই তাঁহার অংশ। সেই অংশকে পূর্ণে অর্পণ করার নামই পূজা। এই অর্পণের অপর নাম নিবেদন। দশ অঙ্গুলি নিয়ে অঞ্জলি করেই দশদিকের দশ প্রহরণীকে দিতে হয়। বেদনাশূন্য হইয়া তাতে দিতে পারিলেই ত পূজার সার্থকতা। বেদনাশূন্য হওয়া যায় মাত্র তখন যখন প্রভেদ জ্ঞান থাকে না—যখন ভেদাভেদ এক হইয়া যায়। তাই আমাদের ষোড়শোপচারে পূজা—কত রকমে কত প্রকারে আপনাকে অচ্ছেতে আরোপ করিয়া তাঁকে নিবেদন করা—আমরা যে সকলিই সেই। এই জ্ঞান—এই বোধ প্রস্ফুটন করার নামই আত্মবোধ, আর যেখানে আত্মবোধে আত্ম নিবেদন সেইখানেই উপাস্য উপাসক সব এক—পূজ্য পূজক—হোতা হুত অভিন্ন। ঘটে পটে প্রতিমায় প্রতীকে ধূপে দীপে গন্ধে চন্দনে জলে আপনাকে আরোপ করিয়া উপাস্যকে উপাসকের সহিত উপাসনার নামই পূজা। সেইজন্য আচমন, সেই জন্য অর্ঘ্য, সেই জন্য বলি। তুমি আমি কেনা "বলি'। বলি মানেই ত উৎসর্গীকৃত। আমরা যে জন্মাবধিই মায়ের চরণে বলিরূপে অবস্থিত। তবে তা মায়া মোহ অজ্ঞানান্ধকারে বুঝিতে পারি না বলিয়াই না এত ঘোরাঘুরি, এত আসা যাওয়া, এত ভোগাভোগ। যেদিন সে ভাবের ভাবুক হইয়া সেইদিকে দৃষ্টি ফিরিবে সেইদিনই যে আমরা মায়ের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব—আমরা মায়ের ছেলে হইয়া আপনাকে জানিয়া মুক্ত হইব। তার জন্য চাই হৃদয়ের আবেগ—তার জন্য চাই গুরুর কৃপা। কেহ বা বনিতায়, কেহ বা কবিতায় কেহ বা ঢেঁকিতে, কেহ বা পক্ষীতে সে জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হয়, যেমন কিনা কবি জয়দেব, নারদঋষি হইয়াছিলেন। যে চোখ খুলে দেয় সেই গুরু।

আছে ত সব, ছিলও সব, থাকিবেও সব। সব হচ্ছে, যাচ্ছে, আবার হচ্ছে। এই যে হওয়া ইহার নাম ভব। এই ভবর অনুভূতিই ভাব। এই ভবকে ভাবের ভাবনায় ভাবিত করিয়া গতি দিয়া ভবানী করিতে পারিলেই ত সব সার্থকতা—ইহা করিবার যে কৌশল তাহার নাম পূজা বা উপাসনা। ভব—ভাব—ভবান্—ভবানী। যিনি ভব, তিনিই ভবানী—যিনি শিব, তিনিই শিবানী। মাঝে ভাবরূপে আমি, আর ভবান্ রূপে মহান্ বর্ত্তমান। এই মহান্‌কে পাওয়ার নামই পূজার সার্থকতা। যা বৃহৎ তাই ঋত—যা ঋত—তাই সত্য—যা সত্য তাই অমৃত, জগৎ ভাবময়। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই ভাবযুক্ত। গরু হাম্বা হাম্বা রবে, পাখী কিচিমিচি করিয়া, কীট ঝিল্লীশব্দে, পতঙ্গ ভন্‌ভন্ ভঙ্গিমায় আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্র মানুষ তার ভাব সুস্পষ্ট কথায় অনন্ত অগ্নির তেজে, অসীম শক্তিতে উদাত্ত, স্বরিত, প্লুত বা বৈখরী স্বরে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। তজ্জন্য মানবজন্ম সকল জন্মের সার। আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া যেন বেহুঁস হইয়া না পড়ি—আমাদের জন্মের সার্থকতাই ঐ পূজায়। ঐ আপনাকে জানায়—এ কথা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই। "আত্মানং বিদ্ধি" এই হল সকল নীতির বড় কথা। আমাদের অপৌরুষেয় বেদের কথাও "জান" তোমাকে জান। জানাই পূজার সফলতা।

কথা প্রসঙ্গে

(গায়ত্রী ব্যাখ্যা-সংগ্রহ)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

গায়ত্রী হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থ সম্বন্ধে অনেক সময় আমরা জিজ্ঞাসিত হই। সেই জন্ম বৈদিক গায়ত্রীর অর্থ বোঝবার জন্ম উপনিষদ্ ও বেদ ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা এখানে আমরা যথা সম্ভব সংগ্রহ করব। তন্ত্রে অন্যান্য দেবদেবীর অনেক গায়ত্রী আছে, উহাদের তাৎপর্য্য জ্ঞানও সায়ণাদি বৈদিকাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তা ছাড়া তান্ত্রিক ব্যাখ্যাও আমরা পরে উপস্থিত করবার চেষ্টা করব।

ঋগ্বেদের ৩ মণ্ডল। ৫ অনুবাক। ৬২ সূক্তের। ১০ ঋকটি হচ্ছে—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং।

ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

পদপাঠ—তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যং। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি। ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ॥*

ভাষ্যকার সায়ণ এটিকে চার রকমে ব্যাখ্যা করছেন—

(১) যে সবিতা দেব আমাদের ধর্ম্মাদি বিষয়া কর্ম্ম অথবা বুদ্ধি সকল পরিচালিত করেন, সর্ব্বান্ত-র্যামিতা হেতু যিনি প্রেরক, জগৎ স্রষ্টা, পরমেশ্বর—সেই সবিতা দেবের,—সকলের উপাস্য, জ্ঞেয় এবং সংভজনীয় যে বরেণ্য ভর্গঃ—যা অবিদ্যা এবং তার কার্য্য ভর্জন (দহন) করে, অথবা যে ভর্গঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজঃ, তার ধ্যান করি।

বেদক নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক "ধী" শব্দের দু রকমের অর্থই করেছেন—কর্ম্ম অথবা বুদ্ধি। "ভর্গ" শব্দের অর্থ যেখানে দহনকারী বোঝাবে সেখানে ওর ব্যুৎপত্তি √ভ্রস্জ্ হতে হয়েছে বুঝতে হবে। "ধীমহি" ক্রিয়াটি বৈদিক প্রয়োগ। আধুনিক সংস্কৃতে হবে ধ্যায়ামঃ।

(২) "তৎ" শব্দটি ভর্গঃ শব্দের বিশেষণ। সবিতা দেবের তাদৃশ ভর্গঃ ধ্যান করি। কী সেই ভর্গঃ? যে ভর্গঃ বুদ্ধি সকলকে প্রেরিত করেন—সেই ভর্গকে ধ্যান করি।

তৎ বা 'সেই' পদটি য বা 'যে' পদটিকে অপেক্ষা করে। তৎ শব্দ ভর্গঃ পদের বিশেষণ, সেই জন্ম "সঃ" পদটিও ভর্গঃ পদের বিশেষণ। কিন্তু ভর্গঃ পদটি ক্লীব লিঙ্গ। এবং সঃ পদটি পুংলিঙ্গ। বিশেষণ বিশেষ্যের অনুযায়ী না হওয়ায় সঃ পদের লিঙ্গ ব্যত্যয় হয়েছে। এ সকল বৈদিক প্রয়োগ আধুনিক সংস্কৃতে এরূপ চলে না।

(৩) যে সবিতা সূর্য্য কর্ম্ম সকলকে প্রেরণা করেন, সকলের প্রসবিতা, দ্যোতমান সেই সবিতা দেব বা সূর্য্যের, সর্ব্ব দৃশ্যমানতাহেতু প্রসিদ্ধ

---

* ব্যাহৃতি ও শিরঃযুক্ত গায়ত্রী যা বৈদিক প্রাণায়ামে ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। (গোভিলসূত্র)। প্রাণায়াম কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধ্যান করতে হয়।

সংভজনীয় বরেণ্য পাপ-তাপক ভর্গঃ বা তেজঃ মণ্ডল ধ্যান করি—ধ্যেয় রূপে মনে ধারণা করি।

(৪) ভর্গঃ শব্দের দ্বারা অন্নকেও বোঝায়। যে সবিতা দেব ধী সকলকে প্রচালিত করেন, তাঁর প্রসাদে ভর্গঃ—অন্নাদি লক্ষণ ফল ধ্যান করি—ধারণা করি—তাহার আধার ভূত হই—অর্থাৎ কি না ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হই।

ভর্গঃ শব্দের "অন্ন পরত্ব" এবং ধী শব্দের "কর্ম্ম-পরত্ব" আথর্ব্বণ শ্রুতিতে (গোপৎ ব্রাহ্মণ ১।৩২) দেখা যায়—"বেদাংশ্ছান্দাংসি সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য কবয়োঽন্নমাহুঃ কর্ম্মাণি ধিয়স্তদু তে প্রব্রবীমি প্রচোদয়াৎ সবিতা যাভিরেতীতি।"

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩ অধ্যায়ে ৩৫ মন্ত্রটি গায়ত্রী বা সাবিত্রী। উবটাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা প্রায় সায়ণ সম্মত। তাতে যেটুকু নূতনত্ব আছে, সেইটুকু মাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করছি—

"তৎ" শব্দ সবিতার বিশেষণ বলে ষষ্ঠীর ন্যায় ব্যবহার হবে। সবিতুঃ—সকলের প্রসবদাতার অর্থাৎ আদিত্য মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ-উপাধি-অবচ্ছিন্ন পুরুষ দেব—বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব ব্রহ্মের। ভর্গঃ শব্দের অর্থ (১) বীর্য্য হয়। প্রমাণ—"বরুণাৎ হ বা অভিষিষিচানাৎ ভর্গঃ অপচক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ"—(তৈঃ ব্রাঃ, ৫।৪।৫।১)। জগৎ প্রসবিতা ব্রহ্মের বীর্য্যকে ধ্যান বা নিদি-ধ্যাসন্ করি। অথবা (২) √ভ্রস্জী ভর্জনে—পাপদহনকারী ভর্গকে ধ্যান করি। অথবা (৩) ভর্গস্তেজোবচনে—ব্রহ্মের তেজকে ধ্যান করি। অথবা (৪) মণ্ডলপুরুষের রশ্মি সকল ধ্যান করি। "দেব" শব্দের অর্থ দানাদি গুণ যুক্তও হয়। তা হলে "সবিতুঃ দেবস্য" মানে হলো, 'সকলের প্রসবকারী দানাদি গুণযুক্ত ব্রহ্মের।' (সায়ণ পূর্ব্বে দেব শব্দের অর্থ দ্যোতনশীল বা প্রকাশশীল করেছেন)। "ধী" শব্দের অর্থ উবটাচার্য্য তিন প্রকার করেছেন—(১) বুদ্ধিসকলকে পরিচালিত করুন, (২) কর্ম্মসকলকে পরিচালিত করুন, অথবা (৩) বাক্য সকলকে পরিচালিত করুন। আর সব সায়ণেরই মত।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের অপর ভাষ্যকার মহিধর "দেব" শব্দের অর্থ দ্যোতনাত্মক বা প্রকাশাত্মক করেছেন অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃ জগৎ প্রসবিতার। "সবিতুঃ" শব্দের বিশেষণ দিয়েছেন—সকলের প্রেরক, অন্তর্যামী, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব, হিরণ্যগর্ভোপাধ্য-বচ্ছিন্ন, আদিত্যান্তর পুরুষ ব্রহ্মের বরেণ্য অর্থাৎ বরণীয়—সকলের প্রার্থনীয়, সর্ব্বপাপ, সর্ব্বসংসার দহন সমর্থ, সত্যজ্ঞানানন্দাদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য তেজঃ আমরা ধ্যান করি। আর সব উবটাচার্য্যেরই মত।

এক্ষণে এই মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ কে? ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (১।৬।৬) যা বলছেন—আচার্য্য শংকর তার ভাষ্য করছেন—'এই আদিত্যের অন্তর মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষকে দেখা যায়—যিনি হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, নখ পর্য্যন্ত যাঁর সব সুবর্ণময়। এখানে হিরণ্ময় মানে সুবর্ণের বিকার নয়, কারণ দেবতার শরীর সুবর্ণ বিকার হতে পারে না। তা ছাড়া অচেতন সুবর্ণাদিতে অপহত পাপত্বাদি ধর্ম্ম সম্ভব নয়। স্বর্ণ চোখে দেখা যায়, কিন্তু এই হিরণ্ময় পুরুষকে কেহ চর্ম্মচক্ষে দেখতে পায় না, সেই জন্য এখানে "হিরণ্ময়" শব্দের অর্থ জ্যোতির্ম্ময় বা চৈতন্যময়। "পুরুষ" শব্দের অর্থ দেহ রূপ পুরীতে যিনি শয়ন করেন, অথবা নিজ আত্মার দ্বারা যিনি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। নিবৃত্ত চক্ষু, সমাহিত চিত্ত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন পরায়ণদের দ্বারা যিনি দৃশ্য হন।'

তার পরের শ্রুতি (ছাউ, ১।৬।৭) হচ্ছে—

"কপির পুচ্ছাধোভাগের ন্যায় লোহিতান্ত পুণ্ডরীক যেরূপ, এঁর চক্ষু দুটিও সেইরূপ; তাঁর নাম 'উৎ'—কারণ তিনি সমস্ত পাপ হতে উত্তীর্ণ;

যে লোক ঐরূপ তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও সমস্ত পাপ হতে উদ্গত হন—নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।১৫) শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগের শেষ অধ্যায় হতে মণ্ডল পুরুষ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে এবং আচার্য্য শংকর তার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করছেন—

'হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়—ইষ্ট বস্তু যেমন কোনও পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে, সেইরূপ সত্যাখ্য ব্রহ্মও জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের দ্বারা (ঐশ্বর্য্য-দ্বারা) আচ্ছাদিত—কারণ অসমাহিত চিত্তেরা তাঁকে দেখতে পায় না। এখন সেই কথাই বলা হচ্ছে—সত্যের মুখ অপিহিত অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ (মায়াদ্বারা) আবৃত। অপিধান পাত্র অর্থাৎ পাত্রটি দর্শনের ব্যাঘাত জন্মায় বলে অপিধানের বা আচ্ছাদনের মত। হে পূষণ্—জগতের পোষণ্ করেন বলে সবিতা বা সূর্য্যের এক নাম পূষা। হে পূষণ্, তুমি ব্রহ্মদৃষ্টির প্রতিবন্ধ যে মায়াবরণ—অপাবৃত বা অপসারিত কর। কারণ সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। সেই সত্যধর্ম্মা আমি তোমারই আত্মভূত। সেই সত্য দর্শনের জন্য আমাতে যোগ্যতা বিধান কর।

'পূষন্ ইত্যাদি নামগুলি সূর্য্যের আমন্ত্রণ সূচক। হে একর্ষে—এক (প্রধান)+ঋষি=একর্ষি। যাঁরা সত্য দর্শন করেন, তাঁরাই ঋষি। সূর্য্য সর্ব্ব জগতের আত্মা ও চক্ষু স্বরূপ বলে সমস্ত জগতের তাৎপর্য্য দর্শন করেন। একর্ষির আর একটা মানে হতে পারে='যিনি একাকী গমন করেন'। কারণ মন্ত্র বর্ণে আছে—"সূর্য্য একাকী চরতি।" হে মণ্ডল বা জীবাবচ্ছিন্ন পরমাত্ম সূর্য্য! তুমি যম অর্থাৎ তোমা দ্বারাই সমস্ত জগতের সংযমন বা নিয়মন সম্পন্ন হয় বলে তুমি "যম" পদবাচ্য। কী ভাবে সংযমন্ করেন—বিশ্বের রস, রশ্মি, প্রাণ ও বুদ্ধি যথাযথ ভাবে পরিচালিত করেন। হে প্রাজাপত্য! প্রজাপতি হচ্ছেন সগুণ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভের অপত্য বা সন্তান, সেই জন্য মণ্ডল বা জীবাবচ্ছিন্ন পুরুষ প্রাজাপত্য—তুমি রশ্মি সমূহ অপসারণ কর—তোমার ঐশ্বর্য্যরূপ তেজঃ সংক্ষেপ কর যাতে আমি তোমাকে দর্শন করতে পারি। বিদ্যুৎ স্ফুরণে যেমন কোনও রূপ দর্শন করতে পারা যায় না, তেমনি তোমার তেজেও দৃষ্টি শক্তি ব্যাহত হওয়ায় তোমার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি গোচর হয় না। অতএব তোমার তেজঃ উপসংহার কর, আমরা তোমার কল্যাণ হতে কল্যাণতম রূপটি দর্শন করি। পশ্যামি=পশ্যামঃ—বচন ব্যত্যয় হয়েছে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের আভায় ভাষ্যে শংকর গায়ত্রী উপাসনার উপকারিতা বলছেন—'গায়ত্রী রূপেও ব্রহ্ম অভিহিত হয়ে থাকেন এবং এঁর মধ্য দিয়ে ব্রহ্মোপাসনাই সহজ, কারণ সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত এবং নেতি নেতি প্রতিষেধগম্য ব্রহ্মকে সহজে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, আরও অনেক ছন্দঃ থাকা সত্ত্বেও গায়ত্রীর প্রাধান্য অধিক, কেন না, গায়ত্রী দ্বারাই যজ্ঞীয় সোম আনয়ন করতে হয়, অপরাপর ছন্দের মধ্যেও গায়ত্রীর অক্ষর সন্নিবিষ্ট থাকায় গায়ত্রীই অপর সমস্ত ছন্দের ব্যাপক, সমস্ত সবন কার্য্যে গায়ত্রী ব্যবহৃত হয় এবং গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সারভূত এবং মাতার ন্যায়।' সেই জন্য ছান্দোগ্য (৩।১২) গায়ত্রী স্বরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করছেন—

"এই যে সমস্ত ভূত—প্রাণিসমূহ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক যা কিছু—গায়ত্রীরই স্বরূপ। এখানে গায়ত্রী কেবল ছন্দঃ মাত্র নয়। বাক্ বা শব্দই গায়ত্রী। শব্দ ছাড়া কোনও অর্থের জ্ঞান হয় না সেই জন্য সর্ব্বভূতই গায়ত্রী সাপেক্ষ। √গৈ+√ত্রা—এই দুটি ধাতু যোগে গায়ত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। সকল অর্থকে গায়ত্রী বা বাক্ বা শব্দ দ্বারা গান বা প্রকাশ করা হয় এবং বাক্যের দ্বারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা বা ত্রাণ করে। ১

"যা সেই গায়ত্রী তা এই পৃথিবী, কেন না, সমস্ত ভূতই এই পৃথিবীতে অবস্থিত, কেহই একে অতিক্রম করতে পাবে না। ২

"যা সেই পৃথিবী তা এই পুরুষাশ্রিত শরীর; কারণ সমস্ত প্রাণই এই শরীরে আশ্রিত, কেউ এই শরীরকে অতিক্রম করতে পারে না। ৩

"যা সেই পুরুষাশ্রিত শরীর, তা এই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃদয়। কেন না, এই প্রাণ সমূহ উক্ত হৃদয় মধ্যেই অবস্থান করে, কখনও তাকে অতিক্রম করতে পারে না। ৪

"সেই এই গায়ত্রী ছন্দোরূপা চতুষ্পদা এবং বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ এই ছয়টি বিধা অর্থাৎ ছটি করে অক্ষরে যে এক এক পাদ হয়, সেই এক এক পাদের প্রতি অক্ষরের স্বরূপ। মন্ত্র ভাগেও এইরূপ বর্ণিত আছে।" ৫

সামবেদে গায়ত্রীকে ছটি করে অক্ষরে এক পাদ এবং চার পাদে চব্বিশটি অক্ষরে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—

ত ৎস বি তু র্ বে | ণি য়ং ভ র্গো দে ব | স্য ধী ম হি ধি য়ো | যো নঃ প্র চো দ য়াৎ | কিন্তু যজুর্ব্বেদীরা (বৃউ, ৫।১৪।৭) আটটি করে অক্ষরে গায়ত্রীর একএকপাদ কল্পনা করেন এবং গায়ত্রীর উপস্থান (নমস্কার) মন্ত্রের দর্শত ও পরোরজঃ অপদ পদকে তুরীয় বা চতুর্থ পদ কল্পনা করেন। যথা—

ত ৎস বি তু র্ বে ণি য়ং | ভ র্গো দে ব স্য ধী ম হি | ধি য়ো যো নঃ প্র চো দ যাৎ |

ন ম স্তে, তু রী য়া য়, দ র্শ তা য়, প দা য়, প রো র জসে, হ্সা ব দো, মা, প্রা পৎ।*

চতুর্থ পাদ উপস্থান মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আমরা বৃহদারণ্যকীয় গায়ত্রী উপাসনা কালে করব। এঁদের মতে গায়ত্রীর আটটি অক্ষরের স্বরূপ হচ্ছে—ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌ (দ+যৌ) এই সর্ব্বলোক প্রকাশক আটটি অক্ষর। তারপর ছান্দোগ্য শ্রুতি (৩।১২) বলচেন –

"পূর্ব্বে যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েচে, সে সব সামবেদীয় চতুষ্পাদ গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি মাত্র। পুরুষ বা আত্মা তাঁ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্। চতুষ্পাদ গায়ত্রীর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভূতবর্গ আবার এই ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র, আর তাঁর নির্ব্বিকার তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে। ৬

"সেই যে গায়ত্রী ব্রহ্ম, তা পুরুষের বহির্দ্দেশ-স্থিত এই ব্যবহারিক আকাশ। আবার পুরুষের বহির্দ্দেশগত যে এই আকাশ, তা পুরুষের দেহ মধ্যগত আকাশ। সেই দেহমধ্যগত আকাশ, এই হৃদয় মধ্যগত আকাশ। সেই এই হৃদয়াকাশ পরিপূর্ণ ও নির্ব্বিকার। যে লোক এইরূপ হৃদয়াকাশ অবগত হন, তিনিও পূর্ণ ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করে থাকেন।" ৭।৮।৯

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দশ ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরে গায়ত্রীর উপাসনা যা বলা হয়েচে, তা সংক্ষেপে এই—

---

* সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে গায়ত্রীর আহ্বান, ধ্যান ও বিসর্জন মন্ত্র এইরূপ—

আবাহন—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

প্রাতঃ ধ্যান—ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

মধ্যাহ্ন ধ্যান—ওঁ সাবিত্রীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥

সায়াহ্ন ধ্যান—ওঁ সরস্বতীং শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সমবেদ সমাযুতাম্॥

[গায়ত্রী জপের পর প্রণাম—
নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো-মা প্রাপৎ।]

বিসর্জন—ও মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

ভূমি, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ (ভূ ভু ও স্বঃ) এই তিনটি শব্দে যে আটটি অক্ষর, তাই গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর যুক্ত প্রথম পাদের স্বরূপ। ঋক্, যজুংষি ও সামানি এই তিনটি শব্দের যে আটটি অক্ষর, তা গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর যুক্ত দ্বিতীয় পাদের স্বরূপ। প্রাণ, অপান ও ব্যান এই তিনটি শব্দের যে আটটি অক্ষর, তা গায়ত্রীর অষ্টাক্ষরযুক্ত তৃতীয়পাদের স্বরূপ। দর্শত ও পররজাই গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ। সূর্য্যমণ্ডলে যেন তিনি দেখা যাচ্চেন, সেই জন্য তাঁকে দর্শত বলে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি সমস্ত রজোগুণের পারে বলে কেহ তাঁকে দেখতে পায় না—মাত্র যাঁরা সমাধিবান তাঁরাই তাঁকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন। শোনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। এই প্রত্যক্ষই সত্য। সত্য অপেক্ষা বল বা প্রাণই শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রাণ সাহায্যেই মানুষ সত্যাচরণ করে। আবার এই গয় বা প্রাণ সমূহকে যিনি ত্রাণ করেন, তিনিই গায়ত্রী। কোন কোন বেদশাস্ত্রী সাবিত্রীকে অনুষ্টুপ ছন্দে উপদেশ করেন, কিন্তু শ্রুতি আদেশ করেছেন যে সাবিত্রীকে গায়ত্রীছন্দেই উপদেশ করবে। বিদেহাধিপতি জনক অশ্বতরাশ্বির পুত্র বুড়িলকে উপদেশ করেন যে অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। লোকে যেমন অগ্নিতে বহু বস্তু ও যদি প্রক্ষেপ করেন, তা হলেও অগ্নি যেমন সে সমস্ত দগ্ধ করে, তেমনি গায়ত্রীমুখবিদ্ পুরুষ যদি বহু পাপকর্ম্মও করেন, তা হলেও গায়ত্রী তাঁর সর্ব্বপাপ ভক্ষণ করে তাকে শুদ্ধ, পূত, অজর ও অমৃত করেন। ১৮

এক্ষণে হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে" যে স্মৃতি সাহায্যে একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন, তার অনুবাদ আমরা এখানে দিচ্ছি—

"সেই সবিতার সেই তেজঃ আমরা চিন্তা করি। এখানে যদিও ভর্গ শব্দের বিশেষণরূপে 'সেই' এই 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ নেই, তথাপি 'যে' এই 'যদ্' শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই 'তদ্' শব্দের 'তৎ' পদ উহ্য করে নিতে হবে। গায়ত্রী ব্যাকরণে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলেচেন, "যেখানে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ থাকবে সেইখানেই 'যদ্' শব্দ উহ্য ধরে নিতে হবে এবং যেখানে 'যদ্' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাবে, সেইখানেই 'তদ্' শব্দ অধ্যাহার্য্য হবে।" কিরূপ সবিতা?—যিনি সর্ব্বভূতের প্রসব কর্ত্তা। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "সবিতার অর্থ সর্ব্বভূতের প্রসবকর্ত্তা। সবিতা চেতন অচেতন সর্ব্বভাবের প্রসবকর্ত্তা। 'সবন' শব্দের 'উৎপাদন' ছাড়া 'পাবন' অর্থও হয়, অর্থাৎ যিনি সকলকে পবিত্র করেন।

পুনরায় সে সবিতা কিরূপ? না, তিনি দেব অর্থাৎ দীপ্তি ক্রীড়া যুক্ত। তাই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "তিনি সর্ব্বদা দীপ্তিশালী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ ক্রীড়াবান, সদা আকাশমণ্ডলে উপাধিযুক্ত হয়ে দ্যোতমান এবং রুচি দ্বারা সকলকে তর্পিত করেন, তাই তিনি দেব শব্দের দ্বারা আখ্যাত হন।"

সেই ভর্গ কিরূপ—না, যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিসকলকে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষে প্রেরিত বা নিয়োজিত করেন। তাই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "আমরা সেই ভর্গের ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে পুনঃপুনঃ পরিচালিত করেন।"

এই ভর্গ শব্দের দ্বারা বহুবিধ মাহাত্ম্যযুক্ত, সবিতৃমণ্ডল মধ্যগত, আদিত্য দেবতা স্বরূপ পুরুষকে বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "ভর্গ শব্দটি √ভ্রস্জ ধাতু হতে হয়েচে। √ভ্রস্জ ধাতুর চারিটি অর্থ—(১) পাক করা—সূর্য্য হতেই সমস্ত বস্তুর পাক বা রূপান্তর হয়; (২) প্রকাশ করা—সূর্য্য এই সৌর মণ্ডলের প্রকাশক; (৩) দীপ্তি পাওয়া—সূর্য্য আকাশে দেশ কালাবচ্ছিন্নরূপে সদা দীপ্তিমান; এবং (৪) সংহার করা—সূর্য্য প্রলয় কালে তাঁর সর্ব্বাকাশ ব্যাপী কালাগ্নিরূপ (Cosmic Light) ধারণ করেন এবং সপ্ত রশ্মির দ্বারা জগৎ উপসংহার করেন; এই জন্যই তাঁর নাম

ভর্গ। অথবা (১) 'ভ' শব্দের অর্থ—যিনি পদার্থ সমুদয়ের আকৃতি বিভাগ জ্ঞান করিয়ে দেন, (২) 'র' শব্দের অর্থ—যিনি সমুদয় সৃষ্ট-পদার্থের রঞ্জন বা বর্ণ (colour) উৎপাদন করেন, এবং (৩) 'গ' শব্দের অর্থ যিনি অজস্ররূপে গমনাগমন করেন; এইজন্য তিনি ভ, র, গ বা ভর্গ রূপে অভিহিত হন।

এই ভর্গ বহিরাকাশে সূর্য্য মণ্ডলের অন্তঃস্থ হয়েও সকল প্রাণীদের মধ্যে জীবোপাদান রূপে অবস্থান করে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "আদিত্যের অন্তর্গত যিনি জ্যোতিরও উত্তম জ্যোতিঃ, তিনি সকল ভূতের হৃদয়ে জীবভূতরূপে অবস্থান করচেন। এইরূপ একটি শ্লোক আছে, "অন্তরে হৃদ্‌ব্যোমে যিনি তাপ দান করেন, তিনি বাহ্যে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত। ইনিই অধূম বহ্নিতে বিচিত্র জ্যোতিঃ। সাধকগণ কর্তৃক হৃদয়াকাশে যে জীব বর্ণিত হন, তিনিই আদিত্যরূপে বহির্নভে রাজিত।" যদিও এই ভর্গ প্রাণি-হৃদয়ে জীবরূপে এবং আকাশে আদিত্য মধ্যে পুরুষরূপে বর্ত্তমান, তথাপি এঁদের মধ্যে ভেদ নেই। সেই জন্য আমাদের বুদ্ধি সকলের যিনি পরিচালনকারী—প্রাণি-বুদ্ধি প্রেরক হৃদয়বর্ত্তী ভর্গ তিনিই চিন্তনীয়। তবে এই ধ্যানের এইটুকু বিশেষত্ব এই যে সূর্য্য-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভর্গের সহিত স্বীয় অন্তরবর্ত্তী ভর্গের অদ্বৈত ভাবে একীভূত চিন্তা করবে।

পুনশ্চ কীরূপ ভর্গ?—না বরেণ্য, বরণীয় জন্ম মৃত্যু দুঃখাদি নাশের নিমিত্ত, ধ্যানের দ্বারা উপাসনীয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "জন্ম সংসার ভীরু মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু এবং ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের জন্য সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বরেণ্য ভর্গ-পুরুষকে ধ্যান দ্বারা দর্শন করবেন।'

পুনরায় এই ভর্গ কিরূপ?—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোকস্বরূপ আদিত্যাত্মক ভর্গ। ভবিষ্যপুরাণে আছে, বাসুদেব বলচেন, "সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনি জগতের চক্ষুঃ স্বরূপ ও দিবাকর। এঁ অপেক্ষা শাশ্বতী দেবতা আর কেউ নেই। এই সমগ্র জগৎ সূর্য্যের অঙ্গ হতে উৎপন্ন হয়েচে এবং তাঁতেই লয় পাবে। ক্রুট পল, দণ্ডাদি কাল বিভাগ, গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, রাশি, করণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, অনল, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শম্ভু, ভূলোক, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং দশদিক-দিবাকর (Cosmic Heat) হতে জাত।"

ত্রিলোকের সমস্ত পদার্থ—সূর্য্যেরই পরিণাম দেখাবার জন্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলচেন, "তপস্যা ও জ্ঞানের উদ্ভব স্থল দীপ্ত হৈরণ্যমণ্ডল এক হয়েও অদিতি (অখণ্ড আকাশ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হয়েচেন। এই তেজোমণ্ডলের উল্ব (গর্ভাবরণ) হতে সুমেরু, শোণিত হতে সপ্ত সমুদ্র, জরায়ু হতে ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ধমনী হতে নদী সকল উৎপন্ন। যাঁর কপালদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবী এবং কপাল মধ্যস্থ শূন্যাংশ আকাশ নামে খ্যাত—এখান হতেই ত্রিলোকের উদ্ভব। এই অণ্ড-কপালদ্বয় মধ্যে আকাশ রূপ কারণ জলে একটি ধাত্রী বা পৃথিবী আর দ্বিতীয়টি নন্দন-কানন বা স্বর্গ। এই উভয়ের মধ্যে যে শিশু জাত হন, তিনিই মার্ত্তণ্ড সবিতা।"

এ সমুদয় চরাচরাত্মক (Organic and Inorganic) ত্রিলোকই ভর্গ স্বরূপ। এই ভর্গ হতে পৃথক আর কোনও বস্তু নেই। অতএব ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়-যুক্ত গায়ত্রী দ্বারা কেবল ভর্গ মাহাত্ম্যই প্রতিপাদিত হয়েচে। (ইতি হলাযুধকৃত ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব)*

---

* কয়েক দিন পূর্ব্বে রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর লিখিত "গায়ত্রী" নামক একখানি পুস্তিকায় গায়ত্রীর শাংকর ভাষ্য উদ্ধৃত হয়েচে। এ তিনি কোথা হতে পেলেন তার কিছুই উল্লেখ নেই। যা হোক তিনি যে শাংকর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ দিয়েছেন তাই আমাদের পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করচি—'সর্ব্বদেবাত্মক

গায়ত্রীর আগে ও পরে ওঁ পুটিত করে জপ করতে হয়। এই ওঁ বা প্রণব সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (১।১) বলচেন, "ওঁ এই ব্রহ্মের প্রিয় নামটকে তাঁর প্রতীকরূপে উপাসনা করবে।

সর্বশক্তিমান ও যে ওজঃ সকল পদার্থের প্রকাশক, সেই তেজঃ স্বরূপ পরমাত্মা যে সর্বাত্মক, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, পরমাত্মার সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদক গায়ত্রী মহামন্ত্রের উপাসনা প্রকার প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিগণ প্রণবাদি সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত (ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং) শিরঃ সমেত গায়ত্রী (গায়ত্রীর পর ওঁ আপোজ্যোতীর-সোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্) সর্ববেদসার বলিয়াছেন। এইরূপ বিশিষ্ট গায়ত্রী প্রাণায়াম দ্বারা উপাসনা করিতে হয়। সপ্রণব ও তিনটি ব্যাহৃতি যুক্ত প্রণবান্ত গায়ত্রী জপাদির দ্বারা উপাস্য। তন্মধ্যে শুদ্ধ গায়ত্রী প্রত্যেক আত্মা ও বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যে একই পদার্থ তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। "আমাদের বুদ্ধি সমূহকে যিনি প্রেরণ করেন" এই কথার দ্বারা সকল জীবের বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণ সমূহের প্রকাশকে সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা, ইহা কথিত হইয়াছে। "প্রচোদয়াৎ" এই শব্দের দ্বারা সেই আত্মার স্বরূপ ভূত পরমব্রহ্ম নির্দিষ্ট। সেই পরমব্রহ্ম "তৎসবিতুঃ ইত্যাদি শব্দের দ্বারাও নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মের "ওঁ" "তৎ" "সৎ" এই তিন প্রকার নির্দেশ। এজন্য পূর্বোক্ত স্থলে "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে "তৎ" শব্দ আছে তদ্দ্বারা প্রত্যগ্ভূত স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম বলা যাইতেছে। "সবিতুঃ" এই শব্দের দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি ও লয় যাহার লক্ষণ। বুঝিতে হইবে এইরূপে সমস্ত জন্য জগতেরও সমস্ত দ্বৈত বিভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছে। "বরেণ্য" এই শব্দের দ্বারা সকলের বরণীয় নিরতিশয়ানন্দরূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে। "ভর্গস্" এই শব্দের দ্বারা অবিদ্যাদি দোষের ভর্জনরূপ, এইরূপ জ্ঞানের বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। "দেবস্য" এই শব্দ দ্বারা সর্ব প্রকাশ স্বরূপ অখণ্ড চিদানন্দ লক্ষিত হইয়াছে।

'বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপ আমার যে স্বরূপ, যাহা সকলের অধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ ও যাহাতে সমস্ত অবিদ্যাদি অনর্থ নিরস্ত, এমন স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে, এই প্রকারে ধ্যান করি। এইরূপ হইলে ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্ম 'বনস্ত জড় জগতে রজ্জু সর্পের ন্যায়, অধ্যারোপ ও অপবাদের সামানাধিকরণ্যরূপ একত্ব এবং "সোঽহং" "সেই" এই দেবদত্ত ইত্যাদির ন্যায় সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মার অভেদরূপ একত্ব হয়। সুতরাং এই গায়ত্রী মন্ত্র সর্বাত্মক ব্রহ্ম বোধক প্রতিপন্ন হয়।'

উক্ত শংকর ভাষ্যে ব্যাহৃতিগণ নিম্নলিখিত ধাতু সমূহ হতে উৎপন্ন দেখা যায়—ভূঃ—√ভূ—সৎ বা অস্তি, ভুবঃ—ভাব—প্রকাশ বা চিৎ, স্বর্—√স্বৃ—সুখ বা আনন্দ, মহঃ—√মহী—পূজ্য, জনঃ—√জন্—জনক বা কারণ, তপঃ—√তপ্—তেজঃ, সত্যং—সর্ববাধারহিত নির্গুণ। গায়ত্রী শিরে আপঃ=সর্বব্যাপী কারণ বারি বা সৎ, জ্যোতিঃ=প্রকাশ স্বরূপ চিৎ, রস=আনন্দ, অমৃত=পরিণামহীন, ব্রহ্ম=বৃহৎ। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও পূর্বে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পৃথিবী ভূত সকলের রস (সার) স্বরূপ, পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধী, ওষধীর রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্, বাক্যের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্গীথ বা ব্রহ্মপ্রতীক ওঁকার। এ সর্বরসের রসস্বরূপ নামীর (ব্রহ্মের) এই নাম অর্দ্ধ স্বরূপ এবং সকল রসের এ অষ্টম। বাক্ ঋক্ স্বরূপ এবং সাম প্রাণ স্বরূপ—এই বাক্-প্রাণাত্মক মিথুন ওঁ এর সহিত মিলিত হলেই সর্ব্ব কামনা সম্পাদন করেন।" ১-৬।

অথর্ববেদীয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদে (১-১২) ভূত ভবৎ ও ভবিষ্যৎ সবই ওঁকার বলা হয়েচে। ওঁকারের প্রথম পাদ 'অ'কার—জাগ্রৎ অবস্থা, স্থূল, প্রত্যক্ষ, দৃশ্য, বহিঃপ্রজ্ঞ, বৈশ্বানর। দ্বিতীয় পাদ—'উ'কার স্বপ্নাবস্থা, সূক্ষ্ম, দৃশ্য, অন্তঃপ্রজ্ঞ, তৈজসঃ। তৃতীয় পাদ 'ম'কার—বীজস্বরূপ, সুষুপ্ত্যবস্থা, একীভূত, প্রাজ্ঞঃ। তুরীয় বা চতুর্থ পাদ—অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যম, অগ্রাহ্যম, অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারম্, প্রপঞ্চোপশমম্, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।

তন্ত্র মতে যে ব্রাহ্মণ সপ্তাঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা যুক্ত ওঁকার অবগত নহেন, তিনি ব্রাহ্মণই নন। মাণ্ডুক্যকারিকার আগম প্রকরণে সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশ মুখের উল্লেখ আছে, কিন্তু তারা কী—তা বলেন নি। আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি উল্লেখ করে মাত্র সামান্য একটু বলেচেন—বিরাট পুরুষ বা স্থূল দৃশ্যমান্ জগতের মূর্দ্ধা—সুতেজঃ, চক্ষুঃ—বিশ্বরূপ, প্রাণ—পৃথক বর্ত্ম, আত্মা—সন্দেহ বহুল, বস্তি—রয়ি, পাদ—পৃথিবী, এই সপ্ত অঙ্গ। জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয় দশ, পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত—এই উনিশটি মুখ। কিন্তু তন্ত্র মতে—সপ্তাঙ্গ হচ্চে—অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা এবং কলাতীত। চতুষ্পাদ হচ্চে—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান হচ্চে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং পঞ্চ দেবতা হচ্চে

—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর। এ সকল তত্ত্বের কিছু আলোচনা আমরা ১৩৪১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় করেছি। এর বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ সাপেক্ষ। তবে সংক্ষেপে এখানে কিছু বলব।

অ—রজোগুণ, উ—সত্ত্বগুণ, ম—তমোগুণ। নাদ=মহত্তত্ত্ব (বা স্পন্দমুখ শক্তি) এবং বিন্দু= অহঙ্কার তত্ত্ব। কলা শব্দের অর্থ অঙ্কুর—তামসিক অহংকার হতে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রের উৎপত্তি এবং এরাই পঞ্চীকৃত হয়ে (এক একটির ½ এবং বাকি চারটির ⅛) আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতির উৎপত্তি হয়েচে। এঁদের অধিপতি দেবতা হচ্চেন মহেশ্বর, ঈশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এই পঞ্চ দেবতা। তারপর রাজসিক অহংকার হতে শব্দাদি পঞ্চ শক্তি এবং তা হতে বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। তারপর সাত্ত্বিক অহংকার হতে হয়েচে শব্দাদি পঞ্চ চৈত্তিক জ্ঞান এবং তা হতে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর ঐ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিন্দু বা অহংকার মিলিত ভাবে হয়েচে—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও চিত্ত্ব। চিত্ত ও চিত্ত্ব উভয়ই অবচেতন ভূমি—এখানে অনাদি কালের সংস্কার তোলা আছে, তবে প্রথমটার সংস্কার ব্যবহার হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টির সংস্কার কবে কোন সময়ে ব্যবহার হবে তার কোনও স্থিরতা নেই। এ সবই কলা। আর কলাতীত হচ্চেন এ সকলে অণুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

প্রণব তিন প্রকার—অপর, পর ও মহাপ্রণব। গায়ত্রীর প্রথম প্রণবটি অপর—অঙ্গ পদাদি বিভাগ অপর প্রণবেই সম্ভব। গায়ত্রীর 'তৎ' রূপ পরব্রহ্ম পাদটিই পর বা তুরীয় বা নির্গুণ প্রণব। এখানে মাত্রাতীত অবস্থা বলে বিভাগাদি অসম্ভব। (৪৮০,৪৮১ পৃঃ পাদটীকায় শংকর ভাষ্য দেখুন)। কারণ যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে এমন পঞ্চীকৃত ভূত, অথবা যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে অথচ বেধ নেই এমন ভূত, অথবা যাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ ও বেধ নেই এমন যে তন্মাত্র, অথবা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ হীন যে অন্বীক্ষা বা বিন্দু অথবা স্পন্দোন্মুখ শক্তি বা নাদ সেখানে সম্ভব নয়।

গায়ত্রীর শেষ প্রণবটি মহাপ্রণব—এ পর ও অপর প্রণবের সংশ্লেষ। মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ—সপ্ত আম্নায়। পাদ চতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ত্রিস্থান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। হিরণ্যগর্ভ (স শক্তিক ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব), সশক্তিক ঈশ্বর (কলা) সশক্তিক মহেশ্বর (বিন্দু) সশক্তিক পর-শিব (নাদ) ও পরমব্যোম (নাদাতীত) এই পঞ্চ দেবতা।

এ সকলেরও বিশদ বিবরণ অপর প্রবন্ধ সাপেক্ষ। কাজেকাজেই আমরা এখানে নিরস্ত হলুম
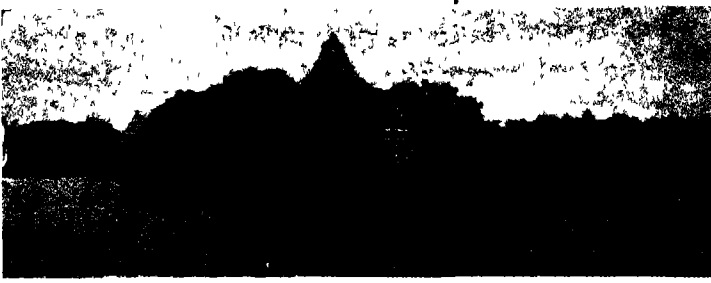
মারিয়াম্মান্ কোভিল]   [মাদুরা, সপ্তদশ শতাব্দী

দক্ষিণ-ভারতের পথে

স্বামী সুন্দরানন্দ

দক্ষিণ ভারতের প্রধান সহর—বিশেষ করে প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানগুলো দেখ্বার সংকল্প নিয়ে ১৯৩৪ সনের ১৪ই এপ্রিল ওয়েলওয়েতা (সিংহল) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হতে অপরাহ্নে কলম্বো বন্দরে এলাম। বি, আই, এস্, এন কোম্পানীর জাহাজে পাশ্চাত্য ডেক্ যাত্রী (European Deck Passenger) শ্রেণীর টিকেট নিয়ে টুটিকোরিণ হয়ে যাবো এরকম অভিপ্রায়। গরীব সাহেবরা সাধারণতঃ এ শ্রেণীতে যাতায়াত করেন, এ কতকটা মধ্যম শ্রেণীর মতো। জাহাজ ছাড়তে তখনও ঘটা খানেক বিলম্ব আছে। জগতের প্রায় সব বন্দর হতেই এখানে জাহাজ আসে, কাজেই এই ভাসমান পান্থশালাটীতে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের প্রায় সব জাতের লোক দেখা যায়। জলযানের কৃপায় জগতের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা যেন পাড়াপড়শীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূরত্বের ব্যবধান বিনষ্ট করে সমগ্র বিশ্ব-মানবের মধ্যে নৈকট্যের সম্বন্ধ সৃজন এবং ভাবের সহজ ও দ্রুত আদান-প্রদান সংস্থাপন কার্য্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দান অশ্রুতপূর্ব্ব। দেখ্তে দেখ্তে লঞ্চ এসে পড়্লো, আমি উপস্থিত বন্ধুবর্গের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে লঞ্চে উঠ্লাম। মন্থরগতিতে যাত্রা করে লঞ্চখানা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিরাট বপুঃজাহাজের গায়ে এসে লাগ্লো। জাহাজটীর নাম 'এস্, এস্, ছাক্লা'। ওপরে যেয়ে দেখি অর্ণবযানটী যাত্রীতে একেবারে আকণ্ঠ পূর্ণ। যথাস্থানে জায়গা করে জাহাজটী একবার বেশ করে দেখেনিলাম। সাম্পান জাতীয় ছোট ছোট নৌকায় নানারকমের খেলনা নিয়ে সিংহলী ফেরিওয়ালারা যাত্রীদের নিকট বিক্রি করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধূমোদ্গীরণ করতে করতে বিরাটকায় জলযান সদাশান্ত বন্দরের জলরাশি আলোড়ন করে ধীরে ধীরে দেয়ালের বাইরে সমুদ্রে এসে পড়্লো; সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাহাজটী গভীর সমুদ্রে এসে আন্দোলিত হতে লাগ্লো। তখন মুগ্ধান্তঃকরণে দেখ্লাম,—

> "চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
> আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
> লক্ষ লক্ষ হাতে। একদিকে যায় দেখা
> অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বন রেখা ;—

অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যের পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ধীরে ধীরে কলম্বো সহর ও পরে স্বর্ণ লঙ্কার সীমা-রেখা নয়ন-পথের বহির্ভূত হয়ে অনন্তের কোলে মিশে গেল। জানিনা এম্নি ভাবে কবে এই নামরূপের জগৎ মন হতে অদৃশ্য হয়ে অনন্তের অরূপ-রূপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। চারদিকে সুদূরবর্ত্তী চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত নীলাম্বুলহরী সীমাহীন অন্তহীন মহাসমুদ্রের বক্ষে আনন্দে নৃত্য করছে। যে দিকে চাই যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল দিঙ্মণ্ডলব্যাপী ক্ষিপ্তোন্মত্ত তরঙ্গরাশি যেন জগৎ ছেয়ে আছে। কি গম্ভীর—কি মহান এই দৃশ্য!

জাহাজটীতে প্রায় হাজারের ওপর যাত্রী সব দক্ষিণদেশী কুলী, সিংহলে সাহেবদের চা বাগানে কাজ করে এই বিধাতার অভিশপ্ত জীবগুলো দেশে ফিরে যাচ্ছে। অধিকাংশের সঙ্গেই সম্বল মাত্র ছেঁড়া মাদুর এবং ময়লা কাপড়ের গাঁটরি। দক্ষিণ ভারত হতেই বেশীর ভাগ কুলী অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্ম এবং আসাম প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। দেখ্‌লাম ভগ্নস্বাস্থ্য কঙ্কালসার স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা অধিকাংশই ছিন্ন নোংরা কাপড় চোপড় পরে ডেকের যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। এই মানব নামধেয় জীবগুলোর প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের দৈন্য ও দারিদ্র্যের নির্ম্মমতা প্রসূত বহু বেদনার বিষতিক্ত গ্লানি যেন নিঃসৃত হচ্ছে। হায় বিধাতার কি দারুণ বিদ্রূপ, যাদের খাদ্য একটু তেঁতুল জল আর ভাত, তাদেরও শুধু উদরান্ন সংস্থানের জন্য কি জঘন্য জীবন—কি উন্মত্ত প্রচেষ্টা। এই বিশাল ভারত—বিপুল এর ঐশ্বর্য্য, তবু এদেশের অগণিত জনসঙ্ঘ এম্নিভাবে দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা ও অজ্ঞানতায় পাঁকের পোকার মতো কেন ডুবে রয়েছে? প্রশস্ত-বক্ষা নির্ম্মলা স্রোতস্বিনী সম্মুখ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর তারই তীরে থেকে এই হতভাগ্য পশুপ্রায় জীবগুলো পয়ঃপ্রণালীর জলপান করতে বাধ্য হচ্ছে। যতদিন একদল শক্তিমান বুদ্ধিমান লোক আপনাদের ভোগের জন্য যত অধিক অর্থ স্তূপীকৃত করতে চেষ্টা করবে, ততদিন তাদের সীমাশূন্য স্বার্থ ও বিজ্ঞানসম্মত প্রবঞ্চনারূপ ইন্ধনে আর একদল দুর্ব্বলচিত্ত অজ্ঞ লোককে শুধু দুমুঠো উদরান্নের জন্যও এম্নিভাবে তত অধিক জ্বলে পুড়ে মরতে হবেই।

এত বড় জাহাজটীতে প্রায় দেড় হাজার যাত্রীর মধ্যে আমি একা বাঙালী। চাঁটগেঁয়ে মুসলমান খালাসী এ জাহাজে ৬২ জন আছে, এরা সব ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী, তামিল ও চাঁটগেঁয়ে ভাষা মিলিয়ে 'কচ্চাল্লাদা' গোছের এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষায় অন্যের সঙ্গে কথা বলে। এদের মধ্যে অনেকেই ৬।৭ বৎসর যাবৎ দেশ ছেড়ে এই জলযানের ওপরই জীবন কাটাচ্ছে। বাঙালী যাত্রী এরা কদাচিৎ দেখে, কারণ এ পথে বাঙালী খুব কম যাতায়াত করে। এই বিরাটকায় জাহাজটী প্রকৃতপক্ষে এই নিরক্ষর বাঙ্গালী মুসলমানরাই দিনরাত সমুদ্রের মধ্যে চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—সমগ্র হিন্দুজাতি জাতের উপদ্রবে বর্ত্তমান সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং ধনাগমের প্রধান অবলম্বন এই জাহাজের কাজ হতে বঞ্চিত থেকে কি ভীষণ আত্মহত্যাই না করছে। যে জাতি জীবিকার্জ্জনের এমন উপায়কে বর্জ্জন করে আছে, সে জাতির বেকার সমস্যা কে দূর করবে?

পরদিন এই সীমাহীন অন্তহীন সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌লাম। এর সঙ্গে তীর হতে সূর্য্যোদয় দেখার তুলনাই হয় না। কি অবর্ণনীয় শোভা! পূর্ব্বদিকের দিক্‌চক্রবালস্থিত সুনীল

নভোমণ্ডলের কতকটা স্থানের তমিস্রা সহসা বিদূরিত হয়ে রক্তরাগ রঞ্জিত হলো, একটা প্রকাণ্ড গোলাকার অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণপাত্র যেন সমুদ্রস্নাত হয়ে আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ওঠে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকে উদ্ভাসিত করলো। বেলা ৯টার সময় পূর্ব্বঘাটের পর্ব্বতরাজী প্রথমতঃ বহুদূরে মেঘমালার ন্যায় দেখা গেল এবং ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জাহাজটী টুটিকোরিণ বন্দরের ৩।৪ মাইল দূরে এসে নঙ্গর করলো। এখান হতে সমুদ্রের গভীরতা কম, কাজেই জাহাজটী আর বেশী দূর অগ্রসর হতে পার্‌লো না। আমরা জাহাজ হতে নেমে একটা ক্ষুদ্র ষ্টীমারে ওঠে বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লাম। উপকূলে ৩টী মালপত্রবাহী জাহাজ এবং কয়েকটী দেশী বড় বড় নৌকা রয়েছে। ছোট ছোট অসংখ্য নৌকায় অদ্ভুত দর্শন পালখাটিয়ে জেলেরা মাছ ধর্‌ছে। বন্দরে কয়েকটী কারখানার চিম্‌নি ও গির্জ্জার চূড়া মাথা উঁচু করে কি যেন ভাব্‌ছে। বেলা প্রায় ১১টার সময় ষ্টীমার খানা বন্দরের ক্ষুদ্র জেটিতে এসে লাগ্‌লো, টুটিকোরিণে পদার্পণ করেই মনে হলো—আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যখন বাসগৃহের কোন্ কোণে কোন্ সময় কাক ডাক্‌লে বা টিকটিকি শব্দ কর্‌লে কি ফল হয়, যাত্রাকালে মালী, তিলি, ধোপা, নাপিত দর্শন করা কেন অশুভ, সমুদ্র যাত্রায় কি কি কুফল, অস্পৃশ্য স্পৃশ্যের দেহ স্পর্শ করলে কেমন করে উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত করা সঙ্গত, তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রের পুকুরের জল খেলে তার শুদ্ধ হবার উপায় কি ইত্যাদি গভীর বিষয়ের গবেষণায় মস্তিষ্কের প্রখরতা ব্যয় কর্‌ছিলেন, তখন পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকরা প্রথমতঃ এখানেই এসে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অদম্য উদ্যমে ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ এখন গোটা ভারত জগতের উন্নত জাতি সমূহের পেছনে পড়ে রয়েছে। বণিকদের সঙ্গে এসেছিলেন পাদরী সাহেবরা বাইবেল নিয়ে 'অন্ধকার হতে আলোকের পথ দেখাতে,'—যার প্রভাবে এই বন্দরের ⅓ অংশ লোক আজ খৃষ্টান—অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। প্রায় সমগ্র পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের এই অবস্থা। দেখে শুনে বল্‌তে হয়—"দোষ কারো নয় গো শ্যামা, এ যে স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি !"

ষ্টীমার হতে নেমে কাষ্টমস্ হাউসে গেলে একজন অফিসার তন্ন তন্ন করে মালপত্র পরীক্ষা করে আমাকে ছেড়ে দিলেন। একটা টাঙ্গা করে সহর দেখতে গেলাম। সহরটী খুব পুরাণো ধূলাপূর্ণ এবং নোংরা। স্থানে স্থানে ভাঙ্গা কুঠি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কয়েকটী ভাল ভাল বাড়ীও আছে। দোকানপত্র যথেষ্ট, তবে অধিকাংশই খুব ছোট ছোট। স্থানে স্থানে ছোট বড় গির্জ্জা রয়েছে। এখানে ডাচ্‌দের সমাধি স্থান দ্রষ্টব্য। মাদ্রাজ অঞ্চলে সমুদ্র হতে মুক্তা উত্তোলন (Madras Pearl Fisheries) এখান হতে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

দ্বিপ্রহরে এখান হতে ট্রেনে ত্রিনেভেলী যাত্রা করলাম। রেলের কামরা গুলো ছোট এবং অপরিষ্কার। রাস্তায় দেখ্‌লাম এদিকে তুলার চাষই প্রধান, জমি তেমন উর্ব্বর নয়, সব পাথরে। অপরাহ্ণে ত্রিনেভেলী টাউন-ষ্টেশনে নেমে মিঃ পিলে নামক একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ী যেয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ইনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তামিল সাহিত্যের অধ্যাপক এবং খুব সজ্জন লোক। এখানে সহরের অদূরে তাম্রপর্ণী নদীর ধারে কয়েকটী পরিত্যক্ত মন্দির এবং দূরে এলোমেলো ভাবে পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। এই নদীর তীরে কুরুকাপুরী নামক গ্রামে বিখ্যাত সাধক শঠরিপু জন্মেছিলেন, ইনি নারায়ণের অবতার বলে দক্ষিণদেশে পূজিত। ত্রিনেভেলী সহরটী বিশেষ বড় নয়, রাস্তাঘাট অপরিষ্কার।

সহরের মাঝখানে একটী বড় শিবমন্দির। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে রাজপথের ওপর দুটী কারুকার্য্য-যুক্ত কাঠের রথ রয়েছে। শুনলাম ফাল্গুন চৈত্রমাসে দক্ষিণের সব শৈব মন্দিরে ১০ দিন ব্যাপী ব্রহ্মোৎসব নামে একটী বিশেষ উৎসব হয়, এই উৎসবের সপ্তম দিন "উৎসব বিগ্রহ"কে রথে আরোহণ করিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের চারদিকে প্রাচীর, সম্মুখে উচ্চ গোপুরম্ (গেট), ভেতরে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও নাট মন্দিরের সামনে প্রধান মন্দির, বিগ্রহের নাম নটরাজ (শিব)। এর অপরূপ কারু-কার্য্যমণ্ডিত দীর্ঘ প্রাকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য বিগ্রহ আছেন। নবরাত্রী উৎসব বা বসন্ত উৎসব উপলক্ষে বিগ্রহকে বেশ করে সাজিয়ে মন্দিরের ভেতরেই বাগান বাড়ীতে আনা হয়েছে। বাদ্যভাণ্ডে দর্শকের বেশ ভিড় জমেছে। একজন বিখ্যাত তামিল গায়ক পূর্ব্ববঙ্গের "রামমঙ্গলের" মত বাদ্যযন্ত্র ও দোহারপত্র নিয়ে চামর ব্যজন করে শিবগুণ কীর্ত্তন করছেন।

শৈব-মন্দির-প্রাকার, ত্রিনেভেলী, ত্রয়োদশ শতাব্দী

এই মন্দিরটী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। দক্ষিণ দেশের মধ্যে এই সহরটী শৈব সম্প্রদায় বা সিদ্ধান্তবাদীদের বিশিষ্ট কেন্দ্র। কুমারিকা অন্তরীপ হতে ত্রিচিনাপল্লী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশের সমস্ত পূর্ব্বভাগকে পাণ্ড্য দেশ বলে। মাদুরা এই পাণ্ড্য দেশের রাজধানী। সমগ্র পাণ্ড্য দেশে তামিল ভাষা ও শৈব মত প্রচলিত। ত্রিনেভেলী অঞ্চলের হিন্দুমাত্রেই শৈব। এদেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস—বেদান্ত ও সিদ্ধান্ত (শৈব সিদ্ধান্ত বা দর্শন) এই দুটীই উল্লেখ যোগ্য ধর্ম্মমত আছে, এর মধ্যে সিদ্ধান্তই উৎকৃষ্ট এবং শিবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। শৈবসাধু মেইকণ্ডদেবের "শিবজ্ঞান বোধম্" এবং তাঁর শিষ্য অরুলনন্দী শৈবাচার্য্যের "শিবজ্ঞান সিদ্ধি" গোঁড়া শৈবসিদ্ধান্তবাদীদের প্রামাণিক গ্রন্থ। এতে প্রভাকর, সাংখ্য ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি মত খণ্ডন করে শৈবমত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোঁড়া সম্প্রদায় ভিন্ন বীর শৈব সিদ্ধান্তবাদী নামে একটী সম্প্রদায় আছে। এ মত পাঁচ শাখায় বিভক্ত, যথা—পাশুপত, বাম, ভৈরব, মহাব্রত এবং কালমুখ। শিবের এক একটী লীলার ভাবকে অবলম্বন করে এই সব সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছে। বীর শৈববাদে বংলার তন্ত্রের প্রভাব আছে।

তিন দিন পর প্রাতে এখান হতে বাসে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী সুচিন্দ্রম্ রওনা হলাম। কিছুদূর যেয়েই ব্রিটিশ-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে হয়। সীমায় কাষ্টমস্ অফিসার যাত্রীদের মালপত্র পরীক্ষা করলেন। রাস্তায় স্থানে স্থানে নাতিউচ্চ পর্ব্বত এবং ছোট ছোট গ্রাম গুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে 'নাগরকয়েল' নামক ত্রিবাঙ্কোরের একটী সহরে এলাম। পর্ব্বতগাত্রে সহরের পাকা রাস্তা এবং ছোট বড় বাড়ীঘরগুলির দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। সহরটী ছোট।

এখান হতে বাস বদল করে অপরাহ্ণে 'সুচিন্দ্রম্' তীর্থে এসে মিঃ নটরাজনের বাড়ী গেলাম। ইনি অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের গবেষণা করেন। বেশ ভাল লোক এবং স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ। এই তীর্থ স্থানটী বেশ। গ্রামের মধ্যদিয়ে একটী পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা। রাস্তা সব প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানকার ভারতবিখ্যাত মন্দির দর্শন করতে গেলাম। মন্দিরের প্রবেশ পথে বিগ্রহের জন্য পার বাঁধানো প্রকাণ্ড পুকুর রয়েছে। উচ্চ গোপুরমযুক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত বিরাট মন্দিরটী দ্রাবিড়ী শিল্পকলার চূড়ান্ত নিদর্শন। যেয়েই দেখি ৩টী হাতি সুদৃশ্য স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে নটরাজ (শিব), কান্দস্বামী (কার্ত্তিক) এবং বিনায়ক (গণেশ)কে পৃষ্ঠে ধারণ করে বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিলের সঙ্গে চলছে। দক্ষিণের প্রত্যেক মন্দিরে দুপ্রকার বিগ্রহ আছেন,—'অচল বিগ্রহ' মন্দিরেই থাকেন এবং তাঁর প্রতিনিধি 'সচলবিগ্রহ' বা 'উৎসববিগ্রহ'কে বের করা হয়। মিছিলের অগ্রে বহু ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদপাঠ করতে করতে চলছেন। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে এই মিছিল বের করা হয়েছে। প্রধান মন্দিরে শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি এবং ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য দেবতা। আশে পাশে অনেক বড় বড় নাটমন্দির। শুনলাম এই উৎসব উপলক্ষে ১০ দিন যাবৎ দু বেলা প্রায় তিনশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান হচ্ছে। পূর্ব্বে সারা বৎসর স্থানীয় সব ব্রাহ্মণ মন্দিরে দু বেলা খেতেন এবং তাঁদের জীবন-যাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মন্দির হতে দেওয়া হতো, তখন এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে উনুন জ্বলতো না। মাদুরার মন্দিরে নিত্য পাঁচশতাধিক ব্রাহ্মণ দু বেলা খেতেন। এর ফলে দক্ষিণদেশের ব্রাহ্মণদের দ্রুত অধঃপতন হয়েছে। এ সব দেখে শুনে দক্ষিণ-ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বড়লাট লর্ড চেম্‌স ফোর্ডের সময় মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা হতে মন্দির সম্বন্ধে কতকগুলো আইন (South Indian Temple Endowment Acts) বিধিবদ্ধ করেন, এর ফলে উৎসবাদি বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া ব্রাহ্মণ ভোজন বন্ধ হয়ে যায়। এখানে মন্দিরের চারদিকে ব্রাহ্মণ, তাঁদের পেছনে ক্ষত্রিয়গণ, পরে বৈশ্য এবং শেষে শূদ্রদের বস্তী, পঞ্চমা বা অস্পৃশ্যদের বাড়ীসব গ্রামের বাইরে। শুনলাম—মন্দিরের দিকে বা ব্রাহ্মণ পল্লীতে তাদের প্রবেশ অধিকার নেই। আমরা ইংরেজের কাছে সমান অধিকার দাবি করি কিন্তু আমাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মাবলম্বীকে সেই অধিকার দেবার বেলা শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করতে আমাদের বাঁধে না। এখন থাক্ এ কথা। এখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর শাপ-মুক্ত হয়েছিলেন বলে পাণ্ডারা বলেন। শিব কন্যাকুমারীকে বিয়ে করতে কৈলাস হতে রওনা হয়েছিলেন কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়ে যাওয়ায় এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে প্রবাদ।

কন্যাকুমারী এখান হতে মাত্র দশ মাইল। দু দিন পর এখান হতে বাসে কন্যাকুমারী গেলাম। মিঃ নটরাজন সঙ্গে যেয়ে ওখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ ভূমিখণ্ড—কন্যাকুমারী তীর্থ দর্শন জীবনের আবাল্যপোষিত এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। কন্যাকুমারীর মন্দির খুব বড় না হলেও ছোট নয়, চারদিকে পাঁচিল। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের সমুদ্রতীর পাথর দিয়ে বাঁধানো। এখানকার উপকূলে কয়েকটী নিমজ্জিত পর্ব্বত মস্তক উত্তোলন করে রয়েছে। দক্ষিণদিকে এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্ত কয়েকটী নিমজ্জিত পাহাড়ের আড়ালে নিরাপদে স্নানের জন্য দুটী বাঁধানো ঘাট এবং লৌহশৃঙ্খল দিয়ে কতকটা স্থান ঘেরা। এই স্থানে ভারত মহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর তিনটী সমুদ্রের সঙ্গমস্থল, এজন্য এখানে স্নানকরা বিশেষ পুণ্যজনক বলে পাণ্ডারা বর্ণনা করেন। এখানকার উপকূল অত্যন্ত গভীর, পাহাড়ের আড়াল ভিন্ন অন্যস্থানে স্নানকরা

একেবারেই নিরাপদ নয়। আমরা স্নান করে মন্দিরে গেলাম। দ্বারদেশে দুজন ত্রিবাঙ্কোরী পুলিশ বন্দুকহাতে পাহারা দিচ্ছে। একটা দীর্ঘ অন্ধকারময় সংকীর্ণ কোঠার শেষপ্রান্তে কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারী মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্ব
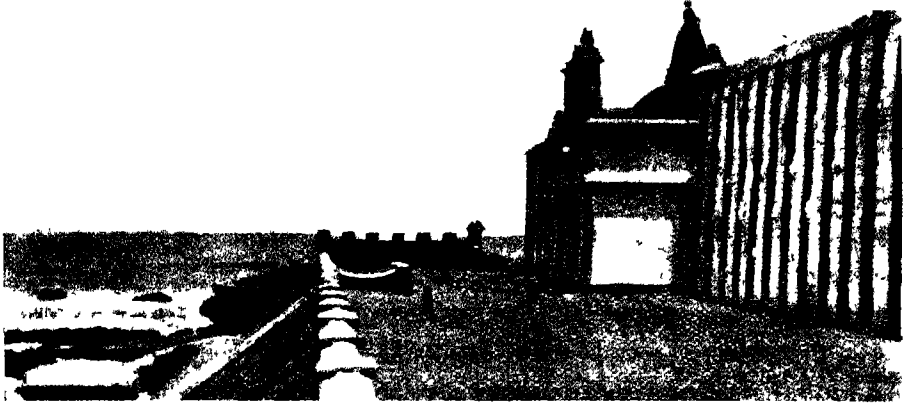
দণ্ডায়মানা। দিনেও আলোছাড়া কিছু দেখবার উপায় নেই। শ্রীমূর্তির সামনে একটা ঘৃত প্রদীপ জ্বলছে। মার ললাটে একটা বড় অত্যুজ্জ্বল মণি শোভা পাচ্ছে। এমন সুদৃশ্য মাতৃমূর্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না। মা কুমারী যেন আপনার জ্যোতির্ময়ী অপরূপ রূপের দীপ্তিতে ঘরটাকে

ভারতের দক্ষিণের শেষ প্রস্তরখণ্ড, কন্যাকুমারী

আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন। কন্যাকুমারী আমার নিকট ভারতমাতার জীবন্ত প্রতীক। ভারতমাতার এই সৌম্য প্রিয়দর্শনরূপ আজ আমার অন্তরের পরতে পরতে পুলক জাগিয়ে তুলছে। তাঁর দর্শনে

আজ ভারতের মৃত্তিকা আমার নিকট যথার্থই মহাতীর্থ,—আজ ভারতের বন-উপবন-সাগর-পর্ব্বত যথার্থই আমার নিকট স্বর্গাদপি গরীয়সী। এখানকার শেষ উপলখণ্ডের ওপর বসে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং ভারতের সব সমস্যা ও সে সব সমাধানের উপায় তাঁর যোগদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল, এ জন্য এ স্থান আমার নিকট বিশেষ পবিত্র। কন্যাকুমারীর মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে বাঁধানো ঘাটের পরই গোলাকৃতি যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড রয়েছে, সেইটীর ওপরই স্বামিজী উপবেশন করেছিলেন বলে অনেকে বলেন। সমুদ্র অশান্ত হলে এই পাথরের ওপর দিয়ে ঢেউ চলে যায়, তখন কারো পক্ষে এখানে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি দুদিন অতি সন্তর্পণে যেয়ে ওখানে বসেছিলাম। স্বামিজীর ইংরেজী জীবনীতে উল্লেখ আছে,—এখান হতে পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রায় এক ফার্লং দূরে যে এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরখণ্ড সমুদ্রের ওপর মাথা উঁচু করে রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ তার ওপর উপবেশন করেছিলেন। এই স্থানের সমুদ্র প্রায় সদা অশান্ত, স্থানীয় জেলেরা বল্লে—অন্তঃস্রোতের আকর্ষণ এখানে ভীষণ, দেখ্‌লাম—জেলেরা ডিঙ্গি নিয়ে এ স্থানটী অতিক্রম করতে বেশ বেগ পাচ্ছে, সুতরাং এ স্থান সাঁতরিয়ে যাওয়া সাধারণ সন্তরণকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে বলেন—স্বামিজী যোগবলে ওখানে সাঁতরিয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ প্রস্তর খণ্ডের ওপর হতে সমুদ্রে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত দুটীই সন্দর্শন বিশেষ উপভোগ্য। কন্যা কুমারী সমুদ্রের ঢালু তীরে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র সহর। রাস্তাঘাট এবং বাড়ীঘর গুলোও উঁচু নীচু। কয়েকটী রাস্তার দু পাশে দোকান পসারী। সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ঘরবাড়ী। এখানকার স্বাস্থ্য ও জলবায়ু ভাল। অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসেন। মন্দিরের অতি নিকটেই একটী বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মশালা। পাণ্ডাদের উৎপাত এখানে কম। অধিকাংশ পাণ্ডাই হিন্দী জানেন। মন্দিরের অদূরে একটী প্রকাণ্ড গির্জ্জা। উচ্চ বর্ণের অত্যাচারে এখানকার তিন শ ঘর হিন্দু জেলে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাদের গির্জ্জার চূড়াটী মন্দিরের গম্বুজ অপেক্ষা উঁচু করে রেখেছে! আচার্য্য শঙ্করের বংশীয় নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ কন্যাকুমারীর মন্দিরের পূজক। শুন্‌লাম—ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৪ লক্ষ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন—সব নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, তবু মন্দিরের ফটকে লেখা আছে—"অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষেধ"। হায়, প্রাচীন মহত্ত্বের কঙ্কাল ব্রাহ্মণ! তোমার আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে হিন্দু জাতিকে এম্নি করে ধ্বংসের পথে পাঠিয়েও যখন আজ পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো না, তখন তোমার চৈতন্য হবে শ্মশানের চিতা-ভস্মের সঙ্গে মিশে!
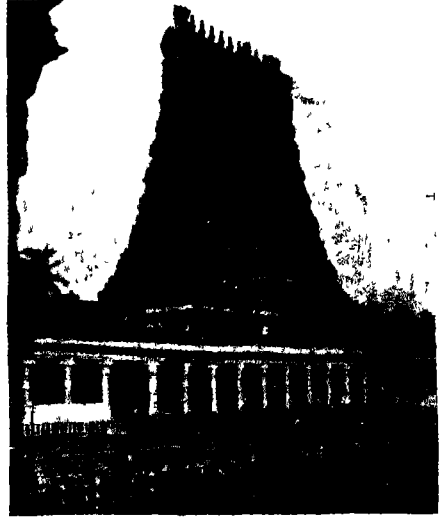
মীনাক্ষি-মন্দিরের গোপুরম, মাদুরা, সপ্তদশ শতাব্দী

সিংহল হতে তালাইমানার ও ধনুষ্কোটি হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ রামেশ্বর দর্শন করেছি। রামেশ্বর আরব সাগরের তীরে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে মাদুরার মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এর পরই রামেশ্বরের স্থান। মন্দিরের চারদিকে উঁচু দেয়াল এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অত্যুচ্চ গোপুরম, এতে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের প্রধান প্রধান ঘটনা মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ করে দেখান হয়েছে। বহুদূর হতে এই মন্দিরের গোপুরম দেখা যায়। মন্দিরটীর সব ঘুরে দেখ্‌তে অন্ততঃ একঘণ্টা লাগে। প্রধান বিগ্রহ 'রামলিঙ্গম্'। সীতাদেবী বালু দ্বারা এই লিঙ্গমূর্ত্তি গড়ে পূজো করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধ। ভক্তরাজ মহাবীর সীতাদেবীর পূজোর জন্য যে পাথরের লিঙ্গমূর্ত্তিটী এনেছিলেন, তিনি 'কৈলাস-লিঙ্গ' নামে অপর একটী মন্দিরে অন্যতম প্রধান বিগ্রহরূপে পূজিত। এ ছাড়া পৃথক পৃথক মন্দিরে নৃত্যরত নটরাজ শিব, সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিক), পিলাইয়ার (গণেশ) এবং আম্মা (কালী) প্রভৃতি দেবদেবীকে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজো করা হয়। বিরাট মন্দিরটীর আগাগোড়া সব প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রায় প্রত্যেক প্রধান মন্দিরের সামনে ধ্বজস্তম্ভ এবং বড় বড় মণ্ডপ। এক মন্দির হতে অপর মন্দিরে যাওয়ার বড় বড় রাস্তা, একে প্রাকার বলে। প্রাকারের দু পাশে সংখ্যাতীত দেবমূর্ত্তি স্তম্ভ এবং কারুকার্য্য যুক্ত ছাদ। মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁধানো বড় বড় দুটী পুকুর এবং স্থানে স্থানে ২৫।৩০টী কূপ। কূপ-গুলোর নাম গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি, পাণ্ডারা বলেন—ঐ কূপগুলোতে স্নান কর্‌লে ঐ সব পুণ্য নদীতে স্নান করার ফল হয়। হাতী ও উটের পৃষ্ঠে উৎসব-বিগ্রহ বসায়ে বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিল করে মন্দিরের প্রাকার দিয়ে ভ্রমণ করান হয়। এখানে রোজ বিরাট ভাবে ভোগরাগ এবং আড়ম্বরের সঙ্গে আরাত্রিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা হয়। বারমাস সমানে নহবৎ এবং পূজা, ভোগ প্রভৃতির সময় বাদকদল বাদ্য বাজিয়ে থাকে। মন্দিরে দলে দলে ব্রাহ্মণেরা এসে বেদ পাঠ করেন। মন্দিরটী রামনাদ রাজার অধীনে একটী সুগঠিত মন্দির-কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরম

এই বড় মন্দির হতে মাইল খানেক দূরে বালুর পাহাড়ের ওপর একটী সুদৃশ্য ছোট মন্দির আছে। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন রয়েছে। এখান হতে দৃশ্য চমৎকার। রামেশ্বরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির স্মৃতি বিজড়িত শতাধিক কুণ্ড আছে, যাত্রীরা এই সব কুণ্ডের জল স্পর্শ করেন। এখানে সমুদ্র স্নান বিশেষ আরামজনক। রামেশ্বর সহরটী ছোট। অধিবাসী অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা এবং দোকানদার।

ক্রমশঃ

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্"

অধ্যাপক—শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটীতে মানবমাত্রেরই মনুষ্যোচিত জীবনবিকাশের উদ্দেশ্যে একটী সুমহান্ সার্ব্বজনীন আদর্শ সুস্পষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটী এই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

মন্ত্রটীর মধ্যে তিনটী উপদেশ। প্রথমতঃ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ('জগতী'তে) যত কিছু পরিণামশীল ('জগৎ') পদার্থ আছে, এ সকলই ঈশ্বর দ্বারা বাসিত বা পরিব্যাপ্ত করিবে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের মঙ্গলময় প্রেমানন্দসুন্দর চিদ্‌ঘন সত্তা অনুভব করিবে, এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট কিছুই নাই বলিয়া জানিবে। দ্বিতীয়তঃ, তৎকর্ত্তৃক যাহা কিছু ত্যক্ত বা প্রদত্ত, তদ্দ্বারাই নিজের ভোগ-সাধন করিবে—অর্থাৎ যাহা কিছু ভোগোপকরণ তুমি কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হও কিংবা নিজের প্রযত্নে আহরণ কর, সে সকলই ঈশ্বর প্রসাদে লাভ করিয়াছ, সে সকলই ঈশ্বরের জিনিষ এবং স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক তোমাকে অর্পিত, ঈশ্বরের দান ব্যতীত নিজের কিছুই নাই, এই প্রকার আন্তরিক অনুভূতির সহিত সুসংযত ও সুপবিত্রভাবে কৃতজ্ঞ ও ভক্তিযুক্তচিত্তে ভোগ করিয়া নিজের জীবনটী পরিপালন করিবে। তৃতীয়তঃ, কাহারও ধনে লোভ করিও না—অর্থাৎ বীর্য্যেশৌর্য্যে ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, যশমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে, যে কোন সম্পদে তোমার অপেক্ষা কাহাকেও অধিকতর ধনী দেখিয়া তুমি ঈর্ষান্বিত হইও না, অথবা তাহার সম্পদ্ তুমি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিও না, তোমার যাহা অধিকার, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

উপদেশ কয়টী একটু বিশ্লেষণ করিয়া ভাবা আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির বিষয়রূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সবই 'জগৎ' গতিশীল, অস্থির, কালাধীন, এ সকলেরই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ আছে, বিকার ও পরিণাম আছে, ইহাদের মধ্যে কোন পদার্থই নিত্য নয়, নির্ব্বিকার নয়, স্বস্বরূপে নিয়ত অবস্থিত নয়, স্বসত্তায় সত্তাবান্ ও স্বচৈতন্যে প্রকাশমান নয়। প্রত্যেকেই কোন কারণ হইতে উৎপন্ন এবং বিনাশকালে আবার কারণেই বিলীন হয়। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয়রূপেই তাহাদের প্রকাশ, ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধির সম্পর্ক ব্যতীত তাহাদের কোন সত্তাই কল্পনা করা কঠিন। এই সমস্ত উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশশীল পদার্থের সমষ্টিই 'জগতী' (Cosmos)। এই 'জগতীর' মধ্যে সবই 'জগৎ'। কিন্তু দেশে বা কালে এই জগতীর কোন আদি বা অন্ত পাওয়া যাওয়া যায় না। জগৎ-প্রবাহরূপে এই জগতীকে নিত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত, স্থূল ও সূক্ষ্ম, কার্য্যকারণসম্বন্ধান্বিত, যাবতীয় অসংখ্য অনিত্য পরিণামশীল পদার্থের সমষ্টিরূপ যে জগতী, দেশে বা কালে তাহার কোন আরম্ভ বা শেষ কল্পনা করা অসম্ভব হইলেও, তাহাকে স্বসত্তায় সত্তাবান্ স্বয়ং প্রকাশশীল কারণান্তর নিরপেক্ষ একটী নিত্য পদার্থ বলিয়া ধারণা করাও সম্ভব নহে। 'বহু'র সমষ্টিরূপে যাহা প্রকাশিত, তাহার অন্তরালে 'এক' থাকা অবশ্যম্ভাবী। একটী অখণ্ড সত্তাই বহুকে একসূত্রে বাঁধিয়া ঐক্যবদ্ধ করিয়া অবিচ্ছিন্ন সমষ্টিরূপে ধারণ, পোষণ ও প্রকাশ করিতে পারে। বহুর মিলনকারী এই একের সঙ্গে আবার সেই বহুর

প্রাণগত—মূলগত—কারণগত—স্বরূপগত এমন নিবিড় সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, যাহাতে সেই বহুর সত্তার অভ্যন্তরেই এই একের সত্তা অন্তর্নিহিত ও প্রকাশিত হইয়া আপনার স্বরূপগত ঐক্য দ্বারা সেই বহুকে পরাবরের সহিত প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত করিতে পারে, একই জীবন্ত সমষ্টি বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-রূপে তাহাদিগকে বিকশিত করিতে পারে, অথচ যাহাতে সেই সুমহান্ একের অখণ্ড ঐক্য কোন প্রকারে খণ্ডিত বা বিভক্ত না হয়। মিলনকারী অথচ এক ও বিভাগকারী বহুর আভ্যন্তরীণ সত্তাগত একটা নিগূঢ় ঐক্য বিদ্যমান থাকিলেই একটা শৃঙ্খলা সমন্বিত সৌসামঞ্জস্যপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত সমষ্টির সৃষ্টি, স্থিতি ও বিকাশ সম্ভব হয়। এই আদ্যন্ত রহিত বিশাল জগতের প্রাণস্বরূপে, এবং ইহার অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থের প্রাণস্বরূপে, এইরূপ একটা ভেদরহিত নির্ব্বিকার নিত্য স্বপ্রকাশ একের সত্তা বিচারদৃষ্টিতে অবশ্য স্বীকার্য্য! সেই একের তত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই জগতের সহিত আরো একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা যাউক।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত অনন্তবৈচিত্র্যসম্পন্ন শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ময় একটা বিশাল বিশ্বের নিত্যপরিণামিণী সত্তার পরিচয় আমরা জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই পাইয়া থাকি। জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমরা উপলব্ধি করিতে থাকি, যে, কি বিশালতার দিকে, কি সূক্ষ্মতার দিকে, কি বিচিত্রতার দিকে, কোন দিকেই ইহার কোন অন্ত পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের কত বৈচিত্র্য, এই সকলের বিচিত্র পরিণামের মধ্যে কি অদ্ভুত শৃঙ্খলা। সর্ব্বপ্রকার ঘাত প্রতি-ঘাত ও আদান প্রদানের মধ্যে, উৎপত্তি স্থিতি গতি বিনাশের মধ্যে, মধুরতা কোমলতা ভীষণতা ও বীভৎসতার মধ্যে, সৌন্দর্য্য, কদর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও দৈন্যের মধ্যে, বিশ্বের সর্ব্বত্র কি আশ্চর্য্য নিয়মের রাজত্ব, কি অচিন্তনীয় কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা ও সৌসামঞ্জস্য পূর্ণ সমাবেশ! আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া এই সকলের সুষ্ঠুতর, ব্যাপকতর ও নিবিড়তর পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে স্ব স্ব শক্তি নিয়োজিত করিতে থাকে। আমাদের মন এই সকলের দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তী হয় এবং ক্রমশঃ বিশাল হইতে বিশালতর এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হয়। আমাদের বুদ্ধি ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা আনীত, সংগৃহীত, কল্পিত ও অনুমিত এই সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে নিরত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের স্বভাবসিদ্ধ শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য আমাদের বুদ্ধি শক্তি কত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে, কত প্রয়াস করে।

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, যতই তাহাদের শক্তি বিকাশ পাইতে থাকে, ততই যেন তাহারা নূতন নূতন জগতের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। নূতন নূতন তথ্যাবিষ্কারের আনন্দে তাহাদের বিস্ময় ও ঔৎসুক্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাদের জ্ঞাতব্য আর ফুরায় না, নেশায় বিভোর হইয়া তাহারা অগ্রসর হইতে থাকে, এই বিশ্বের আদি বা অন্ত তাহারা কোথাও খুঁজিয়া পায় না। ক্রমশঃ এই ধারণাই হয় যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় জগতেরও কোন আদি অন্ত বা মধ্য আবিষ্কার করা, ইহার সমগ্র স্বরূপটী যথাযথরূপে জ্ঞানের গোচরীভূত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যং নান্তো ন চাদি
র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা"

এই অনন্ত বৈচিত্র্য-প্রবাহ-সমন্বিত সার্ব্বদেশিক সার্ব্বকালিক সুবিশাল বিশ্ব চিরকালই আমাদের নিকট জ্ঞাতব্য থাকিয়া যায়, কখনই পরিজ্ঞাত হয় না, কখনই ইহার সমগ্র স্বরূপটী সবিশেষভাবে আমাদের ধারণাগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অন্য দিক্ হইতে বিচার করিলে আরো বিস্মিত হইতে হয়। দেশে কালে সীমাহীন এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় বিশ্ব ইহার অনন্ত বিস্তারে অনন্ত বৈচিত্র্যে অনন্ত শ্রেণী বিভাগে যতই আমাদের ধারণার অগোচর হউক না কেন, আমাদের জ্ঞানশক্তি কল্পনাশক্তি ধারণাশক্তির যতই ক্ষুদ্রতা প্রতিপাদন করুক না কেন, আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহের সম্বন্ধ ব্যতীত ইহার কোন স্বরূপই নাই, কোন সত্তাই নাই। শ্রবণ শক্তির সম্বন্ধেই শব্দের সত্তা, শব্দের শব্দত্ব, দর্শন শক্তির সম্পর্কেই রূপের অস্তিত্ব, রূপের রূপত্ব। রস, গন্ধও স্পর্শের স্বরূপ ও সত্তা রসনা, নাসিকা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্পর্কেই সম্ভব হয়, নচেৎ তাহাদের কোন অর্থই হয় না। এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের যতই বৈচিত্র্য, যতই বিস্তার, যতই শ্রেণী বিভাগ, যতই পরিণাম হউক না কেন, ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহের বিষয় রূপেই তাহাদের অভিব্যক্তি। এই বিশ্বে যদি কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা না থাকিত, তবে শব্দস্পর্শরূপ-রস গন্ধও থাকত না। আবার, বিশ্বে যদি শব্দস্পর্শরূপ রস গন্ধ না থাকিত, তবে শ্রোত্র ত্বক্-চক্ষু-রসনা-নাসারও অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না। ইন্দ্রিয়-জগৎ ও বিষয়-জগৎ একসূত্রে গ্রথিত, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই পরস্পরের স্বরূপাভিব্যক্তি, পরস্পরের সম্পর্কেই পরস্পরের সত্তা, পরস্পরের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ। ইন্দ্রিয় ও বিষয় পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াই নিজ নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

এবম্বিধ শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধের আধার রূপেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতির সত্তা। এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারাই আমাদের জ্ঞেয় জড়জগৎ গঠিত। বলা বাহুল্য যে, আমাদের স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুপরিচিত মাটী, জল, আগুন, বাতাস উপরোক্ত মহাভূত নয়, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অভাবরূপ আকাশ বা শূন্যও একটী মহাভূত নয়। শব্দই যাহার গুণ, একমাত্র শব্দ দ্বারাই যাহার পরিচয়, তাহারই নাম আকাশ। এই প্রকার শুধু স্পর্শ-গুণ, রূপগুণ, রসগুণ, ও গন্ধগুণের দ্বারাই যে কয়েকটী মূল বিষয় বস্তুর সত্তা ও পরিচয়, তাহাদেরই নাম বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি। আমাদের পরিচিত বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি পাঞ্চভৌতিক পদার্থ, মিশ্রবস্তু। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রে যাহাদিগকে মূলবস্তু (Element) বলা হয়, সে সকলই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ। আমাদের সকল জড় বিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয় এই সব ভৌতিক পদার্থ, তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও ঘাত-প্রতিঘাত, তাহাদের বিচিত্র পরিণাম ও কার্য্যকলাপ তাহাদের মধ্যে প্রকটিত বিচিত্র শক্তির খেলা, এবং তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি, ক্রিয়া, সম্বন্ধ, পরিণাম ও বিনাশের নিয়ামক প্রাকৃতিক বিধান-সমূহ। মূল ভূততত্ত্ব এই সব বিজ্ঞানের আলোচ্য-বিষয় নহে। উচ্চতর ও গভীরতর দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রেই মূলভূততত্ত্ব ও মূল ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে।

আরো একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কথাটী এই যে, বিশুদ্ধ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের সহিতও আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। বিশেষ বিশেষ রূপ, বিশেষ বিশেষ রস, বিশেষ বিশেষ শব্দ, বিশেষ বিশেষ স্পর্শ ও বিশেষ বিশেষ গন্ধের সহিতই আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিচয় হয়। গুণ সমূহের বিশেষ বিশেষ পরিণামই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে। আবার, শব্দ স্পর্শ রূপাদির এমন অনেক পরিণাম ও অবস্থাও আছে, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় ধারণাগোচর হয় না। যোগশাস্ত্রোপদিষ্ট বিশেষ বিশেষ 'সংযম' অভ্যাসের ফলে—ধারণা ধ্যান সমাধির সমুচিত অনুশীলনের ফলে—ইন্দ্রিয় সমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি এমন বিকাশ পাইতে পারে, যে, যাহা সাধারণ অবস্থায়

ইন্দ্রিয়ের অগোচর, দর্শন শ্রবণাদির বহির্ভূত, বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়া লই,— জড় বিজ্ঞানসমূহও স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের অনুসন্ধান আরম্ভ করে,—শব্দ স্পর্শ রূপাদির এরূপ অনেক পরিণাম তখন ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং ব্যবহারের যোগ্য হয়। শুধু তাহাই নয়, শব্দস্পর্শ রূপাদির এক একটী বিশুদ্ধ অবিকৃত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ আছে—যাহা বিশেষ প্রকারের শব্দ, স্পর্শ বা রূপ নয়, যাহা শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র রূপমাত্র,—তাহাও ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমানুশীলন দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখনই ভূততত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর, যাহা কিছু উপযুক্ত যন্ত্র বা করণাদির সাহায্যে কিংবা ধ্যানধারণা সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহের অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ গোচর হইতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে যে সব উৎপত্তি স্থিতি লয়, যে সব বিকার, পরিণাম, সংঘর্ষ ও সহযোগিতা, যে সব শৃঙ্খলা বিধায়ক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম প্রণালী, যে সব শক্তির প্রকাশ,—এই সকলের সমষ্টিই বাহ্য জগৎ নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে কত সৌরমণ্ডল কত গ্রহ নক্ষত্র, কত অণুপরমাণু, কত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জীবদেহ, কত কঠিন, তরল ও বায়বীয় জড় পদার্থ, কত সৃষ্টি প্রলয়, কত রূপরূপান্তর, কত অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, কত দূর ও নিকট। সবই এই বাহ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এই বাহ্য জগৎ জগতীর একপাদ মাত্র। এই বাহ্য জগতের কিছুই স্বসত্তায় সত্তাবান্ নয়, কিছুই স্বয়ং প্রকাশ নয়। ইন্দ্রিয় মনের সম্পর্ক ব্যতীত এই জগতের কোন বিষয় সম্বন্ধেই কিছু বলা যায় না, কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না। ইন্দ্রিয় মনে প্রতিফলিত হইয়াই তাহাদের মধ্যে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি গুণ, এবং ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য, ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্ব ও বিশালত্ব প্রভৃতির বিকাশ। ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি নিজেদের অন্তর্নিহিত ভাব রস ও চিন্তা দ্বারা বাসিত করিয়া যে যেরূপে তাহাদিগকে গ্রহণ ও ধারণ করে, তাহাই আমাদের নিকট তাহাদের স্বরূপ। ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধির দরজায় আঘাত করিয়া আপনাদিগকে তাহাদের গ্রহণযোগ্য ও ধারণযোগ্য করে বলিয়াই তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ হয়। সুতরাং এই জগতের অস্তিত্ব যে আপেক্ষিক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাহ্য জগৎ হইতে ভিন্ন জাতীয় একটা জগতের পরিচয় আমরা আমাদের ভিতরে প্রাপ্ত হই। এই জগতে কত চিন্তা ভাবনা ও সুখ দুখ, কত শোকতাপ ও আনন্দোল্লাস, কত রাগদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা ঘৃণা, কত কামক্রোধ ও ভক্তি প্রেম, কত ভোগলিপ্সা ও সেবাকাঙ্ক্ষা, কত জ্ঞানপিপাসা ও কর্ম্ম প্রেরণা, কত বিরহ ব্যথা ও মিলনানন্দ, কত সত্য মিথ্যা, সুন্দর কুৎসিৎ, উচিতানুচিত, উন্নতাবনত ও হেয়োপাদেয়ের পার্থক্যবোধ, অনুভূতি দ্বারাই এই জগৎ নির্ম্মিত। এখানে সবই অনুভূতিময়। এই জগতের নাম মনোময় জগৎ। এই মনোময় জগৎকে আশ্রয় করিয়াই বাহ্য জগতের বিচিত্র প্রকাশ ও স্বরূপাভিব্যক্তি, এবং বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য অবলম্বনেই মনোজগতেরও অনুভূতির বৈচিত্র্য ও বিচিত্র ভাবের অভ্যুদয়। মনোময় জগতে যদি শব্দবোধ, রূপবোধ, রসবোধ, স্পর্শবোধ ও গন্ধবোধ না থাকিত, তবে বহির্জ্জগতেও শব্দ রূপ রস স্পর্শ ও গন্ধের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ থাকিত না। মনের ভিতরেই ভিতর ও বাহিরের একটা পার্থক্য বোধ আছে, সেই হেতুই আমাদের বাহিরে একটা জগৎ আছে বলিয়াই স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। মনের ভিতরেই দেশ ও কালের অনুভূতি থাকার দরুণ, বহির্জ্জগতে উচ্চ ও নীচ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, নিকট ও দূর, সংযোগ ও বিয়োগ, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আমরা অনুভব করিয়া থাকি, এবং এই জ্ঞানের সত্যতা

সম্বন্ধেও আমরা সন্দিহান হই না। বাহ্য জগতে আমরা যে ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ, হেয়োপাদেয়, নিয়ম শৃঙ্খলা ও তাহার ব্যতিক্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া থাকি, অনুভূতিময় জগতের ছাপ লাগাইয়া তদ্দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াই, তাহা দেখিয়া থাকি ও বিচার করিয়া থাকি। মনোজগতের ধর্ম্মসমূহ বাদ দিলে বাহ্যজগতে প্রায় কিছুই থাকে না, সেটা একটা অনির্ব্বচনীয় সত্তায় পরিণত হয়।

এই অনুভূতিময় জগতের শীর্ষদেশে আমরা এক জাতীয় বিশিষ্ট ভাবান্বিত অনুভূতির প্রকাশ উপলব্ধি করি। সেটাকে বুদ্ধিজগৎ বলা যাইতে পারে। এই বুদ্ধিজগতেই সত্য ও মিথ্যার মাপ-কাঠি, সুন্দর ও কুৎসিতের মাপকাঠি, ভাল ও মন্দের মাপকাঠি, উচিতানুচিত, হেয়োপাদেয়, উন্নতাবনতের মাপকাঠি। এই জগতেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ বিরাজমান। এই আদর্শের কষ্টি পাথরেই মনোজগৎ ও বহির্জ্জগতের যাবতীয় জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম ও বিষয়ের পরীক্ষা হয়। এই আদর্শানুভূতি ও তৎপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় আন্তর ও বাহ্য ব্যাপারের পরীক্ষাই বুদ্ধির নিজস্ব ধর্ম্ম। বুদ্ধি যত নির্ম্মল হয়, মনোজগতের নিম্নস্তর সমূহের জ্ঞানভাব ইচ্ছা-দ্বেষ প্রযত্নাদির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যত স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হয়, সত্য শিব সুন্দরের আদর্শও ততই সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাহার আলোকে যাবতীয় আন্তর ও বাহ্য পদার্থ সমূহের সুষ্ঠু বিচার হয় ও তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি গোচর হয়।

এই সমগ্র অনুভূতিময় জগতের কেন্দ্রস্থলে আর একটী বিশেষ অনুভূতি আছে,—সেটী 'অহম্'-এর অনুভূতি। এই 'অহম্'ই সকল মনোব্যাপার ও বুদ্ধিব্যাপারের ঐক্য সাধন করে, এবং তৎসূত্রে সমগ্র আন্তরজগৎ ও বাহ্যজগৎকে একসূত্রে আবদ্ধ রাখে। ইন্দ্রিয়সমূহের বিচিত্র প্রত্যক্ষ, মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির পরিণাম, বুদ্ধি জগতের বিচিত্র বিচার ও অধ্যবসায়—এ সকলই যে একেরই প্রত্যক্ষ, একেরই অনুভূতি, একেরই বিচার, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি ও বিচারের সকলপ্রকার ভেদ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একই প্রত্যক্ষকর্ত্তা, অনুভাবতা ও বিচারক নিত্য বিদ্যমান, 'অহম্'-এর অনুভূতিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 'অহম্'-এর অনুভূতিপ্রবাহ সকল জ্ঞান ভাব ও কর্ম্মের অন্তরালে আছে বলিয়া দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধির এত বিচিত্র পরিণাম সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ঐক্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই বাহ্যজগতের এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সর্ব্বদা আমাদের ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধিকে আঘাত করিলেও তাহার মধ্যে আমরা ঐক্য দর্শন করিয়া থাকি। সুতরাং বাহ্যজগৎ ও আন্তরজগতের স্বরূপগঠনের মধ্যে এই অহং-বোধের একটা বিশিষ্ট অনুপম স্থান।

এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ, মনোজগৎ, বুদ্ধিজগৎ ও অহং-জগতের ঐক্যবদ্ধ সমষ্টিই ঈশোপনিষদুক্ত "জগতী"। এই জগতীতে বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুস্যূত, এবং একত্বের মধ্যে বহুত্বের সুচারু সমাবেশ—একের সম্পর্কে বহুর পরিচয়, বহুর সম্পর্কে একের পরিচয়। এই জগতী বহুধা বিভক্ত হইলেও ইহার ঐক্য অক্ষুণ্ণ। এই জগতীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আপনার অষ্টধা বিভক্ত অপরা প্রকৃতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

এক ভগবানেরই প্রকৃতি বা শক্তি অষ্টধা বিভক্ত হইয়া অহংকার, বুদ্ধি, মন ও পঞ্চমহাভূত রূপে অভিব্যক্ত, এবং এই আটটী তত্ত্বেরই বিচিত্র অভিব্যক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। প্রকৃতি যখন বিচিত্র প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, শক্তি যখন বিচিত্র ক্রিয়ারূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করে, তখনই সৃষ্টি। বৈচিত্র্য যখন ঐক্যের মধ্যে অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, কার্য্যপ্রবাহ

যখন শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অপ্রকাশমান থাকে, তখনই প্রলয়। প্রকৃতি বা শক্তির একীভূত অবিভক্ত অবস্থার নাম 'অব্যক্ত' বা 'অব্যাকৃত'। তখন কিছুরই অভিব্যক্তি নাই, প্রকাশ নাই; সবই আবৃত, সমাচ্ছাদিত, "তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে।" প্রকৃতির বহু বিকৃতি-রূপে, অসংখ্য প্রকার-রূপে অভিব্যক্ত অবস্থার নামই ব্যক্ত জগৎ, মূল শক্তির বিচিত্র কার্য্যরূপে বিলাসই এই 'জগতী'। অব্যক্ত অবস্থায় বহুর আবরণ, একের স্বস্বরূপে অবস্থিতি,—"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্"। ব্যক্তাবস্থায় বহুর বিলাস, একের আবরণ,—এক যেন আপনাকে বলি দিয়া, বিশ্বযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া, আপনার সত্তা হইতে অসংখ্য সত্তার সৃষ্টি করিয়াছে, আপনাকে অসংখ্যরূপে ও নামে পরিণত করিয়াছে এবং এই বিচিত্র পরিণতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কি সমষ্টি জগতে, কি ব্যষ্টি জগতে, সর্ব্বক্ষেত্রেই অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায়, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যাতায়াত চলিতেছে, শক্তির কার্য্যরূপে অভিব্যক্তি এবং কার্য্যের শক্তিরূপে পরিণতি চলিতেছে, একের বহুরূপে প্রকাশ ও বহুর এক স্বরূপে আত্মগোপন চলিতেছে। সমগ্র বিশ্বে, বিশ্বের প্রত্যেক বিভাগে, প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক পদার্থে, এই সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রবাহ চলিয়াছে। কালে এই প্রবাহের আরম্ভ বা শেষ নাই, দেশে এই প্রবাহের আদি বা অন্ত নাই।

ব্যক্ত জগতের বিচিত্র বিলাসের মধ্যে তাহাদের মূলীভূত 'এক' যে বস্তুতঃ আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই, বহুর অন্তরালে 'এক' যে পূর্ণভাবেই জীবন্ত, বহুর প্রাণস্বরূপে, অন্তর্য্যামী নিয়ামক স্বরূপে, 'এক' যে নিত্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বিশ্বের সকল বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে, জগতের সকল বিভাগে নিয়ম শৃঙ্খলার একটা অপরাজেয় প্রভাব ব্যক্ত করিতেছে, সকল পরিণাম, সংঘর্ষ, ভাঙ্গাগড়া, উৎপত্তি ধ্বংসের ভিতর দিয়া একটা নিগূঢ় আদর্শের ক্রমবিকাশ—একটা নিগূঢ় অভিসন্ধির ক্রমপূর্ত্তি সূক্ষ্মবিচার ও ব্যাপক দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশ্ব ব্যাপার যতই সূক্ষ্মভাবে ও ব্যাপকভাবে পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, সমগ্র জগতী যেন একটা বিরাট্ প্রাণবান্ অঙ্গী, একটা বিচিত্রাবয়বসম্পন্ন দেশকালাপরিচ্ছিন্ন সুমহান্ জীবন্ত দেহ, এবং ইহার প্রত্যেক বিভাগ ও তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ যেন ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। জীবদেহের অবয়ব সমূহের ন্যায় বিশ্বের প্রত্যেক ব্যাপার যেন একই কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, সমগ্রের সহিত সম্বন্ধেই প্রত্যেকের সার্থকতা। সমগ্র বিশ্বের অন্তর্য্যামী একটা অব্যাহত অনন্ত প্রাণশক্তিই যেন আপনার অন্তর্নিহিত আদর্শকে অসংখ্য বিচিত্র অবয়বের ভিতর দিয়া—নানাকালে নানাদেশে নানাবিধ বস্তু ও ব্যাপারের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ভিতর দিয়া—বিচিত্র ভাবে প্রকটিত করিয়া অত্যদ্ভুত সৌসামঞ্জস্য-পূর্ণ সাম্য শৃঙ্খলা সমন্বিত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সম্পন্ন বিরাট্ বিশ্বদেহ রচনা করিতেছে। এই বিশ্বের মধ্যে যে স্থানে যে কালে যে অবস্থায় যে অঙ্গে বা উপাঙ্গে যেমনটী সাজে, যে ব্যাপারটী যে প্রকার ভাবে সংঘটিত হইলে সুশোভন হয়, তেমনি ভাবে সব সজ্জিত হইতেছে, তেমনি ভাবে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি স্থিতি সমাবেশ ক্ষয় ও ধ্বংস হইতেছে। অনিয়মে কোথাও কিছু হয় না, সমগ্রের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথাও কোন ব্যাপার ঘটে না, সর্ব্বান্তর্য্যামী সুমহান্ ঐক্যকে নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন কিছু উৎপন্ন বা রূপান্তরিত বা বিনষ্ট হয় না। একের ভিতরেই বহু ফুটিয়া উঠে ও বিলসিত হয়, এককে বিচিত্র ভাবে প্রতিভাত করানই বহুর স্বভাব, আবার অন্তিমে একের ভিতরেই বহু লয় পাইয়া যায়, একের মধ্যে অবিভক্ত

মহাভিনিষ্ক্রমণ

শিল্পী : কে, ভেঙ্কটাপ্পা ।

হইয়া অব্যক্তাবস্থাতেই বহুর অবস্থিতি হয়। এক ও বহু পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া, এই অখণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রিত, অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত, অনেক কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা সমন্বিত বিশ্বপ্রক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। 'এক' প্রাণরূপে বিরাজিত, 'বহু' অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে সুবিকসিত, এবং তাহাতেই সমগ্র দেহের ঐক্য সংরক্ষিত। বহুর বাহ্য নামরূপ বৈশিষ্ট্য যেমন স্থূলতঃ একটে আবৃত করিয়া বহুর সত্তাই প্রধানভাবে দেখাইতেছে, বহুর ভিতরে যে সাম্য, শৃঙ্খলা, সুসমাবেশ, সৌসামঞ্জস্য, তাহাই আবার তেমনি বহুর অন্তরালে বিরাজিত প্রভুশক্তি সম্পন্ন একটে সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত করিতেছে, এবং বহুর ভিতরে একের প্রভাব যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বহু যে একেরই অধীন, একেরই অঙ্গীভূত, একেরই বিচিত্র অভিব্যক্তি, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

এক সূত্রে গ্রথিত, এক প্রাণ দ্বারা বিধৃত, একেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিকসিত, এই যে আন্তর ও বাহ্য অনন্ত বৈচিত্র্য, ইহাদেরই সমষ্টি জগতী। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সাম্যের যত উপলব্ধি হয়, বহুর মধ্যে একটে যত দর্শন করা যায়, এবং এক ভাবান্বিত দৃষ্টি দ্বারা একের সম্পর্কে এই জগতীর অসংখ্য পদার্থ ও বিচিত্র বাহ্য ও আন্তর ব্যাপার সমূহ যত দর্শন করা যায়, ততই যথার্থ দর্শন হয়। এই আদ্যন্ত বিহীন নিয়ত-জন্ম স্থিতি-পরিণাম-বিনাশশীল অসংখ্য প্রকার ভেদ সম্পন্ন আন্তর বাহ্য পদার্থ রাজির সমষ্টির নাম জগতী; এবং যে এক দ্বারা এই জগতী বিধৃত ও সঞ্জীবিত, যে একের ব্যক্ত মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে ইহার যাবতীয় পদার্থ নিচয় বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত, যে এক দ্বারা ইহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় ব্যাপার প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত, যে এক ইহার 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী', তাঁহারই নাম ঈশ্বর।

জগতীর তত্ত্ব অবগত হইলে, ইহার সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধিগোচর হয়। এই বিশ্বে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, যাহা কিছু সংঘটিত হয়, যাহা কিছু বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যে কোন পদার্থ যে কোন ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহারই ভিতর দিয়া ঈশ্বরের সত্তা অভিব্যক্ত হয়, তাহারই মধ্যে এক মহান্ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তাহারই মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, পালনী শক্তি, নিয়ন্ত্রী শক্তি, সংহর্ত্রী শক্তি প্রকটিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সব পদার্থ ঈশ্বরের মধ্যেই অব্যক্ত অবস্থায়—অনভিব্যক্ত কারণ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। ব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরেরই ঐশীশক্তি দ্বারা সৃষ্ট, বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া, ঐশী শক্তিরই বিচিত্র অভিব্যক্তি রূপে, এই সকল পদার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আবার ইহারা তাঁহারই মধ্যে অব্যক্ত ও অবিভক্ত ভাবে বিলীন হইয়া থাকে। তাঁহার সত্তা ব্যতীত কোন কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহার বিচিত্র আত্ম প্রকাশের সঙ্কল্প হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রাকৃতিক নিয়ম জগতীর কোন অংশকে শাসন করে না। সবই ঈশ্বর হইতে, ঈশ্বরেরই জন্যে, তাহারই নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উৎপন্ন ও বিকাশপ্রাপ্ত, এবং তাঁহারই বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া ও তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া, সুরক্ষিত, সুসমাবেশিত, সুপরিচালিত ও সুসংহৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বরই এই জগতীর ও তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ এবং জগতী যেন ঈশ্বরের দেহ, ও তদন্তর্ভুক্ত বস্তু সমূহ তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জগতীর স্বরূপ কি, এবং ঈশ্বর ও জগতীর যথার্থ পারমার্থিক সম্বন্ধ কি,—তাহার সযুক্তিক আলোচনা দ্বারা সম্যক্ তত্ত্ব নিরূপণের প্রচেষ্টায় নানাপ্রকার দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি বহুপ্রকার

বাদ এই সমস্যার সমাধানকল্পে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বাদই অপরাপর প্রত্যেক বাদের দোষখ্যাপন পূর্ব্বক আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ঐ সব বাদ এবং তাহাদের যুক্তিতর্ক আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে। কিন্তু ঈশোপনিষৎ যে আদর্শটী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, কোন বাদের সহিতই তাহার আত্যন্তিক বিরোধ নাই। ব্যক্ত জগতের সহিত আমাদের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। আমাদের সকল সাধনা ও সিদ্ধিই ব্যক্ত জগৎকে অবলম্বন করিয়া।

এই জগতের সত্তা যে ঈশ্বরের সত্তা হইতে সমুৎপন্ন, ইহার যাবতীয় ব্যাপার যে ঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ঈশ্বরের আশ্রয়েই যে ইহার অবস্থিতি, ঈশ্বরের সত্তাব্যতিরিক্ত ইহার যে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, একের আশ্রয় ব্যতীত বহুর পক্ষে সমষ্টিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিবার যে কোন সম্ভাবনা নাই, এবং এক ও বহু—ঈশ্বর ও জগৎ—অত্যন্ত বিভিন্ন সত্তা সমন্বিত হইলে উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ বা আশ্রিতাশ্রয় সম্বন্ধ যে নিতান্তই অযৌক্তিক হইয়া পড়ে, এ বিষয় প্রায় সকলেরই ঐকমত্য আছে। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র বহুত্বের বিচিত্র বিলাস হেতু একত্ব আবৃত আছে, এক বহুধা খণ্ডিত হইয়াই প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অখণ্ড একত্ব উপলব্ধি গোচর হয় না। একের বহু ভাবই আমরা দেখি, বহুভাবের মধ্যেও যে একভাব বিরাজমান তাহা সাধারণতঃ আমরা দেখি না। এই দর্শন সাধন সাপেক্ষ। ঈশোপনিষৎ সেই এক অখণ্ড সত্তাকে বহু খণ্ড সত্তার মধ্যে অনুভব করিতে উপদেশ দিতেছেন। বহুর মধ্যে একের দর্শনই যথার্থ দর্শন। এককে শুধু দেখিতে হইবে না, এককেই প্রধান ভাবে দেখিতে হইবে। যেহেতু একই আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, এক হইতেই সব সমুদ্ভূত, একেই সব অবস্থিত, এক দ্বারাই সব নিয়ন্ত্রিত, বহুর প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এক অনুপ্রবিষ্ট, এক দ্বারা বহু ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত।

বিশ্বজগতের প্রক্রিয়া আরো একটু নিবিড়-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহা অনুভব গোচর হয় যে, ইহার প্রত্যেক অবয়ব দ্বন্দ্ব দ্বারা বিরচিত, এবং প্রত্যেক দ্বন্দ্ব একের দুইটী দিক্ বলিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। ইহার সর্ব্বত্র আলোর সহিত অন্ধকার, উষ্ণতার সহিত শৈত্য, উৎপত্তির সহিত বিনাশ, বৃদ্ধির সহিত ক্ষয়, সৌন্দর্য্যের সহিত কদর্য্যতা, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান, সুখের সহিত দুঃখ, ভাবের সহিত অভাব, প্রেমের সহিত হিংসা, ভোগের সহিত ত্যাগ, লাভের সহিত ক্ষতি, বীর্য্যের সহিত দৌর্ব্বল্য, ঐশ্বর্য্যের সহিত দৈন্য, মিলনের সহিত বিরোধ, সত্যের সহিত মিথ্যা যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত হইয়া বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে। এই দ্বন্দ্ব না থাকিলে সৃষ্টিপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, জগতের অস্তিত্ব থাকে না। এই দ্বন্দ্বসৃষ্টির একদিক্‌কে 'দৈব' সর্গ এবং অন্যদিক্‌কে 'আসুর' সর্গ বলা যাইতে পারে। এই দ্বন্দ্ব প্রবাহের একধারা জগৎকে ঐক্যের দিকে, অখণ্ডতার দিকে লইয়া যাইতে চায়, তাহার নাম দৈব সর্গ, অপর ধারা ইহাকে অনৈক্যের দিকে, বহুত্বের দিকে, খণ্ডতার দিকে লইয়া যাইতে চায়, তাহার নাম আসুর সর্গ। এক ধারার গতি কেন্দ্রাভিমুখী এবং অপর ধারার গতি কেন্দ্রবিমুখী। এই দুই ধারার সংঘর্ষেই এক মহাসত্তার অসংখ্য খণ্ডসত্তারূপে লীলাবিলাস, এক ঈশ্বরের সাম্যশৃঙ্খলাময় বিচিত্র জগদ্রূপে আত্মাভি-ব্যক্তি সম্ভব হইতেছে। এই দেবাসুর সংগ্রামের ভিতর দিয়াই জগৎ প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতেছে।

এই জগৎ প্রক্রিয়ার মধ্যে আরো একটী আশ্চর্য্য তথ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই পাঞ্চভৌতিক জগতে, মনোজগতে ও বুদ্ধিজগতে যতই দ্বন্দ্ব থাকুক, যতই সংঘর্ষ চলুক, সমগ্র বিশ্ব-

ব্যাপার একটা সুমহান্ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যেখানে বহুর মধ্যে একের আত্মপ্রকাশ, যেখানে দেহের মধ্যে প্রাণের বিলাস, সেখানেই সকল প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত একটী আদর্শ থাকে। সেই আদর্শ দ্বারাই ব্যাপার সমূহ পরিচালিত হয়, সেই আদর্শকে অভিব্যক্ত করিবার দিকেই সকল ব্যাপারের গতি হয়। সেই আদর্শই যাবতীয় ব্যাপারের নিয়ামক। ঈশ্বরের স্বরূপের ভিতরে যে তত্ত্ব নিহিত, জগতীর বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তাহাই আদর্শরূপে অন্তর্নিহিত থাকিয়া তাহাদের স্বরূপ ও গতি নিয়ন্ত্রিত করে।

দৈবসর্গ সেই আদর্শের ক্রমাভিব্যক্তির অনুকূল, তাহা ঈশ্বরকে জগতের মধ্যে প্রকাশ করিতে, একেকে বহুর মধ্যে সমুজ্জলরূপে প্রকটিত করিতে, প্রযত্নশীল। আসুর সর্গ তাহার বিপরীত। তাহা আদর্শের প্রতিকূলে জগৎপ্রক্রিয়াকে প্রবাহিত করিতে চায়, ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিয়া জগৎ প্রবাহের বহুধাবিভিন্ন নানাসংঘর্ষ সমাকুল তরঙ্গ ভঙ্গীগুলিকেই বড় করিয়া তুলিতে চায়, একেকে যেন বিদলিত করিয়া জগতীকে ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খলাময় করিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু ঈশ্বর জগতীর অন্তর্য্যামী প্রাণরূপে বিরাজিত থাকিয়া এমনই বিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে, সকল সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অত্যাশ্চর্য্যভাবে সেই আদর্শই সমুজ্জলরূপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, সকল দেবাসুর-সংগ্রামের ভিতর দিয়া দেবতাই ক্রমশঃ জয়যুক্ত হইতেছেন। বিশ্বের মধ্যে জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্য্যের নিকট পরিণামে অজ্ঞান হিংসা ও কদর্য্যতা পরাজয় মানিতেছে, দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যের বক্ষোভেদ করিয়া ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে, মিথ্যা ও কপটতার জাল ছিন্ন করিয়া সত্য ও সরলতা বিজয় নিশান উড়াইতেছে, দুঃখ সুখের ভিত্তিরূপে পরিণত হইয়া জগৎকে আনন্দোজ্জল করিয়া তুলিতেছে, ভোগ ত্যাগের চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া ত্যাগকেই সম্ভোগময় করিয়া তাহার মহিমা খ্যাপন করিতেছে। সত্যের জয়, মঙ্গলের জয়, ধর্ম্মের জয়, ত্যাগের জয়, সৌন্দর্য্যের জয়, আনন্দের জয়,—ইহাই জগৎপ্রক্রিয়ার স্বরূপ, ইহাই জগৎপ্রক্রিয়ার ভিত্তিস্থানীয় ঐশ্বরিক বিধান। আসুরভাবের পরাজয় ও দৈবভাবের বিজয়ের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর আপনাকে এই সংঘর্ষ-সঙ্কুল দ্বন্দ্বময় জগৎপ্রক্রিয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

আমাদের দৃষ্টি যত পূত হয়, সূক্ষ্ম হয় ও ব্যাপক হয়, ততই আমরা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল আপাত-সংঘর্ষ সঙ্কুল বহুর প্রত্যেক অঙ্গে একের সাক্ষাৎকার লাভ করি, বিশ্বের সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করি, এবং ততই সমস্ত জগৎ আমাদের দৃষ্টিতে সুন্দর মধুর সত্যময় মঙ্গলময় আনন্দময় হইয়া প্রকাশ হয়। ক্রমশঃ সকল আসুরশক্তি দৈবশক্তির পদানত দেখিতে পাই, সকল আধিভৌতিক ব্যাপারসমূহ আধিদৈবিক ভাববিলাসের প্রতিচ্ছবি-রূপে আমাদের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। জড়জগতের, পশুজগতের, ইন্দ্রিয়জগতের, মনোজগতের যাবতীয় শক্তিসমূহ ঐশ্বরভাব প্রকাশক দৈবজগতের অধিবাসী ও দেবতার বাহনরূপে কার্য্য করিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। সমগ্র বাহ্যজগৎ ও আন্তরজগৎ তখন যেন চেতন ভাবাপন্ন—সচেতন হইয়া উঠে, সর্ব্বত্র এক মহাচৈতন্যের বিলাস পরিদৃষ্ট হয়। জগতী তখন আর বহুর সমষ্টিগত বলিয়া প্রতিভাসিত হয় না, এক সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের দৃষ্টিকে চরিতার্থ করে। এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর জগতীর অন্তরাত্মারূপে—স্বামিরূপে নিত্য বিরাজমান, এবং তাঁহারই পরিণামশীলা সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি তত্ত্বতঃ তাঁহার সহিত অভিন্ন থাকিলেও আপনার স্বামীকে—প্রাণের দেবতাকে—কর্ম্মজ্ঞানপ্রেম ও ভোগের পূর্ণ আদর্শকে—অনন্তরূপে অনন্তনামে

অনন্তভাবে স্তরে স্তরে নানাবিধ আলোছায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য, সমগ্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য, সমগ্র কৃতার্থতা ও আনন্দ সেই পরিণামশীলা ঐশ্বরী মহাশক্তির কোলে ক্রমশঃ অবিভজ্যমানরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মাহাত্ম্য সমুজ্জ্বলভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই যেন সেই মহাশক্তি বিচিত্র মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বিচিত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও অহংবৃত্তি, বিচিত্র জড়শক্তি ও জীবশক্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রাজ্যমধ্যে—স্বরূপাভিব্যক্তির ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের বাহনরূপে তাহাদের চরণতলে তাহারা হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করিয়া বিচিত্র খেলা খেলিতেছে এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, মহাশক্তির সেই মহিমা সকলের পূর্ণস্বরূপাভিব্যক্তির সহায়তা করিতেছে।

এক পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতা সত্যজ্ঞানপ্রেমানন্দৈশ্বর্য্যময়ী মহাশক্তির বিচিত্র বিলাস যখন আমরা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তখন শোক-তাপের কোন কারণ থাকে না, ঘৃণা-নিন্দার কোন বিষয় থাকে না, ঈর্ষ্যা বা দম্ভের কোন পাত্র থাকে না। আমিও সেই মহাশক্তির দ্বারা প্রসূত, তাঁহারই ক্রোড়ে অবস্থিত, আমার সকল কর্ম্ম ও ভোগের ভিতরেও তাঁহারই অভিব্যক্তি। যাহাদের সহিত আমার যে কোন সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহারা সকলেই সেই মহাশক্তিরই সন্তান,—তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তাঁহাতে স্থিত, তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারই আরম্ভবিহীন ও শেষবিহীন মহতী স্বরূপ সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যাহাকে যে ভাবে গঠিত ও পরিচালিত করেন, তাহা ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি যে ব্যক্তির হয়, তাহার কিছু চাহিবারও থাকে না, পাইবারও থাকে না, লোভ করিবারও থাকে না, বর্জ্জন করিবারও থাকে না। এই দৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্তই 'অহং'-এর একটা স্বাধীনতাবোধ থাকে, নিজে খণ্ড-শক্তিদ্বারা অপরাপর আপাততঃ প্রতিকূল ভাবাপন্ন খণ্ড-শক্তিগুলিকে অভিভূত করিয়া সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস থাকে, নিজের হেয়োপাদেয় বোধকেই জগতে ভালমন্দের, সুন্দর কুৎসিতের, মাপকাঠি ধরিয়া লইয়া তদনুসারে জাগতিক ব্যাপার সমূহ বিচার করিবার ও নিয়ন্ত্রিত করিবার বাসনা থাকে। এই সত্যদৃষ্টি লাভ হইলে 'অহং' নিজেকেও সেই ঐশী মহাশক্তিরই একটী বিশেষ ঘনীভূত বিগ্রহ বলিয়া অনুভব করে, সেই বিশ্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরকেই নিজের অন্তরাত্মা—নিজের পারমার্থিক স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎকার করে, স্বসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপার সমূহও তদীয় মহাশক্তিরই বিলাস বলিয়া উপলব্ধি করে। তখন স্বাধীনতা ও পরাধীনতার ভেদ থাকে না, যেহেতু তখন স্ব ও পর ভেদবুদ্ধি লোপ পায়। সর্ব্বান্তর্য্যামীকে আত্মান্তর্য্যামী ও আত্মান্তর্য্যামীকে সর্ব্বান্তর্য্যামী বোধ হওয়ায়, সব পরই আপন হইয়া যায়, সুতরাং পরাধীনতার বোধ দূরীভূত হয়, স্বাধীনতাবোধের পূর্ণ বিকাশ হয়।

এই তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হইলে মানুষ সেই মহাশক্তিরই কোলে বসিয়া ব্যবহারিক জীবনযাপন করে। বুদ্ধিতে সেই মহাশক্তির প্রাণস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের সহিত স্বীয় আত্মার ঐক্য অনুভব করিতে থাকে, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে সেই মহাশক্তি আপন লীলায় যে ভোগ সম্ভার উপস্থিত করে, তাহাই গ্রহণ ও সম্ভোগ করিয়া জীবনযাপন করে, সেই মহাশক্তি যেভাবে তাহার দেহেন্দ্রিয়মন স্পন্দিত ও চালিত করে, আনন্দের সহিত জ্ঞানেচ্ছাসম্পন্ন যন্ত্রবৎ সেই ভাবেই দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদিত করিতে থাকে। কাহারও ধনসম্পৎ বা বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা যশমান সে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখে না, এবং তাহা পাইতেও লোভ করে না। সবই যে সেই

মহাশক্তির জিনিষ,—তাহারই বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রকাশ। যদি কখন কোন বাসনা তাহার মনে উদিত হয়, তবে সেই বিশ্বজননী পরমেশ্বরী মহাশক্তির নিকটই তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রার্থনা করে, তজ্জন্য আকুলভাবে ভিক্ষাপাত্র হস্তে সংসারের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে না। সেই মহাশক্তির সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ উপলব্ধি গোচর হওয়ায় আগন্তুক বাসনাগুলির চরিতার্থতা বা ব্যর্থতায় তাহার চিত্তে কোন উল্লাস বা যাতনাও উপস্থিত হয় না। মায়ের দেওয়া দেহ ইন্দ্রিয়, মায়ের দেওয়া মন বুদ্ধি, মায়ের দেওয়া সুভোগ ও দুর্ভোগ, মায়ের দেওয়া সম্মান ও লাঞ্ছনা,—সবই সে আনন্দের সহিত গ্রহণ করে, সর্ব্বত্রই সে সত্য ও মঙ্গল, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শন করে।

বিশ্বজগতীর এই রূপটী আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সমুজ্জ্বলভাবে উপস্থিত করিবার জন্য আমাদের শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গামূর্ত্তির পরিকল্পনা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের আত্মপ্রকাশরূপা মহাশক্তি আপনাকে বিশ্বজগতীরূপে অভিব্যক্ত করিয়া দশ হাতে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বন্দ্বময় জগৎপ্রবাহের যাবতীয় রাজসিক ও তামসিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ অসুর ও সিংহ তাঁহার চরণতলে,—তাহাদিগকে আসন করিয়াই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন ও বিশ্বলীলা করিতেছেন। তামসিক শক্তির ভিতরে অহংবোধ জাগ্রত না হওয়ায় তাহারা স্বভাবতঃই তাঁহার বশীভূত, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বাহন। আসুরিক শক্তির ভিতরে অহংবোধ জাগ্রত হওয়ায় তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্ত সম্পদের লোভ, আত্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বাস ও বিশ্বনীতির বিরুদ্ধে এক প্রকার বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে। সেই বিদ্রোহী অহংকে মহাশক্তি সবলে পদতলে চাপিয়া রাখেন। দশহাতের দশবিধ প্রহরণ বিশ্বের যাবতীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি, মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখিয়া সকলকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সচেষ্টভাবে বা নিশ্চেষ্টভাবে, সপ্রেমে বা সদ্রোহে সেই মহাশক্তির অন্তর্নিহিত আদর্শেরই অনুকূল পথে চালাইয়া নেয়। সকল রাজসিক ও তামসিক শক্তিপুঞ্জ যেমন পদতলে থাকিয়া বিশ্বব্যাপারের আনুকূল্য করে, তেমনি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সিদ্ধি মহাশক্তির কোলে সমুজ্জ্বল রমণীয় মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠে—কার্ত্তিক ও লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গণেশ তাঁহার কোলে নৃত্য করিতে থাকে। বিশ্বের যাবতীয় দৈবশক্তি সেই মহাশক্তির অঙ্গজ্যোতিরূপে চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, দেখা যায়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব অন্তরালে অন্তরাত্মারূপে থাকিয়া নির্ব্বিকারভাবে স্বকীয় মহাশক্তির এই বিশ্বলীলা দর্শন করিতেছেন।

বিশ্ব-জগতী রূপিণী ভগবতী মহাশক্তির নিকটে সাধক মানুষ আত্মনিবেদন পূর্ব্বক ভিতরে বাহিরে তাঁহারই বিচিত্র লীলা সন্দর্শন ও সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয়। বর্ষান্তে শারদীয় জ্যোৎস্না-স্নাত হাস্যময়ী বাহ্য প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় মহোৎসব এই ভগবতী মহাশক্তিকে বিশ্বজগতীর এই সর্ব্বাবয়বশোভিত মহিমমণ্ডিত পরিপূর্ণ স্বরূপটীকে—চাক্ষুষ দৃষ্টির প্রত্যক্ষভূতা মনোনয়নানন্দকরী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী মূর্ত্তিতে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত করিয়া ঈশোপনিষদের সুমহান্ জীবনাদর্শটী বিশ্বমানবের নিকট প্রচার করিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বৎসর

স্বামী আত্মানন্দ

নবীন ভারতের আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম, ভারতের নবজাগরণ ও পুনরুত্থানের জন্য যে বিশাল কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন,—বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার তার মধ্যে একটি। স্বামীজি জানতেন,—ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক দুরবস্থাতেও এমন আধ্যাত্মিক সম্পদ আছে, যা ভারত দেশ বিদেশে অকাতরে বিতরণ করতে পারে। ভারতের অতীত ইতিহাস যাঁদের জানা

স্বামী আত্মানন্দ

আছে, তাঁরা জানেন,—কিভাবে ভারত হতে অতীত কালে ধর্ম্মাচার্য্যগণ দেশে দেশে গিয়েছিলেন আর কিভাবে সেই সব দেশের অধিবাসীদের চিন্তা ও কর্ম্মধারা ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সত্যই, বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম তার বাহ্যিক, ব্যবহারিক ও দার্শনিক অংশে কত সার্ব্বজনীন, কত অভিনব। হিন্দুধর্ম্ম কখনো কারো ধর্ম্মবিশ্বাসে বিন্দুমাত্র আঘাত করেনি, বা ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা আর্থিক সুবিধা সুযোগ আদায় করবার চেষ্টা করেনি।

ভারতের এই ধর্ম্মবিস্তার প্রবাহ যেদিন হতে নানাকারণে বন্ধ হয়ে গেল—সেদিন থেকেই তার অবনতির সূচনা। স্বামীজি আমাদিগকে বার বার বলে গেছেন,—"বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু।" তাঁর গুরুদেব, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ মস্তকে করে, তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বামীজি ভারতের ধর্ম্ম সুদূর পশ্চিমে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজির পদাঙ্ক ও নির্দ্দেশ অনুসরণ করেই রামকৃষ্ণ মিশন বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করে আসছেন,—বিশেষভাবে আমেরিকাতে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে কোনো সন্ন্যাসী পাঠাবার সুযোগ এতদিন হয়নি। গত ১৯৩৩ সালে ট্রান্সভালের (Transvaal) হিন্দু অধিবাসিগণ, একজন প্রচারক পাঠাবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে অনুরোধ করে পাঠান। আমাকে সেই কাজে যেতে হয়েছিল। প্রায় এক বৎসরকাল আমার সে দেশে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। সে সময় আমাকে সেখানকার বহু বড় বড় শহরে যেতে হয়েছে, ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বক্তৃতা ও বেদান্ত শিক্ষা দিতে হয়েছিল। সে দেশের বহু বড় বড় গণ্যমান্য ও পদস্থ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করবার সুযোগও আমার হয়েছিল। গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তির ফলে ১৯১৪ সন হতে আর কোনো ভারতবাসী সে দেশে গিয়ে বাস করতে পারে না। আমি প্রথম ছ মাসের জন্য প্রবেশাধিকার পেয়েছিলুম এবং পরে আরো ছ মাসের অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছিল।

কালা বিদ্বেষের জন্য আফ্রিকা সুবিখ্যাত। রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে সাদা-কালাবর্ণ একটি ভয়ঙ্কর জিনিষ এবং এই

সাদাকালা বর্ণের দ্বারাই সে দেশে সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হয়। বাইরে থেকে কোনো নূতন লোক যখন সে দেশে যায়,—সে দেশ সম্বন্ধে ইহাই হয় তার প্রথম ধারণা। কিছুদিন সেখানে বাস করলে সে দেখতে পায়,—সেখানকার সাদা লোকদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা ক্রমশঃ জেগে উঠ্‌ছে—এ বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। কিন্তু এর প্রভাব আজ পর্য্যন্ত অতি সামান্যই বলা যেতে পারে।

এ বর্ণবিদ্বেষের কুফল সব চেয়ে বেশী ভোগ করে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা,—তারপর এসিয়ার লোক। কিন্তু একটি বিষয় আশ্চর্য্য বলা যায়, সাদা অধিবাসীদের অধিকাংশ, বিশেষভাবে যারা উচ্চ শিক্ষিত, তারা কালাদেশের অতিথিকে আদর করে এবং আগ্রহ করে তার বক্তৃতা শোনে। একদিনের একটি ঘটনা ছাড়া আমাকে সাদা লোকদের মধ্যে বক্তৃতা করতে বিশেষ কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। সেদেশে মেয়েদের একটা ক্লাব আছে, তার নাম "The Women's Section of the former South African Party club' তার নেতা জেনারেল স্মাট্‌স্ (General Smutts) সেখানে বক্তৃতা করবার জন্য আমি আহূত হই। আমার সঙ্গে যাতে দুজন ভারতীয় ভদ্রলোককে যেতে দেওয়া হয় তার জন্য আমি ক্লাবের সেক্রেটারীকে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধে সেক্রেটারী রাজি হন। যথাসময় আমি বন্ধু দুজনকে সঙ্গে করে ক্লাবে উপস্থিত হই। তখন আমাকে জানান হোল,—আমার সঙ্গের দুজনকে ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না এবং এর জন্য ক্লাবের সেক্রেটারী বিশেষ দুঃখিত। তাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে আমি একটু জোর করলুম। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই রাজি হলেন না। আমিও তাই তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করে বক্তৃতা না দিয়েই চলে আসি।

ভারতীয় ফুটবল টিম যখন দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিল, আমি তখন সেখানে। অবশ্য তাদেরও বর্ণসঙ্কট বেশী ভোগ করতে হয়নি। প্রত্যেকটি খেলা তাদের অতি চমৎকার হয়েছিল, তবুও কোনো সাদা টিম তাদের সঙ্গে খেলেনি। সত্যই কালাবিদ্বেষ দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ভীষণ ব্যাপার, এবং ইয়োরোপীয়ানরা ছাড়া সকল জাতিই ঐ কালার অন্তর্ভুক্ত। সেদেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে কেহ কেহ মনে করেন এ সাদাকালা সমস্যা ক্রমশঃ ভালর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেখানকার সাদা লোকদের মজ্জাগত এ কালাবিদ্বেষ কখনো সমূলে যাবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ। এ কালা বিদ্বেষের মূল অনুসন্ধান করলে তার নানা কারণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক, এ কালাবিদ্বেষ পাশ্চাত্য খৃষ্টান সভ্যতার একটি বিষময় ফল।

সে দেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—(১) ইয়োরোপীয়ান বা সাদা জাতি, (২) সেখানকার আদিম অধিবাসী বা নিগ্রো জাতি, (৩) ভারতীয় এবং (৪) সাদা ও নিগ্রোদের মিশ্রণে সঙ্কর জাতি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভাস্কো ডিগামার আফ্রিকা গমনের পর হতেই ইয়োরোপীয় জাতিরা সে দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করে। তারপর নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে পর্ত্তুগীজরা সে দেশ অধিকার করে, তারপর ডাচ্; সর্ব্বশেষ, গত বুয়র যুদ্ধের পর ১৯১০ সালের ইউনিয়ন এক্ট (Union Act) অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ ডমিনিয়ন (British Dominion) বলে গণ্য হয়। বুয়র যুদ্ধের আগেই কেপ প্রভিন্স (Cape Province) ও নেটাল (Natal) ব্রিটিশের অধিকারে এসেছিল। বুয়র যুদ্ধ পর্য্যন্ত ওরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট এবং ট্রান্সভাল (Orange Free State, Transvaal) স্বাধীন ডাচ্ রিপাব্‌লিক্ (Dutch Republic) ছিল। যুদ্ধের পর এ চারটি প্রদেশ একত্র সংযুক্ত

হয়ে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট (Union Government) গঠিত হয়। ১৯৩১ সনে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্টেটিউট্ (West Minister Statute) বলে একটা আইন পাশ হয়, ১৯৩৪ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন পার্লিয়ামেণ্টে ষ্টেটাস্ বিল (Status Bill) পাশ হবার পর দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। কেবল রাজাকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজা (King of South Africa) বলে মান্য করে মাত্র।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা নেটাল অধিকার করে। তারপর নেটালে চিনির কারখানা স্থাপিত হয়। তাতে মজুরের কাজের জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের প্রথমদল সেদেশে গমন করে। ইক্ষুক্ষেতে ভারতীয় মজুরদের দ্বারা কম খরচে কাজ চলে বলে ভারত থেকে তখন মজুর আমদানি হতে আরম্ভ হয়। এইসব মজুরদের সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট ব্যবসায়ীও ভারত হতে আফ্রিকাতে প্রবেশ করে। প্রথম থেকেই ভারতীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয় নি এবং নানা অসুবিধার ভেতর দিয়ে ওদের দিন কাটতো। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নির্য্যাতনের করুণ কাহিনী আজকাল সকলেই জানেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ নীতি প্রথম সেখানেই কর্ম্মে পরিণত করেন। তাঁর প্রাণপাত চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের অবস্থা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়।

ভারতীয়দের দুঃখের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা এখানে সম্ভব নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতীয়দের কোনো স্থান সে দেশে নেই। আর্থিক সম্পর্কে ও সামাজিক ব্যাপারে তারা একেবারে একঘরে। পোষ্ট অফিস, ট্রাম, বাস্, সিনেমা প্রভৃতি সাধারণ স্থানেও ভারতীয়দের সাদার সঙ্গে স্থান নেই। সরকারের আদেশ ছাড়া ভারতীয়রা এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে যেতে পারে না। কেপ প্রভিন্স ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে ভারতীয়গণকে পৃথক পাড়ায় বাস করতে হয়। শহরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। ব্যবসাতে সাধারণতঃ ভারতীয়কে লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

১৯২৬ সনে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। তার নাম "ভদ্রলোকের চুক্তি" (Gentle-men's Agreement) সেই চুক্তির পর থেকে ভারত সরকারের পক্ষ হতে সেখানে একটি প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয়েছে। তারপর থেকে ভারতীয়দের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ১৯২৬ সনের চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ইউনিয়ন সরকার ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ক্রমশঃই বেশী ভাবে সাহায্য করছেন। মোটামুটি বলা যায়,—স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা আশীই ভারতীয়। আবার ভারতীয়দের অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতের সঙ্গে তাদের সমুদয় সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়াতে, অধিকাংশেরই নিজেদের ধর্ম্ম বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছু না জানলেও ধর্ম্ম শিক্ষা করবার আগ্রহ তাদের অপরিসীম। যে সব বিভিন্ন নগরে আমি গিয়েছি, ভারতীয়েরা অতি সমাদরে, অতি আন্তরিকতার সহিত আমাকে গ্রহণ করেছে। তারা যথার্থই একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের অভাব অনুভব করে,—একথা আমাকে বহুলোক বহুস্থানে বলেছে। আমার মনে হয় ভারতের কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান কালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ধর্ম্মপ্রচার মন্দির স্থাপনে কৃতকার্য্য হবে।

সেদেশে অধিকাংশ ইয়োরোপীয়গণই, ভারত, ভারতবাসী ও ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রাচ্য দর্শনের কিছু কিছু ভাব থিওজফিক্যাল সোসাইটী ওদেশে দিচ্ছে বটে তবে তা অতি সামান্য লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি ঘটনা

বলছি, তাতেই ভারত সম্বন্ধে ওদেশের লোকের কি ধারণা তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। জোহান্‌স্‌-বার্গের সেলবান হলে আমি আমার প্রথম বক্তৃতা দিই। আমার বিষয় ছিল,—পৃথিবীকে ভারত কি শিখাতে পারে। প্রায় ছয়শ ইয়োরোপীয় মেয়ে পুরুষ সভায় উপস্থিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিভিন্ন সময়ে, ভারতীয় চিন্তাধারা কিভাবে বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, মানবত্বের পূর্ণতা সম্বন্ধে হিন্দুভাব কি, এই সব বিষয় আমি আমার বক্তৃতায় আলোচনা করছিলুম। প্রসঙ্গ ক্রমে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মের কথাও আলোচিত হয়েছিল। বক্তৃতার পর সময় সময় আমি শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করতুম। শ্রোতাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করলেন,—"ভারত জগতে কী করেছে? কটি দেশ ভারত জয় করেছে?" উত্তরে আমি ভারতের চিন্তাধারা বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম অতীত কালে কি ভাবে তখনকার সারা বিশ্ব-জয় করেছিল, সেই সব কথা বলছিলুম। আবার প্রশ্ন হলো,—"বুদ্ধ কি ভারতীয় ছিলেন?" ইয়োরোপীয়দের অধিকাংশ লোক ভারত সম্বন্ধে কতটুকু জানে, তা এ প্রশ্নেই বুঝতে পারা যায়। তাঁদের ধারণা—ভারত একটি নোংরা, দরিদ্র ও রোগের দেশ। সেখানে না আছে কোনো শিক্ষা, না আছে কোনো কৃষ্টি (Culture), না আছে কোনো সভ্যতা; ভারতে ধর্ম্ম বলে কিছু নেই, দর্শন বলে কিছু নেই। অবশ্য তাদের মধ্যে এরূপ মুষ্টিমেয় লোক আছে যারা ভারত সম্বন্ধে সত্যিকার খবর রাখে। আমি যে যে স্থানে বক্তৃতা করতে গিয়েছি, সব জায়গায়ই বহু শিক্ষিত মেয়ে পুরুষ আমার বক্তৃতা খুব আগ্রহ করে শুনেছে। তাতে মনে হয়,—আমাদের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা তাদের আছে।

ঐ সব দেশে, উপযুক্ত লোক যদি বহুকাল ধরে কঠোর চেষ্টা করেন, তবে সত্যিকার কাজ কিছু হতে পারে। যেখানে এসিয়াবাসিদের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ একটি সাধারণ নিয়ম, যেখানে পদে পদে বহু বাঁধা, এবং যাদের মনে এরূপ বিরুদ্ধ সংস্কার, তাদের মধ্যে কাজ করা অতি শক্ত ব্যাপার। প্রাচ্য মন ও পাশ্চাত্য মন বাস্তবিকই কত তফাৎ!

ডারবান সহরের একটি সভায় কথা বলছি। সভায় নানা সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি অনেকের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। আমাদের কথাবার্ত্তা ভারত ও ভারতীয় সম্বন্ধেই হচ্ছিল। বিজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে নানাভাবে সংযোগ স্থাপন করছে। এসময় ভারতের আধ্যাত্মিকতা কি ভাবে মানবজাতির বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে, বিশেষ জোর দিয়ে আমি সেইসব কথা আলোচনা করছিলুম। জীবনের আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করলে,—আমরা প্রত্যেকের প্রতি একটা সদ্ভাব ও সমন্বয়ের সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এইটিই আমরা ভুলবার চেষ্টা করছি। "কেবল মাত্র রুটিতেই মানুষ বাঁচতে পারে না," (Man cannot live by bread alone) এ মহা সত্যটিকে আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে বাদ দিয়ে চলছি। সেখানে একজন নামকরা উকিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি উত্তর করলেন,—"সত্যই, মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচতে পারে না; জেম, জেলি, মাখনও তার সঙ্গে চাই।"

উকিল বন্ধুটি হয়ত একটু হালকা ভাবেই তার কথাটি বলেছিলেন। লোক-প্রসিদ্ধ উক্ত প্রবাদ বাক্যটির এভাবে সরল ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য মনের একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মত্যাগ বা বৈরাগ্যের কোনো স্থান পাশ্চাত্য মনে নেই। বরং তারা বৈরাগ্যকে দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতাই মনে করে। কিন্তু আমরা জানি, ত্যাগ ও বৈরাগ্য

ব্যতীত মানবের কোনো প্রকার আত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়। যতক্ষণ মানুষ তার অন্তরের নিম্নমুখী বাসনাগুলি দ্বারা পরিচালিত হবে, ততক্ষণ তার উন্নতি সুদূর পরাহত। যা হোক সব দেশেই এমন কতক লোক পাওয়া যায়, যাঁরা প্রকৃত সত্যান্বেষী। দক্ষিণ আফ্রিকা একটি নূতন দেশ হলেও এ নিয়মের বাইরে নয়। বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকতার জন্য এবং তাহা যে ভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাতে যে কোনো দেশই তা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য প্রচারের জন্য উপযুক্ত আচার্য্যও দরকার।

যে সব প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে সে দেশে আমার সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে জেনারেল হার্টজগ (General J B. M Hertzog), জেনারেল স্মাট্‌স্ (General J C Smutts) ও মিষ্টার হপমেয়ার (Mr. Hopmeyr) এর নাম করা যেতে পারে। অতি আন্তরিক ভাবে তাঁরা আমায় গ্রহণ করেছিলেন এবং বেশ সদয় ব্যবহার আমি তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। এঁদের প্রত্যেকে ভারত ও ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত! সবচেয়ে বেশী কথা হয়েছিল আমার জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে। জেনারেল স্মাট্‌স্ বর্ত্তমানে পৃথিবীতে একজন নাম-করা লোক। তিনি একজন উঁচুদরের রাজনৈতিক, বিদ্বান, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা। আমাদের কথা-বার্ত্তা সাধারণতঃ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, মানব জীবনে তাদের কার্য্যকারিতা, বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগের ফল প্রভৃতি বিষয় ছিল। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করলেন—এবং পরস্পরের সহানুভূতি ও গুণগ্রাহিতা দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিই লাভবান্ হবে, এবং সভ্যতার ভবিষ্যৎ অনেকটা এর উপরই নির্ভর করছে,—বলে মত প্রকাশ করলেন। আমি প্রশ্ন করি,—"পাশ্চাত্য জীবন যাত্রার মূল তত্ত্বটি কি?" "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা,"—তিনি উত্তর করেন।

"কিন্তু অবিনাশী চিরন্তন সত্তার কোনো ধারণা পাশ্চাত্য মনের নেই। পাশ্চাত্য মন এমন কোনো বস্তুর সন্ধান পায়নি—যা কালের করাল গতিতে ধ্বংস হয় না। তা ঐ মানুষের স্বাধীনতা।"

"কিন্তু, পেছনে যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনো বাস্তব সত্তা হতে পারে না। পাশ্চাত্যের উগ্র কর্ম্মশীলতা, যেভাবে ধর্ম্মকে জীবন থেকে কেটে বাদ দিয়েছে, তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা যা বুঝায় তা কখনো হতে পারে না।"

তারপর ভারত সম্বন্ধে আমাদের কথাবার্ত্তা হতে লাগলো। ভারতের কয়েকজন নেতার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। অন্যান্য ইয়োরো-পীয়দের মত তিনিও এভাবে তাঁর মত প্রকাশ করলেন, ভারতে আদর্শবাদের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে; যার ফলে ভারতীয়দের কর্ম্মতৎপরতা, মৌলিকতা, উৎসাহ প্রভৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের জনসাধারণ এভাবে তাদের পৌরুষ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ জাগাবার শিক্ষা দিতে হবে। জেনারেল স্মাট্‌সের কথায় অনেক সত্য আছে। স্মাট্‌স্ অবশ্য একথাও স্বীকার করেছিলেন,—পাশ্চাত্য জীবনে ভারতের আধ্যাত্মিকতারও বর্ত্তমানে দরকার। জেনারেলের সঙ্গে কথা বলে আমি সত্যই অনুভব করতে পেরেছিলুম,—কেন জেনারেল স্মাট্‌স্ আজ জগদ্বিখ্যাত। সারা পৃথিবীর ইতিহাস এবং প্রত্যেক দেশের খুঁটিনাটি খবরটিও তাঁর নখদর্পণে। বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সব বিষয়েই তিনি অভিজ্ঞ। তিনি সত্যই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। সে দেশের প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) জেনারেল হার্টজগের সঙ্গে যখন আমার আলাপ

হয়েছিল,—দেখলুম, লোকসেবার ভাব তাঁর মধ্যে কি ভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এত উচ্চপদস্থ লোকদের মনেও আমি পদাভিমান দেখতে পাই নি, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নয়।

অনেক বিশিষ্ট ইয়োরোপীয় সে দেশে আজকাল ভারত ও ভারতবাসীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ইচ্ছুক হয়েছেন। Witwatensrand বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলুম। অনেক অধ্যাপক ও শিক্ষিত গণ্যমান্য লোক তাহা আগ্রহের সহিত শুনেছিলেন। তাঁদের অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভেতর দিয়ে এভাবে কৃষ্টিগত শিক্ষা (Cultural) বিস্তার নিয়মিত ভাবে হওয়া দরকার।

রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী ভারত সরকারের প্রথম প্রতিনিধি হিসাবে সে দেশে গিয়েছিলেন। ভারত-সভ্যতা ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি সে দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা দ্বারাও সে দেশের বিশেষ উপকার হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মত স্থানে বেদান্ত প্রচারের গুরু দায়িত্বের তুলনায়, সময় আমি অতি সামান্যই পেয়েছিলুম। এই এক বৎসরের মধ্যে আমি দশ বারটি সহরে ভ্রমণ করেছি এবং প্রায় শতাধিক বক্তৃতা প্রদান করেছি। হীরা, সোনা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি আফ্রিকা, ধর্ম্ম, দর্শন ও সভ্যতার জন্মস্থান ভারত, এ উভয় দেশের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে একটি প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হোক, ইহাই আমি কামনা করি এবং আমার সামান্য শক্তিতে যা আমি সে দেশে করেছি, তা ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী

বর্ত্তমান ১৩৪২ সনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই সনের ফাল্গুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪৩ সনের ফাল্গুন মাসে তাঁহার জন্মতিথি পর্য্যন্ত সম্বৎসরব্যাপী এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠান যাহাতে ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও এসিয়ার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘটিত হয়, সেইজন্য একটী জনসভায় বিস্তৃত কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য আকস্মিক বিপদে পর্য্যুদস্ত জনসাধারণের সাহায্যকল্পে সেবাকার্য্যের নিমিত্ত এবং সাধারণের ভিতর কার্য্যকরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে একটী কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে জগতের সকল মানবের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ভাব স্থাপনার্থ একটী 'কৃষ্টি-ভবন' প্রতিষ্ঠা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। 'শতবার্ষিকী স্মৃতিগ্রন্থ' প্রকাশ, বিবিধ ধর্ম্ম-সম্মেলন ও ভারতীয় কৃষ্টি-প্রদর্শনী প্রভৃতি শতবার্ষিকীর অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভারত এবং ভারতেতর দেশের প্রধান প্রধান গণ্যমান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে লইয়া বিবিধ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে ইহাতে যোগদান করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

মাধুকরী

১। বাঙ্গালার বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু, জেকোস্লোভাকিয়া, কার্লসবাদ হইতে "বাঙ্গালার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে 'হিতবাদী' পত্রিকায় গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশের যুবকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে—অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয়, তবে ইহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রমহলে "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ-সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্ত্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ—সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার তদ্রূপ মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে। চরিত্রগঠনের জন্য "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য" অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাহিত্যের আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

২। "ভারতবর্ষের" গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীবটুক নাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্, কাব্যতীর্থ মহোদয়—"হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের একদিক্" নামক একটী তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"মানবজীবনের কর্ত্তব্য সমূহ সম্বন্ধে হিন্দুর দৃষ্টি কিছু বিলক্ষণ। আমরা আজকাল কর্ত্তব্যগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় ভাগ করিয়া থাকি—যথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। কিন্তু সকল কর্ত্তব্যই আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক সাধারণ নামে—তাহা ধর্ম্ম। এবং সকলের মূল এক—বেদের বিধি। এককালে স্মৃতিশাস্ত্রই ছিল সকল কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক ও প্রমাণ। আদ্যযুগে কল্পসূত্রের তিন ভাগ শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রে এবং পরবর্ত্তিকালে স্মৃতিগ্রন্থের আচার, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহার-খণ্ডে এই কর্ত্তব্য সমষ্টি উপদিষ্ট ও আলোচিত। মনুসংহিতায় এগুলিকে পৃথক্ না রাখিয়া মিশ্রিত ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকেও এরূপ বিভাগ-সঙ্কর (overlapping) দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বত্রই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যে প্ররোচনা ও বাধ্যতা দিয়াছে—পাপ-পুণ্যের —ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা। রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের উদ্ভাবন করেন নাই—তিনি সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতিপালক ও ধর্ম্মের সংরক্ষক কিন্তু তিনিও শাস্ত্র-শাসিত। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন আশ্রমের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার ও সম্বন্ধের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ামক ও প্রভু অপৌরুষের জ্ঞান-পুঞ্জ। আর্য-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া ও গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া, তাহা শ্রুতি এবং পরবর্ত্তী মুনিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়া, তাহা স্মৃতির আকার ধরিয়াছে। স্মৃতি বলিতে বুঝায় কল্পসূত্র, সংহিতা এবং পুরাণে নিবদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ। এগুলি হইল মূলীভূত উপদেশ সমষ্টি। কিন্তু কালক্রমে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল মূল বিধিনিষেধগুলির নানাভাবে ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করিয়া লোকের

প্রয়োজন সাধন ও স্থানীয় আচারগুলি বজায় রাখা হইয়াছে। সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে বহু নিবন্ধ-গ্রন্থ বা digests রচিত হইয়াছে—এগুলির নাম স্মৃতি-নিবন্ধ।

এই বিস্তৃত স্মৃতি-শাস্ত্রের মধ্যে যুগ-যুগান্তর ব্যাপ্ত হিন্দুর সামাজিক জীবনের কাহিনী নিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব কাণে ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করিয়া, উহা কত বিপুল ও বিস্তৃত তাহার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত ও বর্ণিত গ্রন্থরাশির মধ্যে যে সামাজিক কাহিনীর উপাদান নিহিত আছে—সেগুলিকে কালের ফ্রেমে আঁটিয়া এবং রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিবৃত্তের সহিত মিলাইয়া—সুবিন্যস্ত করিয়া ধারাবাহিক সমাজ-চিত্র—আঁকিয়া তুলিতে এখনও বহু কর্ম্মী ও বিদ্বানের প্রয়োজন। মূল স্মৃতিগুলিরই এখনও যথাযথ সঙ্কলন ও পরীক্ষা হয় নাই। পুরাণ-গুলির কথা বহুদূরে। নিবন্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত ঋষিগণের বচন এবং বিভিন্ন সংহিতাকারের নামে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বহু পার্থক্য। কোন কোন স্মৃতি-কারের—যথা কাত্যায়নের—পুনঃসঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে মাত্র। বিস্তৃত ভূমি—শ্রমিকের সংখ্যা অল্প, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।"

গোরাষ্টক

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল

নির্ম্মল করে চিত-দরপণ অমলিন যার সুরের তান
সংসার বনে দাব হুতাশন হিমধারে যার লভে বিরাম,
শ্রেয়স-রূপিণী কুমুদিনী বুকে কৌমুদী-সুধা যাহার দান
প্রতিপদে যার চুমুকে চুমুকে অমিয়ার রসে মগন প্রাণ,
বিদ্যা-বধূর যে হয় জীবন, বিশ্ব-আত্মা করায় স্নান
বহায় যাহার চন্দ্র কিরণ পরমানন্দ সাগরে বান,
জয় জয় সেই কানু-কীর্ত্তন উচ্চ কণ্ঠে করহ গান
সাধনার বীজ বাঙ্গার ধন হুঙ্কারে তোল হরির নাম।

সঙ্ঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত-সোসাইটী, লণ্ডন

লণ্ডন নগরীতে নবস্থাপিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত-সোসাইটীর" আহ্বানে গত ১২ই জুন ল্যানক্যাস্‌টার্ গেট্ আন্তর্জাতিক-সভা-গৃহে

স্বামী অব্যক্তানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মিঃ ই, টি, ষ্টার্ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন ঘটনা বর্ণনা করেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক আধ্যাত্মিক জগতে ভারতবর্ষের দান সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অব্যক্তানন্দের ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যের একটি বিবরণী সভায় পঠিত হয়। মিসেস্ হান্‌কিন্‌স্ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত একটি গল্প এবং স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা পাঠ করেন। পরে মেরী বি, ক্লার্ক ও স্বামী অব্যক্তানন্দ সময়োপযোগী বক্তৃতা দান করিলে জলযোগান্তে উৎসবকার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

গত ১৯শে আগষ্ট সোমবার আশ্রম-কর্ম্মিগণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজকে এক অভিনন্দন দিয়াছেন। এই উপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইলে যুগাচার্য্য স্বামীজি বিরচিত "হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" "সন্ন্যাসীর গীতি" ও "সখার প্রতি" হইতে কতকটা কয়েকজন আবৃত্তি করেন। অতঃপর অভিনন্দন পঠিত হইলে উত্তরকাশী হইতে সমাগত স্বামী তেজসানন্দ "কর্ম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ" বিষয়ক একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দানে সমাগত সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। পূজনীয় শুদ্ধানন্দ মহারাজ অভিনন্দনের উত্তর প্রদান-প্রসঙ্গে আশ্রমের লোকহিতকর কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং কর্ম্মিগণকে অধ্যক্ষের আদেশ সর্ব্বপ্রযত্নে মান্য করিতে উপদেশ দেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব যথাযথভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। শ্রদ্ধেয় কল্যাণানন্দ মহারাজ বলেন,—স্বামীজি যে কয়জনের উপর তাঁহার অভিনব বার্ত্তা প্রচারের ভারার্পণ করিয়াছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজির বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতির পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অবশেষে ম্যাজিক্ প্রদর্শিত হইলে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবা-কার্য্য

জনসাধারণ অবগত আছেন—গত আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হুগলী, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার বহু অঞ্চল দামোদরের বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং উহার ফলে সহস্র সহস্র নরনারী গৃহহীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া অশেষ দুঃখ দুর্দ্দশায় কালাতিপাত করিতেছে। বন্যার প্রারম্ভ হইতেই আমরা চারিটি কেন্দ্র হইতে ঐ সব অঞ্চলে সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছি। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চাঁপাডাঙ্গা কেন্দ্র, থানা পুরশুড়া, জেলা হুগলী—১৬ই হইতে ২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ১৫খানি গ্রামে নিয়মিত ও সাময়িক সাহায্য হিসাবে মোট ১৬১ মণ ২৮ সের চাউল এবং কয়েক মণ ডাল, চিঁড়া, গুড়, ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

ভাঙ্গামোড়া কেন্দ্র, থানা পুরশুড়া—২৪শে আগষ্ট হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১০ খানি গ্রাম এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে নিয়মিত ও সাময়িক সাহায্য হিসাবে মোট ১১৩ মণ ৬ সের চাউল এবং কিছু চিঁড়া, মুড়কি ও ডাল ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

খণ্ডঘোষ কেন্দ্র, থানা খণ্ডঘোষ, জেলা বর্দ্ধমান—১৯শে হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৫ খানি গ্রাম এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে নিয়মিত ও সাময়িক সাহায্য হিসাবে মোট ১৩৮ মণ ১৮½ সের চাউল এবং কিছু চিঁড়া, ডাল, তেল, কাপড়, গুড়, বার্লি, মিছরী ইত্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামও এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ওয়াড়ী কেন্দ্র, থানা খণ্ডঘোষ—২০শে হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ১১ খানি গ্রামে মোট ৩৫ মণ ২০ সের চাউল এবং ৬ মণ চিঁড়া, ২ মণ ডাল, ১½ মণ গুড় ও ৫২ খানি কাপড় নিয়মিত ও সাময়িক সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হইয়াছে।

সকল কেন্দ্রেই নিয়মিতভাবে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান এবং গৃহ নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের হাতে যে টাকা আছে তাহা অভাবের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সকল সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আমরা আর্ত্ত-নারায়ণগণের সেবাকল্পে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। অর্থ ও বস্ত্র নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

(১) অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ
অস্থায়ী সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
৭-৯-৩৫

স্যর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

গত ১০ই আগষ্ট, শনিবার, রাত্রি ২টা ৫৫ মিনিটের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার সুনাম প্রসিদ্ধ স্যর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুমূত্র ও রক্তের চাপাধিক্যে বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি দিন।

চিত্র-পরিচয়

১। **প্রচ্ছদপট**—উদ্বোধনের বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রচ্ছদ-পটের দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী চিত্রটী মহাবল্লীপুরস্থ মহিষমণ্ডপের প্রাচীর গাত্র হইতে গৃহীত। এই মন্দির পল্লবরাজদিগের সময় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মহাবল্লীপুর বা মামাল্লাপুরম্ মান্দ্রাজ সহর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে। মহাবল্লীপুরস্থ পল্লবরাজদিগের নির্ম্মিত গণেশরথ, দ্রৌপদীরথ, সহদেবের রথ, তটমন্দির ইত্যাদি প্রস্তর খোদিত (monolithic) মন্দিরগুলি প্রাচীন স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরগুলি পল্লবরাজ মহামল্ল নরসিংহ বর্ম্মণ, (খৃঃ অঃ ৬২৫-৫০) এবং পরবর্ত্তী পল্লবরাজ পরমেশ্বর বর্ম্মণের (খৃঃ অঃ ৬৫৫-৯০) সময় নির্ম্মিত। গণেশরথ এবং তটমন্দিরের চিত্র মন্দিরময় ভারত শীর্ষক চিত্রাবলীতে দেওয়া হইল।

২। প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্রটী শ্রীনিতাই চন্দ্র পালের নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি হইতে গৃহীত। তরুণ শিল্পী শ্রীনিতাই চন্দ্র পাল মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অদ্বিতীয়। সম্প্রতি তিনি ব্রোঞ্জে নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান শিল্পকলায় এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত গঙ্গা, যমুনা, নটরাজ, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি এবং অজন্তার চিত্রাবলম্বনে মূর্ত্তি সমূহ শিল্পানুরাগী ব্যক্তিদিগের বিশেষ আনন্দ উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই।

৩। ৪৬১ পৃষ্ঠায় আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের চিত্রটী পূর্ব্বে কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। এই চিত্রটী ক্যালিফোরনিয়াতে তোলা। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দের সৌজন্যে এই চিত্রটী আমরা পাইয়াছি।

৪। ৪৭৩ পৃষ্ঠায় অঙ্গুরীদান চিত্রটীর শিল্পী মহিশূরের মিঃ কে, ভেঙ্কটাপ্পা। ইনি শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন কৃতী ছাত্র। চিত্রটীর তাৎপর্য্য এই:—শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারার্থ মহাবীর হনুমানকে প্রেরণ করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্রই হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছেন কিনা পাছে সীতার এই সন্দেহ উপস্থিত হয় এইজন্য নিদর্শন স্বরূপ তিনি স্বীয় অঙ্গুরী হনুমানকে দিতেছেন। দক্ষ শিল্পী শ্রীরামচন্দ্রের মুখমণ্ডলে প্রবল বিশ্বাস এবং বিষাদের ভাব বিশদভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। হনুমানের মুখমণ্ডলে আনুগত্য এবং ভক্তির ভাব, পেছনের দিকে সুগ্রীবের ভক্তিবিনম্র মুখ দেখান হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের পেছনে লক্ষ্মণের শুধু মুখটী দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মণের মুখে বিদ্রূপ এবং অবিশ্বাসের স্মিতহাস্য পরিলক্ষিত হইতেছে, ভাবটী এই যে "তুমি সামান্য বানর তোমাদ্বারা এই কাজ হইবে না।"

৫। ৪৯৭ পৃষ্ঠায় মহাভিনিষ্ক্রমণ চিত্রটীরও শিল্পী মিঃ কে, ভেঙ্কটাপ্পা। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের উদ্দেশ্যে কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, অশ্ব 'কণ্টক' যাত্রার্থ প্রস্তুত। সিদ্ধার্থের মুখমণ্ডলে বৈরাগ্যের ভাব সুপরিস্ফুট।

৬। মন্দিরময় ভারত শীর্ষক চিত্রাবলীতে দাক্ষিণাত্য, রাজপুতানা এবং মধ্যভারতের কতকগুলি প্রাচীন মন্দির এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি চিত্র স্বামী সুন্দরানন্দের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রবন্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধটী এই সংখ্যায় সমাপ্ত করা সম্ভবপর হইল না। চিত্রগুলির নীচে অতি সংক্ষেপে পরিচয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রকৃতির দৌত্য

ব্রহ্মচারী অমূল্যকুমার

আজ, শরতে কে সোণার বরণ আস্‌ল ধরণীতে ?
তাঁর মুখে সোণার হাসি।
তাঁর দুটি চরণ রক্তবরণ মেঘের তরণীতে
ওঠে নীল দরিয়ায় ভাসি।
তাঁর আঁচল ধানের ক্ষেতে—
শুনি, দুকূল ভরা নদীর ধারা দেখ্‌লো পথে যেতে।

ধরি তৃণের গলে শিউলি দলে দেখ্‌রে লক্ষ্মীরাণী
ঐযে হাসে কমল বনে।
এলো শুভ্র মেঘে মরাল বেগে লয়ে প্রাণের বাণী,
তাই ভ্রমর ক্ষণে ক্ষণে
মধুর গুঞ্জে বীণার তারে,
ভরি গগন পবন, জাগায় স্বপন তাহারি ঝঙ্কারে।

ঐযে গভীর রাতে গগন-পাতে তারার ভাষায়
লেখে সিদ্ধি-আশিস গণপতি।
তাই নিদ্ না গিয়া বন-পাপিয়া হয়ে আশায়
তাঁরে জানায় প্রাণের 'নতি'।
কহে প্রজাপতি, বনের পথে—
এলো রঙ্গে সাজি, কুমার আজি ময়ূর-রথে।

সতীর প্রেমে বিভল ভোলা, পাগল শ্মশান-চারী
এলো দুপুরের উদাস হাওয়ায়।
তাই গুম্‌রে উঠে কি অস্ফুট তরুর সারি ;
বুঝিঐ বিরহীর ব্যথিত চাওয়ায়।
তাইকি গোপনে বরুণ-জায়া—
শিশিরের অশ্রু ঢালে পৃথ্বিতলে, জানায় মায়া ?

যদি স্বর্গ হতে জ্যোতির রথে সবাই এলো,
তবে ধরায় আঁধার কেন ?
যদি কোলের ছেলে সবাই মিলে মাকেই পেলো,
কেন মরছে ক্ষুধায় হেন ?
আজি বল মা উমা আসি,—
ওকি পূজার থালা ?- না ছেলের খেলা ?
—বৃথাই মন্ত্ররাশি ?

মন্দিরময় ভারত

গণেশ-রথ, মহাবল্লীপুরম, সপ্তম শতাব্দী
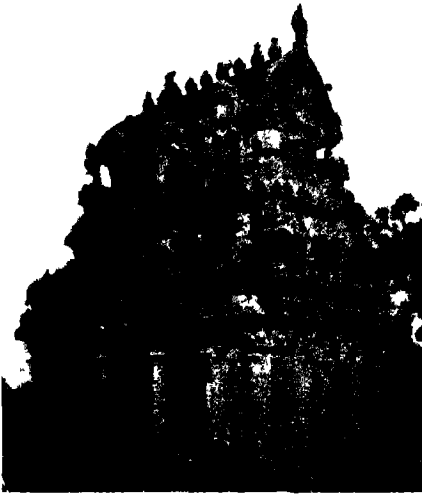
তট-মন্দির, মহাবল্লীপুরম, অষ্টম শতাব্দী

আলোকস্নাত চামুণ্ডামন্দির, মহিশূর

প্রস্তর খোদিত বৃষ, চামুণ্ডী পাহাড়, মহিশূর
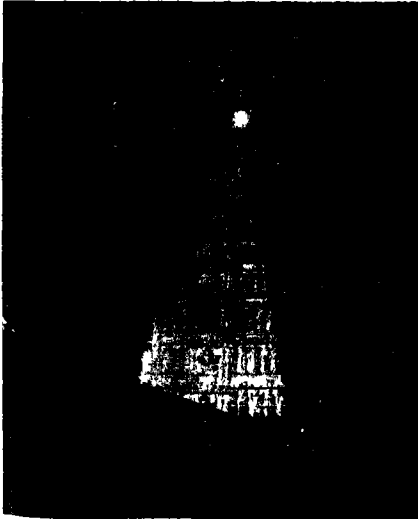
কৈলাসনাথ মন্দির, কাঞ্চী,
অষ্টম শতাব্দী

চিদাম্বরম মন্দির,
ত্রয়োদশ শতাব্দী

সুব্রহ্মণ্য মন্দির, তাঞ্জোর,
অষ্টাদশ শতাব্দী
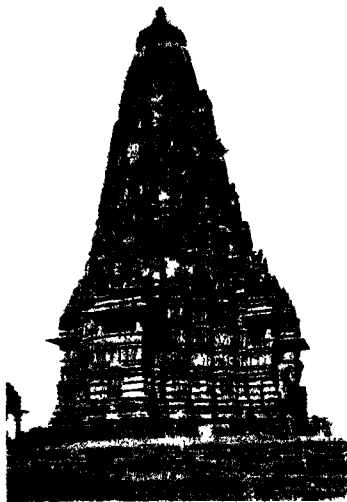
খজুরাও, মহাদেব মন্দির,
দশম শতাব্দী

ইলোরা, পর্ব্বত-খোদিত কৈলাস মন্দির,
অষ্টম শতাব্দী

কুরুক্ষেত্র

পিচ্ছিল হ্রদ মধ্যে রাজপ্রাসাদ,
উদয়পুর

উদয়পুর প্রাসাদ

ঈশ্বর মন্দির, আরসিকিয়ার, মহিশূর,
ত্রয়োদশ শতাব্দী
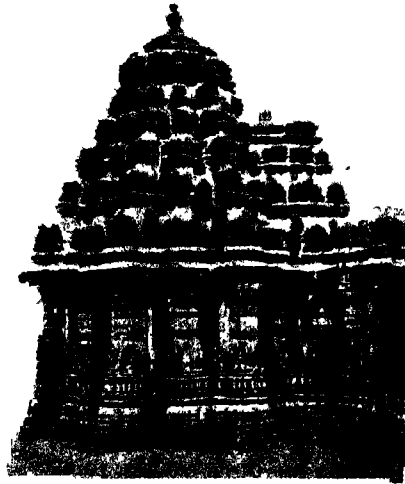
দিলোয়ারা, তেজপাল নির্ম্মিত মর্ম্মর-মন্দিরের একাংশ,
ত্রয়োদশ শতাব্দী

কার্ত্তিক—১৩৪২
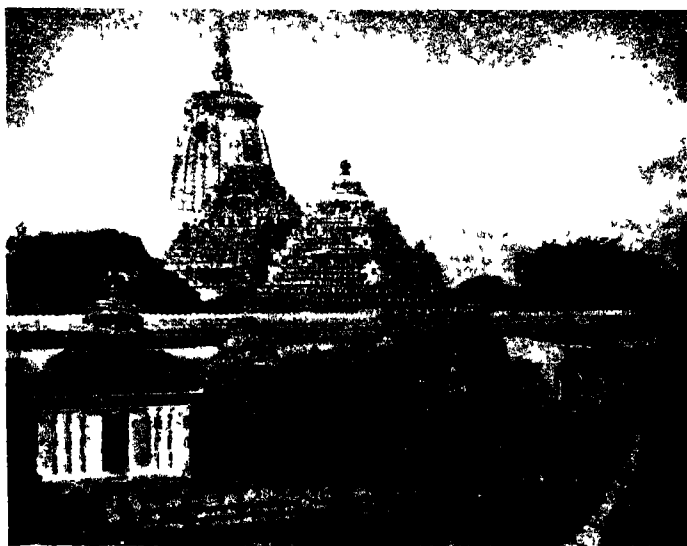
"তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কর্ম্মপরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি, আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৮০ ওয়াকলি ষ্ট্রীট, চেল্‌সিয়া
৩১শে অক্টোবর, ১৮৯৫,
৫টা

প্রিয় বন্ধু,

এই মাত্র মিঃ সিলভারলক্ এবং তাঁহার জনৈক যুবক বন্ধু চলিয়া গেলেন। মিস্ মুলারও আজ বৈকালে আসিয়াছিলেন এবং উঁহাদের আসিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই চলিয়া যান।

ইঁহাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যটি বীজের ব্যবসা করেন, দর্শন ও বিজ্ঞান এঁরা বিশেষভাবেই পড়িয়াছেন এবং উঁহাদের আধুনিকতম সিদ্ধান্তটির সহিতও হিন্দুদিগের প্রাচীন চিন্তাধারার অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। উভয়েই সুন্দরলোক—বেশ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। একজন গির্জ্জার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন আর একজনও করিবেন কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর দুইটি জিনিষ আমার মনে জাগিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ বইটি আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে। উহা দ্বারা আমরা এমন একদল লোককে হাত করিতে

পারিব যাঁহারা দার্শনিক ভিত্তিতে ধর্মকে বুঝিতে চান এবং অলৌকিক ভেল্কিবাজি একদম পছন্দ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, এঁরা উভয়েই আমাদের ধর্মের অন্তর্গত পূজাবিধি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। এইটিতে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। মূর্ত্তি ও প্রতীক—এই দুইয়ের মধ্য দিয়াই জগতের প্রকাশ। বস্তুতঃ পূজা, অর্চনা ও মূর্ত্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়া দর্শন যখন স্থূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তখন তাহাকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। তাই, ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং পূজা-বিধির প্রচলন নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এবং আমাদিগকেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কিছু আনুষ্ঠানিক পূজার প্রচলন করিতে হইবে। যদি তুমি শনিবার কিংবা তৎপূর্ব্বে একদিন আসিতে পার তবে তোমাকে সঙ্গে লইয়া 'এশিয়াটিক সোসাইটির' লাইব্রেরী হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি অথবা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে 'হেমাদ্রিকোষ' বইখানি তুমিই আমার জন্য লইয়া আসিও, ঐ বইতেই আমরা যাহা চাই তাহা পাওয়া যাইবে। আসিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক উপনিষদগুলিও সঙ্গে লইয়া আসিও।

জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি পরিব্যাপ্ত মানবের সমগ্র জীবনখানির উপর ভিত্তি করিয়া একটি চমৎকার দর্শন আমরা গড়িয়া তুলিব। অসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদ মানবজীবনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

আমার বিশ্বাস যদি আমাদের এই ক্লাশটি শেষ হইবার পূর্ব্বে পুস্তকটি প্রণয়ন করিয়া তদনুযায়ী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটি কি দুইটি পূজার অনুষ্ঠান করি এবং তারপর উহাকে প্রকাশিত করি তবেই পুস্তকটি চলিয়া যাইবে।

স্‌ঙ্গেরমত কিছু এঁরা চান আর না চান আনুষ্ঠানিক কোন পূজার ব্যবস্থা দরকার। আর ঠিক এইটিই একটি কারণ যাহার জন্য—রা পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

নৈতিক-সমিতি 'তাহাদের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছি' বলিয়া আবার আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া চিঠি দিয়াছে। নিয়মাবলীপত্রও একখানা পাঠাইয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা যে আমি একখানা বই লইয়া গিয়া ১০ মিনিটের জন্য উহা তাহাদের সমিতির সভায় পাঠ করি।

গীতার অনুবাদ এবং বৌদ্ধজাতকের অনুবাদটি তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক সঙ্গে আনিও। তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ে কিছুই করিব না।

আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিও। ইতি

বিবেকানন্দ

শিব-রুদ্র
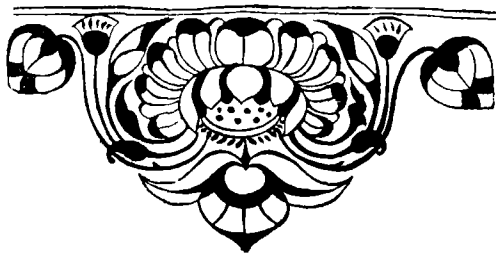
শ্রীবিজয় গোপাল বিশ্বাস

মহাশূন্য-তমো-ঘোর-তমিস্রা ভেদিয়া হর হর শঙ্কর হে বীর সন্ন্যাসি—
প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-দীপ্ত ক্ষিপ্ত শূল-পাণি ! সগর্ব্ব-নির্ভিক-বক্ষে দাঁড়াইলে আসি’।
করাল-বিজলী-জ্বালা উজলি’ ত্রিলোক ধ্বক্ ধ্বক্ জলে ভালে সহস্র-শিখায়,
লটাপট্ জটাজুট টুটিয়া উল্লাসে উন্মাদিনী যেন প্রেম-গঙ্গা বাহিরায়।
তর্জ্জনে গর্জ্জে ভীম-ভুজঙ্গভয়াল্ ভ্রূভঙ্গী-তরঙ্গ-বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ-ফণায়,
দুর্দ্দান্ত-শার্দ্দূল-দল-বিপুল-বিক্রমে মূর্ত্ত-শক্তি পরিব্যক্ত রুদ্র-চেতনায়।
অশনি-নির্ঘোষে ঘন মাভৈঃ মাভৈঃ রবে উদ্ভূত-জাগ্রত-বিশ্ব সহসা চঞ্চল,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে তব তাণ্ডব-নর্ত্তনে উন্মত্ত-পাথারে নাচে তরঙ্গের দল ॥

ধীর, স্থির, সুগম্ভীর শান্ত-সুনিবিড়, পুণ্যচ্ছায়া-তপোবনে প্রণমি তোমায়,
যোগীশ্বর, যোগমগ্ন, নগ্নদিক্‌বাস, ছিন্ন-পাশ, ভস্মরাশ-সমাচ্ছন্ন-কায়।
আনন্দ-অলকানন্দা, নন্দন-সুন্দর, মন্দার মধুর-গন্ধ, চন্দ্রমা উদয়,
ভ্রূকুটি-কুটিল-নেত্র, প্রলয়-কটাক্ষে ‘সংহারো’ ‘সংহারো রবে মৃত্যু-মহাভয়।
সর্ব্ব-সিদ্ধি-সদা-সিদ্ধ, সমৃদ্ধি-সাধক, সম্যক-সম্ভোগ-শম্ভু, শিব-শুভঙ্কর,
প্রমত্ত-পিনাকী, শিঙ্গা ‘সম্বরো’ ‘সম্বরো’ অম্বরে ববম্ বম্ বাজে নিরন্তর।
পঞ্চশর স্মরহর, অযুত-ভাস্কর, রশ্মিমান খরশাণ করে খান্ খান্,
মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল, তীব্র-কাল-কূট নীলকণ্ঠ, কণ্ঠভরি করিয়াছ পান ॥

আদিহীন অন্তহীন প্রশান্ত অতল নিস্তরঙ্গ পয়োধির তরঙ্গ—লীলায়
সৃষ্টি স্থিতি-মহাধ্বংস অনাদি-কারণ কার্য্যরূপে একাধারে তোমাতে মিলায়।
বিচিত্র-বিরাট-নাট্য-নব-নটরাজ, রাজ্য রাজা-ভাঙ্গাগড়া-নিগূঢ়-ক্রীড়ায়
অনন্ত নিয়ন্তা স্বয়ং, স্বয়ম্ভূ, সোঽহম্, সসীমে অসীম সত্তা সত্য মহিমায়।
প্রকৃতি-পুরুষাদ্বয়, অখণ্ড-অব্যয়, অচিন্ত্য অব্যক্ত-নিত্য, মুক্ত-মহেশ্বর,
শুদ্ধ-সত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, তেজস্বী রাজস্, তত্ত্বমসি তৎসৎ, ব্রহ্মপরাৎপর।
আগম-নিগম-বেদ-বেদান্ত-বিধান-বিশাল-বারিধি, বিধি, বিষ্ণু, অবতার,
পরাক্ষর, পরবেদ, প্রণবনিনাদ, নিখিল-স্পন্দন-সিন্ধু-সঙ্গীতঝঙ্কার ॥

নমো দেব, দেবারাধ্য, অধ্যাত্ম-প্রতীক, জগতের তপঃশক্তি বিদ্যুৎ-স্ফুরণ,
বিদারিয়া, বিচ্ছুরিয়া, ছিঁড়িয়া ভূতল জ্যোতির অক্ষরে তব জলন্ত-লিখন।
কোদণ্ড-টঙ্কার তব সঘন হুঙ্কার শঙ্কার অঙ্কুর-ধ্বংসে প্রংশ অবিরাম ;
জার্ণতার পিঞ্জরেতে প্রাণ-সঞ্জীবনী, জড়ত্বে জীবন-বন্যা, উত্তাল, উদ্দাম।
ঘর্ঘর ঘর্ঘর রবে রথচক্রে তব রক্ত-ধারা নেচে উঠে ঘিরি চক্রবাল ;
ঈশানের বিষাণেতে বজ্রে বাজে গান, লক্ষ হাতে জলস্থল দেয় করতাল।
দুর্দ্দম নির্দ্দয় তব অশ্বপদাঘাতে ধূলিসাৎ অকস্মাৎ উদ্ধত-ভূধর ;
কক্ষচ্যুত সচকিত চন্দ্র-সূর্য্য-তারা, স্থাবর-জঙ্গম আদি কাঁপে থর থর ॥

আবর্ত্তন-প্রবর্ত্তন-প্রবৃত্ত নূতন, নির্ব্বাণ-নিবৃত্ত-চিত্ত, নির্দ্বন্দ্ব—নিলয়,
সাক্ষীভূত অতি স্থূল, সূক্ষ্ম-নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ তুমি মৃন্ময়-চিন্ময়।
আদিম-প্রভাত-কবি কাব্য-চিত্রকর, বিকাশ-রচনা-চারু-চিত্র-তুলিকায়
অভ্রান্ত, অব্যর্থ চির, প্রত্যক্ষ স্বরূপ, অরূপরূপের লেখা প্রোজ্জ্বল প্রভায়।
প্রেমিক-পাগল-ছন্দ, নিয়ম-বন্ধন, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ-গতি, উত্থান, পতন,
অমৃতত্ব সনাতন, অখিল-রঞ্জন, জগন্ময়-বরাভয় করুণা-কেতন।
একাধার—পারাবার, পবিত্র-উদার, শতধার শেষাধার, সাম্য-সুদর্শন,
সর্ব্বস্বান্ত, সাবসান, উলঙ্গ-শ্মশান, শবের আসনে শ্যামা নাচে রণরণ ॥

কাশীধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্গমে

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

—মোহমুদ্গরঃ, ৫।

প্রশ্ন—কোন একটা ভাব বিঘ্নকর এ জানা সত্ত্বেও যদি সেই ভাবটি বারে বারে ওঠে?

শ্রীশ্রীমহারাজ—এ ভাবটা আমার অত্যন্ত বিঘ্নকর—এই চিন্তাটা আপনি বারে বারে মনে impress (আঁকতে) করতে থাকুন, দেখবেন আপনি মন থেকে সে ভাবটা চলে গেছে। মনটা এমনি মজার জিনিষ ওকে যা শোনাবেন ও তাই শিখবে। যদি এই ধারণা একবার মনে জন্মিয়ে দিতে পারেন যে এই ভাবটা আপনার পরম শত্রু ও আমার সর্ব্বনাশ করে দিতে পারে—আমায় মেরে ফেলতে পারে—দেখবেন আপনা হতে মন থেকে সেটা চলে যাবে। মনে করুন এই যে ছেলেটি বসে রয়েছে—আপনি ভাবুন ও ছেলেটা কে, ওটা একটা কিছু না, ওটা অতি অপদার্থ—দেখবেন ও আপনার কাছে কিছু না-ই হয়ে যাবে। ওর দিকে আপনার আর মন যাবে না। মনে করুন ছোট ছেলে, সে কিছু জানে না বিষ খেলে কি হয়। তার কাছে

খানিকটা বিষ থাকলে সে ভয় পায় না; কিন্তু আপনি যদি খানিকটা বিষ দেখতে পান, একেবারে শিউরে উঠে বাপরে বলে দশহাত দূরে সরে যাবেন। আপনি জানেন কিনা ওখেলেই মরে যাবেন।

লেগে যান, খাটুন। Ideal fixed (আদর্শ স্থির) থাকা চাই। Ideal must never be lowered (আদর্শ কখনও ছোট করতে নাই) "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্"—তিনি ক্ষুদ্র—পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র, আবার এই সমস্ত Solar system (সৌরমণ্ডল) এর চেয়েও বড়। 'তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমান'—এটি জানতে হবে। তিনি আপনার ভেতরেও আছেন, আমার ভেতরেও আছেন, পিঁপড়েটার ভেতরেও আছেন—তবে কোথাও কোথাও প্রকাশ, কোথাও কোথাও অপ্রকাশ; কিন্তু সেই এক পরমাত্মা সর্ব্বত্র রয়েছেন। একটু খাটুন দেখতে পাবেন, এতে কি মজা। "Knock and it shall be opened"—ধাক্কা মারুন। পরদা ফেলা রয়েছে, সরিয়ে ফেলতে হবে। একটা চেষ্টা করুন। এ মায়ার গণ্ডি থেকে যাওয়াটা কিছু না, অতি সহজ। একটু লাগলেই পারবেন। একবার লাগুন, বুঝতে পেরেছেন, একবার লেগে যান—দেখবেন দুনিয়া আর এক রকম হয়ে গেছে। এইত দুনিয়া দেখছেন। একটু লেগে যান, দেখবেন—এ দুনিয়াটা বদলে গেছে।

প্রশ্ন—এই শাস্ত্রাদিতে যা আছে—ওসব কি বিশ্বাস কর্ব্বো?

শ্রীশ্রীমহারাজ—হাঁ ও সব সত্যিই। লোকের কল্যাণের জন্য বহু যুগ যুগান্তর ধরে ঐ সব ব্যবস্থা করা হয়েছে—ও সব জানতে হয়। "কর্ম্মটা" রাখবেন, তা না হলে চলবে না। "কর্ম্ম" আপনাকে শেষ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। 'কর্ম্মটা' হচ্ছে অনাদি, কিন্তু সান্ত (অন্তযুক্ত)। যখন আপনার উপলব্ধি হবে, তখন ওটা খসে যাবে, তখন আর কর্ম্ম থাকে না—এর আগে পর্য্যন্ত থেকে যায়। ওটা ছাড়লে চলবে না—"কর্ম্মটা" রাখবেন—এক্ 'কর্ম্ম' থেকেই সব হয়।

প্রশ্ন—আহারাদি কি রকম করা যায়?

শ্রীশ্রীমহারাজ—বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন; এর জবাব দেওয়া মুস্কিল। মানুষের system (শরীর) এত আলাদা আলাদা যে কিছু একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না। কোন একটা জিনিষ, ধরুন আমার ধাতে সয়, আপনার ধাতে সয় না। আমার system কোন একটা জিনিষ assimilate (ধারণ) করতে পারে, আপনার system হয়ত পারে না। আমাদের শাস্ত্রেও—গীতায় আহারের কথা একবার উল্লেখ আছে—সে একটা general classification (মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ), মোটামুটি এই বলা যায় যে, গুরু ভোজন না হয়, আর ওরই ভেতর দেখে শুনে, যার পেটে যেটা সয়, তার সেই রকম খাওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন—এই যে মাছ মাংস খাওয়া—তাতে হিংসাবৃত্তি হয় না?

শ্রীশ্রীমহারাজ—ও কোন কথা নয়, তবে যে বলে—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ", সে কখন? সে যখন সমাধি হয়েছে, জ্ঞান লাভ হয়েছে, সর্ব্ব ভূতে সেই ভগবানকে দেখ্ ছে,—তখন অহিংসা। তা না হলে অমনি মুখে বললেই অহিংসা হল? যখন দেখবেন—আপনিও যে ঐ পিঁপড়েটাও সে, কোন ভেদ নাই, তখন অহিংসা, তার পূর্ব্বে কি কখনও হয়? এই যে বলছেন 'অহিংসা', আপনি কি হিংসা avoid (ত্যাগ) কর্ত্তে পারেন? কি খাবেন, আলুটা খাবেন? সেটা পুঁতলে গাছ হয়, আবার তাতে আলু হয়—সেটার প্রাণ নাই? ভাত খাবেন? ধানগুলো ছড়িয়ে দিন, গাছ হবে, তাতে আবার ধান হবে—

তার কি প্রাণ নাই ? আচ্ছা ধরুন জল ? ওতেওত কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে। আপনি একটা microscope (অণুবীক্ষণ যন্ত্র) দিয়ে দেখুন—কি করে খান ? বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাসও নিতে হবে ?—প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনি অসংখ্য জীব হত্যা করছেন ! তার বেলা আর দোষ নাই ? আর দোষ হল একটু মাছে ! ওকথা কখনও ট্যাকে ? আচ্ছা, যারা বলে vegetable diet (নিরামীষ আহার)—তারা দুধ ঘি এসব তো খায় ? দুধটা কি রকম করে পাওয়া যায় ? সেটা একটা প্রাণীকে deprive (বঞ্চিত) করে তার মায়ের দুধটা দু'য়ে নিচ্ছে। ওত একটা মহা cruel (নিষ্ঠুর) ব্যাপার। ও কোন কথা নয়, আমাদের ও সমস্ত কখনও ছিল না—ও বৈষ্ণবদের ঢোকান। লেগে সাধন করুন। আকুল প্রাণে তাঁর নিকট প্রার্থনা করুন, প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করে দেবেন। আপনার প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব উত্তর দিলাম। এই ভাবে কিছু দিন চলতে পারেন ? যথেষ্ট কল্যাণ হবে,—জীবনের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

প্র—ধ্যান জপ কত সময় করা দরকার ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত সময় ধ্যান জপে, কত সময় পূজা পাঠে দেওয়া উচিত ?

উ—ধ্যান জপ পূজা পাঠে যত বেশী সময় দেওয়া যায় ততই কল্যাণ। যারা কেবল সাধন ভজন লয়ে থাকে তাদের অন্ততঃ দশ বার ঘণ্টা ধ্যান জপ করা উচিৎ। অভ্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যাবে। মন যত ভেতরের দিকে যাবে, আনন্দ তত বেশী হবে। মজা একবার পেলে ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। তখন কত সময় কি করব সে প্রশ্ন মন আপনিই ঠিক করে নিবে। তার পূর্ব্বে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ৪ সময় যাতে ধ্যান জপে কাটে তার চেষ্টা করা দরকার। বাকি সময় সৎগ্রন্থ পাঠ ও 'আজ ধ্যান জপের সময় মনে কত ভাব উঠল, মন কতটা স্থির হল' ইত্যাদি বিষয় ভাববে। কেবল চোক কাণ বুজে কয়েক ঘটা মালা জপ বা চিন্তা করলেই সকল কাজ হয়ে গেল না। তার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এই ভাবে চিন্তা করলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব উঠে সেগুলোকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করা যায়। এরূপ একটী একটী করে ত্যাগ করে যখন মন শান্ত হয়ে যাবে, তখনই ঠিক ঠিক জপ ধ্যান হবে। এ অবস্থা পাবার জন্যই জপ ধ্যান করা। জপ ধ্যান করে মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝতে হবে জপ ধ্যান ঠিক হচ্ছে না। একটী কথা বিশেষ খেয়াল রাখবে যে কেহ তোমার আহারাদি যোগাচ্ছেন তিনি তোমার সঞ্চয়ের কিছু পাবেন। সঞ্চয় এমন হওয়া চাই যে খরচ হয়েও যেন নিজের জন্য কিছু থাকে।

প্র—মন অনেক সময় ধ্যান জপ করতে চায় না। সে সময় ধ্যান জপ ছেড়ে পাঠাদি করা উচিৎ বা জোর করে ধ্যান জপ করা উচিৎ ?

উ—মন খাটিতে চায় না—সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু—পেতে হলে খাটতে হবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করবার জন্য খাটতে হয়। যদি শুয়েই জপ কর, ঘুম পেলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কর—এরূপে অভ্যাস দৃঢ় করে ধাতস্থ করে নিতে হবে। ইচ্ছা না হলেই ছেড়ে দিতে হবে—এরূপভাবে চললে কোন দিনও অভ্যাস হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করা চাই। এরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বশে আনাই সাধন পথের লক্ষ্য।

প্র—প্রাণায়াম আসনাদি অন্য বিস্তর হঠযোগের ক্রিয়া করা বিশেষ আবশ্যক কি না ?

উ—এখন এসব করবার দরকার নাই। হঠযোগাদি ক্রিয়া গুরুর সাহায্য ছাড়া হয় না।

যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন ছেলের কাছে থাকবে, সে সময় ইচ্ছা হলে ও তাঁদের অনুমতি পেলে তাঁদের সাহায্য নিয়ে করতে পার। একলা এসব চেষ্টা করো না—ফল খারাপ হবে। তাঁর নাম কর—প্রার্থনা কর—স্মরণ মনন কর—তিনিই তোমায় যা দরকার করিয়ে নিবেন, বিশ্বাস কর।

প্র—পূজা পাঠে কত সময় ও ধ্যান জপে কত সময় দেওয়া উচিৎ? নিদ্রা কতটা দরকার? নিদ্রা ব্যতীত কিছু সময়ের জন্য শরীর বা মনকে বিশ্রাম দিবার দরকার হয় কি না?

উ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ⅓ সময় ধ্যান জপে, বাকি ⅓ পাঠ, চিন্তা, নিত্য-কর্ম্ম ও আরামের জন্য রাখা দরকার। সুস্থ শরীরে চারঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। কারও দু-এক ঘণ্টা বেশী দরকার হয়। পাঁচঘণ্টার বেশী ঘুম রোগবিশেষ। এ রোগের সকলেরই চিকিৎসা করা দরকার। বেশী ঘুমুলে শরীরের rest হয় না, খারাপ হয়, অনিষ্ট করে। সাধকের ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট করা উচিৎ নয়। কাঁচা বয়স—সুন্দর সময়—শরীর মনের তেজ খুব থাকে। ঘুমিয়ে সে তেজ নষ্ট হলে পরে কিছু করা বড় শক্ত। প্রথম বয়সে মন গড়ে নে, ঘুমুবার সময় পরে যথেষ্ট থাকবে। কাকে কিছু করতে বললেই—প্রথমেই শরীরে সইবে না—rest চাই ইত্যাদি নানা খোঁজ তোলে। খাটবার নাম নেই rest (বিশ্রাম)! যে ঠিক ঠিক ধ্যান জপ করে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন regular (নিয়ম মত) চলে যে তার পক্ষে চারঘণ্টা ঘুমতেই যথেষ্ট rest হয়। সাধারণতঃ আমরা irregular (অনিয়মিত) ভাবে চলে ইন্দ্রিয় ও মনকে এত tired (ক্লান্ত) করে ফেলি যে অনেকের আট দশ ঘণ্টা ঘুমেও rest হয় না। Regular (নিয়মাবদ্ধ) হবার চেষ্টা কর। Life (জীবন) কে regulate (নিয়মিত) কর, যোগীর মত ঠিক চলবে, শরীর মন খুব ভাল থাকবে। কর কিছু। শুধু বড় বড় কথা! খালি প্রশ্ন কল্লে কি হবে? কাজে লেগে যা—দেখতে পাবি বুঝতে পারবি।

নবীন শিক্ষার শুকতারা

স্বামী বাসুদেবানন্দ

মানব প্রগতির চিরন্তনী সংবৃত (Conventional)-শিক্ষার মূলে প্রথম আঘাত করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশো (Rousseau)। শিশুর স্বাধীন স্ফূর্ত্তির ওপর যে, প্রয়োগিক (Practical) শিক্ষা, তার গঠন মূলক কার্য্য আরম্ভ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেস্‌ড (Basedow)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ব্যায়াম, ছোট ছোট শিল্পকাজ, ভ্রমণ, বস্তুপাঠ (Object lesson) এ অপরাপর খেলাধূলার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জ্জন, তাঁর শিক্ষা-সূচীর (Programme) মধ্যে ছিল। কিন্তু পেস্‌টলোজি (Pestalozzi) এ সম্বন্ধে যেরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন, সেরূপ আর কেউ তাঁর সময় হন নি। তাঁর শেষ বয়সে 'পেস্‌টলোজি' ও 'আদর্শ-শিক্ষক' প্রতিশব্দ হয়ে পড়েছিল।

রুশো ও পেস্‌টলোজি উভয়েই সুইস্—একজন ফরাসী এবং আর একজন জার্ম্মাণ

জেলা থেকে এসেছিলেন এবং দুজনই অত্যধিক ভাবপ্রবণ। পেস্‌টলোজ্জির বিধবা মা ছিলেন ভক্তিমতী আত্মত্যাগী এবং নির্জ্জনপ্রিয়, পক্ষান্তরে রুশোর বাপ, ঠিক এর বিপরীত। পেস্‌টলোজ্জির বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি রুশোর 'এমিল' (Emile) নামক গ্রন্থ পড়ে একেবারে যাদুগ্রস্তের মত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি গির্জ্জায় প্রবেশ করবার জন্য যান, কিন্তু প্রার্থনা পাঠের অস্পষ্টতা হেতু, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কাজে কাজেই তাঁকে চাষবাসে মন নিয়োগ করতে হলো, কিন্তু যখন প্রায় দেউলে হবার দাখিল তখন বিবাহ করেন। একটি ছেলে হয়েছিল এবং পেস্‌টলোজ্জি তার ত্রিশ বৎসর জীবিত কালের ভেতর দিয়ে রুশোর সব রকমের কল্পনাই পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। পেস্‌টলোজ্জি দারিদ্র্য কি তা জানতেন, তাই তিনি তাঁর সহধর্ম্মিণীর সহকারিত্বে এবং সাধারণের অর্থ সাহায্যে যে বিদ্যালয়টি খুলেছিলেন, তাতে অনাথা, পড়ে পাওয়া, ভিকিরী, পঙ্গু, খোঁড়া ছেলেই ছিল সব। তাদের তিনি শেখাতেন—যথন, ফলের বাগান করা, লেখা, পড়া, গণ্য, কথোপকথন, কাপড় কাচা, রান্না প্রভৃতি। তাঁর সকল শিক্ষাঙ্গের একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকভাবে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার।

কিন্তু হলে কি হয়, ক্রমেই চাঁদা বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো এবং স্ত্রীধনও ফুরিয়ে এলো। কাজে কাজেই তাঁকে লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো; ফলে তাঁর জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ "লিওনার্ড এবং গার্টরুড" (Leonard and Gertrude) লোকচক্ষে উপস্থিত হলো। জার্ম্মাণীতে গেটে (Goethe) তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ফ্রান্স তাঁকে তাঁদের গণতান্ত্রিকের একজন নাগরিক বলে প্রচার করেন। এ সময় তাঁর বয়স বাঁয়ান্ন। এতদিনের দুঃখ কষ্টের পর, সৌভাগ্যের উষা তাঁর জীবনে বোধ হয় এইবার উঁকি দিলেন। ১৭৯৮ খৃঃঅব্দে ফরাসীরা সুইস্‌দের একটি ছোট সহর ষ্টানজ পুড়িয়ে ফেলেন। পেস্‌টলোজ্জি সেখানকার অনাথ বালকদের ভার গ্রহণে উদ্‌যোগী হন এবং সুইস্ গণতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁর এই সেবাকার্য্য সাদরে অনুমোদন করেন। এখানে একটি ঘরে, মাত্র একটি নারী পরিচারিকার সাহচর্য্যে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রবঞ্চনাকে উপেক্ষা ও চল্লিশ থেকে আশীটি বালককে খাইয়ে, পরিয়ে, শিক্ষিত ও নিয়মিত করে পালন করেন। পৃথিবীর শিক্ষেতিহাসে এ এক অভিনব ব্যাপার। কিন্তু পাঁচ মাস পরে তাঁকে সেখান থেকে উঠে যেতে হলো, কারণ কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ গৃহটিকে একটি ফৌজ্‌ হাঁসপাতালে পরিণত করলেন।

এর পর বার্ণের (Bern) নিকটবর্ত্তী বার্গডর্ফ (Burgdorf) সহরের একটি স্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে এঁকে দেখতে পাওয়া যায়। একজন মুচি এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিল, সে তাঁর এই সব অদ্ভুত মতবাদে সম্মতি না দেওয়ায়, তিনি ওখানেরই একটা স্কুলের শিশু-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এ বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষা ছিলেন একজন মহিলা। এত বড় শিক্ষাতাত্ত্বিকের কেন যে এরূপ পরিণাম এবং কেন যে হঠাৎ তিনি পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর বালকদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সময় তিনি একজন শিক্ষকের সাহায্য পান, তাঁর নাম ছিল হারমান ক্রুসি (Hermann krusi) এবং হেলভেটিক (Helvetic) সরকার, যুদ্ধের ফলে যে সব শিশুরা অনাথ ও অসহায় হয়ে পড়েছিল তাদের পালন ও শিক্ষার জন্য বার্গডর্ফের একটা দুর্গ ছেড়ে দেন। পেস্‌টলোজ্জি এখানে ১৮০১—৪ পর্য্যন্ত বাস করেন এবং তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর দেশবাসী কর্ত্তৃক এমন সম্মানিত হন যে তিনি

একজন সুইস্ প্রতিনিধিরূপে ফ্রাঁস্ দেশের ভবিষ্যৎ গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করাবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি নেপলিয়ঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সুযোগ ঘটেনি। অত বড় লোক কখনও কি ক খ নিয়ে সময় ক্ষেপ করতে পারেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে হয়ত তাঁর সেই ঢালাই করা কেন্দ্রগামিতা (Centralization) পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারতেন।

কিন্তু এর এক বৎসর পরেই তাঁকে বার্গডর্ফ দুর্গটি ত্যাগ করতে হয়, কারণ সেটি কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রিফেক্টের (prefect) বাসস্থানরূপে নির্দ্দেশ করেন। যা হোক, অতঃপর তিনি তাঁর শেষ আশ্রয় রূপে যভারডন (Yverdon) দুর্গ টি প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি কুড়ি বৎসর বাস করেন। এখানেই ইনি ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-তাত্ত্বিক বলে পরিচয় লাভ করেন। জার, প্রুশিয় সরকার, দার্শনিক ফিকৃতে (Fichte), লর্ড ব্রোগহাম্ এবং ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধেক বড় বড় লোকেরা তাঁর প্রশংসক ও দর্শক শ্রেণী মধ্যে ছিলেন। জার্ম্মাণী, ফ্রাঁস্, রাশা, ইট্‌লী, স্পেন, ইংলণ্ড, এমন কি আমেরিকা থেকে পর্য্যন্ত তাঁর কাছে দলে দলে ছাত্র এসে উপস্থিত হতে লাগলো।

এ সময়ে তাঁর ভাব প্রবণতার কিছু আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়, এরূপ ভাব প্রবণতা এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke) প্রভৃতি অনেক প্রতিভা সম্পন্ন লোকের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। ১৮০৮ সালের নববর্ষ দিনে তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি শবাধার সকলের সমক্ষে রক্ষা করে তাঁর জীবনের সকল মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, দুর্ব্বলতা, ব্যর্থতা এবং প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি এখনও তাঁর আদর্শে নিয়ে যেতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। অসংবৃত (Unconventional) মতবাদ, বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র ও জাতীয় চরিত্র, তার ওপর তাঁরই সদৃশ অত্যুৎসাহী, আত্মত্যাগী কিন্তু অত্যধিক ভাবপ্রবণ কতকগুলি সহকারী নিয়ে পেস্‌টলোজির প্রেমপূর্ণ কিন্তু বিশৃঙ্খল প্রতিভা যে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষকদের কোনও মাইনে ছিল না, তাদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ মাত্র মেটান হোত। কাপড় চোপড় দরকার হলে ছাত্রদের মাইনের বাক্স থেকে যার যেরূপ পয়সা কড়ি দরকার সে সেইরূপ গ্রহণ করত। তারা চারটের সময় উঠত এবং তাদের মধ্যে একজন ছুটোর সময় উঠে পেস্‌টলোজিকে তুলে দিত—কয়েক বর্ষের মধ্যে তিনটের পর কেউ কখনও ওঠেনি।

পেস্‌টলোজির বেশ বিন্যাসে কখনও মনোযোগ ছিল না—তার ওপর চেহারও বিশেষ সুশ্রী নয়, মুখে বসন্তের দাগ—মনের ভাব চোখে মুখে সর্ব্বক্ষণই ফুটে উঠত—কখন যেন ক্ষ্মাইত মেঘে বজ্রধ্বনি, কখনও বা যেন সঙ্গীতের তরঙ্গ চোখের ওপর দিয়ে খেলে যেত—এই ক্রোধে টেবিল দরজা চাপড়িয়ে অস্থির, পরক্ষণেই অতি দীনতার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা। পেস্‌টলোজি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন—তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ক্রমেই স্কুলের শৃঙ্খলা ও নিয়মের ওপর আধিপত্য করতে অসমর্থ হয়ে পড়ল। ক্রমাগত বিবাদ, দলাদলি, কর্ম্মপরিত্যাগ, বরখাস্ত, পদচ্যুতি প্রভৃতি হতে লাগলো। তিনি যভারডনের বিদ্যালয় ১৮২৫ অব্দের মার্চ্চে বন্ধ করে তাঁর প্রথম পরীক্ষার স্থল নিউহফে (Newhof) ফিরে যান এবং ১৮২৭ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৮১ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

আপাততঃ দৃষ্টিতে তাঁর জীবন যেন একটা ব্যর্থতা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। চিরাচরিত গতানুগতিক শিক্ষার পার্শ্বে স্বাধীন চিন্তার ওপর কার্য্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির এমন একটা অস্পষ্ট কিন্তু সত্যাদর্শ ভবিষ্যতের জন্য রেখে গ্যালেন, যা একটা মহামহীরুহে পরিণত হবে। জগতের ইতিহাসে রুশোর চাইতে তাঁর কম স্থান নয়। রুশো যাক্যোর

ঝনৎকারে ঢের বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করে গ্যাছেন, পরন্তু পেস্‌টলোজি তাঁর আদর্শ প্রতিপন্ন করবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যুক্তি করেছেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁর অসম্পূর্ণ যুক্তি তাঁর অনুসরণ-কারীরা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন।

সামাজিক দিক থেকে তিনি শিক্ষার বিচার করেছিলেন—শিক্ষালয়টা গৃহ থেকে পৃথক নয়, গৃহেরই একটি অংশমাত্র—এমন কি সংসার প্রবেশে প্রস্তুত হবার জন্য একটা ব্যয়ামাগারও নয়। শিক্ষালয়ের উপাদান হচ্ছে শিশু—বৃদ্ধ নয়, কাজেকাজেই শিশুমনের নিয়মাবলী যত আমরা আবিষ্কারে সমর্থ হব, ততই শিশু-শিক্ষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে। বাইরে থেকে ভেতরে আসা নয়, ভেতর থেকে বাইরে যাওয়াই হচ্ছে, এ শিক্ষার রহস্য। তাঁর একটা শ্লোক ছিল—"I wish to psychologize instruction." শিক্ষা ও সমাজ দুটো অবরুদ্ধ গৃহ নয়—একটা গোটা জিনিষের দুটো দিক্। তিনি পুঁথিগত বিদ্যার খুব বিরোধী ছিলেন—ছেলেরা শিখবে তাদের সহজ বুদ্ধি (Intuition), যাকে তিনি বলতেন, Anschanung এবং জাগতিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর। পুঁথিগত সংবৃত-জ্ঞানের ভেতর দিয়ে যে বস্তু-পাঠ, তাতে বিকল্প বা অযৌক্তাভাসেরই (Pseudo concept) প্রাধান্য আমাদের অন্তঃকরণে অধিক হয়ে পড়ে। সেই জন্য তিনি ভাষার সহিত পরীক্ষা, গণিতের সহিত প্রত্যক্ষ উদাহরণ, ভূগোলের সহিত গ্রাম্য পাহাড়, নদী, উপত্যকা পর্য্যবেক্ষণ এবং স্তূপীকৃত বালুকার কৃত্রিম গঠনের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি পাঠের সাহায্য করা শিক্ষার উপকরণরূপে গ্রহণ করেন। পেস্‌টলোজির এই ভাবের মধ্য দিয়েই বিখ্যাত ভূগোল বৈজ্ঞানিক কার্ল রিটার (Karl Ritter) তাঁর পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। যা হোক, পেস্‌টলোজির পূর্ব্বেও অনেক শিক্ষকই শিক্ষার এই নবীন জীবনী শক্তিকে স্পর্শ করেছেন বটে, কিন্তু সত্যের জন্য এমন আত্মত্যাগ ও উন্মাদনা কেউ ইতিপূর্ব্বে স্বীয় জীবনে বিকাশ দিয়ে যেতে পারেন নি।

যা হোক, তাঁর মৃত্যুর পর কিন্তু তাঁর ঐ শক্তিধারা সমগ্র জগৎকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নেপলিয়ঁর নিকট জেনার (Jena) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশকে প্রগতি পথে আলোকিত, প্রবুদ্ধ ও শিক্ষিত করবার জন্য জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌তে (Fichte) তাঁর Discourses to the German Nation নামক নিবন্ধে পেস্‌টলোজি পদ্ধতির প্রতিধ্বনি মাত্র করলেন। জার্ম্মাণীতে এখনও অনেক স্থলে শিশুশিক্ষার নাম, "The Prussian—Pestalozzian School System". শিক্ষাতাত্ত্বিক বেটি (H. M. Beatty) বলেন, "যেখানে শিক্ষা পুরোহিত-তন্ত্র, সেখানে আধ্যাত্মিকতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।" * অর্থাৎ তাঁরা বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ বজায় রাখবার জন্য যে কোনও প্রত্যক্ষকেই তুচ্ছ করতে নারাজ নন। যা হোক, ১৮৩০ অব্দে কজিন্ (Cousin) ও গুইজোর (Guizot) তোদবিরে ফ্রাঁস্ এ পদ্ধতি স্বীকার করেন এবং ইংরেজের শিক্ষাভিজ্ঞানের গোঁড়ামী, কঠোরতা এবং অর্থকরিতার ব্যূহ ভেদ করেও এ পদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রবেশ লাভ করে। আমেরিকায় এ পদ্ধতির প্রবেশ ঘটে ১৮০৬ এবং পরে হোরেস মান (Horace mann—Secretary to the Massachusetts Board of Education) এবং ডাঃ সেলডন (Dr. Edward Sheldon in the schools

* A Brief History of Education, P. 94. "In countries where education was controlled by priests, spiritual development was out of the question." উক্ত পুস্তক হতেই এ অংশটি সংগৃহীত হয়েছে।

of Oswego, New York State) এতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটান।

রুশো শিক্ষা জগতে যে বিপ্লব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, পেস্টলোজি তার উপকরণের যত্ননা করলেন। তিনি নবীনের জন্ম দিলেন, কিন্তু তার পূর্ণাবয়ব দেখে যেতে পারেন নি। যা হোক, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য ফেলেনবার্গ (Fellenberg) ইউরোপে শ্রমিক ও সাধারণ শিক্ষার একটা সমন্বয় বিধান করে তাঁর গুরুর পদ্ধতিকে একটা প্রয়োগিক ভিত্তিতে দাঁড় করালেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা যথার্থই শিক্ষাজগতে এক বিরাট বিবর্ত্তনের (revolution) সূচনা করলেন, তাঁরা হচ্ছেন—হার্বার্ট ও ফ্রইবেল।

হার্বার্ট (John Frederick Herbert, ১৭৬৬—১৮৪১) অনেক বিষয়ে পেস্টলোজির তুলনায় বিপরীত ছিলেন। এই দার্শনিকের মসৃণ, উজ্জ্বল, ফিটফাট চেহারা থেকেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রম ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি ওলডেনবার্গ (Oldenburg) সহরের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জিমনাসিয়াম (Gymnasium) বিদ্যালয় থেকে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দর্শন, গণিত এবং গ্রীক্ সম্বন্ধে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। জাগতিক নানা বিষয়ে ঔৎসুক্য বাড়াবার জন্য রুশো যেমন ছেলেদের হাতে "রবিনসন ক্রুশো" (Rabinson Crusoe) দিতে ভাল বাসতেন, ছেলেদের সম্বন্ধে হার্বার্টের প্রিয় বই ছিল তেমনি "ওডেসি" (Odyssey)। সাবালক হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি সুইট্জারল্যাণ্ডের এক জন বড় কর্ম্মচারীর তিনটি ছেলের গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। তিনি বলেন—এ সময়ই তিনি শিক্ষার প্রাণশক্তিটিকে অবগত হয়েছিলেন। এই অবসরে তিনি পেস্টলোজির শিক্ষাপদ্ধতি অধ্যয়ন এবং সুইট্জারল্যাণ্ড হতে ফেরবার পূর্ব্বে বার্গডর্ফ বিদ্যালয়ে পেস্টলোজির সঙ্গে দেখা এবং জার্ম্মাণীতে ফিরে এসে ঐ পদ্ধতি সে দেশে প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক বক্তৃতাদি এবং শিক্ষার দর্শন ও বিজ্ঞান এমন সুন্দর ভাবে প্রচার করেন যে কনিংস্বার্গে (Konigsberg) কাণ্টের (Immanuel Kant) স্থানে তাঁকে বসান হয়। তিনি সেখানে ১৮০৯—১৮৩৩ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং শিশু-শিক্ষা ও তাদের মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সেখানে মিশনারী প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিপক্ষের আবির্ভাব দেখে, তিনি গটিনজেন (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করেন।

দর্শন বিভাগে হার্বার্ট আনুমানিক ও প্রত্যক্ষপর দুটো সত্যের বিভাগ করেন, যেমন ইউরোপের মধ্যযুগে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক বলে দুটো প্রতিযোগী সত্য দেখা যেত। যা হোক, শিক্ষা বিভাগে তিনি ইংরেজ দার্শনিক লকের (Locke) পরিত্যক্ত কর্ম্ম, যা রুশো এবং পেস্টলোজি গ্রহণ ও উজ্জীবিত করেন, অধিকতর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। লকের পদ্ধতি পুঁথিকে গৌণ কোরে, অভিজ্ঞতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন, কিন্তু সেটা একটা অভিজাত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; রুশো অ-সংবৃত পন্থী ছিলেন, কিন্তু প্রয়োগিক সংগঠনহীন, পেস্টলোজি এই অভিজ্ঞতা, অ-সংবৃততা ও প্রয়োগিক গঠনমূলকতা সব এক সঙ্গে যোগ করলেন এবং হার্বার্টের কাজ হচ্চে বিষয়টিকে একটা দার্শনিক যুক্তি দিয়ে, মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা—যা আজকাল বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি বলে আমাদের কাছে পরিচিত।

হার্বার্ট লকের মত সদ্য প্রসূত শিশুর মনকে

একটা সাদা কাগজের মত তুলনা করলেও, লকের মত, অন্তঃকরণের বিভিন্ন গুণগুলি (Faculties) যা অভ্যাসের দ্বারা পরস্পরকে পরস্পরের কাজে লাগাতে হয়—স্বীকার করেন নি, তিনি একটি বিশিষ্ট আত্মার ঐক্য স্বীকার করতেন, যাকে হিন্দু শাস্ত্রে জীবাত্মা বলে, যার বিভিন্ন গুণাবলী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। হার্বার্ট ও লক উভয়ের মতে "Virtue" 'ধর্ম্ম' লাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। লকের 'ভার্চ্চু' শব্দের অর্থ সাধারণে যা বোঝে 'moral excellence' বা 'শীল সম্পন্নতা', কারলাইল (Carlyle) 'ভার্চ্চু' ও 'valor' বা 'বীরত্ব' এক জিনিষ বুঝতেন। কিন্তু হার্বার্টের মত অনেকটা বেদান্তের মতো "the idea of inner freedom" —'আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা।' বিবেকানন্দের শিক্ষার সংজ্ঞা হচ্চে—"Education is the manifestation of the perfection already in man"—'যা মানুষের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ দেয় তাই শিক্ষা।' এ থেকে শিক্ষা জিনিষটা যে আমাদের জীবন যাত্রার কত বড় সহায় তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের কর্ম্মে প্রেরণা দেয় এবং কর্ম্মের পৌনঃপৌনিকতা থেকেই আমাদের চরিত্র (persona) গঠিত হয়ে ওঠে। এ জিনিসটা পেস্‌টলোজির অবচেতন ভূমি (unconscious plain) থেকেই তাঁকে কাজে প্রবুদ্ধ করেছিল—এ ধারণাটা তিনি জ্ঞানভূমিতে এনে তার প্রয়োগের দিকটা লোককে বুঝিয়ে উঠিতে পারেন নি। কাজেকাজেই হার্বার্টের পদ্ধতিই জ্ঞানার্জ্জনের প্রাণস্বরূপ বলা যেতে পারে। হার্বার্ট বলেন, "কতকগুলো সংবাদ মাথার ভেতর ঢুকলেই শিক্ষার কাযা শেষ হলো না—তাতে যে মানুষ সেই মানুষই থেকে যায়। ভাবগুলোর 'apperception' পরিপাক হলো কিনা এবং তা থেকে শিশুর জীবনে জ্ঞানের একটা 'interest' বা ঔৎসুক্য জাগচে কিনা দেখতে হবে।" এই ঔৎসুক্যের উত্তেজক (stimulus) হচ্চে নবসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য অসংখ্য অভিজ্ঞতা দান করতে পারে, কিন্তু জীবনে যদি সামাজিক লেন দেন না থাকে, তা হলে তা নিরর্থক ভাবে অকেজোর (vestigal) মতই হয়ে থাকে। সেই জন্য বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের শিক্ষাপথে সমান্তরালভাবেই চলা উচিত। ভাষা, সাহিত্য, রূপায়ণ (Art) প্রভৃতি বীক্ষাশাস্ত্র (Æsthetics), রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—সবই ইতিহাসের অঙ্গীভূত বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও দর্শন একই জিনিষের দুটো দিক- একটা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও আর একটা যুক্তি ও সমন্বয়। এ শিক্ষা-পদ্ধতির ফলস্বরূপে আমরা প্রাপ্ত হই, (১) আধ্যাত্মিকতার নিরপেক্ষভাব, (২) মানবের বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগে সহানুভূতির বিবৃদ্ধি এবং (৩) সমষ্টি মানবতার অখণ্ডত্বের অববোধ।

হার্বার্টের দানগুলোকে আমরা নিম্নলিখিতরূপে এক এক করে বলে যেতে পারি। যদিও অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেকাল হতে অনেক উন্নত, তথাপি হার্বার্ট কনিংসবার্গে যে দুটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন—Pedagogic Seminar এবং Practice School—সেই দুটির দৃষ্টান্ত স্বরূপে আধুনিক সমস্ত বিশ্বশিক্ষালয়গুলি পরিচালিত। যদিও হার্বার্টের মনস্তত্ত্ব সেকেলে (archaic) বলে আজকাল পরিত্যক্ত তথাপি তাঁর আবিষ্কৃত মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা-পদ্ধতি অজ্ঞানান্ধকারে নব ঊষার সূত্রপাত করেছিল। তিনি বিজ্ঞানের সহিত সমাজের উদ্বাহ ক্রিয়া সাধন করে জ্ঞানের শেষ অনুবন্ধ প্রয়োজনকে নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁরই নব শিক্ষা প্রচারের ফলে ইতিহাস কতকগুলো তারিখ ও বংশ তালিকার শৃঙ্খল হতে মুক্তি পায়। হার্বার্টের পদ্ধতি ফলেই আমাদের মহাভারত রামায়ণ আজ

ইতিহাস বলে জগতে পরিচিত হয়েচে। এই সময় হতে ইতিহাসের সংজ্ঞা হলো—আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, শিক্ষা-শাস্ত্র, সমাজ প্রভৃতি সভ্যতার রষ্টিগত উপাদানের ব্যাকরণ বা ক্রমাভিব্যক্তি। তাঁরাই প্রথম সাহিত্য ভাষাকে গৌণ এবং মনস্তত্ত্বকে মুখ্য করে লোকচক্ষে উপনীত করেন, যার ফল স্বরূপে আজ আমরা জার্ম্মাণীর "New Humanism" প্রাপ্ত হচ্চি যা আজ জগতের শিল্প সাহিত্যে এক নবোন্মাদনা আনয়ন করেচে। তাঁদের একটি বাণী আজ প্রত্যেক দেশজ প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে খাটে এবং প্রত্যেক দেশীয় সাহিত্যিকদের স্মরণীয়—"The Greek master-pieces not as grammarians' texts, but as reservoirs of the Hellenic spirit, from which would issue the inspiration to the creation of masterpieces in the vernacular তারপর এলেন ফ্রোইবেল—শিক্ষাজগতে তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কার হচ্চে, শিশুর ভেতর সৃষ্টি শক্তির সন্ধান।

ফ্রোইবেল (Friedrich Wilhelm August Froebel, ১৭৮২—১৮৫২) জার্ম্মাণীর থুরিঞ্জিয়ান (Thuringian) অরণ্যের একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁর শিশুকালের অভিজ্ঞতাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রধান উত্তেজক কারণ হয়েছিল। তার পিতা ও সৎমার তাচ্ছিল্যের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিশুর প্রতি এত সহানুভূতি সম্পন্ন এবং অরণ্যের নির্জ্জনতাই তাঁর চিন্তাধারাকে রাহস্যিক (mystic) করে তুলেছিল। একজন অরণ্যরক্ষকের তাঁবেতে কিছুকাল নবিসী করে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি নিয়মিতভাবে কোন বিষয় অধ্যয়ন না করে, বিজ্ঞানের প্রায় বারটা বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা শুনতেন এবং তার মধ্য হতে একটা রাহস্যিক ঐক্য বার করবার চেষ্টা করতেন। বোধ হয় হার্বার্টের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা পেলে, ফ্রোইবেল, সন্দেহের অনেক মেঘ অপসারিত করে, অনেক শিশুতত্ত্বের অনুসন্ধান পেতেন। কিন্তু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শ অর্থাভাব বশতঃ বেশী দিন থাকে নি—ত্রিশ শিলিং এর জন্য তাকে নয় সপ্তাহ কারাগার ভোগ করতে হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে এক এক করে কৃষক, কেরাণী, হিসাবরক্ষকরূপে কাজ করলেন। তার পর স্থপতি-বিজ্ঞান শেখবার জন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort-on-the-main) যখন ভর্ত্তি হলেন, তখন সেখানে একটা স্কুল-মাষ্টারী পেলেন। তিনি এক জায়গায় লিখেচেন, "মাছ জল পেলে, পাখী আকাশ পেলে যেমন আনন্দ পায় আমার ঠিক তেমনি আনন্দ হলো।"

এই সময় তিনি পেস্টালোজির লেখা পড়তে আরম্ভ করেন এবং একটা ছুটিতে এক পক্ষের জন্য যেভারডনে ঐ শিক্ষাবীরকে দর্শন করবার জন্য গেলেন। পেস্টালোজির সহানুভূতি এবং উৎসাহ তাঁকে একেবারে টালমাটাল করে দিলে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেক পদ্ধতির 'কেন' এবং 'কিসের জন্য' একটাও খুঁজে পেলেন না। পেস্টালোজি কেবল পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন, "যাও করে দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে কি অদ্ভুত ভাবে এ পদ্ধতি কর্ম্ম করে।" স্বামিজীর ঠিক এমনি একটা কথা আমরা পাই,—"নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্মরহস্য শিক্ষা দেয়।" পেস্টালোজি অবচেতন ভূমিতে যে প্রেরণার অনুভব করতেন, সেটাকে জ্ঞানভূমি থেকে বোঝাতে পারতেন না। অন্য দেশীয় অনেক কবি একে 'প্রাণ দিয়ে বোঝা' বলেন।

দু বছর স্কুলমাষ্টারি করে তিনি তিনটি ছেলের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। প্রথম তিনি তাদের রুশোর নির্দ্ধারণানুযায়ী কঠোর নির্জ্জনতার মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগলেন, কিন্তু তাদের যেভারডনে নিয়ে এসে কিছু দিন পরে বুঝতে পারলেন, খেলা

ভাবধারা

ভারতের কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

বেদান্ত ভারতীয় জাতির প্রাণ, বেদান্ত ভারতীয় জাতির আত্মা। ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও কৃষ্টি বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবন বেদান্তকে অবলম্বন করিয়াই আজও বাঁচিয়া আছে। বেদান্ত ভাবরাজ্যের অমূল্য সম্পদ, বেদান্ত দর্শনের শিরোমণি। বেদান্ত ভবিষ্যৎ সুশিক্ষিত মানবের ধর্ম্ম। বেদান্ত ভারতীয় মনীষার অদ্ভুত বিকাশ। বেদান্ত ভারতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। বেদান্তের 'অদ্বৈত' বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্তও ভারতীয় ধর্ম্মসমূহে বহুত্বের মধ্যে একত্ব,—অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য,—অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই বেদের তাৎপর্য্য বেদান্তবেদ্য 'অদ্বৈত' ঋষি-হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল। জগতের বিভিন্ন শক্তি যে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, এবং বিভিন্ন দেবদেবীগণ যে 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিভিন্ন সবিগ্রহ অভিব্যক্তি জ্ঞানে বৈদিক যুগে উপাসিত হইত, তাহার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। সেই প্রাচীন বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও ভারতীয় ধর্ম্মের শত দার্শনিক বিরোধ, সহস্র পৌরাণিক বৈষম্য, অনন্ত আনুষ্ঠানিক অসামঞ্জস্যের মধ্যেও "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি" সুর ধ্বনিত হইতেছে। ভারতের আপাতবিরোধী ধর্ম্মমত সমূহকে 'অদ্বৈত'ই অনাদি কাল হইতে সনাতন ধর্ম্মের বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া রাখিয়াছে। এই সর্ব্বংসহ বেদান্তই শত শত প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের মধ্যেও ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব ধর্ম্মকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা, বেশভূষা ও আচার-গত বৈষম্যকে এই বেদান্তই এক অপূর্ব্ব কৃষ্টি সমন্বয়ে সমন্বিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই—যুগে যুগে বেদান্তের আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শনের প্রভাবশালী প্রচারকগণের মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের স্থান শীর্ষস্থানীয়। দর্শন রাজ্যের সম্রাট শঙ্করের সময়েই বেদান্ত বিশালায়তন প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতে বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই লোকোত্তর মনীষীর প্রভাব এমন অসাধারণ ছিল যে বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত 'অদ্বৈত' পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার নামে উহা "শাঙ্কর দর্শন" বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইঁনি বেদান্তকে কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

আচার্য্য শঙ্করের জীবনে অপূর্ব্ব জ্ঞানের সঙ্গে অশ্রুতপূর্ব্ব কর্ম্মের সমাবেশ ছিল। জ্ঞান-রাজ্যের শীর্ষদেশে অবস্থিত এই অতি-মানবের ভারতব্যাপী ছিল কর্ম্মক্ষেত্র। এই মহান আচার্য্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত ভগ্নী নিবেদিতা যথার্থই বলিয়াছেন,—"We contemplate with wonder and delight the devotion of Francis of Assisi, the intellect of Ablerd, the virile force and freedom of Martin Luther, and the

Political efficiency of Ignatius Loyola, but who could imagine all these united in one person ?" ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়,—আচার্য্য শঙ্করই ছিলেন একমাত্র মহাপুরুষ, যাঁহার মনে হিন্দু কৃষ্টিমূলে এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতীয় নেশন্ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। ইংরাজী nation শব্দের অর্থ —রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ জাতি। ঠিক্ এই পাশ্চাত্য ধরণের নেশন্ গড়িয়া তোলা কাম্য না হইলেও কতকটা এই রকমের অর্থাৎ বেদান্তোক্ত বহুত্বে একত্ব লক্ষ্যে সমগ্র ভারতের হিন্দুধর্ম্মের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও প্রচার করা তাঁহার সংকল্প ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্ত—দ্বারকায় শারদামঠ, পূর্ব্বপ্রান্ত—পুরীধামে গোবর্দ্ধনমঠ, উত্তর প্রান্ত (হিমালয়)—জ্যোতির্ধামে জ্যোতির্মঠ এবং দক্ষিণ প্রান্তে শৃঙ্গেরীমঠ স্থাপন করিয়া দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দ্বারা বেদচতুষ্টয়—বিশেষভাবে বেদান্ত প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রভাব মগধের সীমা অতিক্রম করে নাই, ঈশদূত খৃষ্টের প্রভাব তাঁহার জীবনকালে য়াহুদী দেশের কতিপয় গ্রামেই আবদ্ধ ছিল, মহাত্মা মহম্মদের প্রভাব তাঁহার জীবদ্দশায় আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভক্তরাজ রামানুজের প্রভাব আজও দাক্ষিণাত্যে মাত্র বর্ত্তমান, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বঙ্গ ও উড়িষ্যার বাহিরে যায় নাই বলিলেই চলে এবং এই সকল আচার্য্য দীর্ঘজীবী ছিলেন কিন্তু ক্ষণজন্মা আচার্য্য শঙ্করের প্রভাব তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম আচার্য্য শঙ্করের দান। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বিখ্যাত মঠমন্দির সমূহে আজও তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার প্রচারিত বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—নিরাকার হইয়াও সাকার, আবার সাকার হইয়াও নিরাকার। তিনি অদ্বৈতী হইয়াও দ্বৈতী, আবার দ্বৈতী হইয়াও অদ্বৈতী। তাঁহার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। যেমন একই সূর্য্য বিভিন্ন বর্ণের কাঁচের ভিতর দিয়া বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হন, ঠিক তেমনি একই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে আবৃত বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইতেছেন—হইতে পারে কোনটা কিছু বিকৃত সত্য কিন্তু তথাপি সত্য,—সত্য ভিন্ন মিথ্যা নয়। এই সর্ব্বমত সমঞ্জস অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ভগবান শঙ্কর বিভিন্ন দেবদেবী ও বিভিন্ন মতপথকে এক অত্যাশ্চর্য্য সামঞ্জস্যে—সমন্বিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন তাঁর বিখ্যাত "History of Indian Philosophy" নামক পুস্তকে* বলিয়াছেন —"In Sankar we find one of the greatest expounders of the comprehensive and tolerant character of the Hindu religion, which is ever ready to assimilate alien faiths. His attitude of toleration was neither a survival of superstition nor a means of compromise, but an essential part of his practical philosophy." সকল ধর্ম্মমত পথকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করা এবং সব ধর্ম্মকে আপনার করিয়া গ্রহণ করা আচার্য্য শঙ্করের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি"—'যিনি সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহার পক্ষে কি আর ভেদদৃষ্টি সম্ভবপর ?

আচার্য্য শঙ্করের উদারতার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, যে বৌদ্ধধর্ম্মমতকে তিনি বিচারে নিরসন করিয়াছিলেন, সেই মতেরই প্রবর্ত্তক শ্রীবুদ্ধকে পর্য্যন্ত "য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী

স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্ত্তী" বলিয়া হিন্দুর দশাবতারের এক অবতার স্বরূপে হিন্দুমন্দিরে স্থানদান করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের অনাত্মবাদ এবং নিরিশ্বরবাদের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, বৌদ্ধমতের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ এত কম ছিল যে এ জন্য গোঁড়া সম্প্রদায় তাঁহাকে "প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন—বৌদ্ধ মহাযানমতে উপাসিত অনেক দেবদেবী—এমন কি বহু অনার্য্য-আরাধিত দেবতাও তাঁহার প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি জ্ঞানে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। এমনি ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি—ঔদার্য্য ও পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা।

আচার্য্যের জীবনীলেখকগণ বলেন—তিনি দাক্ষিণাত্যের কাপালিক, কাঞ্চির শাক্ত এবং উজ্জয়িনীর ভৈরবগণের ধর্ম্মমতের অনাচার দূরীভূত করেন কিন্তু তাঁহাদের উপাসনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবী এবং মতপথের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার রচিত বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তুতিই এ সম্বন্ধে সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধর্ম্মরাজ্যে এমন উদারতার দৃষ্টান্ত বিরল। অদ্বৈতজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ প্রতিভাত,—একত্ব যাঁহার আদর্শ, তাঁহার পক্ষে এরূপ ঔদার্য্যই স্বাভাবিক ছিল। দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান প্রায় সব মন্দিরেই দেখা যায়,—গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে স্থাপিত দ্বারপাল মূর্ত্তি একটি হাত উত্তোলন করিয়া একটা আঙ্গুল দিয়া কি যেন নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। পাণ্ডারা বলেন,—এই মূর্ত্তি দেখাইয়া দিতেছেন,—মন্দিরে যে সকল দেবদেবী রহিয়াছেন, তাঁহারা মূলতঃ এক,—সমগ্র জগৎ এক শক্তিরই অভিব্যক্তি,—জগতে এক ছাড়া দুই নাই। বহুত্বের মধ্যে একত্ব এমনভাবে হিন্দুই দেখাইতে সক্ষম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি আজ পর্য্যন্তও হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম-মোক্ষধর্ম্ম, হিন্দুর দেবদেবীগণের পূজা-স্তব-স্তুতি, হিন্দুর দৈনন্দিন সন্ধ্যা-বন্দনা, হিন্দুর তীর্থ-মঠ-মন্দির, হিন্দুর দশবিধ সংস্কার, হিন্দুর উৎসব-পার্ব্বণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের লক্ষ্যরূপে তাঁহার প্রচারিত 'অদ্বৈত' নির্দ্দেশিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের সঙ্গে পারম্পর্য্য ও সংযোগ রক্ষা করতঃ আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তকে কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিয়া সমগ্র ভারতকে সংহত ও একযোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতব্যাপী ধর্ম্মপ্রচার ও গঠনমূলক কর্ম্মজাল বিস্তারের মূলে যে এই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। আচার্য্য শঙ্কর অষ্টম-শতাব্দীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী প্রভাবশালী কোন বৈদান্তিক আচার্য্য ভারতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। আচার্য্যের প্রচারিত বেদান্ত সমগ্র ভারতের ভাবরাজ্যে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া বৌদ্ধদার্শনিক মতের ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে, ফলে ঐ সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত অবনতি সূচিত হইয়াছিল। ইতিহাস প্রমাণ দেয়,—আচার্য্য শঙ্করের পরেও ভারতের নানাস্থানে অবনত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষের মত একটী বিশাল দেশে কোন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন অল্প সময়ে সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। এ জন্য বৌদ্ধভারত হিন্দুভারতে পরিণত হইতে যে অনেক যুগ অতীত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকগণ—খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং খৃঃ পূঃ ১৮৪ হইতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্র) অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে হিন্দু-অভ্যুদয় যুগ আরম্ভ হয়। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের দার্শনিকতত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মের

অস্থিমজ্জায় প্রবেশলাভ করিলেও উহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভাবরাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল,—দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই,—কেবল ইহার মূলতত্ত্বগুলি সকলে মান্য করিয়া লইয়াছিল। ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব পণ্ডিতজনেরই বোধগম্য,—সাধারণের মধ্যে দর্শন প্রচার সম্ভবও ছিল না,—বিশেষ করিয়া সেই যুগে, যে যুগে বিদ্যা অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ জন্য বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট করিয়া হিন্দুপ্রভাব আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানপূর্ণ পৌরাণিক মত প্রচলনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রাচীনকালে বর্ত্তমান থাকিলেও গুপ্ত সম্রাটগণের সময়েই (খৃঃ অঃ ৩০০-৬৫০) উহা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণের ধর্ম্ম অদ্বৈতমূলক হইলেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠানভাগই বিস্তার লাভ করে। পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের বিহার, চৈত্য, সঙ্ঘারাম ও মন্দির প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র দেশ পরিব্যাপ্ত ছিল এবং আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদি ছিল এ সকলের অঙ্গ। এই সব বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সহায়েই সাধারণে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। সাধারণ লোক সব দেশেই ধর্ম্ম বলিতে বাহ্যিক অনুষ্ঠানই বুঝিয়া থাকে। এ জন্য ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানমূলক পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পৌরাণিক মতও ঐ সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংখ্যাতীত বিবদমান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যে ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান যত বেশী, মতদ্বৈধও তত অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে দেখা যায়—আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তী যুগ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যুগোপযোগী এক একটী মত প্রচার করিয়া হিন্দুর অখণ্ড আধ্যাত্মিক সাধনার এক একটী দিক পুষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব দু একটী প্রদেশ বিশেষে প্রচারিত পুরাণ-প্রভাবান্বিত এক একটী সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য দেশের ঐ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা—অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব এই মহান আচার্য্যগণের ভারতব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের অনুকূল ছিল না। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেই সব দেশে দার্শনিক ভাব বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। এই সময় উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি বর্ত্তমান ছিল; এ জন্য দক্ষিণ ভারতে দার্শনিক ভাব সমধিক প্রসারিত হইয়াছিল। তবে ইহাও সত্য যে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে—এমন কি ইস্‌লাম প্রভাব প্লাবনের সময়েও অনেক ধর্ম্মাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব স্থান বিশেষে এক একটী ছোট বড় সম্প্রদায়েই আবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক মতপ্রাধান্য যুগে—সবিশেষ ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্লাবনের সময় বিভিন্ন সংহিতাকার ও স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়া হিন্দু সমাজ পরিচালনের জন্য বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ শুঙ্গবংশের রাজত্বকালকে মনুস্মৃতির সংকলয়িতা সুমতিভার্গবের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য আরও দুই শত বৎসরের পরবর্ত্তী। কাত্যায়ন ও পরাশর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত। অন্যান্য সংহিতা ও স্মৃতি পরবর্ত্তীকালে প্রণীত হয়। স্বদেশ ও

বিদেশাগত অবৈদিক ধর্ম্ম প্রভাব হইতে সমাজকে মুক্ত করিয়া হিন্দুর ঘর গুছাইয়া রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং এ বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের তথাকথিত নিম্নবর্ণের দেশশুদ্ধ জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিয়া ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় লোকের প্রাধান্য স্থাপনের একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ তাঁহাদের ছিল এবং আচার্য্য শঙ্কর পর্য্যন্ত ইহার প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। স্মৃতি-সংহিতা সমূহের মধ্যে অনেক ভাল বিষয়ের সঙ্গে এরূপ সব নেশন্-প্রতিষ্ঠা-বিরোধী ঐক্য-বিধ্বংসী বিধি-নিষেধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার প্রভাবে আজ পর্য্যন্তও হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবন পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর আবার প্রধানতঃ এই সময়েই হিন্দুভারত লোকাচার ও দেশাচারের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া এখন অনৈক্য বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের লীলাভূমিতে পরিণত। বেদান্তের জন্মভূমি ভারতের এই দৃশ্য যথার্থ ই হৃদয়-বিদারক। যে সর্ব্বমতসহিষ্ণু বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া উপনিষদের ঋষিগণ সেই প্রাচীন যুগে 'নানা মুনির নানা মতের' মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—মহাভারতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বৈত—গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত-বেদ্য যে 'অদ্বৈত' আজও সমগ্র ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া প্রেরণা যোগাইতেছে, সেই সাম্য-সংস্থাপক ও মহাসমন্বয়কারী বেদান্তের অদ্বৈত আজ হিন্দুজন-সঙ্ঘের ব্যবহারিক জীবন হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ দেশশুদ্ধ সকলে স্মৃতি-সংহিতা-কারদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া দেশাচার ও লোকাচারের দোহাই দিয়া বলিতেছেন—"হাঁ বেদান্ত যে শিক্ষা দেয়—আত্মা হিসেবে সকলেই এক—সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে, এ মত খুব ভাল, কিন্তু এ সব উত্তমাধিকারীর জন্য—খুব উঁচু-দরের সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য—আমাদের এ সব শোভা পায় না।" এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া হৃদিবান স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"এ জাতি ডুবিতেছে, অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের মস্তকে রহিয়াছে,—যাহাদিগকে আমরা নিত্য প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া যাইলেও তৃষ্ণার সময় পয়ঃপ্রণালীর জলপান করিতে দিয়া আসিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি—যাহাদিগকে সম্মুখে অপর্য্যাপ্ত আহারীয় থাকিতেও আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি এবং প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী—যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি,—যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি,—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই,—মনে মনে রাখ্‌লেই হল,—ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈত লইয়া আসা—বাপরে !! তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল। উঠ, জাগো! এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি কি?" জানি না দেশভক্ত স্বামীজির মর্ম্মস্থলোত্থিত এই উদ্বোধন-বাণী কয়জন মহাপ্রাণের অন্তর স্পর্শ করিবে।

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহকে বেদান্তের অদ্বৈত ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে যে সংহত ও একযোগ করিবার চেষ্টা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। তবে হিন্দুভারত দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে না লাগাইলেও তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনের আদর্শরূপে অজ্ঞাতসারে

'অদ্বৈত'কে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের লক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে এই আদর্শই ধরা পড়ে। জগতের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই অদ্বৈতকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন, ইস্‌লাম সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই জন্য যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ "বেদান্তের মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামের দেহকে" হিন্দুর জাতীয় মুক্তির আদর্শরূপে দেশের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান যুগ হইতে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ভারতে পরমার্থ সাধনার এক বিশাল কারখানা গড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। "প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া কারখানার শত শত বিভিন্ন অঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে এমন এক সুনিপুণ যন্ত্রশিল্পী ইঞ্জিনিয়ার আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি সকল বিভাগেই পারদর্শী—এবং যিনি এই বিশাল কারখানার সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি এক মূল অভিপ্রায়ের দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও সংযোগ করিয়া দিয়া ভারতব্যাপী বিরাট যন্ত্রটী এক লক্ষ্যে চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—ইনিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।" উদ্ধৃত বাক্যের 'মূল অভিপ্রায়' ও 'এক লক্ষ্যের' অর্থ বেদান্তের অদ্বৈত। এই আদর্শ সাধনে সকল সম্প্রদায়কে একযোগ করিবার জন্যই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ধর্ম্মপ্রচার। তিনি সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের অন্তর্বর্ত্তী—তত্ত্ব সমূহকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও তদতিরিক্ত এমন এক তত্ত্বভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন, যাহার অধিষ্ঠানে সমস্ত বৈচিত্র্য বা সকলমত-পথের চরম স্বার্থকতা তাঁহার নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত সেই তত্ত্বভূমি,—যাহার সম্বন্ধে তিনি, অতি সোজাভাষায় বলিয়াছেন—"ও সব ধর্ম্মের শেষ কথা।" সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি "সব ধর্ম্মের শেষ কথা" অদ্বৈতলক্ষ্যে আপাতবিরোধী মতপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র ভারতকে যে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই আদর্শেরই জীবন্ত প্রতীক। এই যুগাবতারের সাধনালোকে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের অদ্বৈতকে ভারতের কর্ম্ম-জীবনে পরিণত করিবার জন্য দেশবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"যদি সাংসারিক ধন সম্পদের আকাঙ্খা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত কর, টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদ সেইদিকে প্রয়োগ কর,—তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে,—তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—এই পর্য্যন্ত। এখন কর্ম্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না। এখন আর হিমালয়ের গুহায় বন জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উহা থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্ব্বত্র—এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। * * তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ—উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক; সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া

আমাদের প্রত্যেক শোণিত বিন্দুর সহিত প্রবাহিত হউক।"

কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগে মানুষের পশুত্ব অন্তর্হিত হইয়া দেবত্ব ফুটিয়া উঠিবে,—অনন্তশক্তি—অনন্তবীর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগে দুর্ব্বল হৃদয়ে নববল,—হতাশ মনে উদ্যম,—নিরাশ অন্তরে আশা,—আপনাতে বিশ্বাসহীনের জীবন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হইয়া উঠিবে। 'আত্মস্বরূপে আমরা সকলে এক'—এই অদ্বৈতবোধ মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। কর্ম্মে পরিণত অদ্বৈত হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতি-বিরোধরূপ বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া হিন্দুকে এক অচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে আবদ্ধ করিবে। ব্যবহারিক জীবনে অদ্বৈতের প্রয়োগ হিন্দুর ধর্ম্মমত সমূহে সমন্বয় আনয়ন এবং সমাজের ভোগাধিকার বৈষম্য দূরীভূত করিয়া হিন্দুর স্বগৃহে সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিবে। অদ্বৈত লক্ষ্যে নরকে প্রত্যক্ষ নারায়ণ-জ্ঞান জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে একযোগ করিয়া ভারতে সমষ্টিবদ্ধ জাতীয় সংহতি বা নেশন্ গড়িয়া তুলিবে। বেদান্তের একত্ব ও অভেদত্বে অনুপ্রাণিত সেবাধর্ম্ম পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সকল সমাজের গণ্ডি ছিন্ন করিয়া সকল মানবকে যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ করিবে। ব্রহ্মভাবাশ্রিত অদ্বৈতানুসরণ মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পদবীতে উন্নীত করিয়া তুলিবে।

গোমুখী যাত্রা

গঙ্গোত্তরীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

আহারাদির পর হঠাৎ আকাশে মেঘের উদয় দেখিয়া মনে বিষাদের ছায়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এমন অতর্কিত ভাবে বৃষ্টি সমতলে কমই হয়। ধর্ম্মশালার অনেক নীচে বৃক্ষান্তরালে একটি নির্ঝরিণী পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এতক্ষণ আমরা উহার দিকে লক্ষ্যই করি নাই। এখন সে গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে পর্ব্বত-গাত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

মনেরী হইতে নয় মাইল ভাটোয়ারী। সেখানে কালিকমলি বাবার ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপন করিব স্থির করিয়া অবিলম্বে রওনা হইলাম। বৃষ্টির ফলে বায়ুর তাপ কমিয়া গিয়াছিল। আকাশে তরল মেঘ থাকাতে রৌদ্রের তেজও ম্লান বোধ হইতেছিল। স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে আমরা স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে লাগিলাম—কারণ রাস্তায় চড়াই উতরাই বিশেষ ছিল না। চারি মাইল পর কুমাহিটি চটি পথে পড়িল। সেখানে একজন দোকানদার আমাদিগকে ডাকিয়া যবের ছাতু ও গুড় ভিক্ষা দিল। শুনিলাম গাজীরাম নামে একজন গ্রামবাসী সাধারণের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া এই সদাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতি সাধুকে আধসের ছাতু ও কিঞ্চিৎ গুড় দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহার আধ মাইল পর মেলাচটি। এখানে গঙ্গাপার হইয়া বুড়োকেদারের রাস্তা ধরিতে হয়। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য একটি কাঠের পোল আছে। গঙ্গার অপর পারে একটি শিবমন্দির ও ধর্ম্মশালা দেখিতে পাইলাম। গঙ্গোত্তরী দর্শনান্তে যাত্রিগণ মেলাচটিতে ফিরিয়া এই পথে বুড়োকেদার হইয়া কেদারনাথ বদরীনারায়ণে গমন করেন। এই রাস্তা ত্রিযুগী নারায়ণে কেদারনাথের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। বুড়োকেদারের পর এই পথে একটি বিকট চড়াই পড়ে। উহা পঁহালীর চড়াই বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ভাটোয়ারীতে পৌঁছিলাম। এখানে ভাস্করেশ্বর শিবের একটি প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া একটি নিঝ´রিণী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। টিহিরি রাজের বনবিভাগের একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গলাও এখানে বর্ত্তমান। কালিকমলি বাবার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা ইতিপূর্ব্বেই যাত্রিতে ভরিয়া গিয়াছিল। এরূপ যাত্রীর ভিড় গঙ্গানির পর আর দেখি নাই। সমবেত যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে গঙ্গোত্তরী দর্শনান্তে ফিরিতেছিলেন। যাত্রীর ভিড়ে সে রাত্রে রন্ধনাদি সম্ভবপর হইল না। আমরা দোকান হইতে পুরী তরকারী আনিয়া ভোজন ব্যাপার সমাধা করিলাম।

ধর্ম্মশালাটি গঙ্গার ঠিক উপরে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার নীচেই গঙ্গা পাগলিনীর মত উৰ্দ্ধশ্বাসে কাহার পানে ছুটিয়াছে। উন্মত্ত আবেগে প্রস্তর সমূহে আছাড় পড়িয়া গঙ্গার বক্ষঃ স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমরা দ্বিতলের বারান্দা হইতে সান্ধ্যছায়ায় গঙ্গার আকুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। স্থানাভাব বশতঃ বারান্দায়ই শয়নের ব্যবস্থা করিতে হইল। যাত্রিগণের কোলাহল শীঘ্রই থামিয়া গেল। যে যার স্থানে নিদ্রায় অভিভূত হইল। গঙ্গার গুরু গম্ভীর নির্নাদ গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে দূরাগত সুমধুর ওঙ্কারধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। মনে হইল নৈশ নিস্তব্ধতায় গঙ্গা গর্ভোত্থিত সুগভীর নাদ অনন্ত শূন্যে প্রণবধ্বনির মত বাজিতেছে।

শেষ রাত্রে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভাতালোকে আকাশ, পর্ব্বতরাজি ও গঙ্গাবক্ষঃ দৃষ্টিপথে পুনরায় আসিতে লাগিল। কিন্তু বৃষ্টি থামিল না। এত বৃষ্টি, যে বাহির হওয়া অসাধ্য। যাত্রিগণ নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিল। এ পর্য্যন্ত আমরা বৈকালে ও রাত্রে বৃষ্টি ভোগ করিয়াছি। কাজেই সকালবেলা পথ চলার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই, আজ বৃষ্টি থামিতেছে না দেখিয়া একেবারে আহারাদি সারিয়া যাত্রা করিব স্থির হইল। দোকান হইতে চাল ডাল ইত্যাদি আনিতে দুইজন ছুটিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে। এই সময় একটি বৃদ্ধা পাঞ্জাবী মহিলা অতিশয় স্নেহভরে আমাদিগকে কিছু জলখাবার দিতে চাহিলেন। তাঁহার সহিত আর একটি বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই জলযোগ করিয়া রওনা হওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তৎপূর্ব্বে সাধুসেবার ইচ্ছা করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা একবারে স্নানাদি সারিয়া ভোজন করিব বলিয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "আনন্দ করো মাইজী। যব্ ইচ্ছা হোগী তো হাম আপ্ হী মাঙ্গ লেগেঁ। আউর ইস্‌বখত্ জলপান করনেসে খানা খানেমেভী দিক্কত হোগী। আভী তক্ তো আয়ান ভী নাহি কিয়া। বুরা না মানায়েঁ।" কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। তাঁহারা ডাণ্ডিতে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সহিত কোন পুরুষ অভিভাবক ছিল

বলিয়া মনে হয় না। বৃদ্ধার সঙ্গিনীর হাতে একখানি শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল। পথে চটিতে বিশ্রাম কালে এবং ডাণ্ডিতে বসিয়া গমন কালে তাঁহাকে গ্রন্থপাঠে নিবিষ্ট দেখিয়াছি।

আহারাদির পর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই গঙ্গনানীর অভিমুখে রওনা হইলাম। যমুনা তীরবর্ত্তী 'গঙ্গানি'র কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। 'গঙ্গানি' ও 'গঙ্গনানী' দুইটি বিভিন্ন স্থান। গঙ্গনানী গঙ্গোত্তরীর পথে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা ভাটোয়ারীর নয় মাইল উপরে। তখনও মাথার উপরে কালো মেঘ আকাশ জুড়িয়া রহিয়াছে, কখন বর্ষে ঠিক নাই। আমরা আড়াই ঘণ্টায় সাড়ে পাঁচ মাইল চলিয়া সত্যনারায়ণ চটিতে পৌঁছলাম। এখানে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত দোলায়মান সেতু যোগে গঙ্গা পার হইতে হইল। এ পর্য্যন্ত আমরা গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া আসিয়াছি, এখন বাম তীরে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত রাস্তা কোথায়ও গঙ্গার বামতীরে কোথায়ও দক্ষিণ তীরে। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কাঠের বা লোহার পোল আছে। একটি পোলের অবস্থা দেখিলাম অত্যন্ত সঙ্গীন। কখন যে উহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে ঠিক নাই। আমরা গঙ্গালাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া ইহার উপর ভর করিয়া সশরীরে অপর পারে উপস্থিত হইলাম।

ক্রমে ক্রমে দুইটি উপনদী পূর্ব্বদিক্ হইতে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। একটির জল ঈষৎ আবিল, অপরটির জল জল-মিশ্রিত দুধের ন্যায়। তা ছাড়া আরও কত স্রোতস্বিনী, সরিৎ, নির্ঝরিণী যে দুই দিক হইতে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ নির্ম্মল। স্থানে স্থানে গঙ্গা অতি ভীষণ রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। গঙ্গার সেই প্রচণ্ডবেগ, প্রমত্ত তরঙ্গ বিক্ষেপ কল্পনা করাও কঠিন। জলের মধ্যে যেন সহস্র মত্ত মাতঙ্গের লড়াই চলিতেছে। কৃষ্ণকায় সুবিশাল প্রস্তর সমূহের সহিত ঘাত প্রতিঘাতে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলপ্রবাহ আবর্ত্তিত উচ্ছ্বসিত হইয়া ফেনরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। গঙ্গার বজ্রগম্ভীর নিনাদ পর্ব্বতপার্শ্ব বিকম্পিত করিয়া অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। স্নিগ্ধ শীতল জলরাশির এমন ভয়াবহ করাল রূপ বড়ই অদ্ভুত। জননী জাহ্নবী একাধারে পালিনী ও সংহারিণী।

সৌভাগ্যক্রমে সেইদিন আর বৃষ্টি হইল না। সূর্য্যাস্তের অনেক পূর্ব্বে আমরা গঙ্গনানীতে পৌঁছিলাম। স্নিগ্ধ রবিকরে তখন দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। শুভ্র মেঘমালা ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে সঞ্চিত হইয়া লোহিতশ্রী মণ্ডিত হইতেছে। গঙ্গনানীর একদিকে গঙ্গা ও অপরদিকে উচ্চ পর্ব্বত। গঙ্গনানীতে প্রবেশের পথে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া উপর হইতে ঢক্কানিনাদ শুনিতে পাইলাম। সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলাম কয়েকজন লোক পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া আমাদিগকে উপরে উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আমরাও কৌতূহলভরে কিছুদূর উঠিয়াই বুঝিতে পারিলাম পর্ব্বতোপরি উষ্ণ প্রস্রবণ বর্ত্তমান আছে। কারণ দেখা গেল উষ্ণ জলের ধারা পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া পড়িতেছে এবং জলস্থ ধাতব দ্রব্যের (Calcium bicarbonate) সংযোগে স্থানবিশেষ সমুদ্রের-ফেনার-মত একরূপ কঠিন পদার্থে (Stallegmite) পরিণত হইয়াছে। আর উপরে উঠিয়া তিনটি তপ্ত কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। আমরা সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র দুইজন পাণ্ডা সম্মুখে আসিয়া কুণ্ডের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বলিতে লাগিল। ইহারাই যে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঐরূপে ঢক্কাধ্বনি করিতেছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। প্রথম কুণ্ডটি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। উহার নাম পরাশর কুণ্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুণ্ড যথাক্রমে ব্যাস ও বশিষ্ঠ ঋষির নামে অভিহিত। উহারা আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় এবং উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। তিনটি কুণ্ডই পাথরে বাঁধান। যাত্রিগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুণ্ডে অবতরণপূর্ব্বক স্নান করে। আমরাও কুণ্ডে অবগাহন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিলাম—কারণ পথশ্রম জন্য অবসাদ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। কুণ্ডের মাহাত্ম্য এইরূপ সত্য অনুভব করিয়া পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ক্রমশঃ

ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান ও পতন

অধ্যাপক—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী পি-এইচ বি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতা প্রথমত যে গতিবেগ লইয়া অগ্রসর হইতেছিল বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আর্য্য সমাজের ভিতর ক্রমে ক্রমে আর্য্যেতর প্রভাব এত বেশী ঢুকিয়া পড়িতেছিল যে উহার মূল রূপটি অনেকটা বদলাইয়া গেল। মিথিলাতে (উত্তর বিহার) চিন্তারাজ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য খর্ব্ব হইল। ক্ষত্রিয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল এবং ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বেদের যাজ্ঞিক ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র একটি উচ্চতর স্তরের ধার্ম্মিক মতবাদ তপোবনে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে জনক প্রমুখ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজসভায় পুষ্টিলাভ করিতেছিল। কালক্রমে ঐ মতবাদ এক ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে আশ্রয় করিয়া প্রবল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। ইনিই শাক্যবংশোদ্ভূত গৌতমবুদ্ধ। গৌতমবুদ্ধ ব্রাহ্মণের একাধিপত্য ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ভারতের জাতীয় জীবনে ও চিন্তারাজ্যে এক নূতন স্পন্দনার সঞ্চার করেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতই শাক্যমুনির আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতকের অন্তিমভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে এবং তাহারো দীর্ঘকাল পরে ভারতীয় সভ্যতা গাঙ্গেয় প্রদেশ ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিবাহ ও আহারাদি সম্পর্কে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও তখনো উহা পরবর্ত্তীকালের মত কঠোরতা ধারণ করে নাই। সে সময়ে লোক-সংখ্যার আধিক্য ছিল না। সকলেই বেশ সহজে ও আরামে জীবন যাপন করিতেছিল। সমগ্র দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজারা সাধারণতঃ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজপদ প্রাপ্ত হইতেন। তবে লিচ্ছবিদের মত কোন কোন জাতির ভিতর গণতন্ত্র শাসন পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। সম্ভবত গৌতমবুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন নৃপতি ছিলেন না। তিনি গণতান্ত্রিক শাক্যদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তৎকালে কোশল ও মগধ রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিল। এই উভয় রাজ্যের নৃপতিরাই বুদ্ধদেবের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকেও সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতেও সত্য অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেন। তৎকালে এবং তৎপরবর্ত্তী সময়েও ভারতীয় নৃপতিবর্গের অনেকেই ধর্ম্মবিষয়ে উদারনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কোনও এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় চিত্তের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এরূপ বলিলে যথার্থ হইবে না। হয়ত এক সময়ে কোন এক রাজার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার প্রভাব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু হয়ত তাহারই পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা অপর একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ পোষকতা করিতেছেন। ইহাতে ভারতীয় ধর্ম্মজগতে কোন অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তিকালেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিনা বাধায় তাহাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিত।

বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের অপ্রতিহত কৃতকার্য্যতার বিবরণের ভিতর ভক্ত সম্প্রদায়ীদের অতিরঞ্জন থাকিলেও বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত যে তাঁহার জীবিতকালেই জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে সম্রাট অশোকের সক্রিয় পোষকতা লাভ না করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র ভারতের বিরাট ধর্ম্মরূপে পরিণত হইতে পারিত না। অশোক শাক্যমুনির প্রায় ২৫০ শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের Constantine বলা যাইতে পারে।

মৌর্য্যবংশের প্রথম নৃপতিরা জৈনধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অশোক তাঁহার প্রথম জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্মের দিকে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনলিপি হইতে জানা যায় তিনি আজীবক, নির্গ্রন্থ ও বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়েরই পোষকতা করিতেন। তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল এবং উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি নানা দেশে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যদেশ ও প্রাগ্‌দেশের সীমানার ভিতর গণ্ডিবদ্ধ না থাকিয়া উহা মহীশূর, কাশ্মীর, গান্ধার প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। ভারতের বাহিরে ধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও তিনিই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস্, মিশর, সিরিয়া আদি যবন রাজ্যে, উত্তরে মধ্য এশিয়ায়, দক্ষিণে তাম্রপর্ণী (লঙ্কা) ও সুবর্ণ দ্বীপে (ব্রহ্মদেশ) সদ্ধর্ম্মের প্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অশোকের পুত্র (উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ভ্রাতা) স্থবির মহেন্দ্রের প্রচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার প্রচার এতটা স্থায়ী ফল প্রসব করিয়াছিল যে ভারতবর্ষে ইহা লোপ পাইলেও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কদাপি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সিংহল হইতে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং শেষোক্ত দুইদেশ হীনযান মত অনুসরণ করিয়াই চলিতে থাকে। মধ্যযুগে সিংহলে মহাযান মতবাদের কিছুটা প্রভাব বিস্তার হইয়া থাকিলেও ইহা বরাবর প্রধানতঃ আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের (স্থবিরবাদ) কেন্দ্ররূপেই বিদ্যমান আছে।

মহারাজ অশোকের বংশধরগণ দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুরাগী মৌর্য্যসেনাপতি পুষ্যমিত্র খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে শেষ মৌর্য্যসম্রাটকে নিহত করিয়া শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শুঙ্গ বংশীয়েরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ছিলেন। এই সময় মনুস্মৃতি রচনার সূত্রপাত এবং মহাভারতের প্রথম সংস্করণ হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে তাহার কেন্দ্রস্থল মগধ ও কোশল হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ঐ সময় কিন্তু মধ্য এশিয়া, বক্ট্রিয়া ও পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রিয়াশীল ছিল।

ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবময় ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয় সম্রাট কনিষ্কের সময় (খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক)। ইনি ছিলেন কুশান বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নৃপতি। পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার) তাঁহার রাজধানী ছিল। মহারাজ কনিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে এই ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কনিষ্ক স্বয়ং সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধমতের প্রতি অনুরক্ত হইলেও তাঁহারই রাজত্বকালে প্রথমত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রিয়াশীলতার কথা পাওয়া যায়। মহাযান মতে

ভক্তির বিশেষ স্থান রহিয়াছে। ইহার দার্শনিক মতবাদও অধিকতর ব্যাপক। এই সকল কারণে মহাযান মতবাদ হীনযান মতবাদের উপর অনেকটা প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয়। তাহা হইলেও ভারতবর্ষে যতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল হীনযান মত কখনও লোপ পায় নাই।

ইহার পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের স্বর্ণময় যুগ। কনিষ্কের রাজত্বকালের শেষভাগে নাগার্জ্জুনের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার পরে আর্য্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, চন্দ্রগোমী, চন্দ্রকীর্ত্তি, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি প্রধান প্রধান আচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। নাগার্জ্জুনের কিয়ৎকাল পরে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার প্রতিষ্ঠা হয় এবং খ্রীষ্টোত্তর নবম শতক পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। দুই একটি বাদে প্রায় সমুদয় ভারতীয় রাজবংশই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি পোষকতা করিয়াছে অথবা ইহার প্রভাব বৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ করে নাই।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইতে থাকে। শঙ্কর, কুমারিল প্রমুখ হিন্দুদার্শনিক আচার্য্যগণের আক্রমণ ইহার পতনে সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু পতনের প্রধান কারণরূপে দেখা দিয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও নৈতিক দুর্ব্বলতা। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম মন্ত্রযান, তন্ত্রযান প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয়ই প্রায় পাশাপাশি বিকাশ লাভ করিতে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা শক্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সময় হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তথ্য আত্মস্থ করিয়া ফেলে। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় ভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গৌড়েশ্বর পালরাজগণের প্রতিপত্তি হেতু তাঁহাদের রাজত্বকালে (৮০০—১০৫০ খ্রীঃ) পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব আরো কিঞ্চিৎ অধিককাল বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনতর নালন্দার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলে এবং ইহা তৎকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মুসলমানদের ভারত বিজয়ের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই বিশেষভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। মন্দির ও বিহার ভস্মীভূত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নিহত এবং আচার অনুষ্ঠান নানাপ্রকারে প্রতিহত হইতে থাকে। হিন্দুধর্ম্ম তাহার অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতার বলে শীঘ্রই এই আঘাত সামলাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু পতনোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ তাহার জন্মভূমিতে বিলুপ্ত প্রায় হইল। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন প্রকারে টিকিয়াছিল, তৎপর মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রচারের ফলে তাহাও হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল। তথাপি এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ বিশেষভাবে বিদ্যমান, আধুনিক হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-পদ্ধতি, ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা বৌদ্ধভাবে প্রভাবান্বিত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্ম্মই সমভাবে তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তুর্কীরা যেমন বৌদ্ধ-বিহার ও ভিক্ষুদের বিনাশ সাধন করিয়াছিল তেমনি হিন্দুমন্দির ও পুরোহিতদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছিল। এ অবস্থায় কি কারণে হিন্দুধর্ম্ম আজিও ভারতবর্ষে প্রচলিত থাকিল; আর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল? হিন্দুধর্ম্মে গৃহস্থেরাও ধর্ম্মের সংরক্ষক হইতে পারে আর বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষার ভার কেবল ভিক্ষুদের উপরই ন্যস্ত ছিল। ভিক্ষুদিগকে

তাঁহাদের কাষায বস্ত্র ও চৈত্য বিহারাদির দ্বারা অতি সহজেই চেনা যাইত। সুতরাং তুর্কীদের প্রাবম্ভিক আক্রমণে বৌদ্ধেরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরও তখন বামমার্গী ছিল কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল পরিমিত। আর তখনকার বৌদ্ধেরা প্রায় সকলেই ছিল বজ্রযানী। ভিক্ষুদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি তাহাদের মন্ত্রতন্ত্র ও দেবতাদের উপর যতটা নির্ভর করিত তাহাদের ব্যক্তিগত সদাচার ও বিদ্যার উপর ততটা নির্ভর করিত না। যখন তুর্কীদের আক্রমণে দেবতা ও দেবমন্দির সমূহ চূর্ণীকৃত হইল, যখন এত মন্ত্রতন্ত্র কিছুই তুর্কীদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না তখন এ সকলের প্রতি জনসাধারণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। ফলে এই হইল যে, যখন বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তাঁহাদের ভগ্ন বিহারের সংস্কারের নিমিত্ত বৌদ্ধগৃহস্থদের নিকট উপস্থিত হইলেন তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। বিহার মঠ আর পুনরায় নির্ম্মিত হইল না; ভিক্ষুরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বেলায় এরূপ দুর্ঘটনা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের নিজ নিজ সদাচার ও বিদ্যাবত্তা দ্বারাই পূজিত হইতেন। মুসলমান আক্রমণ কালেও হিন্দুধর্ম্মীদের মধ্যে যথার্থ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা যখন ভগ্নমন্দির সমূহের পুনঃ সংস্কারের জন্য গৃহস্থদের নিকট উপস্থিত হইলেন অতি সহজেই তাঁহারা সাহায্য লাভ করিলেন। বারাণসীর পাশেই বৌদ্ধদের অতি পবিত্র তীর্থস্থান ঋষিপত্তন মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) বিদ্যমান। কান্যকুব্জেশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কুমারীদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিহারই ঋষিপত্তন মৃগদাবের সর্ব্বপশ্চাৎ বিহার। তুর্কীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার পর আর ইহার পুনঃ সংস্কার হয় নাই। কিন্তু বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দির একে একে চারিবার সংস্কৃত হয়। নালন্দা, উডন্তপুরী, জেতবন আদি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্রেও দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কোন মন্দির পাওয়া যায় না। বিখ্যাত তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তুর্কীদের দ্বারা বৌদ্ধবিহার সমূহের ধ্বংসের পর ভিক্ষুরা ভাগ ভাগ হইয়া তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে প্রস্থান করে। যে সব বৌদ্ধ রহিয়া গেল দুএক শতাব্দী মধ্যে তাহারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নীচ সম্প্রদায়ে স্থান পাইল, বাকী সব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

ফকির সাহ জালাল উদ্দীন বাসালী

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্-সি, বি-টি

আরবের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশ বহু সাধু মহাপুরুষের পদরজঃ গায়ে মাখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইস্লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের দেহত্যাগের পর হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত বহু প্রেমিক ও উদাসীন মুসলমান ফকির এই খোরাসানে আবির্ভূত হইয়া ইহাকে ভক্তমাত্রেরই নিকট তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের পুণ্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি সে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বত্যাগী, ভগবৎপ্রেমিক সাহ জালাল

দ্দীন বাসালীও খোবাসানেরই বুক আলো করিয়া একদিন জন্মিয়াছিলেন। নিতান্তই সাধারণ ঘরে, সাধারণ দশজনেরই একজনের মত এক পুণ্যদিনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। পৃথিবীর মানব বিশেষ কলকোলাহলে সেদিন তাঁহাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়াছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া দেবতা ও ঋষিকুল সেদিন যে তাঁহার মস্তকে অজস্র আশিষবারি বর্ষণ করিয়াছিলেন ভাবীকালে তাঁহার জীবনের যে অনুপম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল তদ্দর্শনেই সেকথা আমরা অনুমান করিতে পারি। নিতান্ত অখ্যাত এবং অজ্ঞাত অবস্থায়ই তাঁহার শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছিল। আর তাহা না হইবেই বা কেন? সংসারের নাম, যশ, মান মর্য্যাদার প্রতি এককালে উদাসীন হইয়া সে ব্যক্তি পথে পথে ভিক্ষুকের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে সুরু করিলেন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ইতিবৃত্ত কে আর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যাইবে? তাই সে কালের কোন বিবরণই বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু নিজের অলৌকিক সাধনা ও তপস্যালব্ধ চরিত্র-মাহাত্ম্যও আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য পরবর্ত্তীকালে এই দীন দরিদ্র ভিক্ষুক বালক শুধু নিজ দেশে নহে পরন্তু সুদূর ভারতবর্ষে পর্য্যন্ত শত সহস্র ব্যক্তির সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে সমভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

যে ব্যক্তি জ্ঞানে ও প্রেমে সর্ব্বদা "তদ্‌যুক্ত হইয়া" নিত্য অবস্থান করেন আরবী ভাষায় তাঁহাকেই "বাসালী" শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সাহ জালাল উদ্দীন নিরন্তর ভগবৎ প্রেমে মত্ত থাকিয়া ঐ শব্দে ভূষিত হইয়াছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমান পরিবারে জন্ম হইলেও পূর্ব্ব কর্ম্মগত কী এক সংস্কার প্রেরণায় জীবনের প্রারম্ভেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জালাল উদ্দীনের পরমপ্রীতি জাগ্রত হইয়াছিল। 'জপাৎ সিদ্ধিরূপ' আপ্তবাণী তাঁহার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাই, 'একমাত্র অবিশ্রাম নামজপেই তিনি মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন' এইরূপ একটা দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া তাঁহাকে 'জাপক' সাধুতে পরিণত করিয়াছিল। কালে সংসার বিরাগ তীব্রতর হইয়া তাঁহাকে গৃহহীন, বন্ধুহীন, স্বজনহীন নিঃস্ব অবস্থা প্রাপ্ত করাইল। রিক্ত ফকির, পরিব্রাজকবেশে তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়াইলেন। "নিস্ত্রৈগুণ্যঃ পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"—অর্থহীন বিধি নিষেধের গণ্ডি অক্লেশ ছিন্ন করিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে একদা জালালউদ্দীন পাঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতান সহরে আসিয়া উপস্থিত হন। দৈব-নির্দ্দেশে এই স্থানেই তাঁহার জীবনের বিশেষ স্মরণীয় অনেকগুলি ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাঁহার ভক্তিপূত সাধনজীবন অধিকতর উজ্জ্বলশ্রী ধারণ করে। আমরা এক্ষণে সেই কথাই সংক্ষেপে বলিব।

*　　*　　*　　*

সমগ্র উত্তরাখণ্ডে মহাত্মা তুলসীদাসের অপূর্ব্ব প্রভাব অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তৎরচিত হিন্দী রামায়ণ গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত মাত্রেই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। জালালউদ্দীন বাসালী যখন মুলতানে উপনীত হন সেই সময় মুলতান নগরে টেক্‌চাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "কথক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কথকতা'-মণ্ডপে নিত্য বহুব্যক্তি সমাগত হইত। ভক্ত ব্রাহ্মণ ভাগবৎলীলা গান করিতে করিতে কখনো কখনো ভাবস্থ অবস্থায় তুলসীদাসের গ্রন্থ হইতে অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। মুলতানে অবস্থান কালে ঐ কথকতা শ্রবণ করিতে

যাওয়া মহাত্মা বাসালীর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে কথকতা আরম্ভ হইল। নাতিবৃহৎ সে মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে সেদিন জ্যোৎস্নার অস্পষ্টধারা এক ঐন্দ্রজালিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। কথকের ভাবনিশ্রিত সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবিষ্ট হইয়া একটা দিব্য উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছে। 'শ্রীরামচন্দ্র মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন, দেবের অসাধ্যকর্ম্ম "হরধনুর্ভঙ্গ" করিয়াছেন—জনকরাজ দুহিতা সীতার সহিত তাঁহার পরিণয় হইবে'—এই প্রসঙ্গে সেদিন পাঠ চলিতেছিল। শ্রীরামচন্দ্রের অদ্ভুত শক্তি, দেবদুর্ল্লভ তাঁহার অঙ্গকান্তি, অনুপম তাঁহার চরিত্র, ইহা ছাড়া মিথিলার পথে ঘাটে আর অন্য প্রসঙ্গ নাই। ব্রাহ্মণ টেকচাঁদ তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে সে বিবরণ আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। সে অলৌকিক বর্ণনা যথার্থ সুর, তান, লয়ের সহিত উদ্গীত হইয়া মহাত্মা বাসালীকে জগৎসংসার ভুলাইয়া দিল। অসীম তন্ময়তায় তিনি এককালে সমাবিষ্ট হইলেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেদিন কথকতা চলিল তারপর টেকচাঁদ নিজগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। জালালউদ্দীন তখন তাঁহার সমীপে আসিয়া গদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আজ যে স্বর্গীয় আনন্দ আপনি আমাকে দান করলেন জগতে তাহার তুলনা নাই। আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন তথাপি আপনার ঐ অমরগ্রন্থ সম্বন্ধে আমার জানিতে সাধ হয়। কে উহার রচয়িতা, কোন্ দেবতার চরিত্রকথাই বা উহাতে বর্ণিত হইয়াছে?"

পণ্ডিতজী কহিলেন, "সাহ সাহেব! গিরিরাজ হিমাচল হইতে কিয়দ্দূরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ অযোধ্যানগরী অবস্থিত। পুরাকালে পুণ্যশ্লোক দশরথনামে ঐ প্রদেশের এক রাজা ছিলেন। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, শৌর্য্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র ইঁহারই পুত্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জীবনকথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহারই কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া আজ আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। সাধকাগ্রণী মহাত্মা তুলসীদাস ইহার রচয়িতা, 'রামায়ণ' এই গ্রন্থের নাম।"

সাহজী তখন বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আমি প্রতিদিন এইস্থানে আপনার "কথকতা" শুনিতে আসি। প্রতিদিন ঐকান্তিক মনোযোগ সহকারে আপনার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করি। দিনে দিনে সেই বাণী আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাকে পাগল করিয়াছে। সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি এই পরম পুরুষই আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা। ইহারই প্রেমের টানে আজ আমি গৃহহীন, বন্ধুহীন—সর্ব্বত্যাগী উদাসীন।"

টেকচাঁদ বাসালীর বাক্যে বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"আপনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। যদি দয়া করিয়া প্রতিদিন এখানে আগমন করেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। কল্য হইতে আমার পার্শ্বে আপনার নিমিত্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।"

সাহজী উত্তরে বলিলেন, 'আমি তো প্রতিদিনই এখানে আসিয়া থাকি। সকলের আগে আমি আসি এবং সকলের শেষে এস্থান ত্যাগ করি। কেহ আমাকে সম্মান করে কিনা তজ্জন্য কিছুই আসিয়া যায় না। আজ আমি এখন বিদায় হই, কল্য আবার আসিব।"

ইহার পর হইতেই কথকতায়-সমাগত সকলের নিকট সাহজী বিশেষ ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভাব-ভক্তির কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কিন্তু অন্যদিকে স্থানীয় গোঁড়া মুসলমানগণ সাহজীর ঐরূপ আচরণে

বিশেষ ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে মুসলমান আচার ব্যবহারের ভিতর প্রত্যাবৃত্ত করিতে প্রযত্ন করিল এবং ব্যর্থকাম হইয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। দুই চারিদিনের মধ্যেই সাহজীর ব্যভিচারের প্রতিকারকল্পে মুসলমানগণের এক বিরাট জনসভা আহূত হইল। গোঁড়ার দল বলপূর্ব্বক সাহজীকে সেই সভায় ধরিয়া লইয়া গেল এবং এক প্রান্তে বসাইয়া রাখিল। তৎপর সহরের অনেক খ্যাতনামা মুসলমান নেতা সভার বেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইস্‌লামের নীতিকথা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত সাহজী সে বক্তৃতার কিছুটা শুনিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন,

—"যে-জন প্রেমে উন্মাদ, ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুশাসনে তাহার কি প্রয়োজন ?

—"আমার দেহের প্রত্যেকটি তন্ত্রী তাঁহারই সুরে ধ্বনিত হইতেছে, লোক দেখান মালা জপে আমার কী হইবে ?

—"লোকে বলে 'খস্রু' পৌত্তলিক হইয়াছে', 'সে মূর্ত্তি উপাসনা করে।'

—লোক ঠিকই বলিয়া থাকে, সত্যই 'খস্রু' পৌত্তলিক হইয়াছে, নিখিলবিশ্বে সে আর কিছুই চাহে না।"

তারপর নিম্নোদ্ধৃত প্রার্থনাবাণী মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে অন্যের অলক্ষ্যে বাসালী সে স্থান ত্যাগ করিলেন। "হে প্রভু, আমি তোমার জন্য জগতের সব কিছু ত্যাগ করিয়াছি। আশা আকাঙ্ক্ষায় চির জলাঞ্জলি দিয়া তোমার প্রেমের দুয়ারে আজ আমি নিঃস্ব ভিক্ষুক। তোমার অবাধ দর্শনের অধিকার আমাকে দান কর ও আমাকে তোমার করিয়া লও, আর আমি কিছুই চাহি না।"

সভা তখন পূর্ব্বোদ্যমে চলিতেছে, তাঁহার প্রস্থান কেহ লক্ষ্য করিল না। অনেকক্ষণ পর যখন বক্তৃতা সমাপ্ত হইল তখন সকলে ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিল সাহজী সভাতে নাই। ক্ষিপ্ত জনতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্ধানে সহরের বিভিন্ন স্থানে ছুটিল এবং অবিলম্বে একদল কথকতার জায়গায় যাইয়া উপস্থিত হইল। কথকতা তখন জমিয়া উঠিয়াছে, প্রেমাশ্রুতে মহাত্মা বাসালীর গণ্ডদেশ প্লাবিত হইতেছে। ক্রুদ্ধ মুসলমানগণ এদৃশ্য দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইল এবং সে গোলমালে পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমানগণ ভাবিল কথক ব্রাহ্মণই নানাপ্রকারে সাহজীকে হিন্দুভাবের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহারই প্ররোচনায় সে হিন্দুয়ানীর দিকে ঝুঁকিয়াছে—তাই মুসলমানগণ টেকচাঁদকে পুনর্ব্বার কথকতার অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়া গেল।—বলিয়া গেল যে, যদি ভবিষ্যতে আবার সে কথকতার বৈঠক বসায় তবে তাহার জীবনসংশয়।

নিরীহ, নির্ব্বিরোধী পণ্ডিত প্রাণ ভয়ে শঙ্কিত হইয়া মুলতান নগর ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহার প্রিয় গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রিতেই মুলতান ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহজীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সাহজী তাঁহাকে পলায়নোন্মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "পণ্ডিতজী! আপনি কোথায় চলিয়াছেন ?"

—"বিদেশে।"

—"একটু অপেক্ষা করুন, আপনার মুখ হইতে আমার প্রিয়তমের কথা আর দুই চারিটি শুনিব।"

তখন পণ্ডিতজী বলিলেন, "সাহ সাহেব! আমি প্রাণভয়ে সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়াছি। বিলম্বে আমার ধৃত হইবার সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। নতুবা অবশ্যই আপনাকে আমি "রামনাম" শুনাইতাম।"

দৃঢ়স্বরে সাহজী বলিয়া উঠিলেন, "কিসের ভয় পণ্ডিতজী। এই দণ্ডটি আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন। ইহা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেই একটি বিষধর সর্প বাহির হইয়া আসিবে এবং তৎক্ষণাৎ আপনার শত্রুগণ প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবে।"

পণ্ডিত টেকৃচাঁদ সে কথায় আশ্বস্ত হইয়া গ্রন্থ খুলিয়া ঐস্থানে পাঠ করিতে সুরু করিলেন। আজও সেই হরধনুভঙ্গেরই উপাখ্যান বর্ণিত হইল। পণ্ডিতজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রের অমিত বীর্য, অপ্রতিহতশক্তি, নয়নাভিরাম অতুলনীয়রূপ এবং দেবোচিত চরিত্র মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা করিলেন। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই রামনামকীর্তন যেন একটা অব্যক্ত প্রশান্তির ভাব আনিয়া দিল।

"ধরণীকাভার হরণে যহি রাম অব বনে হৈ,
পাপকো ঘন উদনে ঘনশ্যাম অব বনে হৈ,
বিষ্ণু যহি, বিশ্বম্ভর যহি নীলকণ্ঠ ধারী,
যহি পরব্রহ্ম, ঈশ্বর যহি রাম মুরারি।"

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে পণ্ডিতজী পাঠ সমাপ্ত করিলেন। সাহজীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন তিনি সমাধিস্থ, বাহ্যজগতের কিছুমাত্র হুঁস নাই। কিছুক্ষণ পর সহসা যেন কী একটা দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহজী লম্ফ দিয়া উঠিলেন, পণ্ডিতজীর দিকে তাকাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আমার প্রেমাস্পদের মহিমা আমাকে শুনাইয়াছ। তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল।" পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সাহজী, আমি তিনটি জিনিষ প্রার্থনা করি। প্রথমতঃ আমার একটি পুত্র সন্তান হউক, দ্বিতীয়তঃ আমার মৃত্যু যেন সম্পূর্ণ আকস্মিক ও যন্ত্রণাহীন হয় এবং আমি যেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারি।"

সাহজী বলিয়া উঠিলেন, "উত্তম, প্রথম দুইটি প্রার্থিত বস্তু আমি তোমাকে এই মুহূর্তে প্রদান করিলাম। কিন্তু তৃতীয় প্রার্থনাটি এক্ষণে পূর্ণ হইবার নহে। ইহার পর যখন তোমার সহিত আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে এবং পুনর্ব্বার তুমি আমাকে "রামনাম" শ্রবণ করাইবে তখন তোমার ঐ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত টেকৃচাঁদের চেতনা হইল। তৃতীয় বরটি কেন প্রথম চাহিলেন না এই মনে করিয়া অনুতপ্ত হইলেন। কাতর কণ্ঠে সাহজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহজী, কোথায় আপনাকে আমি পুনরায় দেখিতে পাইব?

গভীর ভাবের সহিত সাহজী উত্তর করিলেন, "পণ্ডিতবর, আমার প্রেমাস্পদের প্রেমের পথে আমি এক দীন যাত্রী। সেই পথেই একদিন আপনার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, ভরসা করি সেই পথেই পুনর্ব্বার আপনার সহিত দেখা হইবে। সময় হইলে তিনিই আপনাকে আমার নিকট লইয়া যাইবেন।"

—ক্রমশঃ

জাগরণ

শ্রীসাহাজী

জাগে রুদ্র, বাজে তার প্রলয় বিষাণ,
থরহরি কাঁপে বিশ্ব সমুদ্র বিমান।
শাশ্বত যা, তাহে বল, কিবা ভয় তার?
মিথ্যা যাহা, তারি শুধু বিনাশ এবার।
সত্যহীন মিথ্যাচার, (সমাজের) অনৃত শাসন,
হবে জেনো, হবে তার নিশ্চয় পতন।
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাজে বারবার
শূন্য মশে। হে ভারত, অতি চমৎকার
শাস্ত্রলিপি, ব্রহ্মচর্য্য বিধান তোমার।
ভেবে দেখ, তব সম অন্ধ কেবা আর,
বৃদ্ধের পঞ্চম পক্ষ।—পাতির প্রমাণ।
বৈধব্য।—দুধের মেয়ে? শাস্ত্রের বিধান।
নারীরে রেখেছ করি দাসীর মতন,
তোমরা দেবতা, প্রভু নারীর জীবন!
পাতিব্রত্য তাহাদের ধর্ম্ম সনাতন,
পত্নীব্রতে কিছুই কি নাহি প্রয়োজন?
রূপে না বিকায় কন্যা, রূপচাঁদে বিকায়,
মূর্খ পুত্র, চাঁদি চাহি তাহারো বিদায়।
কর পূজা দশভুজা, হে শক্তি সাধক!
সবি জেনো পণ্ডশ্রম, সবি নিরর্থক।
হে সন্তান, শক্তি পূজা এবে যদি কর,
শক্তি পূজি শক্তি-হীন কেন তবে রও?
মায়ের পেটের ভাই, আপনার ভাই
কাপুরুষ, তারে কর দূর দূর ছাই।

তুমি হও সুব্রাহ্মণ, সে হয় চণ্ডাল,
এরি বলে হোতে চাও মায়ের ছাওয়াল?
তাহারা সহস্র শত, তোমরা দু'জন,
তাদেরি করিতে চাও সমাজে বর্জন?
তাহারা খাটিয়া মরে দেশের কৃষাণ,
অল্পমূল্যে কিনি শস্য বিদেশে চালান
কর তুমি দু'না লাভে। তারা কিন্তু হায়!
অন্ন বিনা জীর্ণ শীর্ণ মরে বুভুক্ষায়।
মন্দিরে যাইতে তার নাহি অধিকার,
বাতুলের প্রায়, এ কথা কি বলিবার।
ভেবে দেখ, আছে তব কিছু অধিকার?
তুমি যার হাতে গড়া ওরে ক্ষুদ্রাশয়,
বুঝে দেখ, সে হাতের গড়া ও কি নয়?
মূর্খ তুমি, মা যে মোর জ্ঞান-স্বরূপিণী,
তোমার ও ফাঁকা বোলে না ভুলেন তিনি।
ভায়েরে যে করে পর, মাকে সে
কি পায়?
সোজা কথা বুঝিবার বুদ্ধি না জোয়ায়?
জেনো মনে, হিন্দু আর যত মুসলমান,
বৌদ্ধ জৈন পার্শি মগ অথবা খৃষ্টান,
সব বর্গ এক হ'য়ে ডাকিবারে মায়
পার যদি, পূরিবে কামনা শুধু তায়।
নতুবা, সেজো না সঙ, করিও না ঢঙ,
আঁধারে লুকায়ে থাক, মাখি কালি রঙ।

দক্ষিণ-ভারতের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী সুন্দরানন্দ

রামেশ্বর হতে ধনুষ্কোটি বার মাইল দূরে। ধনুষ্কোটি হতে বোজ সিংহলের তালাইমানার পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করে। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থান বলে কন্যাকুমারীর মতো এখানে স্নান করাও বিশেষ পুণ্যজনক। এখানে সমুদ্রতীরে মরুভূমি তুল্য বালুকা-রাশির মধ্যে অযত্নে রক্ষিত দুটী ছোট মন্দির আছে। যাত্রীরা ধনুষ্কোটি যেয়ে স্নান করেই ফিরে আসেন, এখানে থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই।

কন্যাকুমারীতে ৫দিন থেকে প্রাতের বাসে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম যাত্রা করলাম। কন্যাকুমারী হতে ত্রিবেন্দ্রম ৬৮ মাইল। কতকদূর যেয়েই রাস্তার দুদিকে এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত পর্ব্বতরাজি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছোট ছোট গ্রাম, মাঝে মাঝে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র এবং অগণিত নারকেল বাগান নবাগত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দেশের গ্রামগুলো দেখে লোকজনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলেই মনে হলো। খোঁজ করে জানলাম—ব্রিটিশ ভারতের মতো এ দেশের লোক অনশন-অর্দ্ধাশনে কষ্ট পায় না, ধনী লোকের সংখ্যা কম, গরীব লোকের মোটাভাত-কাপড়ের অভাব এ দেশে তেমন তীব্র নয়। দীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করে বাসটী সন্ধ্যার পূর্ব্বে ত্রিবেন্দ্রম সহরের মাঝখানে এসে থামলো। এখান হতে আর একটী বাসে উঠে সহরের উপকণ্ঠে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গেলাম। এই মঠটী একটী নাতিউচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। মঠে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা, নানা রকম ফল ফুলের বাগান ও দুটী কূপ আছে। অনেক অর্থব্যয়ে পাহাড়ের গা কেটে মটর প্রভৃতি যান-বাহন যাতায়াতের রাস্তা করা হয়েছে। মঠের একদিকে অদূরে আরব সাগর এবং অপর তিনদিকে অরণ্য সমাবৃত পর্ব্বতের পর পর্ব্বতরাজি চলেছে। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান খুব কমই দেখা যায়। মঠের অট্টালিকার ছাদ হতে পর্ব্বত-সাগর সমাবেষ্টিত এই রমণীয় স্থানটীর দৃশ্য মনকে মাতিয়ে তোলে। নিকটেই একটী ঝরণা পর্ব্বতের অধিত্যকা দিয়ে স্থানটীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে কুল কুল নাদে প্রবাহিতা। এখানে একটী বিদ্যুতাধার আছে। মঠাধ্যক্ষ স্বামী ওজসানন্দ এ দেশের অধিবাসী, অতিভদ্র এবং শিক্ষিত। আটজন এ দেশী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এখানে থাকেন এবং তাঁরা স্বহস্তে মঠের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। স্থানটী সাধনভজনের উপযোগী। এখানকার স্বাস্থ্য ও জলবায়ু চমৎকার।

ত্রিবেন্দ্রম মান্দ্রাজ ষ্টেটগুলোর গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টের প্রধানকেন্দ্র এবং ত্রিবাঙ্কোর করদরাজ্যের রাজধানী। লোক সংখ্যা সহরে ৭২৮০৯ জন। ত্রিবাঙ্কোরের সংস্কৃত নাম শ্রীমহেন্দ্রপুরম্। কুমারিকা ও ত্রিবাঙ্কোর হতে আরম্ভ করে কান্নানোর পর্য্যন্ত পশ্চিমঘাট বা পশ্চিম প্রদেশকে মালাবার (মলয়দেশ) বা কেরল দেশ বলে। এ দেশের ভাষা মালেয়ালম্, কতকটা স্থানে তামিলও চলে। ত্রিবেন্দ্রম সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,

প্রধান প্রধান রাস্তা সব পিচঢালা। সুবৃহৎ রাজবাড়ীটি সহরের একপ্রান্তে। এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন ও পশুশালায় (Menagerie) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অনেক রকম গাছ এবং পশু আছে। এখানে সিংহ ও ব্যাঘ্রী এবং সিংহী ও ব্যাঘ্রের যৌন মিশ্রণে অপরূপ দর্শন নূতন নূতন প্রাণী উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানকার (Napier musium) প্রদর্শনীতেও অনেক নূতন কিছু দেখবার আছে। ত্রিবাঙ্কোরের বর্ত্তমান রাজা বিলেত ফেরৎ এবং বেশ শিক্ষিত। সহরে হুজুর কাছারি, আর্ট ও বিজ্ঞান কলেজ, মহিলা কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, আইন কলেজ, আর্ট স্কুল, লাইব্রেরী এবং রাজ-অতিথিশালা প্রভৃতি দর্শনীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এখানে বেশভূষা, দোকান পসারী, হোটেল রেস্তোরাঁ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিশেষ ভাবে দেদীপ্যমান। সহর হতে তিন মাইল দূরে "ডা লত্যাবাই" নামক স্থানে আরব সাগর সৈকতে সান্ধ্যবায়ু সেবন বিশেষ উপভোগ্য। সহরের এক প্রান্তে রাজপারিবারিক দেবতা অনন্ত শয্যায় শায়িত পদ্মনাভের সুদৃশ্য মন্দির এবং তাঁর পূজা ভোগ এবং আরাত্রিক দর্শনীয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা সমগ্র ষ্টেট বিগ্রহ পদ্মনাভের নামে দান করে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ ত্রিবাঙ্কোর রাজ্য শাসন করেন। আচার্য্য রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্যদেব এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। বৎসরে দুবার রাজকীয় আড়ম্বরে বিগ্রহকে সমুদ্র তীরে শোভাযাত্রা করে নেওয়া হয়, এবং মহারাজ এতে উপস্থিত থাকেন। প্রতি ছয় বৎসর পর লক্ষ প্রদীপ জালিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ৫৬ দিন ব্যাপী "মুরজপম্" উৎসব করা হয়। সহরের পাশ দিয়ে করমানাই নদী প্রবাহিত। এখান হতে কয়েক মাইল দূরে তিরুবেল্লম নামক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরে পরশুরাম ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি পূজিত। ব্রহ্মার মন্দির ভারতে আর আছে বলে শোনা যায় না।

ত্রিবেন্দ্রম মঠে সাতদিন থেকে প্রাতের ট্রেনে ওঠে বেলা ৯টায় কুইলন নামক এ রাজ্যের একটী ছোট সহরে এলাম। এখানে বিশেষ কিছু দেখবার নেই। কুইলন হতে দ্বিপ্রহরে একটী ক্ষুদ্রকায় ষ্টীমারে এ রাজ্যের বিখ্যাত "ব্যাক্‌ওয়াটার" (Back water) দিয়ে য়্যালেপ্পী রওনা হলাম। এই সুদৃশ্য জলপথ শতাধিক মাইল লম্বা, অদূরে আরব সাগর, মাঝে একটী বিরাট বালুচর, এরই সমান্তরালভাবে এই লবণাক্ত "ব্যাক্‌ওয়াটার।" পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাকালের মতো বারোমাস এখানে জল থাকে, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো সংখ্যাতীত নারকেল বৃক্ষ সমন্বিত বহু গ্রাম। শ্রীহট্টের বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন অধিকাংশ ছোট বড় গ্রামের প্রান্তে যেমন ধপ্‌ধপে সাদা চুণকাম করা মসজিদ্ দেখা যায় এবং ব্রহ্মদেশের গ্রামসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ বনানীর অন্তরাল দিয়ে যেমন সোনালী রঙের প্যাগোডার উন্নত শীর্ষ দৃষ্ট হয়, তেমনি এখানেও প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অসংখ্য নারকেল গাছের মাঝে দু একটী গির্জ্জার চূড়া দর্শকের কৌতুহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "স্যাল্‌ভেসন্ আর্ম্মি" নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এখানে বেশী। এ সম্প্রদায়ের সাধুরা 'গেরুয়া' কাপড় পরেন। শুনলাম— এ রাজ্যে এঁদের চার হাজারের ওপর গির্জ্জা এবং অসংখ্য স্কুল আছে। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টান্ট এবং জেসুইট্ প্রভৃতি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবও এখানে আছে। উত্তর ভারত যেমন ইস্‌লাম-প্রভাবান্বিত, দক্ষিণ ভারত—সবিশেষ মালাবর তেমন খৃষ্ট-ভাবাপন্ন। এই প্রভাব সমগ্র মালাবরের অধিবাসী-দের দৈনন্দিন জীবনে পর্য্যন্ত ক্রমে মাত্রা ছাড়িয়ে বিস্তার লাভ করছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি;— ত্রিবাঙ্কোরের বর্ত্তমান হিন্দু মহারাজা এখানকার অবনত অস্পৃশ্য হিন্দুদের উন্নয়নের জন্য "কেরল হিন্দু-মিশন"কে পদ্মনাভ-মন্দির ফণ্ড হতে দশ

হাজার টাকা দান করেছেন, স্থানীয় খৃষ্টান মিশনারীরা মহারাজার এই অপকর্ম্মের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি করে ভারতের বড়লাটের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন এবং এজন্য বিলেতে পর্যান্ত আন্দোলন চালাচ্ছেন। হিন্দুকে অবাধে খৃষ্টান করা যায় কিন্তু হিন্দু খৃষ্টানকে আর হিন্দু করা যেতে পারে না। স্বার্থপর শক্তিমানের যুক্তি সর্ব্বত্রই এরূপ অন্ধ দেখা যায়। সিংহলেও দেখেছি—সেখানকার মুষ্টিমেয় হিন্দুকে খৃষ্টান করবার জন্য অগণিত অর্থব্যয়ে অসংখ্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। সমগ্র হিন্দু ভারত এ সম্বন্ধে একেবারে হতচেতন হয়ে নিদ্রিত। প্রতিক্রিয়ামূলক উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দু প্রতিষ্ঠান ভারত, ব্রহ্ম সিংহলের কোথাও দেখি নি। এর পরিণাম যে হিন্দুর পক্ষে ক্রমেই অধিক মাত্রায় ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন থাক্ এ কথা। এই "ব্যাক্ওয়াটারে" অদ্ভুত ধরণের ছোট বড় নৌকা নারকেল পাতার তৈরি পাল উড়িয়ে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করছে। বাঙলা দেশে যেমন বর্ষার জলে পাট পঁচান হয় ঠিক তেমন এই বদ্ধ "ব্যাক্ওয়াটারে" স্থানে স্থানে নারকেলের ছোবরা পঁচান হচ্ছে। এই ছোঁবড়া দিয়ে দড়ি, পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত করা এ দেশের লোকের প্রধান ব্যবসা, এজন্য স্থানে স্থানে ছোট বড় কারখানা রয়েছে। এ জলে মাছ পর্য্যাপ্ত, গ্রামের লোকেরা নানাভাবে মাছ ধরছে। দেখলাম ষ্টেসনে ষ্টেসনে সিদ্ধ ডিম এক পয়সায় ২।৩টা বিক্রি হচ্ছে। ব্যাক্ওয়াটারের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে রাত্রি ৮টায় য়্যালেপ্পী বন্দরে এসে মিঃ আয়ারের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করলাম। এই ভদ্রলোকটী অবসরপ্রাপ্ত বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত।

য়্যালেপ্পী বন্দর আরব সাগরের তীরে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। স্থানীয় মুসলমান ও খৃষ্টানরা এখানে প্রধান ব্যবসায়ী। ব্যাক্ওয়াটার প্রদেশের মতো এখানকার জল অত্যন্ত খারাপ; এ জন্য এ দেশের আধাআধি লোক গোদ (Elephantiasis) ব্যাধি আক্রান্ত। সহর হতে দু মাইল দূরে আমাদের একটী আশ্রম আছে। দুজন ব্রহ্মচারী এখানে থাকেন। একটী নারকেল বাগানের মধ্যে আশ্রমের দুখানা ঘর এবং একটী স্কুল আছে।

দুদিন পর এখান হতে অপরাহ্ণের বাসে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী কোচিন রাজ্য রওনা হলাম। প্রায় সমগ্র স্থান বালুকাময়, রাস্তাটী বাঁধান, স্থানে স্থানে জঙ্গলাবৃত ছোট ছোট গ্রাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসখানা অনতিপ্রসর ব্যাক্ওয়াটারের ধারে এসে থামলো, অপর তীরে কোচিন রাজ্য। এখানে কোচিনের কাষ্টমস্ অফিসার জিনিষ পত্র পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলেন। এদেশী একটী ক্ষুদ্র নৌকায় ওঠে সন্ধ্যার পর কোচিন সহরে অবতরণ করে একটী রিক্সা নিয়ে মিঃ ভাট নামক সহরের একজন বিখ্যাত সারস্বত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এলাম। রিক্সাওয়ালা ভুল করে প্রায় দু ঘণ্টা সহর ঘুরে যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছিল; শুনলাম—নবাগতের নিকট হতে বেশী ভাড়া আদায় করবার জন্য রিক্সাওয়ালারা এ রকম করে থাকে এবং সময় সময় সুবিধামত স্থানে যেয়ে নবাগতের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। মিঃ ভাটের সৌজন্যে সহরটী বেশ করে দেখলাম। কোচিন সহর একটী দ্বীপ, এর একদিকে আরবসাগর এবং অপর তিন দিকে সমুদ্র সংলগ্ন ব্যাক্ওয়াটার। সহরটী তিন ভাগে বিভক্ত,—মত্তনচেরী, জু-টাউন এবং ব্রিটিশ কোচিন। মত্তনচেরী ভারতীয় বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্র, জু-টাউনে সাদা ও কাল ইহুদীদের বাস, সহরের উত্তর প্রান্তে সাদা ইহুদীদের মন্দির (The White Jew's Synagogue) এবং দক্ষিণ সীমায় কাল ইহুদীদের মন্দির দর্শনীয়।

পর্তুগীজরা ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে এখানে পদার্পণ করেই একটী কেল্লা এবং গির্জ্জা তৈরি করে। সমুদ্রের তীরে গোথিক আর্টের নিদর্শনরূপে ঐ পুরানো গির্জ্জাটী আজও বর্ত্তমান রয়েছে। এই গির্জ্জায় ভাস্কো ডি গামার সমাধি ছিল, পরে উহা গোয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কোচিন সহরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের অনেকটা স্থানের ব্যাক্‌ওয়াটার খুব গভীর এবং উহা প্রাকৃতিক হারবার রূপে ব্যবহৃত। এখানে দেখলাম দুটী মালবাহী জাপানী জাহাজ নঙ্গর করে আছে। সমুদ্রের উপকূলে স্থানে স্থানে অদ্ভুত ধরণের চীনাজাল (China nets) পাতা রয়েছে। সহরে রাজবাড়ীর তেমন কোন বিশেষত্ব দেখলাম না,—অতি সাধারণ। সহরে দোকানপাট, স্কুল, গির্জ্জা, মন্দির অনেক। এখানে কঙ্কণী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটী বড় মন্দির আছে, এতে অন্য জাতির প্রবেশ নিষেধ। এভাবে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন মন্দির এবং এক জাতির মন্দিরে অপর জাতি যায় না। সারস্বত ব্রাহ্মণদের মন্দির সংলগ্ন একটী বড় অবৈতনিক স্কুল আছে, এখানে খৃষ্টান ছেলেকে ভর্ত্তি করা হয়, কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির ছেলেকে গ্রহণ করা হয় না। এই পাপেই দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু আজ ধ্বংসোন্মুখ।

চারদিন কোচিনে থেকে দ্বিপ্রহরে স্টীমারযোগে ব্যাকওয়াটার পার হয়ে অরণকুলম নামক ষ্টেসন হতে ট্রেনে ওঠে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কালাডি রোড ষ্টেসনে অবতরণ করলাম। এখান হতে বাসে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী আচার্য্য শঙ্করের জন্মস্থান কালাডি গ্রামে এসে একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম। ধর্ম্মশালাটী বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কালাডি ব্রিটিশ মালাবরের অন্তর্গত একটী ছোট গ্রাম। গ্রামে দূরে দূরে কয়েক ঘর লোকের বসতি, কয়েকটী ক্ষুদ্র দোকান, ডাকঘর এবং পুলিশ ষ্টেসন আছে। গ্রামটীর প্রান্তদেশ দিয়ে প্রবাহিতা আলোয়াই নদীর তীরে তিনটী নাতিবৃহৎ মন্দির। একটীতে আচার্য্য শঙ্করের মর্ম্মর মূর্ত্তি, পাশেই আর একটীতে সরস্বতী এবং সামান্য কিছু দূরে অপরটীতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি নিত্য পূজিত। শেষোক্ত মন্দিরটী আচার্য্য শঙ্করের সময়ও বর্ত্তমান ছিল। প্রথমোক্ত দুটী মন্দিরের সামনে নদীর একেবারে তীরে আচার্য্যদেবের মাতার সমাধি স্থানটী বাঁধিয়ে একটী স্মৃতি-ফলকে পরিচিত করে রাখা হয়েছে। এখানে দুটী বাঁধানো ঘাট বর্ত্তমান। মন্দিরদ্বয়ের অতি নিকটে শঙ্করের বসত ভিটা ছিল; বর্ত্তমানে সেখানে দশনামী সন্ন্যাসীদের অবস্থানের জন্য একটী গৃহ আছে। নদীবক্ষ বেশ প্রশস্ত, গ্রীষ্মকালে নদীতে জল খুব কম থাকলেও স্রোত আছে। নদীর অপর পারে অরণ্যানী এবং অদূরে পর্ব্বত। শাঙ্কর বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য এখানে একটী অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ১২ জন বিদ্যার্থী আছেন সব এদেশী উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দশনামী সন্ন্যাসী এখানে মন্দির হতে প্রসাদ পেতে পারেন। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একজন অবসর প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী, ইনি সজ্জন, পণ্ডিত এবং সাধু।

কালাডি গ্রামে আচার্য্য শঙ্করের বংশধর বলে পরিচিত কয়েক ঘর নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ আছেন। বর্ত্তমান হিন্দু ভারতের স্রষ্টা আচার্য্য শঙ্করের বংশধরগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বহু চেষ্টায় ওদেশী একজন শিক্ষিত দোভাষীর সাহায্যে জনৈক নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রবেশ করতেই দেখি একজন ২০।২২ বৎসরের মেয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়িয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলো। সঙ্গীয় ভদ্রলোকটিকে এর কারণ অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করে জানলাম মেয়েটী "অদর্শনীয়" (unseeable)

অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত। এই "অদর্শনীয়" মানুষ দর্শনে উচ্চ শ্রেণীর দূর-দৃষ্টি-দোষ (Distant pollution) হয় এবং সেজন্য তাদিকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয় বলে অনেকে এদের দেখলেই প্রহার করে থাকেন; মেয়েটী প্রহারের ভয়েই আত্মগোপন করেছে জেনে সঙ্গীয় ভদ্রলোকটির প্রতিবাদ সত্ত্বেও তার নিকট যেয়ে তাকে স্পর্শ করে চারটা পয়সা দিলাম। আচার্য্য শঙ্কর প্রচার করেছেন—

"শিব এব সদা জীবো জীব এব সদা শিবঃ।
বেত্ত্যৈক্যমনয়োর্যস্তু স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ॥"

অদ্বৈতানুভূতিঃ, ৭৬

—"শিবই সদা জীব এবং জীবই সদা শিব। যিনি এই দুয়ের একতা অবগত হয়েছেন, তিনিই আত্মজ্ঞ, অন্য কেও নয়।"—আজ সেই শঙ্করের জন্মভূমিতে এ দৃশ্য যথার্থই হৃদয় বিদারক। হয়তো এরকম দৃশ্য দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"সমগ্র মালাবর একটী পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে।" কথাটী হাড়ে হাড়ে সত্য। যা হক, নম্বুদ্রীর বাড়ী যেয়ে একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে অনেক কিছু জেনে নিলাম, সঙ্গীয় ভদ্রলোকটী দোভাষীর কাজ করলেন। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা আভিজাত্য গর্ব্বিত এবং ভীষণ গোঁড়া এই যা দোষ কিন্তু গুণও অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশী। এ বংশের মেয়ে পুরুষ সকলকেই কম বেশী সংস্কৃত শিখতে হয় এবং এঁদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন বাধ্যতামূলক। সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ এবং নৈতিক চরিত্রে বিশেষ উন্নত। বাল্যকাল হতেই ছেলে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপর আজ পর্য্যন্ত প্রখর দৃষ্টি, এজন্য ৫ বৎসর বয়স হতেই উভয় শ্রেণীকে কৌপীন ধারণ করতে হয়। নম্বুদ্রী পরিবারের বড় ছেলে নম্বুদ্রী কন্যা বিয়ে করে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হন, অন্যান্য ছেলেরা নায়ার জাতির মেয়ে বিয়ে করেন কিন্তু নম্বুদ্রী পরিবারে সে মেয়েদের স্থান নেই, তাঁদের সন্তান সন্ততিরা নায়ারের সম্পত্তির মালিক হয়। এজন্য সম্পত্তি বিভাগ খুব কম হওয়ায় নম্বুদ্রী মাত্রেরই আর্থিক অবস্থা ভাল এবং তাঁরাই এ প্রদেশের জমিদার। এর কুফলস্বরূপ নম্বুদ্রী পরিবারের বহু মেয়ে চির কুমারী। এদেশের হিন্দু কৃষ্টি সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এ বংশের দান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ

জড়শক্তি ও অঙ্গার পেট্রোলিয়াম

অধ্যাপক—শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম্-এস, সি

মানুষ শক্তির পূজারী, নানাভাবে তাহারা ইহার আরাধনা করে। জাতি, সমাজ ও ব্যক্তির সেবা শক্তির তুলাদণ্ডেই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তি, মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি—এগুলি মানুষের একপ্রকার নিজস্ব সম্পদ, ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে যে কোন একটির কাছে বিশ্বাসী মস্তক নত করে। মহাত্মা গান্ধী, হের হিটলার প্রভৃতি মনীষিগণ প্রত্যেকেই এক একটি শক্তি-উৎস। উঁহাদের ভক্তও কম নয়।

শক্তি নিয়াই মানুষের খেলা। প্রকৃতিরাজ্যে এ হেন খেলা ঘুমন্ত পুরুষকেও জাগ্রত রাখিয়াছে। সমস্ত জড়শক্তির কেন্দ্র ঐ সূর্য্য অবিরতধারে ধরাবক্ষে তাহার কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছে।

যাহার স্নেহ-বন্যায় সিক্ত হইয়া প্রকৃতি আজ এত জাগ্রত ও উদ্ভাসিত। নদীর খরস্রোত, ঝরণার পাগলধারা এগুলি তারই নিদর্শন। শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার—প্রাকৃতিক অঙ্গার—ও পেট্রোলিয়াম (Petrolium) উহারই পুঞ্জীভূত শক্তি। এ বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ জড়শক্তিরই বিশেষ করিয়া কাঙ্গাল। এ ক্ষুদ্র গ্রহে এজন্য এক তীব্র আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞান আজ প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিকে যন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিতে ব্যস্ত। যন্ত্র দৈত্যের এত কর্ম্মপটুতা তাহারই সাক্ষ্য। এ জড়দৈত্য বিশ্বসংসার গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে, কাহাকেও সুস্থির থাকিতে দিবে না। নগর পল্লী সর্ব্বত্র ইহার উৎকট রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। উহার পাগলপারা বংশীধ্বনিতে ঘুমের ঘোর ছুটিয়া যায়। প্রকৃতির দুলাল গ্রাম্য চাষা সেও এখন 'কল'-কবলগ্রস্ত এবং আপাত অর্থসমস্যা মোচনকল্পে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট। শারীরিক শ্রমের লাঘব হওয়াতে যন্ত্র এভাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত। এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? আজ যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের পেছনে উহারই অভিব্যক্তি, বিদ্যুৎ, আলো, তাপ, শব্দ, বায়ু, নদী, ঝরণা প্রভৃতি সমস্ত জড়শক্তি উহার পায়ের ভৃত্য। আজ প্রাকৃতিক শক্তির সবটুকুই উহার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে মনস্থ করিয়াছে এবং যেটুকু পাইয়াছে তাহাতে উহারা সন্তুষ্ট নয়; বুঝিবা শক্তির দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এ ভয়ে প্রত্যেক যন্ত্রাগার আজ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।

যন্ত্রের প্রধান অন্ন—অঙ্গার ও পেট্রোলিয়াম। এই দুইটির অভাবের সাথে যন্ত্রযুগ অবসান হইবে। তবে কি সত্য সত্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী অতি শীঘ্র যন্ত্রহীন হইবে? আমাদের অঙ্গার ও পেট্রোলিয়ামরূপ মূলধনের পরিমাণ কত? অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে নাতো? উহারা যদি শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষ প্রাপ্ত হয় তবে উক্ত রাক্ষসীর আহার যোগাইবে কে? যেরূপ দ্রুতগতিতে মটর যান, উড়োজাহাজ, বাষ্পীয়পোতরূপ কল-দৈত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে প্রকৃতি কতদিন উহাদের ক্ষুধা মিটাইতে পারিবে? অঙ্গারহীন পৃথিবী—বৈজ্ঞানিকের নিকট এক বিভীষিকাময় অন্ধকার যুগ। বিলাসিতা ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে হাওয়া গাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যন্ত্র যেরূপ সুখস্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছে সেই সুখস্বপ্ন যদি অতি শীঘ্র ভঙ্গ হয় তবে সভ্য জগতের অশান্তির পরিসীমা থাকিবে না। যন্ত্র যেরূপ দ্রুত মানুষের সুখ সম্ভোগের সুবিধা ও সুলভ করিয়া দিতেছে তাহা যদি এত শীঘ্র প্রাণহীন হইয়া পড়ে তবে বিজ্ঞান আজ কিসের গর্ব্ব করিবে? কিন্তু প্রকৃতই কি উক্ত হৃদয়-বিদারক সঙ্কট শীঘ্রই আমাদের স্কন্ধে অবতরণ করিবে, না সহস্র সহস্র বৎসর পরে আসিবে তাহাই বিবেচ্য। এ সমস্যা সমাধানার্থ বিজ্ঞান আজ রাসায়নিকের শরণাপন্ন।

রসরাজ আজ তাই বিশেষভাবে অঙ্গার সমস্যা পর্য্যালোচনা করিতেছেন। শ্বেতজাতি যেদিন মার্কিনদেশে প্রথম পদার্পণ করেন সেদিন সেদেশে ৩,৫৪১,০০০,০০০,০০০ টন প্রাকৃতিক অঙ্গার বা কোল (Coal) উহার বক্ষে সঞ্চিত ছিল, আজ ভৌগলিকতত্ত্ব ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উক্ত অঙ্গারের মাত্র ২৫,০০০,০০০,০০০ টন আজ পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়াছে। কেবলমাত্র মার্কিন দেশের কোল সম্বন্ধে বলা যায় যে যেরূপ অফুরন্ত ভাণ্ডার অপরূপ প্রাকৃতিক খেয়ালে সেখানে গচ্ছিত আছে তাহাতে অঙ্গার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা সম্পূর্ণ অমূলক। মার্কিন জাতি উক্ত সম্পদে কেবলমাত্র একটু আঁচড় কাটিয়াছেন। জমার ঘরে যখন এত অঙ্ক তখন এ ব্যাঙ্ক (Bank) কোন দিন অন্তঃসার শূন্য হইবে এ ধারণা পোষণ করা অন্যায়। তবে আমরা উৎকৃষ্ট অঙ্গারভাগেই

হাত দিয়াছি এবং অনেকটা ক্ষয় করিয়াছি বলিয়া যতটুকু আশঙ্কা টিকতে পারে।

অঙ্গার সম্বন্ধে এতটা আশ্বাসবাণী পাইয়াও আমরা পেট্রোলিয়াম নিয়া অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। একমাত্র মার্কিন দেশজাত পেট্রোলিয়ামের হিসাব নিকাশ করিলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। আমেরিকাতে আজ পর্যন্ত ২ কোটি মটরযান ও ট্রাক (Truck) আছে এবং এভাবে বৃদ্ধি পাইলে উহাদের সংখ্যা ১৯৫০ সনে ৪ কোটি ৫০ লক্ষে আসিয়া পৌঁছিবে। এরূপ দ্রুতগতিতে যান বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পেট্রোলিয়াম খরচও তদনুযায়ী ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং অঙ্ক কষিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্যয়ের স্রোত এভাবে চলিলে ২৫ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইবে। পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ খনিজ তৈল আমেরিকার সম্পত্তি, সে আমেরিকার যদি এরূপ দুর্দ্দশা হয় তবে অন্যান্য দেশের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এদিনে এতবড় প্রয়োজনীয় জিনিষ দ্বিতীয়টী আছে কিনা সন্দেহ। পেট্রোলিয়াম সকলেরই চাই—কিন্তু গোলাঘরের এরূপ নিঃস্বাবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। ঈশ্বর যদি আরও তৈলের সন্ধান দেন ভাল, নচেৎ উপায় কি? এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ববাসী আজ রসায়নের শরণাপন্ন হইয়াছে। সাধক, পাগল, দীন কাঙ্গাল, রসবিদ্ এজন্য কি করিতেছেন তাহাই অনুধাবনযোগ্য।

পেট্রোলিয়ামের রাসায়নিক জটিল তত্ত্ব আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইহা যে হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও অঙ্গার ঘটিত কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এজন্য ইহা হাল্‌কা, ভারি নানাপ্রকার তরল ও বায়বীয় পদার্থের মিলনক্ষেত্রও বলা যায়। পেট্রোলিয়ামের যে অংশ যানবাহনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে গ্যাসোলিন (Gasoline) বলে (৭০°-১২০° মধ্যে প্রাপ্ত তৈল)। ইহার পরিমাণ খনিজ পেট্রোলিয়ামের শতকরা ৩৫ ভাগ। কাজেই ২৫ বৎসরে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাইতেছে তাহা এই গ্যাসোলিনেরই ব্যাপার, সমস্তটা খনিজ তৈল যদি যানের জন্য ব্যবহার করা যাইত তাহা হইলে সমস্যাটা এত নিকটবর্ত্তী হইত না।

গ্যাসোলিন বিভ্রাট মিটাইবার জন্য রসায়ন যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলিই বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। আজ কাল প্রায় সমস্তটা পেট্রোলিয়ামই গ্যাসোলিনরূপে পাওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারি অংশও রসায়নের হাতে কল কব্জার চাপে পড়িয়া (উত্তাপ ও চাপ দ্বারা) হাল্‌কা গ্যাসোলিন হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাকেই পরকীয় ভাষায় ক্র্যাকিং (Cracking) বলে। বলিতে কি এই ক্ষুদ্র চেষ্টার বলে আজ পেট্রোলের পরিমাণ কোটি কোটি গ্যালন (gallon) বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণতঃ প্রস্রবণরূপে আমরা খনিজ তৈল পাইয়া থাকি। ভূগর্ভের যে স্থানে উক্ত সরোবর বর্ত্তমান সেখানে একটা নল প্রবেশ করান হইলে স্বতঃই উহারা উপরে উত্থিত হয়, অথবা সময় সময় পাম্পদ্বারাও উত্তোলন করা হয়। ইহা হইল তৈল সরোবরের কথা, কিন্তু প্রকৃতির বুকে অন্যভাবেও ইহার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অনেক স্থানের পাথর (Oil shale) প্রচুর তৈলসিক্ত পাওয়া যায় এবং সে তৈলের পরিমাণও কম নয়। সেখানে তৈলটা পাহাড়ের মধ্যে এরূপ জড়াইয়া থাকে যে অল্প অল্প উদ্ধার করিবার সুবিধা থাকিলেও এতদিন তাহা বিরাটভাবে লাভ করিবার কথা কোনদিন কেহ ভাবে নাই। পেট্রোলিয়ামের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মানুষের দশা কি হইবে এই ভয়ে রসরাজ এখন পাথর

র্গ করিয়া উক্ত লুক্কায়িত তৈলের সন্ধান করিয়াছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত রাসায়নিক ম্যাকি বলেন, "যে পরিমাণ পাথরমুক্ত তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় কূপ তৈলের সাথে তুলনা করিলে উহা তাহার ২০ গুণ হইবে।" ধরাবক্ষে অনেক স্থানেই এই নূতন উৎস বর্ত্তমান। একমাত্র কলোরেডোতেই (Colorado) যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে তাহাতে অনায়াসে ৭০০ বৎসরের পেট্রোলিয়াম-অভাব ঘুচিবে। আজ পর্য্যন্ত অবশ্য কূপ তৈলই পৃথিবীর সমস্যা মিটাইতেছে, কিন্তু যেদিন এদিকে মন্দা পড়িবে সেদিন পাথর ছাঁকা তৈল মস্তক উত্তোলন করিবে।

পেট্রোলিয়াম ভাবনায় পাশ্চাত্য দেশ এরূপ ভীত হইয়াছিল যে নূতন নূতন পদ্ধতিতে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করার সূত্র পাইয়াও উহারা সুস্থ থাকিতে পারে নাই, এজন্য রাসায়নিক আরও দুই একটা অভিনব প্রণালীতে উহার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া পৃথিবীকে অধিকতর নিশ্চিন্ত ও উদ্বেগহীন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মহাত্মা বার্জিয়াস (Bergius) এজন্য ধন্যবাদার্হ। প্রকৃতিদত্ত পেট্রোলিয়ামের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এবার অঙ্গারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ অঃ ডাক্তার বার্জিয়াস যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার ইতিবৃত্ত ও সাফল্য রসায়নশাস্ত্রের এক জয়স্তম্ভ। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টা, কোটি কোটি টাকা অর্থব্যয়, উত্থান পতনের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জার্ম্মাণ পণ্ডিত এতদিনে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। প্রথমেই বার্জিয়াস তাঁহার দূরদৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে পেট্রোলিয়ামেই একদিন দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকেন্দ্র হইবে। এবং যে জাতি এ সম্পত্তির মালিক তাহার প্রতি-পত্তির কাছে অন্যান্য জাতি মাথা নত করিতে বাধ্য হইবে। এজন্য তাঁহার চেষ্টার পেছনে ছিল জার্ম্মাণ জাতিকে দায়মুক্ত করা। প্রথমতঃ তিনি কয়েকদিন অঙ্গারের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেন, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে ইহা আনাইয়া তাহাদের গঠনবিধি চরিত্রগত পার্থক্য অধ্যয়ন করিলেন। ক্রমে সাধারণ বৃক্ষ হইতে কি ভাবে প্রাকৃতিক অঙ্গার (Coal) উৎপন্ন হইতে পারে সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। প্রকৃতির বিশাল কারখানায় কিভাবে কাজ চলিয়া থাকে তাহার তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ অবগত না হইয়াও তিনি তাঁহার অদম্য চেষ্টার ফলে গবেষণাগারে কোল তৈয়ার করিলেন। এখন পেট্রোলিয়াম যদি কোলেরই তরল পরিণতি হইয়া থাকে তবে কোলকে পেট্রোলিয়ামে পরিণত করিতে ভগবান তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক মহাত্মা বার্জিয়াসকে সাহায্য করিবেন না কেন? বার্জিয়াস আজ সকল সমস্যা মোচন করিয়া তাঁহার অভিষ্ট বর লাভ করিয়াছেন। সুযোগ্য জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হাইড্রোজেন ও অঙ্গারের মিলনক্ষেত্রে তাপ ও চাপের যোগাযোগে (by heat and pressure) প্রচুর পেট্রোলিয়াম তৈয়ার করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি যে সমস্ত কোল বা অঙ্গার অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য ছিল তাহাও এখন গ্যাসলিনরূপে কি অপূর্ব্ব কল্যাণ সাধন করিতেছে।

বার্জিয়াসের সাথে সাথে আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকও এদিকে বিশেষ তৎপরতা দেখাইতে-ছিলেন। কেবলমাত্র পেট্রোলিয়ামই যন্ত্রের আহার যোগাইতে সমর্থ হইবে, অপর কোন পদার্থ দ্বারা এ ব্যবস্থা চলিবে না একথা কোন পুরুষসিংহ বিশ্বাস করিবেন না। জার্ম্মাণ অধ্যাপক সুপণ্ডিত ফিসার (Fischer) তাঁহার গবেষণাগারে তাহার

যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। জলীয় বাষ্প ও বায়ু যদি উত্তপ্ত পোড়া কয়লা (Coke) স্তরের ভিতরে প্রবেশ করান যায় তবে ঐ কয়লা ভেদ করিয়া যে বাষ্পটা বাহির হয় তাহার সুন্দর দাহিকা শক্তি থাকে। গৃহস্থ-গৃহে আলো ও তাপ সরবরাহ করার জন্য উক্ত বায়বীয় পদার্থ পাশ্চাত্য দেশে অনেক বড বড় সহরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশ্লেষণদ্বারা দেখা গিয়াছে এখানে দুইটী দাহ্য গ্যাসের সমাবেশ হইয়া থাকে, ফিসারের নিকট উহাই একটা বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার হইল। তিনি ভাবিলেন "যদি উহাদের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ বিধান করা যায় তবে কি কোন নূতন তরল পদার্থের উদ্ভব সম্ভব হয়? সেই তরল পদার্থ কি পেট্রোলিয়ামের স্থান পূরণ করিবে?' এ সমস্ত চিন্তাপ্রবাহের ফলে ফিসারের বুদ্ধি নানাদিকে পরিচালিত হয়।

উক্ত গ্যাসদ্বয়কে যদি নিকেল (Nickel) নামক ধাতুপদার্থের সহযোগে উত্তপ্ত ও চাপগ্রস্ত করা যায় তবে অচিরেই উহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি (properties) ভুলিয়া নূতন একটী পদার্থের সূচনা করে। বৃক্ষাদি হইতে যে উপাদেয় সুরা (wood spirit) পাওয়া যায় সেই সুরাই ফিসারের হাতে নূতন পথে আবির্ভূত হয়। ইহাদ্বারা গ্যাসলিনের স্থান পূরণ হইল না সত্য, তবে সুরা জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করার এক নূতন সূত্র পাওয়া গেল এবং গবেষণা রাজ্যেও এক নূতন কবাট খুলিয়া গেল। এ রাস্তা ধরিয়া ফিসার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ অনেক দূর অগ্রসর হইলেন এবং অবশেষে এমন একটী কৃত্রিম গ্যাসলিন সৃষ্টি করিলেন যে চতুর্দ্দিক হইতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। অবশ্য ফিসারের তৈল বাস্তব ব্যবসাক্ষেত্রে কতদূর সমর্থ হইবে, অন্যান্য তৈলের সাথে জুড়িয়া উঠিতে পারিবে কিনা এ সমস্ত বিষয়ও বিবেচনাধীন।

পেট্রোলিয়াম সমস্যা মানুষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। কোথায় কোন্ সূত্র ধরিলে ইহার খোঁজ পাওয়া যাইবে ইহাই ছিল বৈজ্ঞানিকের বিষম চিন্তা। কয়লা (Coal) হইতে আল্‌কাত্‌রা পাওয়া যায়, এসংবাদ আজ কাহারও কাছে নূতন নয়। আল্‌কাত্‌রা আজ বৈজ্ঞানিক মহলে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। বিপুল পণ্যসম্ভারের মূলঘট বলিয়া রসায়ন জগতে ইহার একচেটিয়া রাজত্ব। এ হেন আল্‌কাত্‌রাকেও ক্র্যাকিং (Cracking) দ্বারা পেট্রোলিয়ামে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে এবং এই নবজাত পেট্রোলিয়াম শতকরা ৩৫ ভাগ তৈলাভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিধির বিধান বুঝা ভার। এই কালো বিদ্‌কুটে আল্‌কাত্‌রা অবশেষে আমাদের গ্যাসলিন গ্যাসেরও জনক হইল! ইহার কৃপায় মানুষ আবার সহস্র বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হইল।

নিউইয়র্ক (New york) টাইমস (Times)এর সংবাদপংক্তিতে একবার খবর বাহির হইল যে কেবলমাত্র অঙ্গার চূর্ণ দ্বারা মটর যান চলিতেছে। এ সংবাদে আস্থা স্থাপন করা কঠিন সত্য, কিন্তু এরূপ অসম্ভব বার্ত্তাও যে সম্ভব হয় তাহার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। পিটস্‌বার্গের এক বৈজ্ঞানিক সভায় নিউইওর্কের প্রসিদ্ধ ইন্‌জিনিয়ার (Engineer) ট্রেন্ট (Trent) এ বিষয়ে তাঁহার গবেষণার ফল সকলের গোচরীভূত করেন। অঙ্গারের মিহিচূর্ণ অগ্নিসংযোগে ঠিক তৈলের তরলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং গ্যাসলিনের কার্য্যকরীশক্তি উহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। মিষ্টার ট্রেন্টের মতে, অঙ্গারচূর্ণ সব রকম যন্ত্রে ব্যবহার করা চলে। যে অঙ্গারধূলি একদিন মানুষের বিরক্তির কারণ ছিল তাহাও এখন উহাদের জীবন সার্থক করিল।

আজ অঙ্গারের অঙ্গরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—এটা অঙ্গারেরই যুগ। প্রবলপ্রতাপান্বিত অঙ্গার রাজ সমস্ত জড়শক্তির পেছনে দাঁড়াইয়া আছে। শ্রেষ্ঠজীব মানুষ তাহার সন্ধান পাইয়াছে। তাই বিজ্ঞানরাজ তাহারই পূজারী।

কৃষ্টিশিক্ষা-প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য অনাদি কাল হইতে বিরাজমান। সৃষ্টির সকল স্তরেই এই চৈতন্যশক্তির লীলা চলিতেছে, তবে উহা সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রকট নহে। জড় জগতে এই চৈতন্যশক্তি প্রসুপ্ত অবস্থায় আছে। আমরা ইহাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করি। মানব জগতে ইহার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যশক্তি অতি সূক্ষ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিবেক বুদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে। তাই মানুষকে বলা হয়—বিবেকী জীব (Rational being)। মানুষ এই বিবেক বুদ্ধির জন্যই সৃষ্টির রাজা।

মানুষ বিবেকী জীব হইলেও, সব মানুষের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি সমান জাগ্রত নহে। যে মানুষের মধ্যে ইহার যত অধিক স্ফূর্ত্তি, সেই মানুষ তত উন্নত। মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এই বিবেককে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ—সমস্ত সদ্‌গুণের বিচিত্র সমাবেশ। এই সমস্ত সদ্‌গুণ এবং ইহাদের কেন্দ্রীভূত বিবেকরূপী চৈতন্যের বিকাশপথে অনেক বাধা আসিয়া পড়ে। এই সমস্ত বাধা অপসারণের যে চেষ্টা বা উপায়, তাহাই হইল কৃষ্টিশিক্ষা। শিক্ষার কাধ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির এবং শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ চৈতন্যের পূর্ণতালাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। অতএব শিক্ষাকে মানুষের পূর্ণতালাভের 'সাধনা' বলা যায়।

কৃষ্টিশিক্ষাগুণে মানুষ যতই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তার একটা অভিনব অভাব বোধ হইতে থাকে। এই অভাবস্বরূপ জ্ঞাত না হইবার অভাব। এই অবস্থায় মানুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। তখন মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত ভাব—মানুষের দেবত্ব উঁকি দিতে থাকে। মানুষ যখন তার অন্তরের মণি কোঠায় অবস্থিত এই দেবত্বের সন্ধান পায়, তখন সে শত দিকে বিক্ষিপ্ত মনকে গুটাইয়া লইয়া সেই দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করিবার প্রয়াস করে। দেবত্ব বিকাশের এই যে প্রয়াস—ইহাই ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মকে মানুষের দেবত্বলাভের 'সাধনা' বলা যায়।

ইহা হইতে সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শিক্ষা ও ধর্ম্ম একই সূত্রের দুইটী প্রান্ত; অর্থাৎ, কৃষ্টিশিক্ষার যে পরিণত অবস্থা তাহাই ধর্ম্ম। প্রকৃত শিক্ষার ইহাই পরিণতি। যে শিক্ষার ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধির—মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ হয় না এবং ধর্ম্ম ভাব জাগ্রত হয় না, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। মানুষ এ জগতে আসে পূর্ণত্ব লাভ করিবার জন্য—দেবত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য—স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য, ভোগসুখের জন্য নহে, কামনা বাসনার জাল বুনিবার জন্য নহে। ভোগসুখ—কামনা বাসনা জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে আসিয়া জোটে, উহারা গৌণ বস্তু। আপাত মধুর বলিয়া, অনায়াস প্রাপ্য বলিয়া মানুষ উহাদিগকেই মুখ্য বা একমাত্র কামবস্তু মনে করিয়া মুগ্ধের মত উহাদেরই অনুসরণ করে। মানুষ উহাদিকে লাভ করিবার জন্য বিবিধ কর্ম্ম করিতে থাকে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক, প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্য দিয়া কিন্তু মানুষের আত্মচেতনা একটু একটু করিয়া জাগ্রত হয়—

মানুষ একটু একটু করিয়া পূর্ণত্বের দিকে—দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রত্যেক কর্ম্মেরই মধ্য দিয়া সে জ্ঞানলাভ করিতে থাকে শেষে তাহার জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বুঝিতে পারে। প্রত্যেক মানুষ বহুজন্মের বিবিধ কর্ম্মের ফলে একদিন না একদিন বুঝিতে পারিবে যে, জীবনের লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার করা, আর আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য চাই—ধর্ম্ম-সাধনা। মানুষ যতদিন না এই ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেছে ততদিন সে পশুর সমান। শাস্ত্র বলেন—"ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

আমরা বুঝিলাম—মানুষের কৃষ্টিশিক্ষার আবশ্যকতা কি। এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব—শিক্ষার স্বরূপ কি অর্থাৎ কিরূপ শিক্ষা চাই, আর শিক্ষার ক্ষেত্রই বা কি। প্রথমে ধরা যাউক—যে শিক্ষা বিদ্যালয়ে দান করা হয়, সেই শিক্ষার অর্থাৎ কেতাবী শিক্ষার স্বরূপ কি। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা—সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি চর্চ্চা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। এই সকল বিদ্যার অনুশীলনের ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হইতে থাকে, বিচারশক্তি, চিন্তাশক্তি স্মরণশক্তি, প্রভৃতি কতকগুলি শক্তির চালনা হয়, হৃদয়ও কতকটা প্রশস্ত হয় এবং বিবেকবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞানলাভেরও কিছু কিছু সুযোগ ঘটিতে পারে, কারণ, পুস্তকনিহিত উৎকৃষ্ট চিন্তা এবং সদ্ভাবসকল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কাজ করিতে থাকে চিন্তাশীল ধীরবুদ্ধি পাঠকের মনের উপর। এতদ্ভিন্ন জীবিকার্জ্জনের উপযোগী এবং গার্হস্থ্য জীবনের অনুকূল শিক্ষাও কিছু কিছু দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষার ঝোঁক এই দিকেই—জীবনের ব্যবহারিক দিকটার দিকেই খুব বেশী। ইহাতে জীবনের একটা সমস্যার—অন্ন-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। মনুষ্যত্বের বিকাশ—এই কৃষ্টিশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নহে। এই শিক্ষায় জীবনের সর্ব্বাধিক জটিল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যার সমাধান হয় না—জীবনের মহোচ্চ ব্রতের দিকে লক্ষ্য পড়ে না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহাপ্রাণ খাঁটী মানুষ বিরল নহে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ যে এই শিক্ষার ফল, ইহা বলা যায় না। কারণ, ইহার দ্বারা অধিকাংশ ব্যক্তির মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। তবু এই বর্ত্তমান শিক্ষা—কেতাবী শিক্ষা—আমরা চাই, কারণ, ইহা মানুষের বহুদিনের সাধনার ফল—ইহা কালের দান। ইহাকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না, তবে ইহার সংস্কার যে হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আর সংস্কারও যে সময় ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ—যুক্তিবিচারের বিষয়ীভূত, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কৃষ্টি শিক্ষার আর একটা দিক আছে, সেইটাই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। শিক্ষার এই দিকটা স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়া চলে। এই শিক্ষায় জীবনের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, জটিল জীবন সমস্যার সমাধান হয়, ফলতঃ মানুষের মধ্যে পূর্ণত্ব জাগিয়া উঠে, মানুষ দৈবীসম্পদ লাভ করে। কৃষ্টিশিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ কোন বিদ্যামন্দির নহে,—বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ইহার বিদ্যামন্দির। এই শিক্ষার গুরু কোন অপূর্ণ মানব নহেন,—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ইহার গুরু। এই শিক্ষার জন্য কোন মানুষ কোন গ্রন্থ লেখে নাই,—স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ইহার জন্য বিশ্বগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এক একটি বৎসর ইহার এক একটি অধ্যায়, এক একটি মাস ইহার এক একটি পত্র, এক একটি দিন ইহার এক একটি অনুচ্ছেদ আর এক একটি মুহূর্ত্ত ইহার এক একটি অক্ষর। দৈনন্দিন ঘটনাবলী ইহার অধিতব্য বিষয়। এই পরিদৃশ্য-মান্ জগতে যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ

করি বা আঘ্রাণ করি, তৎসমস্তই আমাদের সুপ্ত শক্তিগুলিকে—আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে—অন্তর্নিহিত ভাগবত ভাবকে আঘাত দিয়া একটু একটু করিয়া জাগ্রত করিতে থাকে। এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতেও মানুষের শিখিবার জানিবার অনেক কিছু আছে। কীট পতঙ্গের মধ্যেও কত সুন্দর সুন্দর কল্যাণকর ভাব বিশ্ব-বিধাতা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন,—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ সমস্ত ভাবরূপে তিনি মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীনকালে দত্তাত্রেয় নামে এক অবধূত ছিলেন। তাঁহার চব্বিশটী শিক্ষাগুরু ছিল, তন্মধ্যে চিল একটি গুরু। চিলের নিকট তিনি শিখিলেন—বিবাদীয় বিষয় অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তির ঈপ্সিত বিষয় ত্যাগ করিলে শান্তিলাভ হয়। ব্যাধ তাঁহার আর একটি গুরু। ব্যাধের নিকট শিখিলেন—একাগ্র সাধনায় কাম্য বস্তু লাভ হয়। মক্ষিকাও একটি গুরু। মক্ষিকার নিকট শিখিলেন—জগতের সর্ব্বত্র সতত বিক্ষিপ্ত মহোচ্চ ভাব সকল সংগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রকৃতিগত করিতে পারিলে সহজ ভাবে শীঘ্র আত্মোন্নতি হইতে পারে। এইভাবে তিনি আরও একবিংশটি প্রাণীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা হইতে বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যদি ইহ সংসারের প্রত্যেকটি বস্তু পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা আত্মোন্নতির অনুকূল যথেষ্ট শিক্ষা পাইব। শুধু আত্মোন্নতি কেন, সাংসারিক উন্নতির পথ—পার্থিব কল্যাণের ইঙ্গিতও পাইতে পারি। স্কটল্যাণ্ডের বীর রবার্ট ব্রুসের এবং সমরখন্দের তাতার বাদশাহ তৈমুরলঙ্গের জীবনে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি।

ভগবান্ করুণাময়। তিনি আমাদের শিক্ষার ভার স্বয়ং লইয়াছেন সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া, সম্পদ বিপদের মধ্য দিয়া, লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাভ ও ক্ষতির মধ্য দিয়া, দুর্ভিক্ষ প্লাবনের ভয়াবহ চিত্র চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—সহিষ্ণু হইতে, অভিমান ত্যাগ করিতে, আত্মনির্ভরশীল হইতে আর পরদুঃখানুভব করিতে। বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি আমাদের ঘৃণা লজ্জা ও ভয় ঘুচাইয়া দিতেছেন, পরকে ভাল-বাসিতে শিখাইতেছেন, শরণাগত করিয়া লইতেছেন। এই শিক্ষা আর কোথায় পাইব—আধুনিক বিদ্যামন্দিরে (ইংরাজী বিদ্যালয়ে না চতুষ্পাঠীতে)? শুধু ইহাই নয়। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি আরও কত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাণপ্রদ-বলপ্রদ কত বিচিত্র ভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার কি সংখ্যা আছে। অনন্ত ভাবময় বিশ্বদেবতা এক একটি সৃষ্টির মধ্য দিয়া এক একটি অতি মনোরম ভাব প্রকট করিতেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের উন্নতির নিমিত্ত। জ্ঞানপিপাসু মন—নির্ম্মল বুদ্ধি ঐ সকল ভাব—ঐ সকল মহাসত্য বিবিধ উপায়ে ধরিয়া লইতেছেন আর জগতের হিতার্থে প্রচার করিতেছেন। তাই চাই ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তবেই ঐ সমস্ত ভাগবত ভাবের—ঐ সমস্ত শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি হইবে। প্রাচীন ভারতে এই প্রকৃতির কতকগুলি মানুষ সত্যের সন্ধানে গৃহসুখ ত্যাগ করিয়া বিপুলা পৃথ্বীর বিরাট শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের জন্য—বিশ্বপ্রকৃতির সংসর্গের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। তাই নাকি তাঁহারা শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য তাহা বেদ উপনিষদ্রূপে প্রচার করিয়াছিলেন। তাই চাই প্রকৃতির সঙ্গ—বহিঃ প্রকৃতির পবিত্র সঙ্গ—আকাশ বাতাস, বৃক্ষলতা, ফলফুল, নদনদী, অরণ্য প্রান্তর প্রভৃতির সঙ্গ—ঘনিষ্ঠ সঙ্গ। যেমন করিয়াই হউক, দৈনন্দিন কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও যতটা পারা যায় প্রকৃতির সহিত সঙ্গ করিতে

হইবে। তবেই আশা। কারণ বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবরাশির সংঘাতে অন্তঃপ্রকৃতির রুদ্ধ ভাবস্রোত মুক্ত হইবে।

প্রাচীন ভারতে যে কৃষ্টিশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহা এই প্রকৃতির শিক্ষা-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল শিক্ষা। সে শিক্ষা ছিল স্বাভাবিক। তখন কি সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিদ্যার চর্চা হইত না?—নিশ্চয়ই হইত—আরও কত বিষয়ের চর্চা ছিল, কিন্তু কৃষ্টিশিক্ষার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল তখন- মনুষ্যত্বের বিকাশ—দেবত্বের উদ্বোধন। তাই আমরা দেখিতে পাই— মহর্ষি গৌতম সত্যনিষ্ঠ সরল স্বভাব ব্রহ্ম বিদ্যালাভেচ্ছু বালক সত্যকামকে দীর্ঘকাল প্রকৃতির সঙ্গ করিতে আদেশ করিতেছেন। মহর্ষির আদেশ—যতদিন না নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অতি ক্ষীণকায় গো-পাল হৃষ্টপুষ্ট ও সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইতেছে, ততদিন সত্যকাম আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না, ততদিন তাহাকে আকাশ বাতাস, নদনদী বনানী প্রভৃতির সঙ্গ করিতে হইবে। মহর্ষির এই আদেশের—সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান এই নিষ্ঠুর আদেশের—মর্ম্মার্থ কি? ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, বালক এইভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অনুকূল গুণাবলী লাভ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যালাভ করিতে হইলে হৃদয় মনের যে অবস্থা হওয়া আবশ্যক, তাহার তাহা লাভ হইবে। কি ভাবে হৃদয় মন এই ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে মন্দ হয় না।

মহর্ষির আদেশ—"নিঃসঙ্গ বনবাস।" এই নিঃসঙ্গ বনবাসের প্রথম অন্তরায়—গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সুখস্মৃতি, জনক-জননীর স্নেহ, আত্মীয় স্বজনের মমতা, দ্বিতীয় অন্তরায়—ভয়। এই মমতা ও ভয় হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া থাকিলে সত্যের আলোকপাত অমানিশায় পূর্ণচন্দ্রোদয়েরই ন্যায় একান্ত অসম্ভব। তাই চাই ত্যাগ—মমতা ত্যাগ, ভয়ত্যাগ—সর্ব্বত্যাগ। আর এই ত্যাগের প্রবৃত্তি আসে—সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সুগভীর ভালবাসা হইতে। মহর্ষি বালক সত্যকামের তীব্র সত্যানুরাগ দর্শন করিয়াই এই কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে বালক স্বীয় জন্মদোষ নিঃসঙ্কোচে—ঘৃণালজ্জা ভয়মুক্ত হইয়া—স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ আর কে হইতে পারে। যে তীব্র সত্যানুরাগী হয়, গুরুবাক্যে তার অবিচলিত বিশ্বাস থাকে—গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, গুরুকে ইহকালের ও পরকালের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া তাহার মনে হয়। তাই আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু বালক সত্যকামকে অম্লানবদনে—অকুণ্ঠিত চিত্তে শাশ্বত কল্যাণের আশায় গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিতে দেখিতেছি। গুরুর এই আপাত প্রতীয়মান নির্মম আদেশে বালকের মনে দুঃখ, ভয় বা অবিশ্বাস আসে নাই—এই আদেশ বালককে স্তম্ভিতও করে নাই। এই আদেশ দানের উদ্দেশ্য ছিল—শিষ্যের চরম কল্যাণ। এই আদেশ পালন করিতে হইলে প্রথমেই মমত্ব ও ভয় ত্যাগ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, অনিবার্য্য দুঃখ বিপদ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই আদেশ পালিত হইলে বহু অকল্যাণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ, নানাপ্রকার প্রলোভন এড়াইতে পারা যাইবে,—বিলাস ব্যসন, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, এবং বিবিধ জল্পনার অবসর থাকিবে না, আর কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনিষ্টকর ভাবসমূহ মানবসঙ্গ বর্জ্জিত অবস্থায় অনুশীলনের অভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। সামাজিক জীবনে কয়েকটী উৎকৃষ্ট ভাবের পুষ্টি হয় সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব কথিত অনিষ্টকর ভাবগুলিরও পুষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা আছে; এতৎসঙ্গে যৌনজ্ঞান ও যৌন আকর্ষণ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে।

ইহার অনিবার্য্য ফল—চিত্ত বিক্ষেপ। বিক্ষিপ্ত চিত্তে সত্যের আলোকপাত সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই চিত্ত বিক্ষেপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই মহর্ষি বালক অবস্থায় সত্যকামকে নিঃসঙ্গ বনবাসের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। বালকের কোমল মনে যে দৃশ্য নিয়ত প্রতিফলিত হইতে থাকে, তাহা মর্ম্ম-ফলকে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়,—যে ভাবসমূহ অনবরত মনকে আঘাত দিতে থাকে তাহা বালকের কোমল প্রকৃতিটিকে নূতন আকার দিতে থাকে। এমনি করিয়াই মানুষ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠে। তাই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থীকে শিশুকাল হইতেই উক্ত বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে রাখিতে হইবে,—অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিরাট বিশ্বের মুক্ত বক্ষে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নচেৎ উক্ত বিদ্যালাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষির ব্যবস্থা সর্ব্বথা সুসঙ্গত এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

আমরা বালক সত্যকামের প্রতি মহর্ষির ব্যবস্থিত 'নিঃসঙ্গ বনবাসের' যৌক্তিকতার বিষয় যথাসম্ভব আলোচনা করিলাম। এবার আমরা ইহার ফলোপধায়কতার বিষয় আলোচনা করিতে চাহি। আমরা প্রথমেই বালককে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিবিড় অরণ্য মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে দেখিতেছি। এই কুটীর সে নিজে রচনা করিয়াছে। তাহার খাদ্য পানীয় এবং বসনভূষণ সে নিজেই সংগ্রহ করে। সে আজ স্বাবলম্বী—পরমুখাপেক্ষী হইবার তাহার সুযোগ কোথায়? তাঁহার পর নিবিড় অরণ্যের সভয় ভাব অবিচ্ছিন্ন সংসর্গের ফলে বিদূরিত হইয়াছে এবং উহার গাম্ভীর্য্য আসিয়া মন অধিকার করিয়াছে—সুদূর মর্ম্ম-দেশ স্পর্শ করিয়াছে। তাহার অবিক্ষিপ্ত শিশু মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—অরণ্যকে কে গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছে,—এ ভাব এ কোথা হইতে পাইল? তাহার নব বিকশিত প্রেম অবলম্বন না পাইয়া বন্য পশুগুলির দিকেই প্রধাবিত হইয়াছে। হিংস্র পশুর অন্তর্নিহিত হিংসার যে তরঙ্গ প্রতিনিয়ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সত্যকামের নিকট আসিয়া তাহা প্রতিহত হইতেছে—তাহার প্রেমসলিলে আত্মসমর্পণ করিতেছে, কারণ এখানে হিংসার অনুরূপ তরঙ্গ নাই—আঘাতের প্রতিঘাত নাই। সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাতে —স্বার্থের অভিনয়ে শিশুমনে স্বার্থবোধ জাগিয়া উঠে এবং এই স্বার্থবোধ শিশুর নব বিকশিত বা বিকাশোন্মুখ বিশুদ্ধ প্রেমকে অনেকটা আড়ষ্ট করিয়া দেয় অথবা প্রচণ্ড আঘাতে বিশেষভাবে আহত করে। তারপর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেইটুকুকে সে পরানুকরণে স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে গণ্য করিতে শিখে। ফলে তাহার মনে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কনিষ্ঠকর ভাব সকল বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। বালক সত্যকাম আজ সমাজের ক্রোড়চ্যুত —তাহার স্বার্থবুদ্ধি জাগিবার অবসর কোথায়? যাহার স্বার্থবুদ্ধি নাই, তাহার অমলধবল প্রেমকে হিংসাদ্বেষ কিরূপে কলুষিত করিবে? তাই আমরা দেখিতেছি—বালকের অনাহত প্রেম প্রবাহ হিংস্র পশুর প্রতিও প্রধাবিত। প্রেমিকের নিকট হিংস্র পশুও যে হিংসা ত্যাগ করে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই অনাবিল স্বচ্ছ কামগন্ধহীন প্রেম যাহার অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতিদেবী তাহার সঙ্গে কথা বলেন—সে তাঁহার কথার—নীরব ভাষার মর্ম্ম বুঝিতে পারে—তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় ভাবরাশি তাহার চোখের সামনে ছবির মত ভাসিয়া উঠে। সত্যান্বেষী প্রেমিক বালক সত্যকাম দিগন্তবিস্তারী নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিশ্চয়ই ইহার সৃষ্টিকর্তার অসীমত্বের ধারণা করিয়াছিল।

দশদিক তাহার কানে কানে বলিয়াছিল—'আমাদিগকে দেখিয়া বুঝ, আমাদের বিধাতা যিনি—সবার ঈশ্বর যিনি, তিনি বিরাট হতেও বিরাট—তাঁহার বিরাটত্বের তুলনা নাই। চন্দ্র সূর্য্য আর অগ্নি বালকের নিকট বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ত্বের ইঙ্গিত বহিয়াছিল। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যালাভেচ্ছু সত্যব্রত প্রেমিক বালক সত্যকামের হৃদয় মন প্রকৃতির অবাধ সংসর্গে ব্রহ্মবিদ্যালাভের অনুকূলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল—বালকের হৃদয়মনে অনাদি পুরুষের—অক্ষর ব্রহ্মের আভাস আসিয়াছিল। ইত্যবসরে গো-পালের সংখ্যা অভিলাষানুরূপ বর্দ্ধিত হওয়ায় সত্যকাম মহর্ষির আশ্রমে ফিরিলেন এবং মহর্ষি এখন তাঁহাকে যোগ্য দেখিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ঐরূপ ভাবে দেওয়া না হইলে দুরূহ ব্রহ্মবিদ্যার ধারণা করা মনুষ্যের অসাধ্য।

উপমন্যু আরুণি প্রভৃতির কাহিনী হইতেও আমরা উক্তপ্রকার কৃষ্টিশিক্ষাপ্রণালীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। এখানেও সেই গুরুর প্রতি অচলাভক্তি, সেই ব্রহ্মচর্য্য-ত্যাগ ও সংযম, সেই প্রকৃতির সহিত অবাধ সংসর্গ, সেই শ্রদ্ধা আর সেই সত্যানুরাগ।

কৃষ্টিশিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। বর্ত্তমান ও প্রাচীন কৃষ্টিশিক্ষার উদ্দেশ্য কি—গতি কোন্ দিকে এবং দুইটি শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি—এতদ্বিষয়ে এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে—বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে কোন পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। এইটি একটি গুরুতর সমস্যা এবং ইহার সমীচীন সমাধান হওয়া আবশ্যক। কারণ ইহার উপরে ভারতের তথা জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

এই বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে হইলে কৃষ্টিশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূর্ণত্বের দিকে লইয়া যাওয়াই যদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রাচীন পদ্ধতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইবে কি না তাহা বিবেচ্য। আর বর্ত্তমান পদ্ধতি দোষবাহুল্য বশতঃ পরিত্যাজ্য কিনা, তাহাও বিবেচ্য। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে,—প্রাচীন পদ্ধতিকে যথাসম্ভব সময়োপযোগী করিয়া লইয়া বর্ত্তমান পদ্ধতির উৎকৃষ্টাংশ সমবায়ে এক অভিনব মনোজ্ঞ শিক্ষা পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে, মানুষের মূল প্রকৃতির যদি পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে—যদি মানুষের প্রাচীনকালের গুণ ও বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান যুগেও জীবন্ত থাকে, তাহা হইলে প্রাচীন পদ্ধতিকে বর্ত্তমান পদ্ধতির সহিত কেন মিলাইয়া লইতে পারা যাইবে না, তাহা ত বুঝা যায় না। প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমান কালে বালক বালিকাগণকে লোকালয় পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কারণ বর্ত্তমানে গুরুগৃহে কৃষ্টিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। ব্রহ্মবিদ্যার রীতিমত চর্চ্চা নাই এবং তৎশিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থাও নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম নিষ্ঠার—ত্যাগ ও সংযমের ত যথেষ্ট অবসর থাকা চাই, এবং এরূপ চেষ্টাও থাকা চাই, যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যার্থী বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা যেন শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রার সম্বল হয়—যেন অব্যবহার্য্য বস্তুর ন্যায় কখনও উহা ত্যাগ করিতে না হয়। প্রত্যেকটি ভাব, প্রত্যেকটি চিন্তা যেন তাহাকে প্রতিনিয়তই নূতন করিয়া গড়িতে থাকে—যেন তাহার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে নূতন মানুষ করিয়া তোলে। মোট কথা—আমাদের লক্ষ্য থাকিবে—চরম লক্ষ্যের দিকে। আমরা চাই—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমরা চাই—ঐ অবস্থালাভের অনুকূল গুণ ও বৃত্তিসমূহের উদ্বোধন ও উৎকর্ষ অর্থাৎ আমরা চাই অদম্য সত্যানুরাগ, ব্রহ্মচর্য্য—ত্যাগ ও সংযম, গুরুভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা—নচিকেতার মত শ্রদ্ধা, ইত্যাদি। আমরা চাই—আত্মবিশ্বাস—স্বীয় দেবত্বে বিশ্বাস।

এইরূপ একটা আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে—চাই চরিত্রবান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ উদারহৃদয় শিক্ষক, শ্রদ্ধাবান্ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সত্যানুরাগী শিষ্য এবং শিক্ষানুরাগী দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিবেচক অভিভাবক।

বর্ত্তমান ভারত চাহিতেছে এইরূপ একটা কৃষ্টিশিক্ষাপদ্ধতি—এইরূপ শিক্ষক, এইরূপ শিষ্য এবং এইরূপ অভিভাবক।

মাধুকরী

প্রাচ্য ভূখণ্ডে লোক সংখ্যার চাপ ও জাতি সঙ্ঘর্ষ,—

"সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তথায় প্রাচ্যের লোক সংখ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা তাঁহার "স্যর উইলিয়ম মেয়ার বক্তৃতাগুলির" প্রারম্ভেই আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য জগতে সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক, সংখ্যায় ৯০ কোটী, ভূভাগের শতকরা মাত্র ৪ অংশে বাস করে, অথচ ৬৫ কোটী ইউরো-আমেরিকান তাহার ৬ গুণ ভূভাগ দখল করিয়াছে। ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের লোক সংখ্যা প্রতিবর্গ মাইলে যথাক্রমে ১২৫, ১৯৩ এবং ৪৫১। অথচ যে সব নূতন, অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশ প্রাচ্য শ্রমিক ও কৃষকের উপনিবেশ রোধ করিতেছে,—যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা—তাহাদিগের লোকসংখ্যা প্রতিবর্গ মাইলে যথাক্রমে কেবলমাত্র ৩৬, ১৪ এবং ১২।

লোক সংখ্যা ও জীবনযাত্রার ভাবের এই তারতম্য বিপুল জন-অভিযানের কারণ হইয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই অভিযান আপাততঃ এসিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ। দক্ষিণ এসিয়ার মরশুমী ও উষ্ণপ্রধান অংশে এখন ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ঔপনিবেশিক বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবাসী এখন সংখ্যায় ৩০ লক্ষ। উত্তরে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও প্রাচ্য রুশিয়ার নূতন ঔপনিবেশিকেরা সংখ্যায় অনেক বেশী,—৩ কোটী ৪০ লক্ষ। যতই আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেত সভ্যতা রক্ষার অজুহাতে প্রাচ্য ঔপনিবেশিকের গতি রোধ করিতে থাকিবে, ততই প্রাচ্য ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইবে। বর্ম্মায় ভারতবাসী ও বর্ম্মী, মালয় উপদ্বীপে চীনা, জাপানী ও ভারতবাসী, ইন্দোচীন ও সিংহলে দক্ষিণ ভারতবাসী ও আদিম অধিবাসীদের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তুমুল জাতি সঙ্ঘর্ষের সূচনা করিতেছে। তাহা ছাড়া, যে কোন জাতিই বহুকাল উষ্ণমণ্ডলের উত্তাপ, জলবৃষ্টি ও বীজাণুর সহিত এবং উত্তর এসিয়ার টুনড্রা ও মরুভূমির সহিত যুদ্ধে অচিরেই বিধ্বস্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে। এই সকল দিক্ হইতে সত্য সত্যই যখন এসিয়াবাসী সঙ্কীর্ণ ভূভাগের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া দ্রুত বাড়িতে থাকিবে তখন নিজেদের মধ্যে লড়াই ও মানুষের অব্যবহার্য্য ভূমিতে প্রসার লাভ করিয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এসিয়ার বিভিন্ন জাতির পক্ষে ইউরো-আমেরিকার প্রাচ্য প্রদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরে নিষ্কাশননীতি কম অমঙ্গলের সূচনা করে না।

প্রাচ্য জাতিসমুদয় যে পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাতে তাহাদের প্রত্যেক বৎসর ৮০ লক্ষ একর জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং প্রতীচ্যজাতি সমুদয়ের আরও ১ কোটী ২০ লক্ষ একর জমির উৎপন্ন শস্য প্রয়োজন হইবে। বিংশ শতাব্দীতে কৃষি বিস্তার পৃথিবীর এমন অঞ্চলেই এখন সম্ভব যেখানে প্রতীচ্য জাতিরা ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যদি পৃথিবীর '২ কোটী' একর জমি প্রতিবৎসর বাড়াইতে হয়, ইউরোপীয়-গণ যে গত শতাব্দীতে নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে কৃষির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল, তাহা এক রকম নিঃশেষ হওয়াতে যে সব অত্যুষ্ণপ্রধান বা

অতি শীতপ্রধান ভূভাগ ইউরো-আমেরিকান জাতি দখল করিয়া বসিয়া আছে, অথচ যেখানে কৃষি বিস্তার করিতে পারিতেছে না, সেখানে সাদরে প্রাচ্য কৃষককে আমন্ত্রণ করিতেই হইবে। সমগ্র পৃথিবীর খাদ্যাভাব কোন দেশেরই অনুদার নীতিকে বহুকাল আর প্রশ্রয় দিবে না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসুন্ধরার কর্ষিতভূমি ৫০ কোটী একর বাড়াইতেই হইবে যদি মানবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে রক্ষা করিতে হয়। পৃথিবীর খাদ্যাভাবের চাপই শস্য উৎপাদনকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিবার সহায় হইবে।" আর্থিক উন্নতি—ভাদ্র, ১৩৪২ সন।

আত্মার সংজ্ঞা,—

"আধ্যাত্মিক সাহিত্য" সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইলে "আত্মা" কাহাকে বলে তাহা আগে বুঝিতে হয়, কারণ বস্তুর আত্মাকে অধিকরণ করিয়া যে সাহিত্য অথবা আত্মা-সম্বন্ধীয় সাহিত্যের নাম "আধ্যাত্মিক সাহিত্য"।

"আত্মা" শব্দের প্রচলিত অর্থ "আমি"। আত্মা বলিতে যে "আমি" বুঝায় সে "আমি"র বিস্তৃতি যে কতখানি সাধারণতঃ আমাদের তাহা অপরিজ্ঞাত।

পাণিনি দেবের শব্দ বুঝিবার পদ্ধতি অনুসারে জীবের আত্মা বলিতে বুঝায় সেই অবস্থান যাহাতে নির্গুণের প্রকাশ, গুণ এবং কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

"আত্মা" এই শব্দটীর মধ্যে আছে 'আ', 'ত্', 'ম্', 'আ'। 'আ' শব্দের অর্থ নির্গুণের প্রকাশ' 'ত্', শব্দের অর্থ "অহংকৃতি" অথবা গুণ, 'ম্' শব্দের অর্থ "স্পর্শ" অথবা কার্য্য, "আ" শব্দের অর্থ গুণ এবং কার্য্যের প্রকাশ, অথবা বিকাশ।

আমাদের ঋষিদের কথা অনুসারে চরাচর সমস্ত জীবের মূল কারণ একটী নির্গুণ দ্রব্য। ভূচর, খেচর, জলচর সমস্ত চর-জীবের এবং লতা গুল্মাদি অচর-জীবের মূল উপাদান ঐ নির্গুণ বস্তু। ঐ নির্গুণ বস্তুর প্রকাশ হইলে তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্য্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই পাণিনি দেবের সংজ্ঞানুসারে নির্গুণ বস্তুর প্রকাশ হইবার পর তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হইলে যে অবস্থানের উদ্ভব হয় তাহার নাম "আত্মা।"

নির্গুণ বস্তু বলিতে বুঝায় "ব্যোম"। ঋষিদের কথানুসারে ব্যোম অচল, অটল। যেখানে অথবা যে জীবের ভিতর ব্যোমের পরিমাণ বেশী, সেই স্থানে অথবা সেই জীবের আকর্ষণী অথবা বিকর্ষণী শক্তি থাকে না। আকর্ষণী অথবা বিকর্ষণী শক্তি না থাকিলে জীব আকাশে উড়িতে এবং বায়ু মণ্ডলে অথবা জলের উপর বসিতে পারে। খেচর জীবের ভিতর ব্যোমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া তাহারা আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

যে স্থানে খুব বেশী পরিমাণ ব্যোম সঞ্চিত থাকেন, সেই স্থানের মধ্য দিয়া কোন স্থূলাবয়ব-সম্পন্ন জীব স্বাভাস্তরে অত্যধিক পরিমাণ ব্যোমের সংস্থান না করিতে পারিলে যাতায়াত করিতে পারে না। আকাশের যে অংশ নীলবর্ণ, সেই অংশে ব্যোম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঞ্চিত। প্রত্যেক দুইটী তারকার মধ্যে ব্যোমের সঞ্চয় আছে বলিয়া একটী তারকা আর একটী তারকার উপর পড়িতে পারে না।

ব্যোমের কোন গুণ নাই। তাঁহাকে মানুষ হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার রস গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার কোন গন্ধও নাই।* তাঁহার ভিতর দিয়া মানুষ কেবলমাত্র শব্দ শুনিতে পারে।

মানুষের কর্ণমূলে (কর্ণরন্ধ্র নহে) ব্যোম

* বেদান্ত মতে ব্যোমে ½ ক্ষিতি, সুতরাং তদ্গুণ গন্ধ আছে। উঃ সঃ

আছেন বলিয়া মানুষ শব্দ শুনিতে পায় এবং কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়া এক শব্দ ছাড়া অন্য কোন বস্তু যাতায়াত করিতে পারে না। মানুষের অবয়বের যে যে অঙ্গে ব্যোম অধিক পরিমাণে আছেন, সেই সেই অঙ্গে অন্য কোন বস্তু প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই সেই অঙ্গে কেবল মাত্র শব্দ শুনা যায়।

ব্যোম না হইলে চরাচর কোন জীবের উদ্ভব ও রক্ষা সম্ভব হয় না। এইজন্য ব্যোমকে বস্তুর "বীজাকার" বলা হইয়া থাকে।

এইখানে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুর তিনটী আকার আছে। তাহাদের নাম বীজাকার, সূত্রাকার অথবা সূক্ষ্মাকার এবং স্থূলাকার।

"ব্যোম" গতিশীল হইলে সূক্ষ্মাকার বায়ুর উদ্ভব হয়। সূক্ষ্মাকার বায়ুর কোন রূপ নাই, কোন রস নাই, কোন গন্ধ নাই।† তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা এবং জীবের শরীরে সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত থাকে বলিয়া জীব স্পর্শ করিতে পারে এবং সুখস্পর্শ চায়। মানুষের ত্বকের ও মাংসের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত থাকে বলিয়া ত্বকের ও মাংসের স্পর্শশক্তি রহিয়াছে। যে যে অঙ্গে সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত হয় না সেই সেই অঙ্গের স্পর্শশক্তি থাকে না। রক্তের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ সূক্ষ্মাকার বায়ু প্রবাহিত হয় না বলিয়া রক্তের কোন স্পর্শশক্তি নাই।

সূক্ষ্মাকার বায়ুর উদ্ভব হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার ও স্থূলাকার জল, তেজ এবং ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীব বিবিধ গুণ ও কার্য্য শক্তিসম্পন্ন হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে, নির্গুণের প্রকাশ হইলেই বায়ুর উদ্ভব হয় এবং বায়ুর উদ্ভব হইলেই সূক্ষ্মাকার ও স্থূলাকার জল, তেজ এবং ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীবের উদ্ভব হয় এবং জীব গুণ ও কার্য্যশক্তি অর্জ্জন করে। কাযেই আত্মা বলিতে বুঝায় চরাচর জীব এবং আত্মার জ্ঞান বলিতে বুঝিতে হইবে জীব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাহা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক বস্তুর উপাদান কি, গুণ কি—এবং কার্য্যসামর্থ্য কি তাহা জানিতে হইবে।"　　　বঙ্গশ্রী, ভাদ্র, ১৩৪২।

† বেদান্ত মতে বায়ুতে ⅛ করিয়া তেজ, জল ও ক্ষিতি, সুতরাং ঐ পরিমাণ রূপ, রস ও গন্ধ আছে। উ. সঃ

পুঁথি ও পত্র

Sage of Sakori—বি, ভি, নরসিংহ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য (ভারতে) আট আনা। বহির্ভারতে এক শিলিং।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীউপাসনী বাবার আশ্রম, সাকোরি (Sakori)। পোঃ আঃ রাহাটা (Rahata)। আমেদনগর জিলা (Ahmednagar Dt) জি, আই, পি, রেলওয়ে। উক্ত ঠিকানায় এবং মাদ্রাজের কয়েকটি প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আমেদনগর (বোম্বাই প্রদেশ) জিলায় সাকোরি নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে কাশীনাথ গোবিন্দ উপাসনী শাস্ত্রী নামক এক জন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে এমন কোন কোন বিশেষ গুণ লক্ষিত হইত

যে গুলির প্রভাবে পরিণত জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত স্থান লাভ করিয়া বহু নরনারীর হৃদয়ে শান্তিদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনে তেমন কোন বিশেষত্ব যদিও লক্ষিত হয় না তথাপি মনে হয় উক্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার সাধু জীবনের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার জীবন নানা অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছিল, সে জন্য তিনি কঠোরতায় খুবই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। নিজ ভার্য্যার সঙ্গে যখন তিনি শ্রীভগবানের সাধন ভজনে রত ছিলেন তখন তিনি শ্রীসাই বাবা নামক একজন ত্যাগী ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে গুরুর অলৌকিক জীবনের প্রভাবে তিনি তাঁহার উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিলেন এবং পরজীবনে তিনি নিজ শিষ্যবর্গকে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন তন্মধ্যে গুরু-ভক্তি প্রচারই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

রিপুর তাড়না, কাঞ্চনাসক্তি প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিরাজি ধর্ম্ম জীবনের পরিপন্থী বলিয়া তিনি ভক্তগণকে উপদেশ দান করেন। কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগই প্রবর্ত্তকের অনুসরণীয় এবং তৎপরে জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয়, ইহাই তাঁহার মত। তিনি শাস্ত্র পাঠ, পূজা, জপ ইত্যাদির সাহায্যে আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইতে উপদেশ দান করেন। তাঁহাতে আর একটি বিশেষত্ব দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকেই নিজ নিজ ধর্ম্মাদর্শ অবলম্বনে জীবন যাপনে উপদেশ দান করেন। এই সকল উপদেশাবলী মানব মাত্রেরই অনুসরণীয়।

তাঁহার উপদেশ ও সাহচর্য্যে অনেক ভক্তের কল্যাণ হইবে নিঃসন্দেহ। ভক্তির আতিশয্যে যদি তাঁহাকে ধর্ম্ম জগতের চরম আদর্শ করিয়া তুলা যায় তাহা হইলে হয়তো ভক্তগণের খুবই আনন্দ হইতে পারে কিন্তু তিনি নিজে তেমন আনন্দিত হইবেন কিনা সন্দেহ। সাকোরির মহাপুরুষের প্রতি আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারেই তাঁহার ভক্তদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন একটা গণ্ডি সৃষ্টি না করিয়া মহাপুরুষের উদার মতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। তাঁহার সঙ্গলাভ ও উপদেশাবলী পালনে অনেকের উপকার হইবে।

আর্য্যশক্তি—শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি তত্ত্বচিন্তামণি শব্দরত্নাকর কর্ত্তৃক পরিচয় লিখিত। ১২০নং অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা।

এই কবিতা গ্রন্থটিতে মোট ষোলটি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত 'আর্য্যভূমি'র ন্যায় এই গ্রন্থটিতেও অতি পবিত্র বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। উচ্চ আদর্শে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে সে জন্য একটু কটাক্ষপাত না করিয়াও মসী চালনা করিতে পারেন নাই। 'রমণী' প্রসঙ্গে সতীত্বের প্রভা বর্ণনা করিতে যাইয়া সাবিত্রী দেবীর প্রশংসা করিয়া মাতৃজাতির হৃদয়ে আদর্শ জাগ্রত করিতেছেন বটে, কিন্তু শেষ ছত্রে 'রমণী হইয়াছ স্বেচ্ছাচারে তুমি কুহকিনী' বলিয়া সকল রমণী জাতির উপর কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় মাতৃজাতির মধ্যে যাঁহাদের ভিতর তিনি দুর্ব্বলতা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া শুধু পবিত্রতার আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিলেই ভাল হইত। 'চণ্ডীদাসে' রজকিনী কিশোরীর মধ্যে যুবক চণ্ডীদাসের মাতৃদর্শন এত উচ্চাঙ্গের সাধনা যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনা করাই অসম্ভব। মাতৃভাবের চিত্র দেবী মূর্ত্তিতে

সুস্পষ্ট। 'গুরুদেব' নামক প্রথম কবিতাটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গুরুগণের অবস্থার উন্নতি না হইলে ভারতীয় হিন্দু জাতির উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে? 'শম্বুক' কবিতাটিও অতি সুন্দর হইয়াছে। সমষ্টির উন্নতি মানসে ব্যষ্টিকে সর্ব্বদাই 'বলি' গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায় গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলা যায়। আমরা তাঁহার সুরুচির সুখ্যাতি করি।

সঙ্ঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল (হরিদ্বার),—আমরা কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর হাসপাতালে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে ৮৩১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং আউট্‌ডোর ডিস্‌পেনসারী হইতে ৩০১২৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। সেবাশ্রমের অধীনে একটী অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয়ে ৩০ জন বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করে। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কয়েকটী দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা এবং ১৬৮৮ খানি পুস্তক সংবলিত একটী গ্রন্থাগার আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে একটী অতিথিশালা বা ধর্ম্মশালা ও একটী মন্দির আছে। আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত হইলে হৃষিকেশে এই সেবাশ্রমের একটী শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। হৃষিকেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক সাধু তপস্যাদি করেন, ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা প্রধানতঃ তাঁহাদের সেবা করার জন্যই এই শাখাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা। এ সম্বন্ধে সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ বদান্য দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। এই সেবাশ্রমের মোট আয় ২৪৩৪৩৸৵৫ পাই এবং ব্যয় ১৮৬২১৷৷৵৩ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশী,—আমরা কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই হাসপাতালের ইন্‌ডোর বিভাগে ১৪৫ জন রোগীকে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং মোট ১০৯৮ জন রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১০৯৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, ১৩৮ জন সাময়িক ভাবে সাহায্য পাইয়াছেন, ১৬৫ জন স্বেচ্ছায় চলিয়া গিয়াছেন, ১৮০ জন ৺কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বৎসরের শেষে ১২১ জন চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

বৃদ্ধ এবং অসমর্থ পুরুষদিগের আশ্রম—এই বিভাগে ২৫ জন দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং অসমর্থ ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ৩ জনকে এই বিভাগে রাখা হইয়াছে।

অসমর্থা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের আশ্রম—আলোচ্য সনে ৭ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। আশ্রয় প্রার্থিনীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহার বিস্তারকল্পে একটী নূতন বাটী-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান ৪০০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

পক্ষাঘাত রোগী বিভাগে—এবার ১৪ জন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ জনের ব্যয়ভার "লছমী নারায়ণ পক্ষাঘাত রোগী তহবিলের" আয় হইতে বহন করা হইয়াছে।

দরিদ্র এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ধর্ম্মশালায়—১৯২ জনকে আশ্রয় এবং আহার দানে সাহায্য করা হইয়াছে। "চন্দ্রাবিবি ধরমশালা তহবিলের" বাৎসরিক আয় ২৭৩৲ টাকা যথেষ্ট না হওয়ায় অবশিষ্ট ব্যয় ভার সাধারণ তহবিল হইতে বহন করা হইয়াছে।

বালিকা শিক্ষা নিবাসে—মে মাস পর্য্যন্ত ২ জন এবং আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১ জন বালিকা ছিল। উক্ত বালিকাদ্বয় স্ত্রী বিভাগের অধ্যক্ষার অধীনে শিক্ষা লাভ এবং ঐ বিভাগের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয় এবং আউটডোর বিভাগ,—আলোচ্যবর্ষে ৪৯,৮৭৯ জন নূতন রোগী বাহির হইতে *আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব* বৎসর এই বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৪,৭৬৫। যে সকল পুরাতন রোগী একাধিকবার ঔষধ লইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা এবার ৮০,৫৫৩, পূর্ব্ব বৎসর ইঁহাদের সংখ্যা ছিল ৭১,২৪৬। (সেবাশ্রমের শিবালয়স্থিত শাখা দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীদের সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যা গুলির অন্তর্ভুক্ত)। আলোচ্য সনে তথায় নূতন রোগীর সংখ্যা ১৭,১০০ এবং পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৫১,৭৩৮ জন। উভয় চিকিৎসালয়ে একত্র দৈনিক রোগীর সংখ্যা এবার মোট ৩৫৬ এবং অস্ত্র চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩৯৪ জন।

আশ্রমের বাহিরে সেবাকার্য্য,—এই বিভাগে ১২০ জন অসহায় ভদ্রবংশীয় এবং দরিদ্র ও অসমর্থ পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে স্থায়ীভাবে অর্থদ্বারা মাসিক ও সাপ্তাহিক এবং চাল ও আটার দ্বারা সাপ্তাহিক সাহায্য করা হইয়াছে, এ জন্য বস্ত্র ও কম্বল ব্যতীত ২,১৩৯।৶১০ আনা এবং ১১৬৷৷৮ চাল ও আটা খরচ হইয়াছে। "অউধর চন্দ্র দাস দাতব্য তহবিলের" বাৎসরিক আয় ১৭৫৲ টাকা উপরোক্ত অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

সাময়িক ও বিশেষ সাহায্য,—এই বিভাগ হইতে ১০০৪ জনকে পাঠ্যপুস্তক, খাদ্য, পাথেয় প্রভৃতির দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

আয় ও ব্যয়,—আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে মোট আয় ৩৮,৭৩৩।/১ পাই, (স্থায়ী তহবিলের জন্য কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বাবদ প্রাপ্য অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত), মোট ব্যয় ৩২,৭০৯৷৷৬ পাই। গৃহ নির্ম্মাণ তহবিলে মোট আয় ১৪,২৫২৷৷৶৫ পাই, মোট ব্যয় ৮,১৪৭৷৷০ আনা এবং এন. সি. দাস ষ্টেট তহবিলে মোট আয় ৬০২৷৷৶৯ পাই এবং মোট ব্যয় ২৮০৸৴৩ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মান্দ্রাজ,—মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯৩৪ সনের *কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে* এই ঔষধালয় হইতে ৬৬৯২১ জন রোগীকে য়্যালোপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে নূতন রোগী ২৬৫৩৭ জন এবং অবশিষ্ট পুরাতন। অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে ২৫০১ জন রোগীকে। এই ঔষধালয়ের মোট আয় ৫৫৯১৲৯ পাই এবং ব্যয় ৪৫৪৬৷০ আনা এবং ইহার গৃহ নির্ম্মাণ বিভাগের মোট আয় ২২৩৪৪।৶১ পাই এবং ব্যয় ২২০৬৬।৴০ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবন, মান্দ্রাজ,—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবনের ১৯৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ছাত্রাবাসটী আলোচ্যবর্ষে ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের মেধাবী দরিদ্র বিদ্যার্থীদিগকে এই প্রতিষ্ঠানে রাখিয়া বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদান করা হয়। সম্প্রতি লোয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ৪০ জন, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৬২ জন, শিল্প-বিদ্যালয়ে ২৮ জন, ভারতীয় ভৈষজ্য বিদ্যালয়ে ১ জন, মেডিক্যাল কলেজে ১ জন এবং আর্ট কলেজে ২২ জন, মোট ১৫৪ জন ছাত্র এই

বিদ্যার্থী ভবনে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী শিল্প বিদ্যালয় এবং ৭২১৩ খানি পুস্তক ও অনেক দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা সম্বলিত একটী পুস্তকাগার আছে। গুরুকুলের আদর্শে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ছেলেদের হস্ত, হৃদয় এবং মস্তিষ্কের যুগপৎ উন্নতিবিধানের জন্য ক্রীড়া সঙ্গীত এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বিভাগে মোট আয় ৩১৫২৯.৫ পাই এবং খরচ ৩৯,৬৫১॥৵১১ পাই, ইহার গৃহনির্ম্মাণাদির জন্য মোট আয় ৬৩৮৮৯৶১ পাই ও খরচ ৫৭৮০৯৶২ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতাল, রেঙ্গুন (ব্রহ্মদেশ),—

আমরা রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালের ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই দাতব্য হাসপাতালের ইন্‌ডোর্ বিভাগে মোট ৩২৭৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন, আউটডোর বিভাগ হইতে মোট ৭৪৩১৮ জন নূতন এবং ৯৪৮৪২ জন পুরাতন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে এবং ৫২৭০ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। এই হাসপাতালে মোট ১২৮টী ইন্‌ডোর রোগীকে আশ্রয় দিবার স্থান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ৫৪১৪১৷৶১ পাই এবং মোট ব্যয় ৪৪২৪৬৸৵৯ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন (মথুরা),—

বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সনে এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটী অষ্ট-বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর্ হাসপাতালে ২৪ জন রোগী রাখিয়া চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগে মোট ৩৩৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং ইহার আউট্‌ডোর বিভাগ হইতে ১২১৩৩ জন নূতন এবং ২২০৬৮ জন পুরাতন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সেবাশ্রম হইতে ৪জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্থায়ী ভাবে এবং ৯জন দরিদ্র ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে মোট ১০৪॥৯ পাই নগদ সাহায্য করা হইয়াছে। ইহার মোট আয় ৯০৯৮ টাকা এবং মোট ব্যয় ৭৯৮০॥৵৩ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী-ভবন, বগুড়া,—এই ছাত্রাবাসটির দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী আমরা পাইলাম। বিগত ১৯৩৩ সনে ইহার জন্ম, প্রথমে স্কুলের ছয়টি ছেলেকে নিয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়, দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহাতে পনরটি ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। সুযোগ্য চারজন শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সর্ব্বদা যত্নবান আছেন। সহরের গণ্যমান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় চিকিৎসকগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতেই আশ্রমের প্রাণ নিহিত। প্রথম বর্ষে আশ্রমের আয় ১৫৫৪৵০ আনা এবং ব্যয় ১১৮৮১৬ পাই, এবং আলোচ্য বর্ষে আয় ২৩৫৪॥৯ পাই এবং ব্যয় ১৯৪৫৷৵৩ পাই হইয়াছে। ছাত্রদিগকে সর্ব্বসমেত মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। রিপোর্ট দৃষ্টে মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার পাল মহাশয়ের সাহায্য ও সহানুভূতির উপরই এই প্রতিষ্ঠানটী দাঁড়াইয়া আছে। এই শিশু প্রতিষ্ঠান শৈশব অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করুক ইহাই কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা (বিহার),—স্বামী বাসুদেবানন্দ

কিছুদিন হয় স্থানীয় থিয়সফিক্যাল হলে "অতিমানব শ্রীরামকৃষ্ণ", হরিসভায় "ভক্তি" এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে "ভারতীয় আচার্যগণ" শীর্ষক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রতি শনিবার তিনি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে "পাতঞ্জল দর্শন", স্থানীয় হরিসভায় প্রতি বৃহস্পতিবার "ভাগবত" এবং প্রতি রবিবার ঠাকুরবাড়ীতে "গীতা" ব্যাখ্যা করিতেছেন। সহরের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এই ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকেন।

ঢাকা, ময়মনসিংহ কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী,—গত জুলাই এবং আগষ্ট মাসে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ঢাকা, কলমা ও আউটসাহি (বিক্রমপুর), সোনারগাঁ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও চাঁদপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য বক্তৃতা দান করিয়া প্রত্যেক স্থানেই স্থানীয় জনমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগে কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে উক্ত স্বামীজি বিভিন্ন বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ঢাকা "আনন্দ-আশ্রম" কর্তৃক আহূত একটী সভায় সহরের শিক্ষিতা মহিলাগণকে লইয়া একটী পৃথক শতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সেন—

মৃদঙ্গাচার্য ভগবানচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২৩শে সেপ্টেম্বর পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার বাজসাহীর বসত-বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। "অখিলভারত সঙ্গীত সম্মেলনের" মৃদঙ্গ প্রতিযোগিতায় তিনবার তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীত-সাধক অবিবাহিত, চরিত্রবান ও সাধু ছিলেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান করিয়া ভজন-সঙ্গীত ও ধ্যান জপে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞে বঞ্চিত হইল। আমরা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

অগ্রহায়ণ—১৩৪২

"তোমরা ও তাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত, এদের বাস্তা অন্তর না হইলে পারে এক উপায় অবলম্বন সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উপরের অবস্থা, কেবল অবস্থাভেদে উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন ভেদ, বাস্তবিক সেই সব ভাব এক বস্তু বিষয়ক অর্থাৎ এক ও অভিন্ন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রহস্য-দেবতা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

হে আদিম বিশ্বের বিধাতা!
দৃশ্যমান জগতের—অস্তিত্বের ওগো জন্মদাতা,
স্পন্দিত মানব চিত্ত সীমাহীন রহস্য তোমার,
নয় সম নাহি আজ করিতে বিচার ও
কবির অন্তরে লেখা সাহিত্য দর্শন—
বিজ্ঞানের প্রশ্নপ্রাণে সঙ্কলিত 'তত্ত্ব' সম্মিলনে,
শাস্ত্রের জটিলতার প্রচারিত লক্ষ মতবাদ—
তর্ক-যুক্তি, বাক-বক্ষ, পদে পদে ঘটায় প্রমাদ।
হায়! তা'রা নাহি জানে বিচার বিজ্ঞান
তুমি নহ জ্ঞান কিম্বা বিজ্ঞান অধীন
তাই ওগো নির্ব্বিকার, নির্গুণ ঈশ্বর
সন্ধান মিলেনা তব মোহে মুগ্ধ বিশ্বচরাচর।

যে মহাকারণে তব চিত্ততলে জটিল কম্পন
প্রশ্নাতীত সত্তা মাঝে সিসৃক্ষার বিপুল ঈক্ষণ
সৃষ্টির আদিতে—
অতীন্দ্রিয় সে রহস্য কার সাধ্য পারেগো ভেদিতে ?
জ্যোতির্ময় মহাচক্র ঘূর্ণমান কোটী নীহারিকা
সেথা সৌর জগতের ভয়াবহ জন্ম বিভীষিকা
চলে নিরন্তর—
হেরি সেই মহাসৃষ্টি, চির মৌনী বিরাট অম্বর।
সে তো অতি তুচ্ছ ক্রিয়া তুমি তার রাখনা সন্ধান
আত্মভোলা উদাসীন শিব সম রয়েছ শয়ান
ক্রিয়াশূন্য হে পুরুষ—প্রকৃতির প্রাণের ঈশ্বর,
স্পন্দনের—অন্তরালে লীলা তব যুগ যুগান্তর।
প্রেমের পরশে তব ত্রৈগুণ্য মননা
প্রিয়তমা প্রকৃতির বক্ষে তাই এত উন্মাদনা।

মোরা প্রকৃতির শিশু মায়ামগ্ন দুর্বল সন্তান
একান্ত নির্ভরশীল রহস্যের রাখিনা সন্ধান
চেয়ে থাকি শূন্য মনে নির্বাক বিস্ময়ে
অসীমের নিরুদ্দেশে তুচ্ছ তৃকর্ণাপে হিনা ভবে।
মানস বলাকা নিতি উড়ে চলে সুদূর আকাশে
ফিরে আসে মর্ত্যে পুনঃ নিষ্ফল প্রয়াসে।
'নেতি', 'নেতি', মন্ত্রামন্ত্র মন্দ্রস্বরে বিরাট অম্বরে
কে যেন শুনায় জীবে সীমাবদ্ধ শঙ্কিত অন্তরে,
চূর্ণ করি অভিমান সসীমের ক্ষুদ্র অহংকার
ভাষাহীন স্তব্ধতায় মহাশূন্য জাগে চারিধার।
চিররুদ্ধ দ্বারে তব কোটি আত্মা উদাস পরাণে
আজো ডাকে বার বার অশ্রুভরা ব্যাকুল আহ্বানে
নিরাশায় ভগ্ন মনোরথ,
চির নিরুত্তর তুমি দেখালেনা কোথা মুক্তিপথ,
কাঁদে তাই সারা বিশ্ব কে শুনাবে মুক্তির বারতা
সুদুর্জ্ঞেয় লীলা তব হে গম্ভীর রহস্য দেবতা।

ব্রহ্মানন্দ সঙ্গমে

স্থান—শাঁখারীটোলা, কলিকাতা

"ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"—মোহমুদ্গরঃ ৫।

শ্রীশ্রীমহারাজ—পাপ পাপ ভেবে মন খারাপ করবে না, কেন না যত বড় পাপই লোকে করুক না, লোকের চক্ষেইত উহা বড়, ভগবানের দিক থেকে দেখতে গেলে, উহা কিছুই না। তাঁর এক কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে। Socetiy's discipline (সমাজের নিয়ম) রক্ষা ও লোককে পাপ পথ হতে নিবৃত্তি করবার জন্য অত সব পাপ ও গুরুতর শাস্তির কথা লেখা হয়েছে। কর্মফল অবশ্য আছেই। অন্যায় কাজ করলে তার জন্য অশান্তি প্রভৃতি মনে আসে। বৈষ্ণবদের ভজন প্রথা বেশ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ, এতে monotony (একঘেয়ে ভাব) আসে না। কিন্তু সখীভাবে থাকতে যে অনেকে মেয়েমানুষের মত করে কাপড় পরে, তাতে দেখা গেছে যে অনেকের পতন হয়।

প্র :—ভগবানে মতি গতি কিরূপে হয়?

উঃ—সাধুসঙ্গ ও তাঁহারা কি করেন লক্ষ্য রাখা, এবং তদনুরূপ জীবন যাপন, প্রশ্ন দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন। আর শুধু শুনলে কিছু হয় না, ব্রহ্মচর্য ও সাধন ভজন না করলে উপদেশ ধারণাই করতে পারে না। শাস্ত্র পাঠ করলেও বুঝতে পারে না। কথামৃত আদি বই পড়বে ও তাহা ধারণা করতে চেষ্টা করবে। যত পুনঃ পুনঃ পড়বে ততই তার নূতন নূতন অর্থ পাবে। সাধক ভগবান সম্বন্ধে শুনে, বুঝে, সাধনা করে অনুরূপ বোঝে—আবার সিদ্ধ হয়ে অন্যরূপ বোঝে। (জনৈক ভক্তকে) নাগ মহাশয় বলতেন প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজ কিন্তু ত্যাগ করা কঠিন। যে ত্যাগ করতে পারে সেই প্রকৃত সাধু। তাঁর আর একটি সুন্দর কথা "নঙ্গর ফেলে দাঁড় টানলে কি হবে?"

এমন দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়ে ভগবান লাভের চেষ্টা না করলে বৃথাই জন্ম। শঙ্করাচার্য বলেছেন "মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং ও মহাপুরুষ সংশ্রয়," অতি ভাগ্যবানেরই ঘটে।"

ঠাকুর ভক্তদের বলতেন "নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকবে—তা এক বৎসর, তিন মাস বা তিন দিনই হোক।

প্র :—আমাদের সাধু সঙ্গের উপর কি নির্জন সাধনের উপর, কোনটার উপর বেশী Stress (জোর) দিতে হবে?

উঃ—নির্জনে ধ্যান করতে বসলে মন সহজেই অন্তর্মুখী হয়, বাজে চিন্তা কম আসে। সাধুসঙ্গ কিন্তু সর্বদাই দরকার। একেবারে নির্জন বাস, একটু না এগুলে পারা যায় না। অনেকে একেবারে নিঃসঙ্গ হতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। তবে ঠিক ঠিক নিঃসঙ্গ, মন সমাধিস্থ—ভগবানে লয় না হলে হয় না। সাধুসঙ্গের একটা ফল, তাঁদের চরিত্র দর্শন—ইহাতে মন যতটা impressed (ছাপযুক্ত) হয়, ততটা বই পড়েও হয় না। অধর সেন একটি স্কুল সব্ ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এঁর প্রায়ই ভাব হত। ঠাকুরের নিকট আসবার একটু পরেই তিনি সমাধিস্থ হন। মুখে অমন হাসি, যেন ভিতরে আনন্দ ধরে না। অধরবাবু সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'তোমাদের ভাব দেখে আমার ভাবের উপর ঘৃণা হচ্ছিল। কেন না সাধারণতঃ বোধ হয় ভেতরে কত যাতনা। ভগবানের নামে কি যাতনা থাকে? কিন্তু এঁর ভেতর আনন্দ দেখে আমার চোখ ফুটল।

এঁর ভাবও তোমাদের ন্যায় দেখলে এখানে আর আসা হত না।"

আর একটি লোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট হতে ফিরে এসে ভাবছিলেন "ইনি কথা বলেন না, এঁর কাছে গিয়ে কি ফল?" অন্যদিন গিয়ে বসে দেখলেন স্বামিজী অত্যন্ত আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, কতক্ষণ পরে আবার খুব হাসি। ইহা দেখে লোকটি আবার ভাবছেন "আজ যা শিখলুম, সহস্র পুস্তক পাঠেও তাহা হয় না। ভগবানের জন্য যখন এমন ব্যাকুল হব, তখনই তাঁর দেখা পাব, আবার তাঁর কৃপা লাভ করলে এমন আনন্দ ভোগ করব।

প্রঃ—মহারাজ অনেকের বিশ্বাস, সাধুদের কাছে গেলে যথেষ্ট কিছু শুনবার দেখবার দরকার হয় না।

উঃ—ও কথা শুনবে না, সাধুদের নিকট হতে নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করে নিতে হয়। আর তাঁদের কার্যাকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে তদনুরূপ নিজের জীবন গঠন করতে হয়। বুঝতে পারলে ত?

প্রঃ—মহারাজ, আপনি বলেছিলেন হাঁক-পাকানিতে কিছু হয় না, সময় না হলে কিছুতেই কিছু হবে না, তবে কি ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুলতা ছেড়ে দিতে হবে?

উঃ—ও হয়ত অন্যপ্রসঙ্গে বলেছিলাম। হাঁকপাকানি মানে ২।১টি emotion (ভাবপ্রবণতা) বশে খুব ছটফটানি, কান্নাকাটি, ভেতরের ভাবের বহির্বিকাশ, উহা কিন্তু ২।১ দিন পরেই লোপ পায় ও সে তখন নৈরাশ্যে, অবসাদে ওদিক একেবারে ছেড়ে দেয়।

প্রঃ—ঠাকুর যেমন বলেছেন, একবার এখানে আরবার ওখানে কূয়ো খুঁড়তে গেলে কোথাও জল পাওয়া যায় না।

উঃ—হাঁ ঠিক সেই রকম লেগে থাকতে হয়। ঠিক ঠিক অনুরাগ থেকে যদি ভগবানের জন্যে হাঁকপাকানি হয় তবে তাতে সে, ভগবান লাভ না হলেও, তাঁকে ভুলে থাকতে পারে না। কোটি জন্মে না পেলেও তাঁকে অচল অটল ভাবে ডাকতে থাকে। স্বামিজী বলতেন "কুলকুণ্ডলিনী একটা জায়গা বড় ভয়ানক।" ও উপরে না উঠলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি ভয়ানক প্রবল হয়, এজন্য বৈষ্ণবদের মধুরভাবে, সখীভাবে সাধন বড় dangerous (বিপদজনক)। রাতদিন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার লীলার কথা স্মরণ করতে গিয়ে আর কাম চেপে রাখতে পারে না, আর নানারূপ ব্যভিচার করে। এজন্য প্রথম প্রথম ওসব রাসলীলা বিষয়ক বই পড়তে নেই। ধ্যান করা কি সোজা কথা একটু বেশী খেলে ত সেদিন আর মন বসল না। এইরূপে কাম ক্রোধ সবগুলি রিপুকে চেপেচুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান সম্ভব হয়। এদের যেকোনটা জোর করলেই আর ধ্যান হবে না। দু পয়সা ঘুটে কিনে জ্বালিয়ে তার ভিতর বসা ত খুব সোজা। কাম ক্রোধাদি রিপুগুলি দমন করে রাখা, ওদের expression (বাহিরে অভিব্যক্তি) না দেওয়াই ত তপস্যা। নপুংসকের কি ধর্ম্ম হয়? কাম ও কামনাদি দমনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সংসারের লোকে কত কি ভয়ানক পাপ করে। মনে ২।১টা খারাপ ভাব উঠলে তত দোষ হয় না। মন থেকে এগুলি টেনে ফেলে দেবে। ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না। আবার মন স্থির না হলেও ধ্যান হয় না। অতএব মন স্থির হলে তবে ধ্যান করব, এরূপ ভাবলে তার আর কখনও ধ্যান হয় না। দুটোই এক সঙ্গে চালাতে হবে।

প্রঃ—মহারাজ, ব্যাকুলতা কিসে হয়?

উঃ—সৎসঙ্গে, গুরুর উপদেশে মন শুদ্ধ হলে তখন সাধন ভজন করতে করতে তবে ত হবে? সংসারে এমন কি চুরি করতে পর্য্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়, আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গুরুর দরকার নেই? সাধুর কাছে এলে

জিজ্ঞাসা কিছু কর্তে হয়। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর।

প্রঃ—কিসে শান্তি পাওয়া যাবে?

উঃ—ভগবানে প্রেম হলেই শান্তি হয়।—আর ঠিক ঠিক বিশ্বাস না হলে কি প্রথমেই শান্তি হয়? প্রথমে অশান্তি, ব্যাকুলতা, ভগবানকে পাচ্ছি না বলে যন্ত্রণা, যেমন যত পিপাসা ততই জল মিষ্টি লাগে। অশান্তি খুঁচে তুলতে হয়। সংসারের ভোগে যখন আর লোকে সুখ পায় না তখন অশান্তি ও তাঁর উপর টান হয়।

প্রঃ—প্রেম কিসে হয়?

উঃ—তাঁর সাধন, ভজন, প্রার্থনা, এইরূপে সকলেই পেয়েছে।

প্রঃ—সংসারে থেকে হয় কি না?

উঃ—সংসারের বাহিরে কেউ আছে?

প্রঃ—না। আমি বলছি পরিবারের মধ্যে থেকে।

উঃ—তাই বলুন। হয়, তবে কষ্টে।

প্রঃ—সংসারে বৈরাগ্য হলে বেরুতে পারবে কি না?

উঃ—উচিত। তার নামই বৈরাগ্য, তাই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য। ঠিক ঠিক্ বৈরাগ্য একবার হলে, যেমন আগুন আর নিবে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়ে। ঠাকুর উপমা দিতেন "যেমন পুকুরের মাছ, বাইরে গেলে প্রাণ যায়, তেমনি সংসার থেকে লোক কি আর আসতে চায়।

প্রঃ—গুরু ছাড়া কি হয় না?

উঃ—আমার বোধ হয়, হয় না। কিছুতেই হয় না। গুরু মানে যিনি ইষ্টের পথ—যেমন কোন নাম দেন। উপগুরু অনেক হতে পারেন। সদ্গুরুই বলে দেন "এই এই সাধন কর ও সৎসঙ্গ কর।" পূর্ব্বে নিয়ম ছিল গুরু গৃহে বাস। তিনি watch (লক্ষ্য) করতেন, শিষ্যও সেবা কর্তেন। শিষ্য বিপথে গেলে ফিরিয়ে আনতেন। সেজন্য ব্রহ্মবিদ্ বা উচ্চ সাধক ভিন্ন গুরু করবে না।

প্রঃ—কি করে চিনব?

উঃ—কিছুদিন সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌লেই চিন্‌তে পারবে। গুরু ও শিষ্যকে দেখবেন। খুব বিষয় বাসনা থাকলে যাকে সহজে ফিরাতে পারবে না তাকে মন্ত্র দিবে না, ফিরিয়ে দিবে। যাকে গুরু পছন্দ করবেন, তার কাছে কাছে থাকবেন ও watch (লক্ষ্য) করবেন। কুলগুরুর এক advantage (সুবিধা) এই যে, সে বংশের সব খবর রাখে।

মন একাগ্র করবার উপায়—সাধন, ভজন, ধ্যান, ধারণা। প্রাণায়ামও উপায়। তবে সংসারীর পক্ষে safe (নিরাপদ) নয়। বীর্য্য স্খলন হলে ব্যারাম হয়। তাহার ভাল উত্তম স্থান, বিশুদ্ধ বায়ু এই সব চাই। আর ধ্যান ধারণার condition (নিয়ম) নাই। ধ্যানের জন্য নির্জ্জন অভ্যাস করতে হয়। একদিনে এক ঘণ্টায় নয়। যত করবে তত হবে। যেখানে যাবে ভালস্থান, ভাল scenery (দৃশ্য) দেখলেই বসে যাবে। তাঁকে খোঁজ, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। আগে ভেতরে ত্যাগ। এসব অনিত্য এ থেকে মন তুলে নেবে। সাকার, নিরাকার, তার পার। বেদান্তের ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎটা আমরা যেমন দেখছি, তা সব মিথ্যা। সমাধিতে জগৎ থাকে না, যেমন সুষুপ্তির পর মনে হয় বেশ আনন্দে ছিলাম। যখন নেবে আসেন, যেমন ঋষিদের, তখন experience (অভিজ্ঞতা) বলে কেবল আনন্দ, আর কথাতে তা explain (বুঝান) করা যায় না। তখন, আমি তুমি থাকে না, কেবল সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বর আছেন, যদি বল প্রমাণ কি?—সাধুরা বলছেন, "আমরা পেয়েছি তোমরাও এরূপে পাবে।" ঠাকুর বলতেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি করলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আন, ঘেঁটে খাও, আবার তারপর একটু অপেক্ষা কর তবে ত নেশা হবে। তেমনি শুধু ভগবান ভগবান বল্লে হবে না—সাধন কর, তারপর আশায় অপেক্ষা কর।"

ক্লেশহেতু ও হানোপায়

স্বামী বাসুদেবানন্দ

আমরা বিগত ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠে "অসমাধি মনের ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাতে দেখান হয়েছে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলই চিত্তের বৈশারদী প্রজ্ঞা লাভের অন্তরায়। চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশে তা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তখন তার একটা পৃথক সত্তা (বেদান্ত মতে) থাকে না—শুদ্ধ আত্মাই থেকে যান, অপরাপর মতে তারা শক্তিভাব প্রাপ্ত হয়। এই উভয় মতের বিবাদ আমাদের এখানে আলোচ্য নয়।

দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বাদীরাই স্বীকার করেন যে অন্তঃকরণের সূক্ষ্মক্লেশ সকলও প্রতি-প্রসবের (চিত্তলয়ের) সহিত হেয় (নাশ) হয়। প্রতি-প্রসব হয় কি করে, না প্রসংখ্যান নামক জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের সংস্কার যখন ভর্জ্জিত বীজের মত জননশক্তি হীন হয়ে পড়ে, অর্থাৎ আত্মদর্শন হলেই দেহ ও চিত্তের ওপর যে আমাদের মমত্ব বুদ্ধি রয়েছে তা আপনি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে, পরে নাশ হয়ে যায়। প্রথম বৈরাগ্য ভাবনায় রাগ বা সুখাসক্তি নাশ পায়, দ্বিতীয় অদ্বেষ ভাবনায় হেয় দ্বেষ নাশ পায় এবং তৃতীয় আত্মভাব ভাবনায় অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয় দূর হয়। এই সব বিদ্যা-প্রত্যয়ের পেছনেও 'অস্মিতা' বা আত্মার 'অহং' উপাধি আছে। এই উপাধিকে বলে সূক্ষ্মক্লেশ—স্বস্বরূপ দর্শনে চিত্তবৃত্তি লয় পায়—চিত্তবৃত্তি লয়ের সহিত সূক্ষ্মক্লেশও লয় পায়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মক্লেশের এলাকা—এখন হতেও জাতি, আয়ু ও ভোগ পুনরায় প্রসব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাসে আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিত এ সম্বন্ধও নাশ পায়।

অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্মক্লেশ সকল হতে যে সকল স্থূল ক্লেশ-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, সেগুলিকে ধ্যানের দ্বারা নাশ করতে হয়। ভাষ্যকার ব্যাস বলছেন, "একখানা ধূলোকাদা মাখা কাপড় পরিষ্কার করতে হলে যেমন প্রথম জলে ধুয়ে তার ধূলো কাদা পরিষ্কার করতে হয়, পরে উপায় ও যত্নের দ্বারা তার সূক্ষ্ম ময়লা গুলো নাশ করতে হয়, ঠিক তেমনি ধ্যান দ্বারা কাম ক্রোধাদি স্থূল ক্লেশ এবং প্রসংখ্যান (চিত্ত নিরোধ) দ্বারা সূক্ষ্ম অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ ত্যাগ করা উচিত।

ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় ২ রকম—(১) দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও (২) অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। আশয় মানে সংস্কার। ধর্ম্মাধর্ম্মভেদে সংস্কার ২ রকম, অথবা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, অথবা সবীজ ও নির্ব্বীজ ভেদে দ্বিবিধ। সবীজ আবার ২ রকম —অজ্ঞানমূলক ও প্রজ্ঞামূলক। কর্ম্মাশয়ের ফল বা বিপাক তিন রকম—জাতি, আয়ু ও ভোগ। কিন্তু বাসনা ছাড়া কর্ম্মসংস্কার (আশয়) ফল (বিপাক) প্রাপ্ত হয় না। এখন এই ফল কখনও দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় অর্থাৎ এই জন্মেই ভোগ হয় অথবা অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় বা পরের কোনও জন্মে ভোগ হয়। কতক পরিশ্রমের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল আমরা এই জন্মেই পেয়ে থাকি। কতক অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় বলে বোধ হয়, কিন্তু এ জন্মেও তা ফলতে পারে। ভাষ্যকার ব্যাস বলেন, "তত্র তীব্র সংবেগেন মন্ত্র তপঃ সমাধিভিঃ নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানু-ভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরি-

·চ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র ক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপ-কর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে।” (পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ ১২শ সূত্র)।—অর্থাৎ অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মের মধ্যে, যেগুলি তীব্র বৈরাগ্যের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি, অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভবদের আরাধনা হতে নিষ্পন্ন যে পুণ্যকর্ম্মাশয় তা সদ্য পরিপাক বা ফল দান করে। আবার তীব্র অবিদ্যা মোহবশতঃ ভীত, ব্যাধিত, দীন, বিশ্বাসী, মহানুভব বা তপস্বীদের প্রতি পুনঃ পুনঃ অপকার করলে যে পাপ কর্ম্মাশয় হয় তাও ইহজীবনে সদ্যই পরিপাক বা ফল প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে আবার যারা নরক ভোগ করছে, তাদের দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নেই এবং যাঁরা জীবন্মুক্ত তাঁদের অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় নেই। তার হেতু এর পর বলা হচ্ছে।

প্রাকৃত জাতি চার রকম—দিব্য, নারক, মানুষ ও তীর্য্যক্। পশুতীর্য্যকাদি শরীরের কর্ম্মফলের ভোগ হয় না, কারণ সেখানে তাদের শরীর ও মনের স্বাধীনতা নেই বল্লেই চলে। কারণ, ঐ সব দেহ অসৎকর্ম্ম ফল ভোগ স্থল। দেবশরীরও তাই কারণ দেবশরীর সৎকর্ম্মের সাত্ত্বিক ফল ভোগ স্থল। দৃষ্ট জন্মবেদনীয় পুরুষকার দেবশরীরে সাধারণতঃ থাকে না বলে, তাঁরাও পরাধীন, সেই জন্য দেবশরীরস্থ কামভোগের ফল নেই—মাত্র সেখানে পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু তবুও দেবশরীরে নহুষের দৃষ্ট-জন্মবেদীয় অসৎকর্ম্মের ফলভোগ দেখা যায়। তা ছাড়া ছান্দস লোকস্থ (জন, তপঃ ও সত্য) দেবঋষিগণের সমাধি দ্বারা ক্রমমোক্ষমার্গে অগ্রসর শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু ভুবঃ (পিতৃ), স্বঃ (মাহেন্দ্র) ও মহঃ (প্রাজাপত্য) লোকস্থ দেবগণ পরাধীন সাত্ত্বিক সুখ ভোগ করে, “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।” ভবিষ্যতে এই সব দেবনিকায় (শরীর) সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাবে।

• এই সব ভব বা জন্মের হেতু হচ্ছে অন্তঃকরণে ক্লেশমল সংস্কার থাকলেই তার বিপাক বা ফল হবে তিন রকমে:—(১) জাতি—দেব, মানুষ, পশু প্রভৃতি, আবার মানুষের মধ্যে দেখা যায় ধনী, দরিদ্র, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক প্রভৃতি, সর্ব্ব জাতির মধ্যে এইরূপ নানাবিধ ভাল মন্দ অবস্থা আছে, (২) আর হচ্ছে দেহের স্থিতি কাল; এবং (৩) ভোগ—সুখ অথবা দুঃখ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সদসৎ কর্ম্মসংস্কার জড়, সে কি করে যথা নিয়মে, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে জীবের ভাগ্য নিয়ন্তা রূপে কর্ম্মফল বিধান করবে? যদি বল কর্ম্ম শক্তিতে—তা হতে পারে না, কারণ কর্ম্মের চৈতন্য নেই, সে জড়েরই তুল্য। যদি বলা যায় দ্রব্যস্বভাব—তাও হতে পারে না, কারণ দুটি বিভিন্ন দ্রব্য যদি পাশাপাশি রাখা যায়, যদি কোনও চেতনদ্বারা তারা প্রেরিত না হয়, তা হলে মাত্র তাদের স্বভাবের দ্বারা কোনও কাজ হতে পারে না। চেতন মানুষদ্বারা প্রেরিত না হলে দুধের দধি জনন শক্তি অপ্রকাশিতই থেকে যায়। চেতন গাভীর দ্বারা অধিষ্ঠিত না হলে, অচেতন ঘাস জলাদি দুগ্ধে পরিণত হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে যে কর্ম্মফলের ওপর জীব চৈতন্যের কোনও হাত নেই, তা হলে আর কেউ স্বেচ্ছায় দুঃখ ফল ইহ বা পর জন্মে ভোগ করত না। কাজে কাজেই সর্ব্বজীবের ও জগতের সমষ্টি-কর্ম্মের ফল-দাতা সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ঈশ্বর চৈতন্যকেই স্বীকার করতে হয়। আর যদি বলা যায় অদৃষ্ট কিন্তু তাও যদি জড় হয়, তা হলে তার দ্বারাও কোন জাগতিক বিধান সম্ভব নয়, আর যদি অদৃষ্ট চেতন হন, তা হলে তিনিই আমাদের ঈশ্বর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, (১) একটি কর্ম্মাশয় কি একটি জন্মের হেতু?—না তা হতে পারে না, কারণ

একটি জন্ম এত জটিল ও বহু ভাবের সমষ্টি যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে, তা কখনও একটি সংস্কার হতে সম্ভব নয়, (২) একটি কর্ম্মাশয় কি বহুজন্মের কারণ, না পূর্ব্বোক্ত কারণে তাও সম্ভব নয় এবং তা ছাড়া অসংখ্য কর্ম্মহেতু এবং প্রত্যেক কর্ম্মের অসংখ্য পরিণাম হেতু, সকল কর্ম্মের বিপাকেরই (ফল) অবসর হবে না, (৩) সেইরূপ একটি কর্ম্ম একটি জন্মকেও নির্বর্ত্তিত করতে পারে না, কারণ একই জন্মে নানাবিধ ফল ভোগ দেখা যায়, সেইজন্য তাদের মূলেও নানাবিধ কর্ম্ম আছে বুঝতে হবে, (৪) আবার অনেক কর্ম্ম যুগপৎ অনেক জন্ম সৃষ্টি করতে পারে না। তবে শোনা যায় যোগীরা সংস্কার-শক্তি হীন-প্রায় নির্ম্মাণ চিত্ত দ্বারা যুগপৎ বহু শরীর অবলম্বনে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করেন। (৫) কাজে কাজেই বলতে হয়, বহু কর্ম্মাশয় একটি জন্ম সংঘটন করায়।

এই ফলোন্মুখ কর্ম্মসংহতির ফলের শক্তি অনুযায়ী কালিক স্থায়িত্বই হচ্ছে আয়ু এবং ফলোন্মুখ কর্ম্মসংহতির প্রবৃত্তির সফলতার উপযোগী অধিকরণ বা দেহই হচ্ছে জাতির নির্দ্ধারক। একই জন্মের বহু কর্ম্ম একত্রিত হয় (এক-ভবিক) যে পরবর্ত্তী জন্ম সৃষ্টি করে তা বলা যায় না। দু তিন জন্মের পূর্ব্বেকার কর্ম্মসংস্কারও বর্ত্তমান জীবনে সুপ্ত থাকতে পারে, যা পরবর্ত্তী জীবনে, বর্ত্তমান জন্মের কোনও কোনও কর্ম্মসংস্কারের সহিত ফলোন্মুখ হয়ে পড়তে পারে। দৃষ্ট-জন্ম-বেদনীয় যে ফল তার জন্য আর নূতন জাতি বা দেহান্তর প্রয়োজন নেই। তবুও ইহজন্মে একজন হয়ত ব্যবসা করে বড়লোক হলো, তখন, সে "বোদ্দর' জাতি, আর সব "অবোদ্দর।" দৃষ্ট জন্মের মধ্যে আবার একটি কর্ম্মের বা বহু সংহতি-কর্ম্মের ফলও পাওয়া যায়। তবে জীবন-ক্রিয়া আমাদের এমন জটিল যে নিছক "একটি কর্ম্ম" বলে কিছু আছে বলে বোধ হয় না। আর ফল যখন ফলে, তখন কোনও একটি মাত্র জন্মকে অবলম্বন করে; কিন্তু তার পেছনে থাকে অনাদি জন্মের সংস্কার ও তার উত্তেজক বাসনা। ফল আবার কতকগুলো সম্পূর্ণ ফলে,—সেগুলো হলো নিয়ত-বিপাক, আর যেগুলো প্রতিবাধা হেতু বা তপস্যা হেতু বা ঈশ্বর কৃপা হেতু সম্পূর্ণ ফলবান না হয়, তা হলো অনিয়ত বিপাক। একটি প্রবল বা প্রধান কর্ম্ম তার বিরুদ্ধ অপ্রধান বা ক্ষুদ্র কর্ম্মের বাধা স্বরূপ। আবার অবিপক্ক কর্ম্মের নাশ হতে পারে,—যেমন সঞ্চিত পাপ-সংস্কার পুণ্যের দ্বারা অথবা সঞ্চিত পুণ্য সংস্কার পাপের দ্বারা। যেমন দেহের পবিত্রতা কামের দ্বারা নাশ পায়, আবার মনের অপবিত্রতা ক্রোধ—প্রীতির দ্বারা নাশ পায়, চিত্তের আসক্তি জ্ঞানবিচারে নাশ পায়, আবার চিত্তের শুষ্কতা রসোবিচারে নাশ পায়। কিন্তু ঈশ্বর এবং অবতার পুরুষেরা কপাল মোচন, তাঁদের কৃপায় জীব কর্ম্মাবর্ত্ত হতে নিস্তার পেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আমি ফরাসডাঙ্গা।' অর্থাৎ যেমন ইংরেজের পুলিশ ফরাস ডাঙ্গায় কিছু করতে পারে না, সেইরূপ যমের দূতেরাও শ্রীরাম-কৃষ্ণের আশ্রয় নিলে কিছু করতে পারে না। যমের দূত মানে কর্ম্মফল-নিয়ামক শক্তিসকল। শুক্ল কৃষ্ণাদি কর্ম্ম-স্বভাব সম্বন্ধে আমরা পরে আরও কিছু আলোচনা করব। তবে সংক্ষেপে জাতি, আয়ু এবং ভোগ যদি পুণ্য বা শুক্ল-কর্ম্মহেতু হয়, তা হলে তা সুখ দান করে, আর যদি অপুণ্য বা কৃষ্ণ-কর্ম্ম হেতু হয়, তা হলে দুঃখ দান করে। যম নিয়মই পুণ্যকর্ম্ম এবং কাম ক্রোধাদিই অপুণ্য কর্ম্ম।

পতঞ্জলি যোগদর্শনের সাধনপাদের ১৫ সূত্রে বলছেন, "পরিণাম, তাপ, সংস্কার রূপ দুঃখ হেতু এবং গুণবৃত্তি সকলের পরস্পর বিরোধ হেতু বিবেকী পুরুষের নিকট সবই দুঃখময়। কোন বিষয়ে রাগ বা আসক্তি হেতু ভবিষ্যতে আমরা দুঃখের ভাগী হই। আর বর্ত্তমানে দ্বেষ হেতু অর্থাৎ যা চাই না তার সংস্পর্শ হেতু, আমরা "তাপ-দুঃখ" ভোগ করি।

আর অতীতের কৃত কর্ম্মাশয় হেতু যে দুঃখ তাকে বলে 'সংস্কার দুঃখ।" এ হলো মণি প্রভাটীকাকারের মত, কিন্তু ভাষ্যকার ব্যাস বলেন, "সুখের বাসনা থেকেই রাগের উৎপত্তি হয়, সেইজন্য রাগ কালেই সুখ, কিন্তু পরিণামে তা দুঃখময়। হেয় বা অপ্রিয় বস্তু দ্বেষ কালে (অর্থাৎ বর্ত্তমানেও) দুঃখ এবং ভবিষ্যতে তার সংস্পর্শে এলেও দুঃখ। আর অতীতের কর্ম্মজন্য সংস্কার—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—উভয়েই দুঃখময়।

গুণ হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এরা কেউ কাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না,—একে অপরের আশ্রয়, এক হতে অপরের জন্ম হয়, কাজেকাজেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সবই সুখ (সত্ত্ব), দুঃখ (রজঃ) ও মোহের (তমঃ) মিশ্রণ। প্রকৃতি-বিকার বুদ্ধির দুইরূপ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই আটটি বিপরীতমুখী রূপ এবং বৃত্তি হচ্ছে শান্ত ঘোর ও মূঢ় এবং এই গুণ বৃত্তি সদাই চল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। কাজেকাজেই সুখ দুঃখ মোহের ঘাত-প্রতিঘাত নিরন্তর চলেছে, সেইজন্য বিবেকবান মানুষের কোনও সুখেই সুখ বোধ করেন না। ভাষ্যকার ব্যাস বলেন, "স্থূল মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম দুঃখ বোধ করবার সামর্থ্য নেই, পরন্তু যোগীর সে অনুভবও তীব্র। একটা মাকড়সার জালের এক কণিকা গায়ে পড়লে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু চোখে পড়লে তীব্র যন্ত্রণা হয়।' কেউ প্রচণ্ড আঘাত পেলেও তখনই ভুলে যায়, আর কারও পক্ষে একটা বিসদৃশ কথা বা দৃষ্টিই যথেষ্ট। অবশ্য, ব্রহ্মস্থিত লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

এই দুঃখের নাশ হেতু, ভাষ্যকার বলছেন, 'চিকিৎসা শাস্ত্র যেমন চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগ-হেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য—সেইরূপ মোক্ষশাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—দুঃখ, দুঃখ-হেতু, অবিদ্যাদি দুঃখহান (মোক্ষ) ও হানোপায় (সাধন)।

যা অনাগত দুঃখ তা পরিত্যাজ্য বা হেয়। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে দ্রষ্টা বা পুরুষ এবং দৃশ্য বা প্রকৃতির সংযোগহেতু সকল অনাগত দুঃখের উৎপত্তি হয়। দৃশ্য যেন অয়স্কান্ত মণি বা চুম্বক এবং দ্রষ্টা যেন লৌহ। দৃশ্যের সন্নিধি মাত্র দ্রষ্টাতে বিকার উপস্থিত হয় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণের বৈষম্য হেতু অবিবেক উপস্থিত হয়। এই অবিবেকই সমস্ত অনাগত দুঃখের হেতু। প্রকৃতি ও পুরুষের যে সংযোগ, তা দৈশিক (spatial) সংযোগ নয়—এ স্ব-স্বামি-ভাবরূপ অহং প্রত্যয়গত সন্নিকর্ষ। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে বহু পুরুষ অবিবেক বশতঃ—'আমি প্রকৃতির জ্ঞাতা, ভোক্তা'—এইরূপ ভাব উপস্থিত হয়। আর প্রকৃতি এক—কিন্তু "সাধারণ"। তত্ত্ব কৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যের "সাধারণ" শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যায় উদাহরণ দেন, যেমন একই নর্ত্তকী নৃত্য করে, কিন্তু বহুদর্শক তা দর্শন বা উপভোগ করে, তেমনি এক প্রকৃতিরূপ দৃশ্যকে বহু পুরুষ সুখ দুঃখ রূপে ভোগ করেন।

কিন্তু বেদান্ত মতে পুরুষ এক। প্রকৃতি তাঁর ঈক্ষণ, ইচ্ছা বা কল্পনা। আমরা যেমন নিজের কল্পনার বহুধা বিভক্ত হয়ে মগ্ন হই—এক 'আমি' কে কল্পনায় বহুধা বিভক্ত করে, স্বপ্ন রচনা করি—তেমনি বিশ্ব সেই আদি-কবির কাব্য সৃষ্টি—তাঁর মগ্নতার রূপ। এক পুরুষ আছেন আর তাঁর এক ঈক্ষণ শক্তি আছে। এই ঈক্ষণ শক্তি তার দেশ-কাল নিমিত্তরূপ উপাধির মধ্য দিয়ে সেই অখণ্ড পুরুষকে বহুধা বিভক্ত করে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির এই চলচ্চিত্র (movies) দেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সেই অখণ্ড পুরুষের এক এক ব্যষ্টিরূপ তার উপাধিকে ত্যাগ করে যেই স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করছে, আর অমনি সেই—সৎ কি অসৎ বোঝবার যো নেই—অনির্ব্বচনীয়া মায়া শক্তি, যার দ্বারা উপাধিযুক্ত দ্রষ্টা বা অহং

এই বিশ্বের প্রতি সীমার পরিমাপ করছিল, কোথায় যে অন্তর্হিত হন, তার ঠিকানা আজ পর্য্যন্ত কেউ নির্দ্দেশ করতে পারে নি। ব্যষ্টি জীবের মায়োপাধি অতি স্থূল, তাই তার স্ব-স্বরূপকে জানবার সত্য-দৃষ্টি প্রতিহত—সে তাই মায়াধীন। আর সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভের সত্ত্ব-প্রধান-উপাধি স্বচ্ছ, সেই জন্য তাঁর স্ব-স্বরূপের স্বানুভূতি প্রায় অপ্রতিহত—তাই তিনি মায়াধীশ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে পুরুষ বহু, কিন্তু সৎ ও চিৎ স্বরূপ। আত্মার অস্তিত্ব এবং জ্ঞান আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি এ সম্বন্ধে মোটামুটি যুক্তি এই, আমি না থাকলে, আমার বোধ হচ্চে কেন, এই জগৎই বা কার কাছে রয়েচে। আবার আমার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে অস্তিত্বের জ্ঞানও রয়েচে আমার কাছে। জগতের প্রত্যেক বস্তুকে আমি জানচি, অতএব পুরুষ সচ্চিৎ। তাঁরা বলেন, সত্ত্বের প্রাচুর্য্যে পুরুষকে আনন্দময় বলে বোধ হয়, আনন্দটা অবিবেক হেতু সত্ত্ববিকৃতি এবং পুরুষে আরোপিত ধর্ম্ম।

কিন্তু বেদান্তীরা বলেন, অস্তিত্ব এবং জ্ঞান যেমন পরস্পর অবিনাভাবে অবস্থিত তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দও পরস্পর অবিনাভাবে অবস্থিত। জ্ঞান যত উপাধিগত বা অসম্যগ্ দর্শন হেতু হবে, আনন্দের অনুভবও তত ক্ষীণ হবে। আবার জ্ঞান যত বিশুদ্ধ হবে আনন্দও তত পরিস্ফুট হবে। সত্তা, জ্ঞান এবং আনন্দ যেন একটি ত্রিভুজের তিনটি দিক—যেমন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ ঈশ্বরেক্ষণরূপা প্রকৃতির তিনটি দিক্। দৃশ্য বা প্রকৃতি হচ্চে—প্রকাশ (সত্ত্ব), ক্রিয়া (রজঃ) ও স্থিতিশীল (তমঃ)। মাত্র ক্রিয়া হলো রজোগুণ, এই ক্রিয়া যখন জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন সেটি তার সত্ত্ব ভাব, আর সত্ত্ব ও রজোগুণের যা রুদ্ধাবস্থা তা হলো স্থিতিশীলতা বা potentiality, বীজের মধ্যে জননশক্তি রূপে যে বৃক্ষের নিদ্রা তা হলো তার তমঃ ভাব, আর অঙ্কুরিত হবার যে উদ্যম বা জাগরণ, তাই হলো বৃক্ষের রজো ভাব, আর বৃক্ষাকারে যে জ্ঞান-গ্রাহ্য ভাবে বৃক্ষের শক্তি-পরিণতি তাই হলো বৃক্ষের সত্ত্ব ভাব।

এই অনাত্ম পদার্থ—প্রধান (অবিকৃত ভাব) বা প্রকৃতি (বিকৃত ভাব) দু ভাগে বিভক্ত—(১) গ্রাহ্য বা ভূত বা বিষয় এবং (২) গ্রহণ—বাহ্য এবং অন্তরেন্দ্রিয়। এই গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ও এই তিনগুণের প্রকাশ। যেমন কর্ণেন্দ্রিয়কে ধরা যাক্—ধ্বনিজ্ঞান হলো কর্ণেন্দ্রিয়ের সাত্ত্বিক ভাব, স্নায়বিক কম্পন হলো তার রজোভাব এবং শব্দ জ্ঞানশক্তি যখন স্নায়ু এবং পেশীতে সুপ্ত থাকে, তখন হলো কর্ণেন্দ্রিয়ের তমো ভাব।

ভূত ও ইন্দ্রিয় হচ্চে মূল দৃশ্যের বিকার। এই উভয়ের সংযোগে আমাদের সকল আপেক্ষিক জ্ঞান হয়—(১) গ্রহণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বেদন। (২) ধারণ—সমস্ত অনুভূত বিষয়ের বা সংস্কারের চিত্তে সংরক্ষণ। (৩) ঊহ—কোন জ্ঞানোদ্দেশ্যে ঐ বিষয়ক সাধারণ সংস্কারগুলির স্মরণ। (৪) অপোহ—উহার মধ্যে প্রয়োজনীয়গুলি গ্রহণ এবং অপরগুলি ত্যাগ। (৫) তত্ত্বজ্ঞান—বিভিন্ন ভাবসমূহের একই ভাবাধিকরণ্য বা এক দ্রব্য-নিষ্ঠতার জ্ঞান। (৬) অভিনিবেশ—এর ফল প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। (এ সম্বন্ধে ১৩৩৯,৩৫ বর্ষের উদ্বোধনের চৈত্র সংখ্যায় খুব ভাল করে আলোচিত হয়েচে)। এই ভূত এবং ইন্দ্রিয়ই হচ্চে পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গের সাধন। পুরুষ-প্রকৃতিকে এক বোধে যে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি, তাই হলো ভোগ হেতু এবং পুরুষকে যখন প্রকৃতি হতে পৃথক ভাবে জ্ঞান হয়, তখন সেই প্রকৃতিই পুরুষের অপবর্গের হেতু হন।

কিন্তু বেদান্ত বলেন, 'এই পুরুষ যদি ভোক্তা হন, আর প্রধান যদি নিত্য পদার্থ হয়, তা হলে

মুক্তি অসিদ্ধ হয়। কারণ ভোক্তার ভোগ্য যতদিন থাকবে, ভোগও ততদিন থাকবে, নচেৎ, মুক্তিকালে ভোক্তাকে প্রকৃতির বাইরে এমন জায়গায় যেতে হবে যে যেখানে আর ভোগের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া মুক্তিকালেও পুরুষকে জলহীন পিপাসীর মত থাকতে হবে, কারণ ভোক্তৃত্ব তার স্বভাব। তবে যদি "ভোক্তা" মানে "জ্ঞাতা" হয় তা হলে আর আচার্য্য শংকরের সঙ্গে সাংখ্যাচার্য্যগণের ভোক্তা আত্মার কোনও বিরোধ থাকত না। ভোক্তা মানে ভোগী হলেই পুরুষকে "ভোক্তার আত্মা" বলতে হয়। পুরুষের ভোগ সিদ্ধিকালে যদি তিনি মাত্র জ্ঞাতাই থাকেন, তখন যদি এরূপ অর্থ প্রচলিত থাকত, তা হলে শংকর পুরুষ মানে 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিশ্চিত "ভোক্তার আত্মা" মানে করতেন না, কারণ তিনি এই শ্রুতি বাক্যটি বেশ জানতেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" তারপর ভোক্তা মানে জ্ঞাতা হলেও, এই ক্লেশ প্রকৃতি তখন কোথায় থাকেন? এবং পুরুষের জ্ঞান স্বভাবই বা তখন কি হয় কিছু বোঝাবার জো নেই।

যা হোক, সমাধিবান চিত্তে—এই দৃশ্য, যা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, যার বিকার হতে ভূত বা গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় বা গ্রহক এবং ভোগ যা ব্যুত্থিত চিত্তে উপস্থিত হয়—সকলেই ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ হতে থাকে। দ্রষ্টা বা আত্মা এবং দৃশ্য বা জগৎ বা বিষয় যখন একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন হয় ভোগ। দৃশ্যের মধ্যে প্রযত্ন ঙ রকম—এক প্রযত্ন—ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্তি, আর এক প্রযত্ন—সমাধির নিমিত্ত নিবৃত্তি। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের অবিবেক-হেতু ভোগ এবং বিবেক-হেতু অপবর্গ লাভ হয়। যোগ শাস্ত্রে গ্রহণকে সদ্ব্যবসায় বলে, ধারণকে রুদ্ধ ব্যবসায় বলে এবং ঊহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশকে অনুব্যবসায় জ্ঞান বলে।

গুণ বা দৃশ্যের চারটি পর্ব্ব বা পাব, বাঁশের যেমন থাকে—(১) বিশেষ, (২) অবিশেষ, (৩) লিঙ্গমাত্র এবং (৪) অলিঙ্গ। (১) বিশেষ=যা বহুকে সাধারণ (common) নয়। যা গুণান্বয়ী, আগমাপায়ী, অতীত ও অনাগত এবং ব্যক্তি। গুণান্বয়ী=গুণ যাতে ব্যক্ত। আগমাপায়ী=যার উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। অতীত=যা কারণ অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে। অনাগত=যার মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিণাম সুপ্ত রয়েছে। ব্যক্তি=যার একটা বিশিষ্ট প্রকারতা আছে। যথা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। (২) অবিশেষ=যা বহু কার্য্যের সাধারণ উপাদান। যথা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং অস্মিতা। অস্মিতা হচ্চে, যখন করণ ও চৈতন্য অবিবেক হেতু যুক্ত অবস্থায় থাকে। (৩) লিঙ্গমাত্র=যে কার্য্যকে ধরে তার কারণকে নির্ণয় করা যায়। যা স্বীয় কারণে লীন হয়। মাত্র শব্দের দ্বারা দৃশ্যের শেষ সূক্ষ্ম কার্য্যকে বলা হচ্চে। মহৎই আদি কারণ প্রকৃতির শেষ সূক্ষ্ম লিঙ্গ বা চিহ্ন। একে সত্তামাত্র আত্মা বলে, অর্থাৎ 'আমি আছি' এইরূপ ভাব। এখানে সত্তা ও নিশ্চয় অবিনাভাবিরূপে আছে। (৪) অলিঙ্গ=সাংখ্যমতে প্রকৃতি—যা অনাদি কারণ। সেইজন্য তিনি কারও কার্য্য না হওয়ায়, কারও লিঙ্গ বা চিহ্নও নন, অথবা তিনি অন্য কোনও কারণে লীন হন না। ব্যাস্ বলেন, "তিনি নিঃসত্তাসত্ত, নিঃসদসৎ, নিরসৎ। নিঃসত্তা=এ অবস্থায় নিশ্চিত পুরুষার্থ লাভ হয়। আবার এ অবস্থাকে অসত্তা বা পুরুষার্থহীনতা বলা যায়, কারণ পুরুষার্থ এই মলা প্রকৃতিতে শক্তি বা বীজরূপে থাকে। নিঃসদসৎ—এ অবস্থা মহদাদির কারণ বলে একে সৎ বলা যায়, আবার এ অবস্থায় অর্থ-ক্রিয়া বা ধারণার যোগ্যতা নেই বলে একে অসৎও বলা যায়। নিরসৎ=সূক্ষ্মও এখানে অবসান হয় বলে একে

অসৎ বলা হয়। মহদাদি ও অসৎ বা অতি সূক্ষ্মরূপে থেকে, কিন্তু নিরসৎ অবস্থা সর্ব্বসূক্ষ্ম কার্য্যের শক্তি বা অনভিব্যক্তিরূপে থেকে।

এখন পুরুষ কি? পতঞ্জলি বলছেন, "দ্রষ্টা বা পুরুষ দৃশি মাত্র অর্থাৎ বোধ স্বরূপ।" (সাধনপাদ, ২০)। অহং হচ্ছে এই বোধের একটা পরিচ্ছেদ। এই বোধ 'অহং' উপাধিযুক্ত হলে তাকে আমরা ব্যক্তি বলি। এই পুরুষ শুদ্ধ হলেও অবিদ্যাবশতঃ প্রত্যয়ানুপশ্য অর্থাৎ বুদ্ধি সম্ভব প্রত্যয় সকলকে অনুদর্শন করেন। ভাষ্যকার ব্যাস পঞ্চশিখাচার্য্যের একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন, 'অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।' অর্থাৎ ভোক্তৃশক্তি যে পুরুষ তার পরিণামও নেই এবং সংযোগও নেই। চৈতন্যের দ্বারা অনুরঞ্জিত বুদ্ধির জ্ঞানানুকরণের সহিত পুরুষের বোধস্বরূপত্বের অবিশিষ্টতা (একত্ব) বলে বোধ হয়। যেমন—জল-চন্দ্র। তরঙ্গের সহিত প্রতিবিম্বিত চন্দ্র (বুদ্ধি+অহঙ্কার) নৃত্য করছে, মনে হচ্ছে যেন আকাশে চন্দ্র নৃত্য করছে বলেই, জলের চন্দ্র নৃত্য করছে। আকাশের চাঁদে ও জল চন্দ্রে যে সাদৃশ্য, তাই হলো আত্মা ও অহং-এর সাদৃশ্য। পরন্তু বুদ্ধিযুক্ত অহং পরিণামী,—পুরুষদ্রষ্টামাত্র কাজেকাজেই অপরিণামী, বুদ্ধি পরার্থ, পুরুষ স্বার্থ, বুদ্ধি চৈতন্য-প্রতিবিম্ব, আত্মা চৈতন্য নিজেই। এই চৈতন্য হচ্ছে দ্রষ্টা, আর এই চৈতন্য প্রতিবিম্ব হচ্ছে গৃহীতা বা বিকারী জ্ঞাতা বা জীব। বিকারী জ্ঞাতা দৃশ্যকেই জানে, অর্থাৎ দৃশ্য বা কোন না কোন সসীম বস্তুতেই তার জানা সীমাবদ্ধ, অথবা স্থূল দৃশ্য ঘটপটাদির গৃহীতা হচ্ছেন সূক্ষ্ম-দৃশ্য বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অহং। স্থূল ঘটপটাদির বেদন (sensation) সূক্ষ্মবুদ্ধিতে তদাকারা বৃত্তি (concept) উৎপাদন করে, পরে এই বৃত্তি সংস্কার রূপে চিত্তে অবস্থান করে। বুদ্ধি যেন কাচ, পুরুষ সূর্য্য। সূর্য্যই কাচকে প্রকাশ করে, কিন্তু কাচের অস্বচ্ছতাহেতু সূর্য্যই অস্পষ্ট হয়ে পড়েন। প্রতিভা যেমন আবেষ্টনীর জড়তা হেতু নিজেকে বিকাশ দিতে পারে না, ঠিক তেমনি বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার ওপর পুরুষের মহিমার তারতম্য ঘটে, পরন্তু স্বরূপতঃ তিনি পূর্ণ।

পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনই হচ্ছে দৃশ্যের আত্মা বা essence পুরুষের এই ভোগাই হচ্ছে দৃশ্য। পুরুষের যখন বিবেকখ্যাতি হয় তখন ভোগ্য বা দৃশ্য তিনি দর্শন করেন না। তখন পুরুষের দৃশ্যে অর্থ বা তাৎপর্য্য না থাকায় তার স্বরূপ হানি হয়। ভাষ্যকার ব্যাস বলেন, 'স্বরূপহানি হেতু দৃশ্য নাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ (অত্যন্ত অভাব) হয় না।" পতঞ্জলির এই মতের সহিত অদ্বৈত মতে বিরোধ উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে যদি দৃশ্যের একান্ত অভাব না হয় তা হলে পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ পুনঃ সংসার আবির্ভূত হতে পারে। তাতে পাতঞ্জলীরা উত্তর দেন যে বিষয় তখন অব্যক্তাবস্থায় থাকে, কাজেকাজেই তা আর পুরুষের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয় না। তাতে বেদান্তীরা বলেন যে এমন কোনও নিয়ম নেই যে দৃশ্য যা এক সময়ে পুরুষকে ব্যক্তরূপে ভোগদান করেছিল, আর এক সময় হতে তা চিরকাল দ্রষ্টার নিকট অব্যক্ত থেকে যাবে। যদি বল পুরুষ বুদ্ধিসাহায্যে জগৎকে ভোগ্য রূপে দেখেন, সেই বুদ্ধির প্রতি অনাসক্তি হেতু জগৎ পুরুষের নিকট অব্যক্তাকারেই থাকে। তা হলেও সেই পূর্ব্বোক্ত দোষই হয় এবং দ্বৈতাপত্তি হেতু আত্মা নশ্বর হয়ে পড়েন। প্রশ্ন হতে পারে অদ্বৈত বেদান্তীদের জগৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে কোথায় থাকে? বেদান্তীরা বলেন, 'আমাদের জগৎ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় রজ্জুজ্ঞান হওয়া মাত্র সর্প-

ভ্রান্তির যে অবস্থা হয, জগতেরও সেই অবস্থা হয।' কাজেকাজেই অদ্বৈত মতে দ্বৈতাপত্তি হতে পারে না। 'কিন্তু একজনের নির্বিকল্পে জগৎ না থাকলেও, অপরের নিকট থাকে কেন?—সেইজন্য আত্ম ব্যতীরিক্ত জগৎ স্বীকার করতে হয।' 'না, তা বলতে পারা যায না, কারণ যদি কেউ ভুলটাকে সত্য বলে দেখে, তা হলে কি সেটা সত্য? আমরা আত্মার তাঁর শক্তির বিক্ষেপ ও আবরণ, এক অখণ্ড মনের বিবর্ত স্বীকার করি। সেই মনের উপাধি বৈচিত্র্যে এক আত্মাকে বহু জীবরূপে ভ্রান্তি হলেও তা সত্যরূপে প্রতিভাত হয। সেই জন্য এক ব্যক্তির নির্বিকল্পে অপর খণ্ড মনে উপাধিযুক্ত জীবের নিকট জগৎ প্রতিভাত হয।' কিন্তু কেন এই অধ্যাস এসে উপস্থিত হয? 'একটা সহজ লোকের হঠাৎ কেন ভ্রান্তি এসে উপস্থিত হয যেমন বলতে পারা যায না, এটাও ঠিক তাই।' একটা উত্তর আছে, সেটা সাংখ্যের পুরুষের অবিবেক এবং বেদান্তীদের অধ্যাসের হেতু বলা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে অমূলা কিন্তু সান্ত অবিদ্যা।

কিন্তু পতঞ্জলি বলেন (সাধনপাদ, ২২) "কৃতার্থ অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট তা নষ্ট হলেও, অন্য-সাধারণ অজ্ঞানীর নিকট তা অনষ্ট ভাবেই থাকে।" এতে বেদান্তীরা প্রশ্ন করেন, যদি সব পুরুষ মুক্ত হয তা হলে দৃশ্য জগৎ থাকবে কি-না? এতে পাতঞ্জলীরা বলেন, 'পুরুষ অসংখ্য, কাজেকাজেই অবিবেকী পুরুষের অভাব কোন কালেই হবে না এবং সেইজন্য দৃশ্যও চিরকাল থাকবে।' বেদান্তীরা পুনরায জিজ্ঞাসা করেন, পুরুষ যদি স্বরূপতঃ শুদ্ধ হন, তবেই তিনি তা প্রাপ্ত হতে পারেন, এখন তাঁর অবিবেক সাদি না অনাদি। সাদি হলে একটা বিশেষ কালে এই দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগ ঘটেচে—কাজেকাজেই তার হেতু কি? অনাদি হলে দ্রষ্টা চিরকালই দৃশ্য যুক্ত হয়ে থাকবেন, তাঁর মুক্তি সিদ্ধ হয না।' পাতঞ্জলীরা বলেন, 'এই সংযোগের হেতু অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান। মিথ্যা জ্ঞানই মিথ্যা জ্ঞানকে প্রসব করে, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের পরম্পরা অনাদি।'

স্বশক্তি অর্থাৎ দৃশ্য এবং স্বামিশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধির হেতু হচ্ছে সংযোগ। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয। এই জ্ঞান দুরকম—অবিবেক হেতু দ্রষ্টার দৃশ্যকে ভোগরূপে কল্পনা এবং বিবেকখ্যাতি হেতু বুদ্ধি নিরোধের দ্বারা দ্রষ্টার স্বস্বরূপ দর্শন। দর্শনের বিপরীত অদর্শন। এই অদর্শনই সংযোগের হেতু। শাস্ত্রে অদর্শনের আট প্রকার অর্থ আছে—(১) গুণের অধিকারে থাকাই অদর্শন বা অবিবেক, (২) ভোগাপবর্গের বীজ স্বরূপ প্রধান চিত্তের অনুৎপাদ বা প্রকাশ না হওয়ায় অদর্শন, (৩) গুণের অর্থবত্তা গ্রহণই অদর্শন, (৪) গতি ও স্থিতি পরিণামী প্রধানের স্থিতি সংস্কার ক্ষয়ে গতি সংস্কারের অভিব্যক্তিই অদর্শন, (৫) প্রধানের প্রবৃত্তি হেতু শক্তিরূপে যে জগদ্দর্শন তাই অদর্শন, (৬) দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ের স্বরূপ না জানাই অদর্শন, (৭) বিবেক জ্ঞান ছাড়া শব্দাদি বিষয়জ্ঞানই অদর্শন এবং (৮) অবিদ্যা বাসনার সংযোগ হেতু অদর্শন। শেষটিই ব্যাসের মত। অদর্শন=ন+দর্শন। সাংখ্যাচার্যেরা 'ন'র ছ প্রকার অর্থ কল্পনা করেন—(১) অভাব, (২) সাদৃশ্য, (৩) অন্যত্ব, (৪) অল্পতা, (৫) অপ্রাশস্ত্য এবং (৬) বিরোধ। প্রথমটাকে মূল ধরে, সকল অর্থই গৃহীত হতে পারে। সম্যগ্ দর্শনের অভাব হেতু বস্তুপাঠে সাদৃশ্যাদির গ্রহণ হয়ে থাকে।

পুরুষ প্রকৃতি সংযোগের হেতু অবিদ্যা অর্থাৎ বিপর্যয জ্ঞান বাসনা। বিপর্যয অর্থ মিথ্যাজ্ঞান—অনাত্মে আত্মজ্ঞান। আগুনে লোহা থাকলে যেমন লোহাটাকেই আগুন বলে বোধ হয়, ঠিক তেমনি পুরুষ সান্নিধ্য বশতঃ বুদ্ধিকে

আত্মা বলে ভ্রান্তি হয়। এই অবিদ্যা অনাদি, কিন্তু বিবেকখ্যাতি দ্বারা এর নাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই সংযোগ হচ্চে হেয় বা পরিত্যাজ্য, এখন তার হানের বা নাশের উপায় বলা হচ্চে—অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাব হয়, সংযোগের অভাবে প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে, প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদে প্রকৃতির পুরুষের নিকট আর ভোগ্যতা থাকে না, ভোগ্যতা না থাকায় তা বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। অবিদ্যা হানের বা নাশের উপায় অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি। অবিপ্লবা অর্থ মিথ্যাজ্ঞানের দগ্ধবীজাবস্থা অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান যাতে আর অঙ্কুরিত হতে না পারে—এ সময় সমাধিপ্রসূত বিবেকজ্ঞানের অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির পৃথক জ্ঞানের খ্যাতি হয়।

এইরূপ বিবেকখ্যাতি সম্পন্ন যোগীর সাতটি প্রজ্ঞার প্রান্ত ভূমি অর্থাৎ চরম অবস্থা উপস্থিত হয়—

(১) হেয় (প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ) পরিজ্ঞাত হয়েচে, এ সম্বন্ধে আর কিছু জানার নেই (পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি)। এ সময় বিষয়ের দুঃখকে দুঃখ বলে জ্ঞান হওয়ায় আর চিত্ত বিষয়াভিমুখী হয় না।

(২) হেয়-হেতু (অবিদ্যা) ক্ষীণ হওয়ায় আর তাকে ক্ষীণ করবার চেষ্টা করতে হবে না।(ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি)। এ সময় ক্লেশ ক্ষীণ হওয়ায় সংযমের আর চেষ্টা থাকে না।

(৩) বুদ্ধি নিরোধ-সমাধির দ্বারা হানের সাক্ষাৎ হয়েচে অর্থাৎ বুদ্ধি ও আত্মার সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান হয়েচে। এ সময়ে আর জিজ্ঞাসা থাকে না। কেন না—

(৪) হান বা প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান তার হেতু যে বিবেকখ্যাতি তা লাভ হয়েচে। এ সময় যোগধর্ম্ম বা উপাসনার আর কোনও ভাবনীয় থাকে না।

উপরোক্ত চারটিকে প্রজ্ঞার কার্য্য বিমুক্তি চতুষ্টয় বলে। কার্য্য-বিমুক্তি মানে সাধনের সমাপ্তি। পরবর্ত্তী তিনটিকে চিত্ত বিমুক্তি বলে, যথা—

(৫) বুদ্ধিচরিতাধিকারা অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পাদিত হয়েচে।

(৬) গুণ সকল গিরিশিখর কূটচ্যুত গ্রাবাণ বা পাষাণের ন্যায় স্বকারণে প্রলয় হবার জন্য ছুটেচে, স্বকারণে অস্ত হচ্চে, প্রয়োজনের অভাবে আর তাদের উৎপাদ বা উত্থান হবে না। এ অবস্থায় বুদ্ধির স্পন্দন নষ্ট হয়।

(৭) পুরুষ, গুণ-সম্বন্ধাতীত, স্বরূপ মাত্র জ্যোতিঃ, অমল, কেবলী হয়ে থাকেন।

কোনও কোনও যোগাচার্য্য বলেন, 'বেদান্তের জীবন্মুক্তি "শ্রুতানুমানজ প্রজ্ঞা' মাত্র। তাঁরা "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান সত্ত্বেও ভীত, সন্ত্রস্ত এবং শোকার্ত্ত হন।' কিন্তু এটা বেদান্ত বিরোধী কথা, কারণ যাঁরা জীবন্মুক্ত, বেদান্ত তাঁদের সম্বন্ধে বলচেন, "ন বিভেতি কদাচন।" (তৈ উঃ, ২।৪) তাঁরা কিছু থেকে ভয় পান না। "মত্বা ধীরো ন শোচতি।" (কঠউ, ১।২।২২)।—বিভু মহান আত্মার মননের দ্বারা তাঁরা শোক করেন না। "ন ততো বিজুগুপ্সতে" (কঠউ, ২।১।৫)।—তাঁরা ঘৃণা করেন না। "তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী" (কঠউ, ২।২।১৩)।—তাঁরা নিত্য শান্তি পান। "আনন্দরূপামৃতং" (মুণ্ডউ, ২।২।৭)।

ভাবধারা

অবনত জাতির উন্নয়ন

গত ১৯৩৫ সনের ১৩ই অক্টোবর নাসিক জেলায় জিওলা নামক স্থানে ডাক্তার বি, আর, আম্বেদকরের সভাপতিত্বে বোম্বাই প্রদেশের অবনত শ্রেণীর একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ উত্তেজনামূলক বক্তৃতার প্ররোচনায় এই সম্মিলনী ভারতের সমগ্র অধস্তন জাতিকে সমবেতভাবে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। দশ সহস্র লোকের সম্মেলনে বিনা প্রতিবাদে এইরূপ একটি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ইহাতে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আসন্ন শাসন সংস্কার উপলক্ষে অবনত শ্রেণীর যে একটি তালিকা (Scheduled Castes' List) বাহির হইয়াছে, তন্মতে ব্রিটিশ-ভারতে এই শ্রেণীর সংখ্যা কয়েক কোটি। বাংলায় ৮৬টি অবনত শ্রেণীভুক্ত লোকসংখ্যা ৯৩,৩৬,৬২৪। অনেক অধঃপতিত জাতি এই তালিকাভুক্ত হয় নাই, এতদ্ভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিতেও অবনত জাতির সংখ্যা কম নহে। এই বিরাট জনসঙ্ঘের অংশতঃও যদি ডাঃ আম্বেদকরের চেষ্টায় হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে যে নূতন সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার ফল হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পক্ষে যেমন ভয়াবহ হইবে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথকেও তেমন কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিবে। ইহা সম্যকরূপে অনুধাবন করিয়া ডাঃ আম্বেদকর এবং তাঁহার অনুগামী অধোগতদিগকে ঝোঁকের মাথায় ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পদ্মরাজ জৈন, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল, ডাঃ বি, এস্, মুঞ্জে এবং স্যার হরি সিং গৌর প্রভৃতি দেশমান্য হিন্দুনেতা এ বিষয়ে মহাত্মাজীর অভিমত সমর্থন করিয়া এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উত্তরে ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন—"কোন্ ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিব এবং কি উপায় আমরা অবলম্বন করিব তাহা এখনও ঠিক করি নাই, কিন্তু বিশেষ চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পর একটী বিষয় আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং তাহা এই যে হিন্দুধর্ম্ম আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে, কারণ অনৈক্য-ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ইহার মধ্যে থাকিয়া অবনত শ্রেণী কোন কালেও তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে সক্ষম হইবে না।"

সম্মেলনে প্রদত্ত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি অবনত জাতিকে সম্বোধন করিয়া আবেগভরে বলিয়াছেন—"আমরা সমানাধিকারের জন্য আর যুদ্ধ করিব না। কারণ হিন্দুরা উহা আমাদিগকে কখনও দিবে না। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার দুর্ভাগ্যের জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। যদি আমরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতাম তাহা হইলে হিন্দুরা আমাদের উপর এইরূপ ব্যবহার করিতে সাহস করিত না। * * যে ধর্ম্ম তোমাদিগকে সমানাধিকার (equal right) দান করে এমন কোন ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" আশ্চর্য্যের

বিষয় এই যে ডাঃ আম্বেদকরের এই মন্তব্যে প্রলুব্ধ হইয়া বিবিধ অ-হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ অধঃপতিত জাতিকে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মাঙ্কে স্থান দিবার জন্য উৎকট ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াই লাহোরের নব দীক্ষিত মুসলমান নেতা—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ কে. এল. গোবা, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের কার্য্যকরী সমিতির সহকারী সভাপতি সর্দ্দার দলীপ সিং, বারাণসী মহাবোধী সোসাইটির সেক্রেটারী বলী সিংহ এবং আর্য্য সমাজের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীরাম শাস্ত্রী অবনত শ্রেণীকে সর্ব্বপ্রকার পদমর্য্যাদা ও সমানাধিকার দিবার লোভ দেখাইয়া ইসলাম, শিখ, বৌদ্ধ এবং আর্য্য-সমাজের সাম্য-অঙ্কে স্থান গ্রহণ করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া ডাঃ আম্বেদকরের নিকট তার পাঠাইয়াছেন। ব্যাসন্যালিষ্ট এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রায় সাহেব জেহাঙ্গীরাম লাহোর হইতে ডাঃ আম্বেদকরকে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মসমূহ মহা অনিষ্টকর, আপনি কোন ধর্ম্মভুক্ত না হইয়াও পৃথিবীতে বাস করিতে পারেন। ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? আমি আমার র‍্যাসন্যালিষ্ট বন্ধুদের পক্ষ হইতে আপনাকে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।" চমৎকার। এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উৎসাহিত হইয়া অধস্তন শ্রেণীকে যে তাঁহাদের নিজ নিজ দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন, এ দৃশ্য একদিকে যেমন কৌতূহলপ্রদ অপর দিকে তেমন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যে দেশে এক সম্প্রদায়ের আত্মকলহ ও দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া অপর সম্প্রদায় সমূহের জনবল বৃদ্ধির এরূপ অস্বাভাবিক আগ্রহ, সেই অভিশপ্ত দেশে নেশন্ বা জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আকাশ কুসুম। যাহা হউক, অনুন্নত শ্রেণীর অন্যতম নেতা—নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ পি. আর. ঠাকুর শ্রীযুক্ত নিবাসন, শ্রীযুক্ত রামভোজ, মিঃ এন. এস্. কাজরোলকার প্রভৃতির ডাঃ আম্বেদকর প্রবর্ত্তিত অধোগত জাতি উন্নয়নের এই উপায় সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা অনুন্নত জাতিকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া তাহাদের জন্মগত স্বত্ব ও স্বাধীকার অর্জ্জনের জন্য আন্দোলন চালাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অবনতগণ আপনাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত না করিয়া অন্য কোন ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমানাধিকার পাইবে না এবং তাহাতে ভাবী শাসন সংস্কারে অবনত জাতি যে সুবিধা লাভ করিয়াছে উহা হইতেও বঞ্চিত হইবে।

অবনত শ্রেণীর নেতা ডাঃ আম্বেদকরের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের সংকল্প তাঁহার 'রাজনৈতিক চাল' মাত্র কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। অনেকে মনে করেন ইদানীং নাসিক, গুজরাট, আমেদাবাদ কবিথ এবং অন্যান্য স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথাকার নিম্নবর্ণের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছেন তাহাই ডাঃ আম্বেদকরের ধর্ম্মত্যাগ সংকল্পের আশু উত্তেজক কারণ। নিপীড়িত জাতির নেতৃবৃন্দ মনে করিয়াছিলেন যে মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী হরিজন সফরের ফলে বর্ণহিন্দুরা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার দিবেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। রাজসহায় ভিন্ন সমাজ সংস্কারে সম্মুখ আক্রমণ কোথাও ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয় না। মহাত্মাজী দুর্ভাগ্য বশতঃ ইতিহাসের এই নির্দেশ অবজ্ঞা করিয়া সংস্কার ক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি (এক বৎসরের মধ্যে) অস্পৃশ্যতা উঠাইয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু অবনত জাতির উন্নয়নের জন্য অর্থসংগ্রহ ভিন্ন তাঁহার সংস্কার প্রণালী আশানুরূপ সাফল্য লাভ ত করিলই না বরং উহা দেশময় প্রসুপ্ত গোঁড়া রক্ষণশীলবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া সংস্কারের

বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিল। ফলে এই সময় 'মন্দির প্রবেশ বিল' পরিত্যক্ত হইল। অনতিক্রমণীয় বাধা পাইয়া মহাত্মাজীর সংস্কারোৎসাহ স্বাভাবিক পথ গ্রহণ করিল। এই ঘটনায় বর্ণহিন্দুদের নিকট লাঞ্ছিত অবনত জাতির সুবিচারের আশা অনেকটা লুপ্ত হইল এবং তাঁহাদের ধারণা জন্মিল—"সামাজিক অধিকার বৈষম্য ও গুরু পৌরহিত্যের ক্রীতদাসত্ব সমন্বিত সনাতনী হিন্দুসমাজের নিকট সর্ব্বাঙ্গীন সমানাধিকার লাভের আশা করা বৃথা।" দুর্ব্বল হিন্দুসমাজকে হুমকি দেখাইয়া তাড়াতাড়ি কার্য্যোদ্ধারের মতলব ডাঃ আম্বেদকরের থাকিতে পারে, কিন্তু অনুন্নত জাতির অধিকার লাভের পথে রক্ষণশীলদলের বাধা ও বিরুদ্ধভাব নিপীড়িত জাতির মধ্যে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও তাঁহাদের সমবেত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-সংকল্পের জন্য কম দায়ী নহে। সত্য বটে ইদানীন্তন অনেক উদার হৃদয় বর্ণহিন্দু বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া স্বাধীনভাবে এবং মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অনুন্নতদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এই সব প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। অনেক স্থলে কার্য্য-প্রণালীও আশাপ্রদ নহে। দশটা অন্য বিষয়ের সঙ্গে এই সংস্কার প্রচেষ্টাও চলিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ শরীরের ব্যাধি বিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব সামাজিক কুরীতির উদ্ঘাটনে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজ শরীর পুষ্ট করাই এই মঠের (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের) উদ্দেশ্য।" সংস্কারকদিগকে সুচিকিৎসকের মত এই দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর জোর দিয়া সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যাধি দূর করিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতে হইবে এবং এ সম্বন্ধে কর্ম্মজাল সমগ্র দেশময় যত বিস্তৃত এবং সত্যব্রত হইবে সংস্কারও তত দ্রুত এবং ফলপ্রসূ হইবে। রাতারাতি যেমন এই দীর্ঘকালের ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয়, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকাও তেমন বিপদ্‌সঙ্কুল। আজকাল জগতের সকল জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে; স্বাধীনতা, সমানাধিকারবাদ এবং সাম্যের বার্ত্তা ঝঞ্ঝাবেগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষও চারিদিক হইতে ক্রমেই অধিক মাত্রায় এই আন্দোলন তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। এ সময় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অবনত শ্রেণীকে অপেক্ষা করিয়া যোগ্যতাৰ্জ্জন করিতে বলিলে অধৈর্য্য প্রকাশ স্বাভাবিক হইবে। ওদিকে আফ্রিকা, আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে বর্ণবিদ্বেষের জন্য ভারতবাসী মাত্রই লাঞ্ছিত হইতেছেন। জগতের উন্নত জাতিসঙ্ঘের আসরে তাঁহার স্থান নাই। এজন্য সমগ্র দেশকে প্রতিবাদে মুখরিত করিয়াও এক শ্রেণীর হিন্দুরা স্বদেশে সেই বর্ণবিদ্বেষ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"যাহা হংসের পক্ষে আচার হংসীর পক্ষেও তাহা-ই।" আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—"অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষ গতপ্রাণ প্রায় পতিত হইয়াছে; অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহার পুনর্জ্জীবনীশক্তি লাভের আশা নাই (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী)।" স্বগৃহে সাম্য প্রতিষ্ঠার অর্থ সব বিষয়ে একাকার প্রতিষ্ঠিত করা নহে এবং ইহা সম্ভবও নয়। বিদ্বান-মূর্খ, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, প্রভু-ভৃত্য, ধনবান-দরিদ্রের মধ্যে গুণগত ভেদ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজি লিখিয়াছেন, "বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ। এবং এই বিচিত্ররূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। অর্থাৎ বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তি বিশেষে ক্রিয়ার বিশেষত্ব থাকিবেই। যথা, কেহ সমাজ শাসনে পারদর্শী,

কেহ বা পথের ধূলি পরিষ্করণে ক্ষমবান।' এই বলিয়া সমাজশাসনে পারদর্শী মানবেরই যে জগতের যাবতীয় সুখভোগের অধিকার থাকিবে এবং পথের ধূলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরিবেন, ইহাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ। আমাদের দেশে সম্প্রতি যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি হয়, তবে কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক সে দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা তত অধিক; কিন্তু মৃত্যুর ছায়া ভোগাধিকার তারতম্যরূপ জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম চলিতেছে। যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তাহার দুর্দশা ততই অধিক। * * অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতি-বিভাগ নষ্ট করা নহে, কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালে যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার সহায়তা হয়, তাহার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত। * * এই সুপ্ত জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য মহাজাতি সমূহের অধিকার তারতম্য ভঞ্জনের বিরাট উদ্যম ও প্রাণপণ সংগ্রামের বার্ত্তা অস্মদ্দেশীয় পরাহত প্রাণেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করিতেছে। মানব সাধারণের অধিকার, আত্মার মহিমা নানা বিকৃত সুকৃত প্রণালী মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ এ দেশের ধমনীতে প্রবেশ করিতেছে। নিরাকৃত জাতি সকল আপনাদের লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধার চাহিতেছে। এ সময় যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ইত্যাদি জাতি বিশেষে আবদ্ধ থাকে তবে সে বিদ্যার ও সে ধর্ম্মের নাশ হইয়া যাইবে (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী)।" আমরা স্বামীজির উদ্ধৃত বাণীর প্রতি চিন্তাশীল হিন্দুসমাজ-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অবনত জাতির প্রতি বর্ণহিন্দুদের অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সম্মানিত ডাঃ আম্বেদকরের অভিযোগ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এ জন্য অভিমান করিয়া ধর্ম্মত্যাগ তাঁহার এবং তাঁহার সমাজের পক্ষে ভ্রমাত্মক এবং আত্মঘাতি। এ যেন রোগীকে মৃত্যুমুখে পাঠাইয়া রোগ আরোগ্য করা। ধর্ম্ম পোষাকের ন্যায় পরিবর্ত্তনীয় নহে। আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান কাহারও ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন সমর্থন করি না। সকল ধর্ম্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভগবান লাভের এক একটি পথ বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। কাজেই ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাও আমরা স্বীকার করি না। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা ভারতে যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, এমনটা আর কিছুতেই হয় নাই। দেখা যায়, যিনি যে ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি সে ধর্ম্মের শত্রু হন, ইহাই মানব-প্রকৃতি! মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টির সংকল্প, প্যান্-ইস্‌লাম মতবাদ, তান্‌জিম্ ও তব্‌লিগ্ সমিতির কার্য্যকলাপ এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দুদের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন ভারতে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফল সমগ্র জাতিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুগিতে হইবে। হিন্দু-ভারত এতদিন তাহার স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, এই সর্ব্বনাশকর ঔদাসীন্যের ফলে অগণিত হিন্দু বিনা বাধায় মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সমাজ পুষ্ট করিয়াছে। এখন হিন্দুদের মধ্যে ক্রমেই জাতীয় জাগরণ আসিতেছে, এক অঙ্গের বেদনা অপর অঙ্গ অনুভব করিতেছে, হিন্দু বুঝিয়াছে—ক্রমাগত তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে হইবে। এই জন্য অবনতদের ধর্ম্মত্যাগ সংকল্প হিন্দুভারতে বেদনার সঞ্চার করিয়াছে।

"যে ধর্ম্ম সামাজিক অধিকারবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়,—যে ধর্ম্ম মানব মাত্রকে সমানাধিকার দান করে" লাঞ্ছিত অনুন্নত জাতিকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এমন কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ডাঃ আম্বেদকর উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহাতে

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতাই সূচিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম বলেন, "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"-যাঁর সমদর্শন নাই, তিনি পণ্ডিত নন।" "শিব এব সদা জীবো জীব এব সদা শিবঃ। বৈক্যোক্যমনযোর্যস্তু স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ॥"—শিবই জীব এবং জীবই শিব, যিনি এতদুভয়ের একতা অবগত হইয়াছেন, তিনিই আত্মজ্ঞ—অন্য কেহ নহেন। হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—আত্মহিসাবে 'তুমি', 'আমি' ও জীব-জগৎ এক ও অভেদ, পৃথক বা ভেদ দৃষ্টির কারণ অজ্ঞান বা মায়া। কাজেই আমি যদি কাহাকেও হিংসা করি, তাহা হইলে আমাকেই আমার হিংসা করা হয়, আমি যদি কাহাকেও নীচ মনে করিয়া অবজ্ঞা করি তাহা হইলে আমাকেই আমার অবজ্ঞা করা হয়। হিন্দুর সকল শাস্ত্র এই চূড়ান্ত সাম্যবাদে ভরপূর। জগতের কোন ধর্ম্ম এমন সাম্যের কথা বলে না। হিট্‌লারিষ্ট, ফাসিষ্ট, বলসেভিক, কমিউনিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বীদের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যবাদ বেদান্তের এই একত্ব ও অভেদত্ব সাম্যতত্ত্বের নিকট দাঁড়াইতেই পারে না। মানব-কল্পনায় ইহা অপেক্ষা অধিক সাম্যতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। হিন্দু বালক পর্য্যন্ত কথায় কথায় বলে—"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"। সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। বৈষ্ণবাচার্য্য প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য গাহিয়াছেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ"। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক তান্ত্রিক চূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ"। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্তের জাতি নাই।" প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি হিন্দুজন সম্মানিত ঋষিগণ নিম্নশ্রেণী ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য অস্পৃশ্য জাতীয় ধর্ম্মাচার্য্য সিদ্ধমহাপুরুষ জ্ঞানে অদ্যাবধি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। যবন জাতি সম্ভূত হরিদাস এবং শূদ্র জাতীয় রঘুনন্দন দাস গোস্বামীর উদ্দেশ্যে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণের মস্তক অবনত না হয়? অস্পৃশ্যতার লীলাভূমি দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু মন্দিরে প্রসিদ্ধ অস্পৃশ্য আচার্য্য নন্দ, চোকামেলা, তিরুপ্পন আলোয়ার, নম্পোদোয়ান প্রভৃতি শৈব সাধুর শ্রীমূর্ত্তি তথাকার গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অদ্যাবধি নিত্য পূজিত হইতেছে। রামায়েৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য রামানন্দ এবং তাঁহার জোলা জাতীয় শিষ্য কবীর এবং মাংস-বিক্রেতা শিষ্য রবিদাস প্রভৃতি এক একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এইরূপে চরণ দাস, কৃষ্ণদাস, মলুকদাস, বলরাম হাড়ী, সধ্ন, ঝড়ু ঠাকুর প্রভৃতি অস্পৃশ্য আচার্য্য এক একটি বিস্তীর্ণ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অনেক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ইঁহাদের শিষ্য। এমন কোন হিন্দু নাই বলিলেই চলে যিনি এই ব্রহ্মজ্ঞ অস্পৃশ্য আচার্য্য-গণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি হিন্দু ভারতমান্য অবতার অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। এই অতি-মানবগণের জীবন হইতে শত শত ঘটনা এ কথার সত্যতা প্রমাণার্থ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজের বাহিরে দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শাস্ত্রমতে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মের দিক দিয়া হিন্দু অস্পৃশ্যতাকে কোনকালেও আমল দেয় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম যেমন সাম্যের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুসমাজ আবার তেমন অসাম্যের আশ্রয়ে নিয়ন্ত্রিত। হিন্দু দর্শন ও ধর্ম্মের অশ্রুতপূর্ব্ব সাম্য হিন্দুর অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় সামাজিক জীবনে বিপরীত আকার ধারণ করিয়া হিন্দু ভারতকে অনৈক্য-বিরোধ-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম বলে—"জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।" হিন্দু সমাজ

বলে—"ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা"। স্বামী বিবেকানন্দ এতদ্দৃষ্টে বলিয়াছেন—"Inspite of our grand philosophy, mark our weakness in practice'—আমাদের মহান্ দর্শন সত্ত্বেও ব্যবহার ক্ষেত্রে আমাদের দুর্ব্বলতা দেখ। এই সামাজিক বৈষম্যই যে হিন্দুর অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধীনতা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দশার মূল কারণ তাহা ঐতিহাসিকগণ সমস্বরে প্রমাণ দেন। অবনত জাতির সমস্যার উদ্ভবও প্রধানতঃ এখান হইতেই। কাজেই উহার জন্য দায়ী ধর্ম্ম নয়,—একমাত্র দায়ী সমাজ—লোকাচার ও দেশাচার।

ডাঃ আম্বেদকর হিন্দু-সমাজের এই অসাম্যদোষ হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আরোপ করিয়া ভুল করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায়, এই অসাম্য দোষে জগতের সকল সমাজই কমবেশী বিড়ম্বিত। খৃষ্ট-সমাজকে সাম্যমূলক বলিয়া দাবী করা হয় বটে কিন্তু দেশী-খৃষ্টানেরা কি সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্য বিষয়ে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের সমকক্ষ? আফ্রিকার নিগ্রো, জুলু এবং হাবসী খৃষ্টানদের সঙ্গে কি প্রতীচ্য খৃষ্টানদের সামাজিক ভেদ কম? ইস্‌লাম ধর্ম্মে মস্‌জিদে যতটা সাম্য রক্ষিত হয়, সমাজে ততটা সাম্য দেখা যায় না। মুসলমান জোলা, কলু, বেদে প্রভৃতি জাতির সামাজিক মর্য্যাদা মোগল-পাঠানের সমতুল্য নহে। এ ছাড়া নারী পুরুষের অধিকার ভেদও যথেষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মে বৈষম্য না থাকিলেও বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে সামাজিক, লোকাচার ও দেশাচারগত ভেদ কম নহে। ফলতঃ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণ সাম্য হিন্দুর অদ্বৈত ভিন্ন অন্য কোথাও নাই।

বেদান্তের এই নিরুপম একত্ব ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করিবার জন্য,—হিন্দু দর্শনের সাম্য-তত্ত্বকে সমাজে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত,—হিন্দুধর্ম্মের অভেদবাদকে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের মহত্তম ভাবগুলি কেবল পুঁথিতে নিবদ্ধ থাকিবে নাকি? হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের পরস্পর বিরুদ্ধ আচরণ লক্ষ্য করিয়া এবং ইহার কুফল অনুধাবন করতঃ ভারতের অবনত নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর হৃদয়হীন ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মই এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক"* নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে। * * ভারত-বর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যত চেষ্টা করুক তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে; তাহার বেদনা তাহারা

---

* "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক,—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদ দৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ হিংসা রহিয়াছে।"

বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইতেছেন। তাহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। * * সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দু-ধর্ম্মের মহান উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানের দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি জনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক (পত্রাবলী, ১ম ভাগ)।" যুগাচার্য্য স্বামীজির নির্দ্দেশমত হিন্দুদর্শনের নিরুপাখ্য সাম্য-তত্ত্বকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইবার উপরই যে হিন্দুর স্বগৃহে সাম্য স্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বর্ণহিন্দুকে একদিকে যেমন যুগযুগান্তরের দেশাচার এবং লোকাচারের মোহমুক্ত হইয়া ঔদার্য্য অবলম্বনে সমদৃষ্টি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং নিম্ন ও অবনত জাতির উন্নয়নের জন্য দেশময় গঠনমূলক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কাজ করিতে হইবে, অপরদিকে তেমন অনুন্নত জাতিকেও আত্মার অনন্তশক্তি, পবিত্রতা, ধর্ম্ম ও নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া কুসংস্কার, কুরীতি প্রভৃতি আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া মেঘমুক্ত রবির মত শিক্ষা ও প্রতিভার দীপ্ত তিলক ললাটে ধারণ করিয়া সমাজে প্রকাশ পাইতে হইবে। অধোগত শ্রেণীকেও উচ্চ শ্রেণীর মত দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি উন্নত বিষয়—যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা মানুষের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য তাহা—অর্জ্জন করিতে হইবে। পতিত জাতিদের বোঝা দরকার যে কেহ কাহাকেও গায়ের জোরে বড় করিতে পারে না। উন্নত জাতির সঙ্গে সকল বিষয়ে সমানাধিকার পাইতে হইলে অনুন্নতকেও তাঁহাদের মত সকল বিষয়ে উন্নত হইতে হইবে। সমানে সমানেই সমানাধিকার সম্ভব এবং স্বাভাবিক। বিদ্যা ও ধর্ম্ম অর্জ্জন এবং অর্থের সদ্ব্যবহার মানব সমাজে সর্ব্বত্র সামাজিক পদ-মর্য্যাদা সৃষ্টি করে, উন্নত শ্রেণীর উন্নতির মূলে এই তিনটী—বিশেষ করিয়া প্রথমটী বর্ত্তমান। পতিত জাতি এ গুণ অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সমানাধিকারের গগন-ভেদী চীৎকারেও সে অধিকার আসিবে না। যে গুণ যে অধিকারের ভিত্তি সে গুণ অর্জ্জন না করিয়া সে অধিকার লাভের চেষ্টা সর্ব্বৈব বৃথা। স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্য জাতি নিচয়ের মধ্যে যেমন অস্পৃশ্য সমস্যা বর্ত্তমান, এক স্পৃশ্য জাতির সঙ্গে অপর স্পৃশ্য জাতির এবং এক অস্পৃশ্য শ্রেণীর সঙ্গে অপর অস্পৃশ্য শ্রেণীর সামাজিক ব্যবহারেও তেমন অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান। এই বিভিন্ন রকমের অপরূপ অস্পৃশ্যতা আবার বিভিন্ন প্রদেশ, জেলা, বংশ, গোত্র প্রভৃতি ভেদে সংখ্যাতীত

আকারে বিভক্ত হইয়া হিন্দুসমাজ শরীরের সর্ব্বাঙ্গে প্রসার লাভ করিয়া অনৈক্য-বিরোধ-বিদ্বেষে সমগ্র হিন্দুস্থানকে পৃথিবীর উন্নতজাতি সমূহের অবজ্ঞার ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। লাঞ্ছিত অবনত হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীগত অস্পৃশ্যতা দূরীভূত না হইলে বর্ণহিন্দুর নিকট তাঁহাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের দাবী নিরর্থক। ডাঃ আম্বেদকর যদি অনুন্নত পতিতদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমানাধিকার প্রবর্ত্তন না করিয়া বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে তাঁহাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে অবনত জাতির অনেক শ্রেণীও উহা সমর্থন করিবে না। সুতরাং অধস্তন পতিতদের মধ্যেও সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। বাহির হইতে কতকটা সাহায্য করা মাত্র সম্ভব, কিন্তু উন্নতি হয় ভিতর হইতে। এ জন্য চাই—রজোগুণের অশ্রান্ত প্রাবল্য, উন্নতির অতৃপ্ত তৃষ্ণা, সর্ব্ব বন্ধন মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অজেয় স্বাধীনতা স্পৃহা, শিক্ষার অনুবন্ত সংকল্প, অশঙ্ক আত্মসম্মান বোধ। শতমুখী চেষ্টায় সর্ব্বপ্রযত্নে নিম্ন এবং অবনত শ্রেণীকে এই দৈবী-সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে—যেমন জল বুদ্বুদের পিছনে রহিয়াছেন অনন্ত মহাসাগর, তেমন তাঁহার মধ্যে রহিয়াছেন আত্মা, যিনি অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান এবং পবিত্রতার স্বরূপ। সকলের ভিতরেই সেই একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন—কেবল প্রকাশের তারতম্য। যিনি চেষ্টা করিবেন তাঁহার মধ্যেই কেবল তিনি প্রকাশিত হইবেন। এমন করিয়া ভারতের অধঃপতিত সুষুপ্ত গণবিগ্রহকে জাগ্রত করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় জীবন-প্রভাত এই কার্য্য-প্রণালীর উপর—কেবল মাত্র এই সমস্যা সমাধানের উপরই নির্ভর করে।

যুগচিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় গমনের পর হইতে তাঁহার দেহরক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল অসংখ্য বক্তৃতায়, পুঁথি পত্রে এবং কথোপকথনে ভারতের নিম্ন-অবনত-অস্পৃশ্য শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় যত মত ব্যক্ত করিয়াছেন এমনটি আর কোন বিষয়ে করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। হিন্দুজাতির অবনতির মূল প্রস্রবণ অবনত জাতির প্রতি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে—ভারতের প্রাণশক্তি নিম্ন ও পতিত জাতির প্রতি বর্ণহিন্দুদের হৃদয়হীন অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার বিপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতেই প্রথম বিদ্রোহের অগ্নিবাণী নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষায় সমগ্র দেশ বিশেষ পশ্চাৎপদ ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে তখন দেশে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইদানীন্তন ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার এবং সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাব ক্রমেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহার স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলীতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতের সমস্ত দুঃখের মূল—"নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ হওয়া।" এই ভেদ নাশ না হইলে কোনও কল্যাণের আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে।" উচ্চবর্ণের অত্যাচার এবং লাঞ্ছনায় উত্যক্ত হইয়া অবনত শ্রেণীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের আন্দোলন হইতে হিন্দু সমাজের শিক্ষালাভ করা উচিত। হিন্দুর অধিকার বঞ্চিত জাতি সমূহকে আর অধিকদিন অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে ক্রমেই এই সমস্যা প্রতিকারের বাহিরে যাইবে। যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ যোগদৃষ্টি সহায়ে এই বিপদ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"তিন বিপদ আমাদের সম্মুখে—(১) ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত আর সমস্তবর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে; (২) বাহ্য দেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে; অথবা (৩) সমস্ত ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

"প্রথমপক্ষে এই অতি প্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহুকালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয়কল্পে ভারতীয় সভ্যতা ও আর্য্য জাতির বিনাশ অতি শীঘ্র সাধিত হইবে। কারণ, যে কেহ হিন্দুধর্ম্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটী শত্রু অধিক হয়। ঐ প্রকার স্বগৃহ উচ্ছেদকারী শত্রুদ্বারা মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তৃতীয়কল্পে মহাভয়ের কারণ এই যে, যে ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত, তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির জীবন ধর্ম্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী)।"

একযোগে অবনত পতিত শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের পরিকল্পনা স্বামীজির উল্লিখিত প্রথম এবং দ্বিতীয় বিপদ এবং ভারতে ধর্ম্মবিধ্বংসী কমিউনিজিম্ এবং সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার তৃতীয় বিপদ জ্ঞাপক ঘণ্টা নিনাদ করিতেছে। হে ভারত, তুমি দীর্ঘকাল আপনার স্বত্ব, স্বাধীকার এবং জাতীয়তা বোধশূন্য হইয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া ৬০ কোটি হিন্দুকে ২০ কোটিতে পরিণত করিয়াছ,—সমগ্র জাতিকে জগতের অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে, এখনও যদি আসন্ন বিপদের প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তুমি জাগ্রত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও—

"এ নিদ্রা হইবে তব প্রত্যক্ষ শমন।"

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-সপ্তমী

ব্রহ্মচারী ক্ষীরোদ

নিজকে ভালবাসাই মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। প্রথমতঃ নিজকে চেনা বড়ই শক্ত—হয়তো বহু জন্ম গ্রহণ করেও দেখা যায় নিজকে ঠিক ঠিক চেনা হয় নি, আরও বহুবার জন্ম নিতে হবে—নিজকে ভালবাসতে—নিজকে জানতে। বিশ্বস্রষ্টার এমনি মজার খেলা যে, তিনি সহজে আমাদের জানতে দেন না আমরা কে, আমাদের স্বরূপ কি? এমন কি তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত এই খেলা চালাবার জন্য আমাদের কি অভিপ্রায়, কেন আমরা এত ছুটাছুটি করে মরছি সেটি পর্য্যন্ত বুঝতে দেন না। কেন দেন না, সে কৈফিয়ৎ শুধু তিনিই দিতে পারেন কিংবা তাঁর স্বরূপ জেনে যিনি এ খেলার তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝেছেন তিনিই দিতে পারেন। আমরা শুধু বলতে পারি এ তাঁর খেয়াল বই আর কিছু নয়—এর বেশী বলা শক্ত।

তাঁর খেলার প্রভাব হতে মানুষ মুক্ত হতে পারে না—সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা চলছে। বাস্তবিকই, একটি ছোট শিশু পুতুল নিয়ে, ধূলো মাটি নিয়ে যে ভাবে খেলা করে—তার সঙ্গে কিশোর, যুবক বা বৃদ্ধের খেলার মধ্যে খুব পার্থক্য আছে কি? সে নাহয় খেলছে এমন জিনিষ নিয়ে যার পরমায়ু ২।১ দিন, আর আমরা এমন জিনিষ নিয়ে খেলছি যার আয়ুষ্কাল হয়তো কয়েক বৎসর—এর বেশী ত নয়। যদি শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'তুমি পুতুল নিয়ে

খেলে গায়ে ধূলো মাটি মাখ্‌ছ কেন' ?—তাঁতে সে হয়তো তার জবাব দিতে পারবে না—যদিই বা দেয়, ত বল্‌বে, সব ছেলেই খেলে আমি কেন খেল্‌ব না। আর অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ—তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি এ জীবনটা কি নিয়ে কাটালে, তার কৈফিয়ৎ কি দিবে বল দেখি ? তুমি হয়তো বল্‌বে—যা নিয়ে সবে কাটায় তাই নিয়ে কাটিয়েছি—ছেলেদের মানুষ করেছি, এত এত বিষয় সম্পত্তি করেছি—নিজে কত মান সম্মান পেয়েছি' ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা এগুলি পেয়ে তোমার মনে শান্তি এসেছে কি ? এগুলির পরমায়ু কতকাল বল দেখি ? এ প্রশ্নের জবাব দিতে তার একটু মুস্কিল হবে। যতই জবাব দিতে চাইবে—ততই তার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে, ফলে তার অশান্তিই বৃদ্ধি হবে। অথচ এম্‌নি মজা যে, আমরা কিন্তু তাই করেছি। শিশুও বৃদ্ধ গুণগত একই কাজ কর্‌ছে—পার্থক্য মাত্র মাত্রায়। ইহাই জগৎ প্রহেলিকা।

এভাবে নানাপ্রকারে খেলিয়ে বেড়িয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মানব যখন আর খেল্‌তে চায় না—তখন তার অন্য একটা কিছু চাইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন আসে—তাইতো, কোথা হতে এলাম, কেন এলাম, কি-ই বা কর্‌লাম এতকাল, সবই যে অস্থায়ী জিনিষ নিয়েই দিন কেটে গেল, এমন কিছু তো পেলাম না—যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। এই প্রকারইতো অধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে। আমরা অনেকে আবার মুখে বলে থাকি যে অন্যের জন্য এত এত কাজ কর্‌লাম—কিন্তু চিন্তা করে সরল ভাবে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়—বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে যা কিছু করা গেছে সকলই নিজের প্রীত্যর্থেই করা হয়েছে। এস্থলে শ্রুতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মুখে একটি সুন্দর কথা বলছেন—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি। 'অর্থাৎ পতি পত্নীকে ভালবাসেন—তাহার কারণ, আত্মরূপী নারায়ণ পত্নীর ভিতর রহিয়াছেন বলিয়া। কেন না আত্মাকেই আত্মা প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। সেইজন্য স্ত্রী পতির প্রিয়া হন। আবার পতির ভিতর আত্মা থাকাতে, পত্নীর মন পতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার প্রীতির বা তৃপ্তির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হন। বিত্ত এবং সংসারের যাবতীয় বস্তুর সম্বন্ধে এই একই নিয়ম।'

পূর্ব্বোক্ত জিনিষটা যখন আমরা বুঝতে পারি তখনই আমরা নিজকে চিন্‌তে ব্যস্ত হই। এই ব্যস্ততা আসা যত সহজ মনে করি তত সহজ নয়। আবার ব্যস্ত হলেও জন্ম জন্মান্তরের ব্যস্ততার অভাব দরুণ যে একটা ভ্রম ধারণা মনে শিকড় গেড়ে বসেছে সেটিকে তাড়ানও সহজ ব্যাপার নয়, সেটিকে তাড়াবার জন্যই আমরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী জিনিষের সন্ধান করতে থাকি এবং এ সন্ধানের নামই শ্রীভগবানের উপাসনা। তখনও আমরা এমন ভাবই অবলম্বন করতে চাই যা এতকাল করা গেছে, এভাব পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজকে জানার পথ যেন অনেকটা সুগম হয়ে যায়। সংসারে যত প্রকার ভাব আছে, শাস্ত্র তার প্রধান প্রধান কতগুলি অবলম্বনে এ জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে অগ্রসর হতে বলেন। মন সূক্ষ্ম জিনিষের অস্তিত্ব এককালে ভুলে যেয়ে দীর্ঘকাল স্থূলের সেবা করায়, হঠাৎ স্থূল ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা করতেই পারে না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে—আত্মানুসন্ধানে ব্রতী মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তিও পরমাত্মার স্থূল বিগ্রহ ভিন্ন অন্যরূপ দেখতে ভীত হন। অবশ্য ক্রমে অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখ্‌তে

পান তাঁদের প্রেমাস্পদই সৃষ্টিস্থিতি ও ভঙ্গের কর্তা। —শেষ অবস্থায় দেখ্‌তে পান এক পরম ব্রহ্ম ছাড়া জগতে দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাই অধিকাংশক্ষেত্রে সাধকের প্রথমতঃ পরমাত্মার সঙ্গে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, কান্ত ইত্যাদি সম্বন্ধ সৃষ্টি করে সাধনে প্রবৃত্ত হতে হয়।

উচ্চ ধারণার প্রধান প্রধান অন্তরায় কাম কাঞ্চন ও যশঃ স্পৃহা। তন্মধ্যে দেহাসক্তি হতে নানাবিধ স্থূল ভোগ বাসনা মানব মনকে বিপথগামী করতে চায়। জন্ম জন্মান্তরের দেহ-সম্ভোগ-বাসনা যদিই বা কোন প্রকারে সামান্য দমিত হল, তখন আসে নিত্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঞ্চনাসক্তি। ইহার হাত হতেও উদ্ধার হওয়া সহজ নয়। তপস্যার ফলে সেটিও যদি কোন প্রকারে স্তিমিত হয়, তখন আসে নাম যশের আকাঙ্ক্ষা। সাধারণ জীব স্থূল জিনিষ নিয়ে এতকাল লিপ্ত থাকায় উচ্চতর জিনিষের বিন্দুমাত্র আস্বাদ পেলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ছোট্ট ঘড়াটিতে অধিক জল রাখা যেমন সম্ভব হয় না তেমনি শিশুমন সামান্য অর্জনেই স্ফীত হয়ে উদ্দেশ্য হারিয়ে বসে। আত্ম-সাক্ষাৎকার যাঁরা করেছেন তাঁরা বলেন নাম যশের আকাঙ্ক্ষা থেকে নানাবিধ বাসনা ও অহঙ্কার এবং সময় সময় সামান্য অগ্রসর হলেই তুষ্টি এসে সাধকের উন্নতির পথ রোধ করে দেয়।

সাধন রাজ্যে রতী হতে হলে প্রত্যেকেরই বিশেষ একটি পথ অবলম্বন করা আবশ্যক, যার যা ভাব তার পক্ষে সেই পথই শ্রেয়ঃ। তবে অসংখ্য পন্থার মধ্যে মাতৃভাবের সাধনাও একটি বিশেষ পন্থা। এভাবের কি বৈশিষ্ট্য তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পাঞ্চ ভৌতিক দেহ ধারণ হেতু মানব মন সাধারণতঃ দেহের গণ্ডি ছেড়ে যেতে চায় না। শুধু চায় না কেন, দেহেতেই আবদ্ধ থাকতে ক্রমাগত চেষ্টা করে। এ আকর্ষণ আবার নিজ দেহ ছিন্ন অন্য দেহেও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। সৃষ্টি-তত্ত্বের ইহাই যেন স্বাভাবিক পরিণতি। সাধারণ ভূমিতে অবস্থিত মন দেহ ভোগটা অত্যন্ত স্থূল ভাবেই যেন চায়। অথচ এতে অবস্থান করে মানব যে স্থায়ী আনন্দ পায় তাও বলা চলে না; কারণ তা হলে এ নিয়েই চিরকাল কাটিয়ে দিতে পারত। অবশ্য মন যখন অত্যন্ত নিম্নস্তরে অবস্থান করে তখন শত দুঃখেও এর বাইরে যেতে চায় না; এ অবস্থায় মানুষ ও পশুতে পার্থক্য অল্পই। প্রখর ধীশক্তি, সুগঠিত দেহ, প্রভৃত বিত্ত সকলই স্বীয় দেহ সেবায় বা দেহান্তরের সেবায় নিয়োগ হয়। একটা জাতি ব্যষ্টির সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যদি কোন জাতি এ অবস্থায়ই এসে পড়ে তবে তার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হয়। ক্রমে সে জাতি আত্ম-সম্মান, দৃঢ়তা, স্বাস্থ্য, সম্পদ হারিয়ে—দীর্ঘকালের জন্য নানা জঘন্য নিয়মের দাস হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয়, যে তার উদ্ধার সাধন বহু বৎসরের কঠোর সাধনায়ও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইতিহাসে দেখা যায়, শ্রীভগবানের অভিব্যক্ত মায়া শক্তিকে অবজ্ঞা করেই মানব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। মাতৃ জাতির মধ্যেই মহামায়ার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। তাঁদের ভেতরই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি—পাশব শক্তি ও দৈবী শক্তি বিদ্যমান। মানুষ পবিত্র হৃদয়ে যখন মহামায়ার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করে তখনই তার পক্ষে দৈবীশক্তি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

আবার ধর্ম্মেতিহাসে দেখা যায় যে মহামায়ার কাছে শরণাগত না হয়ে শারীরিক শক্তি ও প্রখর বুদ্ধি অবলম্বনে কেবল আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী সাধক সময় সময় এমনি বিপদে পড়ে যান যে বহুকালের চেষ্টাতেও সে অবস্থা হতে মুক্তি পেতে কষ্ট হয়। অভিজ্ঞ সাধকগণ বলেন যে জগতে মাতৃভাবের ন্যায় পবিত্র সম্বন্ধ বিরল; তাই শ্রীভগবানের উপর দে-

প্রকার সম্বন্ধ আরোপ করলেই পবিত্রভাবে অনু প্রাণিত হওয়া মানুষের পক্ষে অনুকূল হয়। এ ভাবের সাহায্যে মন অনেকটা শান্ত হলে সাধক ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বাদ অনুভবে সমর্থ হন। সংযমী সাধক ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হন—'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—জগৎ জুড়ে সকল স্ত্রী জাতিতে তাঁর অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। এস্থলে তন্ত্রের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যায়—"বৃথা ন্যাসঃ বৃথা পূজা বৃথা জপো বৃথা স্তুতিঃ, বৃথা সদক্ষিণো হোমো সদাপ্রিয়করঃ স্ত্রিয়াঃ" শ্রীভগবানের মায়া-শক্তিকে প্রীত না করতে পারলে সমস্ত সাধনা বৃথা। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন—মানবের অন্তর্নিহিত পাশব বৃত্তিকে সংমার্গে পরিচালিত না করে শুধু একটা 'কায়িক শক্তি' দ্বারা দাবিয়ে রাখলে তা হতে নানা প্রকার স্নায়বিক ব্যাধি আসে—কেহ বা বিকৃত মস্তিষ্ক কিংবা উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যায়—ইত্যাদি। অবশ্য সব সময় সকল মানুষই ঐ প্রকার সাধনায় রত থাকতে পারেন না। এ অবস্থায় দেহ সেবাপেক্ষা উন্নততর বিষয়—সাহিত্য বিজ্ঞান, সঙ্গীত, রূপায়তন, চারুশিল্প প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। সভ্যতার অঙ্গ এ সকলই এ ভাবেই গড়ে উঠেছে। একটা ইতিবাচক (positive) জিনিযের চর্চায় অন্যগুলি আপনি নেতিবাচক (negative) হয়ে যায়। যাহার চর্চাফলে মানুষের মন ঈশ্বরমুখী হয় তাহাই সভ্যতার অনুকূল, প্রাচ্য মনীষিগণ বলেন। কাজেই যে জাতির আদর্শ ঈশ্বর লাভের যত অনুকূল সে জাতি তত সভ্য।

মন ভাল চিন্তা না করলে খারাপ চিন্তা করবেই, শূন্য থাকা ওর স্বভাব নয়। আমাদের প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রই সংযমের কথা বার বার বলেছেন। কারণ সংযমহীন জীবনে ইহ পর সকলই বিনষ্ট হয়।

যে কোন পবিত্রচেতা সাধক মহামায়ার স্ত্রী বিগ্রহে মাতৃভাব আরোপ করতে পারেন; এবং বাহ্যতঃ প্রকাশ না করে এ ভাব যত মনে দৃঢ় করা যায় ততই শক্তি সংগৃহীত হয়।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রথমেই এ আদর্শটি মূর্ত হয়ে ওঠে,—জোর করেও তিনি অন্যভাব আনতে পারতেন না। যুগোপযোগী আদর্শ পালন করা অবতার বা যুগগুরুর একটি চিরন্তনী প্রথা। মহাশক্তির অবমাননা করে অধ্যাত্ম-সমুদ্র হতে রত্ন উত্তোলন দূরের কথা, এমন কি জড় রাজ্যে পর্যন্ত প্রবেশ করে সফলতা অর্জনও অসম্ভব। কেহ বা মনে প্রাণে মহাশক্তির সেবা করে ঐহিক সম্পদের অধিকারী হতেছেন—আবার বিরল ২।১ জন ভাগ্যবান মানব ঐ শক্তিকে জগৎ-কারণ আদ্যা শক্তি জেনে সংযম ও প্রীতি দ্বারা সেবা করে জগৎ রহস্য অবগত হতে সমর্থ হন।

সাধারণ মানবের পক্ষে আবার একটি অপরিহার্য বিপদ ঘটে—যখন তার আরাধ্যা দেবী তার কল্পিত আদর্শ হতে অনেক ছোট হন। আজন্ম সংযমী ও ঈশ্বরানুরাগী মন সহজেই যেকোন মাতৃবিগ্রহে যদিও আদর্শ নির্বাচন করতে পারেন—সাধারণের পক্ষে কিন্তু সেরূপ হওয়া সহজ সাধ্য নয়।

বর্তমান যুগের এ আদর্শের সমস্যা সমাধান করার জন্য বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ (অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে) শ্রীরামকৃষ্ণলীলা পুষ্ট করার মানসে মহামায়া পুনরায় শ্রীসারদাদেবী রূপে স্ত্রী তনু ধারণ করে এসেছিলেন। দৃশ্যতঃ তিনি বাংলাদেশের একটি ছোট গ্রামে অতি সাধারণ একটি গৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কি ভাবে ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের নিত্য সহচরী হয়েছিলেন তার বিবরই সংক্ষেপে আলোচ্য।

অবতার পুরুষ বা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির লীলাভূমি ভারত চিরকালই। ধর্ম এঁদের বাদ দিয়ে হয় না। এঁরাই হলেন ধর্মের বহিঃ প্রকাশ,

শ্রীভগবানের সঙ্গে মানবের সংযোগ করা শুধু এঁদের দ্বারাই সম্ভব। আবার ধর্ম্ম অর্থে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বুঝায়। একটা গোটা জাতি কিংবা সমগ্র মানব সমাজ যখন ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ভুলতে বসে তখনই এই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। অবশ্য প্রত্যক্ষানুভূতি সাধারণ মানব মণ্ডলীর পক্ষে চিরকালই সুদূর পরাহত থাকবে—মাত্র দু'একজনের পক্ষেই সম্ভব। তবে এঁরা এসে সমগ্র জগৎকে এ সুযোগ দান করেন, আর জগতে এমন একটা আবহাওয়া এঁদের দ্বারা সৃষ্ট হয়—যার ফলে এঁদের আগমনে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোকে ধর্ম্ম অনুভব করতে পারে—অনেক অল্পায়াসেই দুর্গম পথ যেন সুগম হয়ে যায়। ধন্য ভারতভূমি, আর ধন্য তার দীন দরিদ্র শ্রীহীন শক্তিহীন সন্তানগণ, এযুগেও তাঁরা এমন একটি দেব মানবের শ্রীচরণ রেণু ধারণ করতে পেরেছে। মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন জগতের মনীষিগণের চিন্তা স্রোতে নূতন প্রেরণা দিচ্ছে। তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানবের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলবার সুযোগ দেবার জন্য। আধ্যাত্মিক চরিত্র গড়ে তুলবার জন্য যুগোপযোগী সামাজিক বা নৈতিকাদর্শ সযত্নে পালন করতে হয়। আমাদের এ জাতি বহুকাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত জাতি কর্ত্তৃক শাসিত হয়ে—তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবার দরুণই হোক কিম্বা মহামায়ার 'ভাঙ্গা গড়া' নীতির ফলেই হোক, জাতীয় আদর্শ অনেকাংশে ছোট করে ফেলেছিল। মহামায়ার জীবন্ত প্রতীক মাতৃজাতির প্রতি উদাসীনতা, অযত্ন, অত্যাচার প্রভৃতি অমানুষিক ব্যবহারই প্রধানতঃ অবনতির কারণ এবং ইহার দরুন তাঁরাও (মাতৃজাতিও) নিজেদের স্বরূপ ভুলে যেয়ে—নিজেদের প্রকৃত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হতে ছিলেন। ফলে ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, কৃষ্টি সকলই বিদেশীয় অবজ্ঞা বা ঘৃণার বিষয় হয়ে উঠল।

বিশ্বনৃপতি, তাঁর রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য যেখানেই অরাজকতা বা বিদ্রোহের আভাস লক্ষ্য করেন সেখানেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসেন, আর এক এক জায়গায় এমন শাসন বিধি প্রণয়ন করেন—যা দেখে তাঁর অন্যান্য প্রজাবৃন্দও সতর্ক হয়ে কিছুকাল সাম্য থাকে। আমাদের অধ্যাত্ম রাজ্যের সম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণও যেমন তাঁর প্রধান সমর সচিব বিবেকানন্দকে এনেছিলেন—তেমনি একটি সাম্রাজ্ঞী এনেছিলেন যাঁকে, আজ ভারতমাতার লক্ষ লক্ষ সন্তান "মা" বলে ডাকছেন। এ সম্রাটের বিশেষত্ব ছিল—আমাদের জাগতিক রাজাদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। তিনি নিজের চালচলন, আচার ব্যবহার, সাধন ভজন প্রভৃতি দ্বারা তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দিতেন; কি করে ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে হয় তা তিনি প্রত্যেক ব্যবহারের দ্বারা সাধারণের শিক্ষার্থে প্রকাশ করতেন।

আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অল্পবয়স থেকে আরম্ভ করে যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য্য লাভ করেছিলেন সর্ব্বদাই তাঁর নিকট হতে সশ্রদ্ধ, সযত্ন ও সস্নেহ ব্যবহার পেয়ে খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে নিজ জীবনেও তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী হয়েছিলেন। অবশ্য দেব মানবের দেবী ভার্য্যা না হলে এ শিক্ষা কত দূর ফল প্রসব করত তা কে জানে। যুগে যুগে অবতারগণকে আমরা কিন্তু দেবী ভার্য্যা সহ-ই আসতে দেখি, নইলে লীলা চলবে কেন?

প্রশ্ন হতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বিগ্রহ ও শ্রীসারদাদেবীকে তাঁহার শক্তিভাবে না দেখলে আমাদের ক্ষতি কি? সাধক জীবনের পক্ষে কি ইহা অপরিবর্জ্জনীয়? এ ভাবাবলম্বন ছাড়া কি কোন উন্নতির আশা নেই? শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে—অর্থবলে, নীতিবলে, ধর্ম্মবলে,

ভারত—শুধু ভারত কেন সমগ্র জগৎ কতদূর হীনদশা প্রাপ্ত হয়েছিল তা বিগত শতকের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানব মাত্রই কি জিনিষ পেতে পারে তাও দেখা যাক্। তাঁর জীবনেই বিশ্বমানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা অদ্বৈতভাব ভূমিতে আরূঢ় হবার পরও, তিনি যেন অনেকটা জোর করেই এমন এক স্তরে নেমে এলেন যেখানে অবস্থান করায় অতি পবিত্র স্বভাবের দিব্যপুরুষগণ ছাড়াও ঈশ্বরানুরাগী অনেক সাধারণ ভক্তগণ পর্য্যন্ত তাঁর দেবচরিত্রে প্রবেশ লাভ করতে পারতো। তাঁর জীবন হতে মোটামুটি দেখা যায় মাতৃজাতি ও নির্য্যাতিত মানবগণের জন্য তাঁর মন বিশেষভাবে ব্যথিত হয়েছিল। এই দুই জাতির উন্নয়নকল্পে তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দও বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। মাতা ঠাকুরাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এ দুই ভাবের বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁরা উভয়েই গোঁড়া ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, শ্রীভগবানের ভক্তগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান-গণ্ডির সৃষ্টি কোনকালই করেন নাই—সর্ব্বদা এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের দেবচরিত্রে প্রকাশিত হত। আর শ্রীভগবানের ভক্ত হওয়া যে মানবীয় ধর্ম্ম, সে স্বাধীনতা যে সকলেরই আছে তা কতবার কত প্রকারে কথায় ও কাজে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের জীবন থেকেই বিশ্বপ্রেমের এ ভাষ্য অবগত হওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম্মের সাধনা ও সিদ্ধি লাভ করা সত্ত্বেও প্রথম হতে শেষ সময় পর্য্যন্ত অধিকাংশের নিকট শ্রীভগবানের প্রতি মাতৃভাবই অবলম্বন করতে উপদেশ দিতেন। সন্ন্যাস নিয়ে অদ্বৈত সমুদ্রে ডুবে গেলেন, তাও জগদম্বার আদেশ মত, আবার ফিরে এসে "ভাব মুখে" রইলেন—সে অবস্থায়ও মায়ের ছোট শিশুটির মতই ছিলেন। নিখিল মাতৃ-জাতির নিকট চিরকাল শিশুপুত্র ছাড়া অন্য ভাবের বিকাশ তাঁতে দেখা যায় নাই। যৌবনে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন হেতু দার-পরিগ্রহ করেও সম্পূর্ণ দেহ-জ্ঞান মুক্ত মায়ের সন্তান ছাড়া আর কিছু তিনি হতে পারলেন না। আর মাতাঠাকুরাণী শৈশবে মা, যৌবনে মা, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মা-ই—এ ভাবের ব্যতিক্রম তাঁর চরিত্রে দেখা যায়নি। এর ফলে তাঁর জীবদ্দশায় কয়েক সহস্র ভাগ্যবান মানব তাঁকে মা ডাক্‌বার সুযোগ পেলেও আজকাল কিন্তু কয়েক লক্ষ মানব তাঁকে মা ডাক্‌তে চায়। কে জানে সময়ে কয় কোটি মানব তাঁকে মা ডাক্‌বে! মনোবিজ্ঞানে আর একটি ভাব দেখা যায়—যাঁর ভেতর মাতৃভাবের বিকাশ তেমন ভাবে প্রকাশ হয়নি, তাঁকে মা ডাক্‌তে অনেক সময় সঙ্কোচ আসে এবং তিনিও যেন সর্ব্বান্তঃকরণে সে ডাকে সাড়া দিতে ইতস্ততঃ করেন। এ দেবী যেন মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশু পক্ষীর কাছ থেকেও মা-ডাক শুনবার জন্য ব্যাকুল! একটা জাতির উন্নয়নকল্পে এ দেব-দেবী প্রদর্শিত পবিত্র ভাব অবলম্বন যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক। যে রোগের বীজাণু নষ্ট করা যে ওষুধের দ্বারা সম্ভব সে ওষুধই প্রযুক্ত নহে কি? তাই ইঁহাদের আদর্শে এযুগে মাতা ও সন্তান তৈরি করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

তিথি পূজার বৈশিষ্ট্য—আমরা যে মহৎ চরিত্রে অনুপ্রাণিত হই সে চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও তাঁর পবিত্র ভাবের কথা বারবার স্মরণ করা। এ রীতি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ ভাব অনুকরণেই সর্ব্বদেশে নানাপ্রকার "জয়ন্তী" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ দেবীর জন্ম তিথিতেও যেন আমরা সে উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই। জাতীয় জীবনের এ দারুণ দুর্দ্দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিরূপে—তিনি এসেছিলেন—এই মাতৃভাব সুদৃঢ় করে

স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতির সম্মুখে এ উচ্চ আদর্শ স্থাপন করবার জন্য। পবিত্রতা ও সংযম ছাড়া জাতীয় জীবন দীর্ঘজীবী হয় না: তাই এ আদর্শ অবলম্বন করলে আমাদের জীবনী শক্তি যে বৃদ্ধিই হবে, তা সুনিশ্চিত। তাই আজ তাঁর কথা—তাঁর শুভ জন্মতিথি অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথির কথা স্মরণ করে বলি—এস ব্রাহ্মণ, এস শূদ্র, এস উন্নত, এস পদদলিত, এস হিন্দু, এস খ্রীশ্চান সকলে মিলে মনুষ্য জাতির এ আদর্শটিকে বারবার স্মরণ করি। ভিন্ন আদর্শের জাতিসমূহের অসংখ্য আক্রমণ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বশতঃ ভারত কিন্তু আজও তার আদর্শ একেবারে ভুলে যায়নি—যুগে যুগে মহামায়া ভারতকে এ আদর্শ ভুলতে দেননি।

দেবি মহামায়ে তুমি কৃপা করে সদ্বুদ্ধি না দিলে মানব কি করে তোমায় জানতে পারে? তোমার ইচ্ছায়ই তো এতকাল তোমার সন্তানগণকে সংসারাসক্ত করে রেখেছ—আবার তোমাকেই যে মা এ বন্ধন মুক্ত করে দিতে হবে। বেদবেদান্ত সবইতো তোমারই ইচ্ছায়, আবার নানা জড় বিজ্ঞানও কি তোমার ইচ্ছা ছাড়া? এ জীবন সমস্যায় কোনটি শ্রেয়: কোনটি প্রেয়: তা তুমি ছাড়া কে বলবে! অনন্ত কর্ম প্রবাহতো চলছে, এর বিরাম তুমি ছাড়া আর কে করবে। ব্যক্তিগত, জাতিগত সমস্যার তুমিই সমাধান কর। তাই মা আজ তোমার শ্রীচরণে ব্যক্তি, জাতি, দেশ, বিদেশ সকলের কল্যাণের নিমিত্ত শরণাগত তোমার সকল সন্তানের পক্ষ হতে প্রার্থনা নিবেদন করছি—

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে"।

গোমুখী যাত্রা

গঙ্গোত্তরীর পথে

(সমাপ্ত)

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

তপ্ত কুণ্ডে স্নানের ফলে পারলৌকিক কল্যাণ হউক বা না হউক উহা যে শরীরের পক্ষে হিতকর সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। উষ্ণ প্রস্রবণের জলে sulphur dioxide ও sulphuretted hydrogen যথেষ্ট পরিমাণ আছে বলিয়া মনে হইল। কাজেই ঐ জলে স্নান করিলে শরীরের স্নায়ু দোষ ও বাতরোগ দূর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতবাসী দৈহিক মঙ্গলের জন্য ঐ জলের আদর করিতে শিখে নাই। ঐহিক কল্যাণ অপেক্ষা পারত্রিক কল্যাণের দিকেই তাহার নজর বেশী। চিরদিনই ভারতবাসী ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সব জিনিস দেখিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে যাহা কিছু বিস্ময়কর, সুন্দর, মহৎ ও হিতকর তাহাই সে ধর্ম্মার্থে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার পাশ্চাত্যে রজোগুণের উদ্রেক করিয়া প্রবল ভোগস্পৃহা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত করে ভারতবাসীর হৃদয়ে উহারা সত্ত্বের উদ্ভব করিয়া সংযত ও ভোগবিমুখ হইতে শিক্ষা দেয়। আমরা যে সকল স্থান তীর্থে পরিণত করি, পাশ্চাত্য সেরূপ স্থানে স্বাস্থ্য নিবাস বা রাত্রির

কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা যাহা ঋষির নামের সহিত বিজড়িত করি প্রতীচ্য সেখানে লৌকিক নাম নির্দ্দেশ করিয়াই তৃপ্ত। আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডল পাশ্চাত্যের The Great Bear হিমালয়ে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়, উহাদের কোন কোনটির জল যে রোগবিশেষের পক্ষে উপকারী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই রূপ স্থলে পাশ্চাত্যে কত স্বাস্থ্য নিবাস, স্নানাগারের উদ্ভব হইত, দেশ বিদেশে জল রপ্তানিরও কত ব্যবস্থা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবাসী এক্ষেত্রে পারলৌকিক কল্যাণ নিয়াই অধিক ব্যস্ত।

গঙ্গনানীতে কালিকমলি বাবার কোন ধর্ম্মশালা নাই। তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটি অতি বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। শুনিলাম উহা পিলিভিতের জনৈক শেঠের যশোময়ী কীর্ত্তি। ধর্ম্মশালায় সাধুদের সদাব্রতেরও ব্যবস্থা আছে। বহু যাত্রী ভাণ্ডার হইতে সিধা লইয়া যাইতেছিল। আমরাও সিধা লইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিন প্রাতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী 'সুখী' অভিমুখে রওনা হইলাম। গঙ্গানি হইতে বাহির হইয়াই একটি সুদৃশ্য লোহনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে হইল। এইরূপ সেতু এই বৎসরই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রকার আর একটি সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্যও অন্যত্র আরব্ধ হইয়াছে। শুনিলাম কাঠের পুলগুলি ক্রমে ক্রমে লৌহ সেতুতে পরিণত হইবে। লৌহ সেতুগুলি যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি দৃঢ়, স্থায়ী ও নিরাপদ। পাশ্চাত্য স্থপতি বিদ্যা সুদূর হিমারণ্যেও ধীরে ধীরে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আর প্রাচ্য বিজ্ঞান নিশ্চেষ্ট জড়তায় অবশ অসাড় হইয়া দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

পূর্ব্বদিনের বৃষ্টির ফলে রাস্তা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই সকল স্থান অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করিতে হইল। প্রায় সাড়ে চার মাইল চলিয়া একটি চটি ও ধর্ম্মশালা দেখিতে পাইলাম। উহাদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক মনে হইল না। স্থানটির নাম লোহার ভাঙ্গা। সেখান হইতে আর সাড়ে চারি মাইল চলিয়া সুখীতে উপস্থিত হইলাম। তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, শরীরও ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল। মনে করিলাম ধর্ম্মশালায় পৌছিতে আর বেশী বাকী নাই। কিন্তু একজন পাহাড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ইস্ পাহাড়ীকে মোড়কে উপর চড়কর আপকো ধরমশালা মিলেগী।" অগত্যা আমরা শ্রান্তদেহে আধ মাইল চড়াই করিয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

সুখী হইতে গঙ্গা অনেক দূরে। বৈকালে প্রায় সাড়ে তিন মাইল চড়াই উতরাইর পর গঙ্গার সমীপবর্ত্তী হইলাম। গঙ্গার ধারে পাহাড়ের উপরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের নাম ঝালা। বাড়ীগুলি সম্পূর্ণ কাঠের। এখানে গঙ্গা অতি শান্তভাবে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গার সেই প্রচণ্ড রুদ্ররূপ আর নাই, উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ প্রশমিত, বজ্রনির্ঘোষ মধুর কলনাদে পরিণত। সমতলের গঙ্গার মত গঙ্গাগর্ভ বিস্তৃত হইলেও ধারা অতিশয় ক্ষীণ। গঙ্গাগর্ভে ছোট বড় অনেকগুলি চড়া পড়িয়াছে। হিমালয়ে গঙ্গার এরূপ দৃশ্য আর কোথায়ও দেখি নাই।

গ্রামের প্রান্তভাগে রাস্তার ধারে একটি ছোট দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। আমরা উহা অতিক্রম করিতে না করিতে কে একজন উচ্চস্বরে পেছন হইতে ডাকিলেন, "মহাত্মাজী।" ফিরিয়া দেখিলাম ধর্ম্মশালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া একজন দীর্ঘকায় দীর্ঘকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু ব্যক্তি হস্তসঞ্চালন পূর্ব্বক আমাদিগকে আবাহন করিতেছেন। বেশ দেখিয়া মনে হইল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। নিকটে যাইয়া শুনিলাম ধর্ম্মশালায় পাঞ্জাবী সত্রের পক্ষ হইতে সাধুদিগকে সদাব্রত দেওয়া হয়। ব্রহ্মচারীজি

উহার তত্ত্বাবধায়ক। আপন কর্ত্তব্য পালনের জন্যই ব্রহ্মচারীজি আমাদিগকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা যচ্ছদৃালব্ধ ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করিয়া পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পশ্চিমদিক্ হইতে একটি স্রোতস্বিনী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু গঙ্গায় পতিত হইয়াও গঙ্গার সহিত মিশিতে পারিতেছে না। কারণ গঙ্গার জল ধূসর আর উহার জল শ্যামল। লোকে ইহাকে শ্যামগঙ্গা বলিয়া থাকে।

আর কিছুক্ষণ পর একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রাস্তার দুইধারে কাঠের বাড়ীগুলি দিবাশেষে স্নিগ্ধ আলোকে মণ্ডিত হইয়া অতি অপরূপ দেখাইতেছিল। ঘরের ভিতরে ও বাহিরে পুরুষ ও মেয়েরা কেহ সূতা কাটিতেছিল, কেহ পশম পরিষ্কার করিতেছিল, কেহ বা লুই বুনিতেছিল। বেলা অবসান প্রায় দেখিয়া সকলেই আরব্ধকার্য্য পরিসমাপ্তির জন্য ব্যস্ত। কাজ করিতে করিতেই আমাদিগকে সসম্ভ্রমে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। বিক্রয়ের আশায় কেহ কেহ ২।৪ খানা লুই ও কম্বল আনিয়া আমাদিগকে দেখাইল। কাশ্মীরের তুলনায় এখানকার বয়নশিল্প অপকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইল। দর বেশী না হইলেও বহন করিবার ভয়ে কিনিতে ভরসা হইল না। আলমোড়া ও গাড়োয়াল অঞ্চলের পাহাড়ীদের চেহারা অনেকটা আমাদের মত কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের চেহারা মঙ্গোলীয়দের ন্যায়। ভুটিয়া ও তিব্বতীদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। গঙ্গোত্তীর পথে ভুটিয়া ও তিব্বতীদিগকে প্রায়ই ভেড়া ও ছাগলের পাল লইয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়। এক একটা পালে ৬০০।৭০০ পশু থাকে। অনেক দূর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জুড়িয়া তাহারা চলিতে থাকে, সে সময় যাত্রীদের পক্ষে পথচলা দায় হয়। ঐ সকল ছাগল ও ভেড়ার পীঠে করিয়া তাহারা তিব্বত ও ভুটান হইতে পশম, লবণ, সোহাগা, শিলাজতু ইত্যাদি লইয়া আসে, আর এদিক হইতে কাপড়, গম, তামাক ইত্যাদি লইয়া যায়। এই 'হরশিল' গ্রামের বাজারে প্রতিবৎসর তিব্বত হইতে আনীত প্রচুর পশম বিক্রয় হয়।

হরশিলের অধিবাসিগণকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে হইল। শুনিলাম গ্রামের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির আছে। এখানে রাজারাম ব্রহ্মচারী নামে একজন প্রতাপশালী "ঘরবাড়ী সাধু" * বাস করেন। তিনি গোসাইদের মত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার বাড়ীতে সাধুদের সদাব্রত আছে। সমাগত প্রত্যেক সাধুকে কিছু ছোলাভাজা ও গুড় দেওয়া হয়।

---

* কখন কি ভাবে রাজারামের পতন হইয়াছিল আমাদের জানিবার অবকাশ হয় নাই। যদি কোন সন্ন্যাসী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পথভ্রষ্ট হইয়া কোন স্ত্রীলোকের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং বাড়ী ঘর করিয়া গৃহস্থালি করেন তাহা হইলে চলতি কথায় তাঁহাকে ঘরবাড়ী সাধু বলা হয়। ঘরবাড়ী সাধুগণ সাধারণ গৃহস্থের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও মস্তকে একটি গেরুয়া রঙ্গের উষ্ণীষ ধারণ করেন। আমরা রাজারামের মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি দেখিয়াছি। তাঁহার বয়স ৭০।৭৫ বৎসর হইবে।

ইঁহাদের বংশধরগণ নিজ নিজ নামের সহিত 'সন্ন্যাসী' বা 'ব্রহ্মচারী' আখ্যা যোগ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও কোন পরিবারে 'চন্দ্রগিরি সন্ন্যাসী' এইরূপ নাম দেখিয়াছি। ইহাতে মনে হয় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ 'গিরি' আখ্যাধারী সন্ন্যাসী পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। হিমালয়ের কোন কোন স্থানে ঘরবাড়ী সাধুর বংশধরগণ গোষ্ঠিবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি সমাজ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্দিরের সেবায়েত, কেহ বা ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। সাধারণত "জনম যোগী" বলিয়া ইঁহারা পরিচিত। নামটা অনেকটা বাংলা দেশের "জাত বৈরাগীর" মত। ইঁহাদের সহিত পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য গৃহত্যাগী সাধুগণ কখন কখন "করম যোগী" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হরশিল অতিক্রম করিয়া একটি পুলের উপর দিয়া গঙ্গার পূর্বতীরে উপস্থিত হইলাম।* সূর্যদেব তখন পর্বতান্তরালে অন্তহিত হইলেও অস্তমিত হন নাই। পশ্চিম তীরস্থ পর্বত চূড়া লোহিত প্রভায় মণ্ডিত হইয়াছে, এদিকে পূর্ব গগন হইতে ধূম্রবর্ণ মেঘের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। সান্ধ্য ছায়ায় বৃক্ষ শ্রেণী স্তিমিত লোচনে চাহিয়া আছে। দূরস্থ দৃশ্যরাজি ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল। পশ্চিম তীরে পর্বতান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া একটি নির্ঝরিণী সহস্র উপলরাশি বিধৌত করিয়া গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করিতেছিল। তাহার অব্যক্ত মধুর কলধ্বনিতে কি এক করুণ সুর বাজিতেছিল, যেন পূরবী রাগিণীতে স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম,—

"আসি যাই, যাই আসি,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই,
কেন আসি, কেন যাই,
জানি না, বুঝি না তাই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।"

সন্ধ্যার ছায়ায় প্রায় দুই মাইল চলিয়া ধরালিতে পৌছিলাম। এখানে জয়পুর রাজের একটি বিরাট ধর্মশালা আছে। বড় বড় শুষ্ক দেবদারু কাঠে বাড়ীটি তৈরী। ইতিপূর্বেই বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। আমরা দ্বিতলের একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে স্থান পাইলাম। কালিকমলি বাবার ধর্মশালা এখানে দেখিতে পাই নাই। ধরালি গঙ্গার বামতীরে অবস্থিত। অপর পারে মুখীমঠ। তথায় গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদের অধিবসতি। মুখীমঠে গঙ্গাজীর মন্দির আছে। শীতের ছয় মাস তথায় গঙ্গাদেবীর সেবা পূজা হয়, কারণ বিগ্রহ তখন গঙ্গোত্তরী হইতে মুখীমঠে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ধরালির আশে পাশে কোন কোন সাধু গঙ্গাতীরস্থ কুটিয়ায় অথবা গিরি গুহায় অবস্থান পূর্বক তপশ্চর্যা করেন। উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ মহাত্মা কৃষ্ণাশ্রম একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরালিতে ছিলেন। এখনও শীতকালে গঙ্গোত্তরী হইতে ধরালিতে আসিয়া থাকেন। তিনি শীত গ্রীষ্ম বারমাস নগ্নদেহে অনাবৃত স্থানে কাটাইতেন। তুষার পাতের সময়ও কোনরূপ কৃত্রিম আচ্ছাদনের নীচে যাইতেন না। ধরালিতে একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত দেখা হইল, তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থান পূর্বক অতিশয় কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন।

পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাজীকে স্মরণ করিয়া ধরালি হইতে বাহির হইলাম। গঙ্গোত্তরী পৌছিবার আর মাত্র তের মাইল বাকী। আজ আমাদের যাত্রার ষোড়শ দিবস। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পথে অবস্থান না করিয়া একেবারে গঙ্গোত্তরী যাইয়া উঠির স্থির হইল। চারি মাইল অগ্রসর হইয়া একটি চটিতে বসিয়া ভাল করিয়া জলযোগ করা গেল। দোকানদার সযত্নে খাঁটি গরুর দুধ জ্বাল দিয়া দিল, আর আমাদের সঙ্গে ছিল যবের ছাতু ও চুরমা। আমরা উত্তরকাশীতে দ্বিতীয় বার চুরমা তৈয়ার করিয়া নিয়াছিলাম। এখানকার গোশালায় গরুই ছিল, মহিষ ছিল না। হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশে, বিশেষ শীতকালে, মহিষ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ গরু যত শীত সহ্য করিতে পারে মহিষ তত পারে না। এই চটির নাম জাঙ্গলা চটি। স্থানটি জঙ্গম ঋষির তপস্যাস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। চটির নিকটে জঙ্গম ঋষি নামে একটি ছোট কুটিয়া আছে। খুব সম্ভবতঃ জাঙ্গলা শব্দ জঙ্গম ঋষির নামের অপভ্রংশ। হরশিল হইতে আর একটি রাস্তা গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া মুখবা হইয়া জাঙ্গলাতে গঙ্গোত্তরীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। মুখবা মুখীমঠের অপর নাম।

আর এক মাইল পর ভৈরবঘাটির চড়াই দেখা দিল। এখানে দুরারোহ উত্তুঙ্গ পর্বত পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। ভাগীরথী দুইটি অত্যুচ্চ পর্বতের মধ্যদিয়া সবেগে বাহির হইতেছেন। উত্তর দিকে জাহ্নবী গঙ্গা পর্বতান্তরাল হইতে নির্গত

হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে ভাগীরথী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উহা তিব্বত হইতে ভুটান হইয়া আসিয়াছে বলিয়া ভোটগঙ্গা নামেও পরিচিত। নিকটেই ভুটান হইয়া তিব্বতে যাইবার গিরিবর্ত্ম আছে। পূর্ব্বে গঙ্গা পার হওয়ার জন্য দুই পর্ব্বতের শিখর দেশে দড়ির ঝোলা ছিল। এখনও ঝোলার ছিন্নাংশ পর্ব্বতের গায়ে ঝুলিতেছে। উহা এত উচ্চে অবস্থিত যে ঘাড় সম্পূর্ণ না বাঁকাইলে নিম্নদেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন গঙ্গার কিছু উপরেই একটি কাঠের পুল দুই পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ সংযুক্ত করিতেছে। এখানে গঙ্গার সেই রুদ্ররূপ পুনরায় দেখিতে পাইলাম। সেই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, ভীম নিনাদ, ফেনময় আবর্ত্তোচ্ছ্বাস যাত্রিগণের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া ভৈরবঘাটি নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। চড়াইর মুখে পুলের নীচে একটি নির্ঝর হইতে আরক্ত জল নিঃসৃত হইতেছে। ঐ জল যে গর্ত্তে সঞ্চিত হইতেছে, উহার তলায় সিন্দুর জমিয়া আছে। ইহাকে Vermilion Spring বলা যায়। Copper sulphate মিশ্রিত থাকায় জলের স্বাদ কষায় রস যুক্ত।

এর পর ভৈরবঘাটির বিকট চড়াই আরম্ভ হইল। আমরা ধীরে ধীরে নিয়মিত গতিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কোন কোন যাত্রী তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে স্থির হইয়া দাঁড়াইবা মাত্র আমাদের শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। এইরূপে আধমাইল চড়াই করিয়া একটি বিস্তীর্ণ শৈলতলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কালিকমলি বাবার ধর্ম্মশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। চারিদিকে বড় বড় বহু দেবদারু বৃক্ষ থাকাতে স্থানটি বড়ই স্নিগ্ধ ও মনোরম বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই ভৈরবজীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ধর্ম্মশালার সমীপে একটি কুঠরী মধ্যে পানীয় জলের চৌবাচ্চা আছে। কোন দূরবর্তী ঝরণার জল কাঠের নলযোগে ঐ চৌবাচ্চায় সঞ্চিত হইতেছে।

ভৈরবঘাটি ধরালি ও গঙ্গোত্তরীর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। ধর্ম্মশালা হইতে গঙ্গোত্তরী ছয় মাইল হইবে। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় চড়াই উতরাই বেশী ছিল না। রাস্তার দুই ধারে নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী বৃষ্টির জলে নিরন্তর অভিসিঞ্চিত হইতেছিল। উহাদের নীচে দাঁড়াইয়াও রক্ষা পাইবার জো ছিল না। আমরা তিনঘণ্টায় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নের পর গঙ্গোত্তরীতে পৌছিলাম।

"ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচার

শ্রীহরদয়াল নাগ

বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে লিখিত হইয়াছেঃ "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"। টীকাকারেরা যাহাই লিখেন না কেন, "অভ্যুদয়" শব্দের সাধারণ অর্থ বৃদ্ধি এবং "নিঃশ্রেয়স" শব্দের অর্থ—মোক্ষ। যাহা হইতে বৃদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়, আর কিছু দ্বারা হয় না, ঐ শ্লোকের এই অর্থ করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নীতির অতীব অনুদার ব্যাখ্যা করা হয়। নিত্য পদার্থ অণু হইতে জড়জগৎ, উদ্ভিদ্ জগৎ এবং জীবজগৎ সৃষ্টি হয়। এই জগৎত্রয়েরই ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ এই জগৎত্রয়ের প্রত্যেক জড় পদার্থ, উদ্ভিদ্ ও জীবের অণু হইতে উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম, অভ্যুদয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি আছে। ভগবান যখন বহু হইতে ইচ্ছা করেন তখনই এই ত্রিবিধ জগৎ সৃষ্টি হয়। পরমাত্মারূপী ভগবান বহু হইয়া পৃথক ভাবে দেহাদিতে প্রবেশ করেন। পরমাত্মার অংশ দেহাদিতে প্রবেশ করিলে জগৎত্রয় কর্ম্মময় হয়। এই কর্ম্মময়তাই ধর্ম্ম। মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি শব্দ হইতে বন্ধন শব্দ অনুমিত হয়। বন্ধন না হইলে মুক্তি অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। সমুদ্রের জল যখন ঘটে প্রবেশ করে তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ বন্ধন হয়। আবার ঐ জলই যখন সমুদ্রে মিলিত হয় তখন তাহার বন্ধন মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। তদ্রূপ জীবদেহরূপ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াকেই মোক্ষ বলা হয়। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অভ্যুদয় ও মুক্তি লাভই জগৎ-ত্রয়ের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম লাভের জন্য প্রয়োজন কর্ম্মের।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিত হইয়াছে "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"- ইহার ভাবার্থ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি সাধক ত্যাগই কর্ম্ম। প্রাণিজগতের হিতার্থে আত্মত্যাগই যে একমাত্র কর্ম তাহার প্রমাণ সৃষ্ট জগতের যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই পাওয়া যায়। সূর্য্য জড় পদার্থই হউন, কি মহাপ্রাণই হউন, আহার নিদ্রা বিহীন হইয়া, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া, জগৎত্রয়কে কিরণ দান করিতে করিতে নিজকে বিলাইয়া দিতেছেন। শাস্ত্রকারদের মতে তিনিও প্রলয়কালে ধ্বংস হইবেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যের ক্ষয় যেরূপ দ্রুতগতিতে চলিতেছে তাহাতে প্রলয় কালের বিলম্ব থাকিলেও সূর্য্যের মোক্ষ লাভের খুব বিলম্ব নাই। সূর্য্য ধ্বংস হইলে সূর্য্যমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহাদির কি দশা হইবে তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদি "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ" নিজ নিজ নশ্বর দেহ জগতের হিতকর কর্ম্মে ব্যয় করিয়া "নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ" লাভ করিতেছেন। উদ্ভিদ জগতেও আমরা কি দেখিতেছিঃ বৃক্ষ জন্মিতেছে, অভ্যুদয় লাভ করিতেছে পত্র ফুল ফল ধারণ করিয়া বিলাইয়া দিতেছে, নিজে কিছুই ভোগ করিতেছে না, অবশেষে কালের হাতে আত্মাহুতি দিয়া মুক্তিলাভ করিতেছে। বৃক্ষলতা গুল্মাদি উদ্ভিদ্ জগতের সকলেই জগতের হিতের জন্য স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া নিজ নিজ দেহ বিলাইয়া দিতেছে। প্রাণিজগতের দৃষ্টান্তগুলি আরও অধিকতর উপদেশপ্রদ: মলজ পোকা ভেকাদির উদরে যাইয়া অন্নদান করিতেছে।

ভেক সর্পের আহার হইয়া জীবন আহুতি দিতেছে। এই ভাবে সকল প্রাণীগুলিই ক্রম বিকাশের পথে অমৃতের দিকে অগ্রসর হইতেছে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া। গোজাতির 'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ' আদর্শ স্থানীয়। গোজাতি লোকালয়ে থাকিয়া ক্রম বিকাশের পথে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মানব জাতিকে সর্ব্বস্ব দান করিতেছে। গোদুগ্ধ অভাবে যে মানবের কি দশা হইত তাহা কল্পনা করাও সুকঠিন। যে ভাবে গোয়ালারা গোবৎসদিগকে কষ্ট দিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সমস্ত শ্রমদান করিয়াও গোজাতি মানব-জাতি হইতে উপযুক্ত প্রত্যুপকার এমন কি উপযুক্ত আহার পর্য্যন্ত পাইতেছে না। অবশেষে গোজাতির মাংস, অস্থি, চর্ম্ম পর্য্যন্ত মানব জাতির সেবায় লাগিতেছে, ক্রম বিকাশের শীর্ষ স্থানীয় মানুষ কি করিতেছে?

মানব প্রকৃতি

একই জাতীয় দ্রব্য হইতে সমস্ত মানব দেহ উৎপন্ন হইলেও মানব জাতির মধ্যে যেরূপ সজাতীয়তার অভাব সেইরূপ সজাতীয়তার অভাব গোজাতি প্রভৃতি অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। মানব জাতির মধ্যেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি ভেদ দেখা যায়। গোজাতির মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। হিন্দু মুসলমানের জল পান করিলে তাহার জাতি যায়। হিন্দুর গরু মুসলমানের জলপান করিলে গরুটির জাতি যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানব জাতির ধর্ম্ম আছে, গোজাতির ধর্ম্ম নাই। তাই কি সত্য? গোজাতির একেশ্বরবাদ হিন্দু মুসলমানের শাস্ত্রে লিখা না থাকিলেও অমৃত অক্ষরে অমৃত ভাষায় আকাশের গায়ে লিখা আছে। গোজাতির ভগবানের অর্চ্চনা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই ইহাও একেবারে ঠিক কথা নহে। যখন রাজা বিশ্বামিত্র লোভপরবশ হইয়া বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমস্থ কামধেনু গাভীটি সসৈন্যে বন্ধন করিয়া হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন গাভীটি প্রথমতঃ বশিষ্ঠ মুনির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় গাভীটি তাহার সৃষ্টি কর্ত্তার শরণাপন্ন হয় এবং রাজা বিশ্বামিত্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজা বিশ্বামিত্র এই ঘটনায় রাজশক্তি হইতে ব্রহ্মণ্যশক্তির প্রাবল্য দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনি হইলেন। ইহা ত মহাভারতের কথা, হিন্দুকে কোন অহিন্দু স্পর্শ করিলে, মুসলমানের কোন আচারগত কার্য্যে কেহ বিঘ্ন ঘটাইলে তাহারা চীৎকার দিয়া বলিবে, আমাদের "ধর্ম্ম গেল"—"ধর্ম্ম গেল"। এইরূপ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদেরই ধর্ম্ম হইতে তাহাদের আচার বড়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক আচারগত প্রথায় পরিণত হইয়াছে। মানবজাতি মানবধর্ম্ম ও মানবাচার পরিত্যাগ করতঃ কতকগুলি ব্যবহারিক আচারের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিতে, সম্প্রদায়ে ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে। মানবেতর সমগ্র সৃষ্ট জগৎ নিজ নিজ দেহ বিলাইয়া দিয়া একই বিভুর অর্চ্চনা করিতেছে, তাঁহার অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিতেছে এবং সজাতীয়তা রক্ষা করিতেছে; আর কেবল মানুষ দেহসর্ব্বস্ব জ্ঞানের পরাধীন হইয়া দেহকে নানাবিধ ভেদ প্রদর্শক বেশে ও সাজে সাজাইয়া বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আচারে একই ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া এক ঈশ্বরের বিভিন্নতা প্রচার করিতেছে; কেবল তাহাই নহে "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচার করিয়া, ধর্ম্মের নামে মারামারি, কাটাকাটি—খুন জখম ইত্যাদি এমন কাজ নাই যাহা না করিতেছে। মানবধর্ম্মবিরোধী মানব প্রকৃতিই "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ধর্ম্ম কোন শব্দাধীন নহে।

ধর্ম্ম শব্দাতীত

ধর্ম্ম হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন শব্দাধীনই নহে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনুগত অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মগত। মানবধর্ম্ম মানবোচিত কর্ম্মগত। হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিতে গেলে "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচার করা হয়। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমের কামধেনু গাভীটি দুগ্ধাদি দ্বারা বশিষ্ঠমুনির অতিথিদিগকে সেবা করিত। তাহাই ছিল তাহার গোধর্ম্ম। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের মলিনতা দূর এবং মানবধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—হিন্দুধর্ম্মের নহে। যীশুখ্রীষ্ট মানবজাতির মুক্তির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলই সাধনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সাধনা সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। ঐ সমস্ত বিশ্বপুরুষগণের বিশ্বধর্ম্ম প্রারম্ভে বিশ্বব্যাপকই ছিল। কালস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া তৎসমস্তই সাম্প্রদায়িকতারূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু মনে করিতেছে হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরাই নিজ নিজ ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম মনে করিতেছে। "কালী" শব্দ যেমন দাস শব্দ যোগে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ "ধর্ম্ম" শব্দ "হিন্দু", "মুসলমান" ইত্যাদি শব্দ যোগে হ্রস্ব অর্থাৎ খাট হয়। হিন্দু মুসলমানাদি সাম্প্রদায়িক শব্দগুলির সহিত "ধর্ম্ম" শব্দের যোগ হইয়া ইহার বিশ্বব্যাপকতা ধ্বংস হইতেছে এবং সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহা হইতে ধর্ম্ম শব্দের ব্যভিচার আর কি হইতে পারে? যদিও অনেক হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাস করে যে হরি ও খোদা একই, তথাপি হিন্দু খোদার নাম লইলে এবং মুসলমান হরির নাম লইলে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়। হিন্দু "হরি" শব্দের দ্বারা যাঁহাকে বোঝে, মুসলমান "খোদা" শব্দ দ্বারা তাঁহাকেই ডাকে। তথাপি হিন্দু "হরি" শব্দকে ধর্ম্মাধীন না করিয়া ধর্ম্মকে "হরি" শব্দের অধীন করিতেছে। মুসলমানও তদ্রূপ করিতেছে। তাহারা কেহই ভাবিতেছে না যে "ধর্ম্ম" কোন শব্দের অধীন নহে। ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে শব্দাতীত।

ধর্ম্মের স্বরূপ

যাহার যে প্রাকৃতিক কর্ম্ম তাহাই তাহার ধর্ম্মের স্বরূপ। সূর্য্যের সূর্য্যত্বই তাঁহার ধর্ম্মের স্বরূপ। অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নিধর্ম্মের স্বরূপ। শৈত্যই জলধর্ম্মের স্বরূপ। জল অগ্নিকে ধ্বংস করে এবং অগ্নি জলকে ধ্বংস করে। সুতরাং এই দুইটির ধর্ম্ম সজাতীয় নহে। একে অন্যের বিজাতীয়। কিন্তু সকল দেশের সকল স্থানের জলগুলিই সজাতীয় ও শৈত্যই সকল জলের ধর্ম্মের স্বরূপ। সকল দেশের অগ্নিও একই জাতীয় এবং একই ধর্ম্ম বিশিষ্ট। আম্রবৃক্ষ জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলফুলাদি দ্বারা জগতের সেবা করিয়া মোক্ষলাভ করিতেছে। অন্যান্য ফলবৃক্ষেরও এই একই জাতীয় ধর্ম্ম। সমস্ত ফুলগাছেরও সজাতীয়তা ও জাতীয় ধর্ম্ম আছে। তাহারাও জন্মিতেছে বৃদ্ধি হইতেছে ফুলাদি দানরূপ ধর্ম্ম পালন করিতেছে এবং মোক্ষলাভ করিতেছে অর্থাৎ মরিতেছে। উদ্ভিদ জগতে বিজাতীয় ধর্ম্ম সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু জীবজগতে বিজাতীয় ধর্ম্ম প্রায়ই দেখা যায়। ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম গো হরিণাদি ভক্ষণ করা। ব্যাঘ্রধর্ম্ম গো-হরিণাদি জাতীয় ধর্ম্মের বিজাতীয় ধর্ম্ম। এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রকে হিংসা করিতে পারে। কিন্তু ঘৃণা করে না। দুই ব্যাঘ্রের মধ্যে কলহ হয় বটে কিন্তু কেহ কাহাকে বিজাতীয় রূপে ব্যবহার করে না। কোন ব্যাঘ্রই ব্যাঘ্রধর্ম্মস্বরূপ নষ্ট করে না। সকল ব্যাঘ্রের একই ধর্ম্ম স্বরূপ।

কাকে কাকে সর্ব্বদাই কলহ হয়, কিন্তু একটি কাককে কাকেতর কেহ আক্রমণ করিলে সমস্ত কাকই আক্রান্ত কাকের পক্ষে দাঁড়ায় এবং কাক

ধর্ম্মের স্বরূপ রক্ষা করে। জড়জগতাদি ত্রিজগতের কোন সজাতীয় শ্রেণীর মধ্যে বিজাতীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মভেদ নাই। আছে কেবল মানব জাতির মধ্যে। মানুষ হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বিজাতীয়তা কি বিভিন্নতা নাই। জন্মিবার পূর্ব্বে কেহই হিন্দু কি মুসলমান থাকেনা। মৃত্যুর পরও কাহারও হিন্দুত্ব কি মুসলমানত্ব যায় না। এক হিন্দুনারী যদি একটি সন্তান প্রসব করিয়া কোন মুসলমান নারীকে দেয় এবং সন্তানটি জন্মাবধি ঐ মুসলমান নারী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর সন্তান পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা মুসলমান হইয়া যায়। হিন্দুত্ব কি মুসলমানত্ব জন্মগত নহে, কর্ম্মগতও নহে, কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতা প্রসূত। মানুষ যখন জন্মে তখন মানুষ রূপেই জন্মে, কেবল সাম্প্রদায়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিভিন্নজাতিতে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত মানুষ যে এক সজাতীয় দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং মরিবার পর এক সজাতীয় দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জন্মমুহূর্ত্তেও মানুষ মানুষই থাকে। পরে হিন্দু কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা তাহাকে হিন্দু এবং মুসলমান কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা তাহাকে মুসলমান করা হয়। মাতৃদুগ্ধ পানাদি মানব প্রকৃতি অনেকদিন যাবৎ শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চলে। কালক্রমে পিতামাতার শিক্ষার দ্বারা মানব শিশু হিন্দু মুসলমানাদি বিভিন্ন জাতিতে নিক্ষিপ্ত হয়। নাম করণের সময়ই মানব ধর্ম্মের স্বরূপ নষ্ট করিয়া হিন্দুশিশুর হিন্দুনাম মুসলমান শিশুর মুসলমান নাম দেওয়া হয়। নামদ্বারাও মানব শিশুর মানবজাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। তৎপরে "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচার করিয়া মানব সন্তানকে যে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া হয় তদ্দ্বারাই মানবজাতি নানাবিধ বিজাতীয়ধর্ম্মবিশিষ্ট জাতিতে বিভক্ত হয়। মানব জাতির সজাতীয়তা ও স্বধর্ম্ম ধ্বংসের জন্য দায়ী কেবল "ধর্ম্ম" শব্দের ব্যভিচার।

প্রেম

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

কবি বলিয়াছেন—"ভগবান আপনি আপনাকে মোহিত করিবার জন্যই গানের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ভক্ত বলেন—"ভগবান আপনাকে ধরা দিবার জন্য প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ঋষিগণ সমাধিবলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এক চিদানন্দময়ী মহাশক্তি হইতেই সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। চেতন অচেতন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তই সেই একই মায়ের সন্তান তাঁহারই লীলা-বিভূতি। এক অজ্ঞেয় প্রাণস্পর্শী ভাষা মানুষকে জানাইয়া দিতেছে সেই মহাশক্তির কথা—যিনি সকল কারণের কারণরূপে নিত্য সকলের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন। এই মাতৃস্বরূপিণী মহাশক্তির অনাদি অনন্ত অন্তর্মুখ আকর্ষণের নামই প্রেম।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য মানুষ বাসনার অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত। তবুও তো সকল কালে এবং সকল দেশেই এমন কি নির্জ্জন পল্লীতে অথবা অনন্ত

কর্ম্মকোলাহলময় নগরে অবস্থার অনুরূপ জীর্ণশীর্ণ কুটীরে বা অট্টালিকার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ সমস্ত পরিচিত স্বার্থের অতিরিক্ত অজ্ঞেয় আর একটী বস্তুকে চিরদিনই কাঙ্গালের মত চাহিয়া আসিতেছে। ধন তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই,—জন তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। কোন প্রলোভনের বস্তুই তাহার অন্তরকে জুড়াইতে পারে নাই। সকল স্বার্থের উপরে কি দেখিয়া যেন তাহার মন কাঁদিয়া উঠে,—সে কান্নার মধ্যেও মানুষ যেন একটা প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। এই যে প্রেম ইহাকে আশ্রয় করিয়াই জগৎরূপ মধুচক্র রচিত। কি সুখে কি দুঃখে মানুষ কোথাও আপনাকে লইয়া, কোথাও বা আপনাকে ভুলিয়া এই প্রেমমধুর জন্যই আপনার সর্ব্বস্বকে সেবার অঞ্জলিরূপে প্রদান করিতেছে। জগৎকে প্রেমস্বরূপিণী সেই আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি জানিয়াই তাঁহারই সত্তায় অকুণ্ঠিত হৃদয়ে আপনাকে বিলাইয়া দিতেছে। কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ স্নেহে, কেহ প্রণয়ে, কেহ বা বৈরাগ্যে,—সকলেরই পর্য্যবসান হইতেছে এই প্রেমের সেবায়। সেবা ভিন্ন প্রেমের পূর্ণতার আর কোন উপায়ই নাই। জগতে একমাত্র আত্মহারা প্রেমের দ্বারাই সকল স্থানে ও সকল সময়ে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রেম সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়া থাকে—একমাত্র এই সেবাতেই। যিনি শ্রদ্ধা করেন, তিনি সেবা দ্বারাই সে শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলেন,—যিনি ভালবাসেন সেবা দ্বারাই ভালবাসাকে তিনি পূর্ণ করিতে চাহেন। যখন সকল অনুভূতির সঙ্গে, কি সুখে কি দুঃখে কাহারও হৃদয়ের অনুভূতি এক হইয়া যায়, তখন সেই আনন্দময়ী প্রেমস্বরূপিণী মানবের জীবন উজ্জ্বল করিয়া দেখা দেন। শুধু যে দেখা দেন তাহা নয়, এই নিত্যানন্দময়ীর আলোক-ধারাই মানব জীবনের সকল তমোরাশি নাশ করিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত করেন। তখনই মানুষ জানিতে পারে এবং দেখিতে পারে যে জগতে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ যাহা কিছু সমস্তই তাহার ভিতর। বহু তখন এক হইয়া যায়। তখন সমস্ত জগতের ভাবরাশিকে আপনার অভ্যন্তরে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এই এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন। গ্রহে উপগ্রহে, জড়ে চেতনে, অণুপরমাণুতে এবং মানুষের উন্নত ও বিকশিত হৃদয়ের প্রতি স্তরে এই প্রেমই আপনি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনারই পরিচয় দিতেছে। ভক্ত এই প্রেমের পরিচয় দিতে যাইয়া অবশেষে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকও এই প্রেমের কথা—সকল জিনিষের সহিত সকলের অবিরাম এই মাখামাখি—জড়চেতনের সম্বন্ধ তাঁর পুস্তকের পাতায় পাতায় লিখিয়া রাখিতেছেন। আজও সে লেখার শেষ হয় নাই। কবি, দার্শনিক, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ধনবান নির্ধন নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিমায় এই প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

স্বার্থবোধই জগতের সকলের একমাত্র প্রবৃত্তি-দায়িনী শক্তি। যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি সেই হেতু অপরকেও ভালবাসিয়া থাকি। এই যে আমাদের "আমি", তাহা সেই প্রকৃত "আমি" বা আত্মার ছায়ামাত্র—যিনি আমাদের "আমি"র পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র "আমি"র উপর ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ। এই সসীম "আমি" বা আত্মার প্রতি ভালবাসাই স্বার্থপরতা। স্ত্রীর যে স্বামীর প্রতি ভালবাসা তাহা সে জানুক আর নাই জানুক, সেই আত্মার জন্যই সে স্বামীকে ভালবাসিতেছে এবং তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতা রূপে প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মতৃপ্তির একটী দিক ভিন্ন কিছুই নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু।" যেখানে প্রেম সেইখানেই বিস্তার, যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি, যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত, যিনি স্বার্থপর তিনিই মৃত।

জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতির অর্থ হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। প্রেমই জীবন এবং একমাত্র উহাই জীবন-গতি নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু। জীবন থাকিতেও উহা মৃত্যু এবং দেহাবসানেও উহা প্রকৃত মৃত্যু স্বরূপ। দেহ বিনাশের পর কিছুই থাকে না, একথাও যাহারা বলে, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতেই হইবে যে স্বার্থপরতাই মৃত্যু। ভালবাসা কখন বিফল হয় না, আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক প্রেমের জয় হইবেই। যাঁহার হৃদয়ে প্রেম আছে তিনিই সর্ব্বত্র জয়ী। শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান —প্রেমের নিকট সব তুচ্ছ। প্রেমই ভক্তি, প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর একতরী করে পারাপার
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন, বিজ্ঞান,
ত্যাগ, ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—
এই মাত্র ধন।"

আত্মানাত্মবিবেক

অধ্যাপক—শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

জীবনে সাংসারিক জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে শেষ নিমেষ ঘূর্ণনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড জ্ঞানধারা অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী সমাবৃত থাকায় রজ্জুসর্পন্যায় অনাত্মায় "আমি ও আমার" প্রবল প্রতিভাস ঘটাইতেছে, যতকাল ঐ মোহমূলক আহঙ্কারিক "আমি'র সমূলে উচ্ছেদ না হয়, ততকাল আমি কি ও আমি কি না" এইরূপ আত্মানাত্মবোধের উদয় সুদূরপরাহত। শৈশবের ধূলাখেলার ঘর বাড়ী ও উহার আস্বাব পুতুলপাটি বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সহিত অসার ও মিথ্যা প্রতীত হইলে যেমন ঐ ধূলাখেলা আর আমাদিগকে তিলার্দ্ধমাত্র আনন্দ দিতে না পারায় উহা হইতে উচ্চতর বস্তু সংগ্রহ করিয়া তজ্জনিত শ্রেষ্ঠতর আনন্দ উপভোগে আমরা যত্নশীল হই, ঠিক তেমনই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানবমাত্রেই জন্মকোটিপরম্পরার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার আলোকে অনাদি পরিচিত অনাত্মার সুতুচ্ছ, হেয়, আবরণগুলি ক্রমশঃ ভেদ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত সুসূক্ষ্ম আত্মা বা "আমি"র সুষ্ঠু পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। তুষ বাদ দিয়া তণ্ডুল, খোসা ছাড়িয়া ফল, বা দুঃখকে দূরে রাখিয়া সুখভোগের বাসনার ন্যায় ব্রহ্মের প্রতিচ্ছায়াস্থানীয় অনাত্মাকে একান্তভাবে পরিহার করিয়া একেবারে "নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব" আত্মার সাক্ষাৎলাভ জন্মমুক্ত বামদেবাদির মত কোটিতে একটীর সম্ভব হইলেও মাদৃশ বদ্ধ

জীবের পক্ষে উহা নিতান্তই অসম্ভব। এতত্তত্ত্বটী শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই প্রচার করিয়াছেন।—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা, ৭।১৯) অর্থাৎ মানব বহুজন্মের সাধনার ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অজ্ঞানের রাজ্য অনাত্মার হাত হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে মানবকে প্রতি জন্মেই সাধনার সুদৃঢ় সোপান-পরম্পরা রচনা করিতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী কোন একটী সোপানের অভাবে লক্ষ্যে উপস্থিতির অসম্ভাবনার ন্যায়, কোন একটী জন্মে সাধনার অভাব ঘটিলে আত্মদর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনাদি অজ্ঞান বা অবিদ্যা নিবন্ধন জীব অনাত্মদেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর গোলকধাঁধায় (Labyrinth) পড়িয়া দিশাহারা হইয়া থাকে। এই স্বরূপচ্যুতির মূল কারণ অবিদ্যা। পাতঞ্জল দর্শন বলেন, "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতির-বিদ্যা" ২।৫। ফলতঃ দূরত্বাদি দোষে যেমন মরুভূমিতে সূর্য্য কিরণে জলভ্রম হয়, তেমনি অবিদ্যার প্রবল মোহেই জীব অনাত্মাতে অর্থাৎ যাহা আমি নই সেই দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান করিয়া জন্মমরণ পথের নিত্যপথিক হইয়া থাকে। মোহের কার্য্য প্রবল বৈচিত্র্য বা অতি তীব্র চিত্ত বিভ্রম। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ মোহের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'এই মোহ জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা, দর্শকের চক্ষে অন্ধতা বা দৃষ্টিভ্রম (Phantas-magoria), শাস্ত্রজ্ঞানীর পক্ষে মূর্খতা ও উজ্জ্বল আলোকে নিবিড় অন্ধকার'।—

"জাগ্রতামপি যো নিদ্রা পশ্যতামপি যোঽন্ধতা।
শ্রুতে সত্যপি যো জাড্যং প্রকাশেঽপি চ যত্তমঃ॥"

নৈষধ, ১৭। এই মোহে অন্ধ হইয়াই ভগবানের অন্তরঙ্গ সখা অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হওয়ায় স্বজাতীয় ধর্ম্ম ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। পরে নিজ সাধনালব্ধ জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত বেদান্তের সার সত্য গীতার উপদেশের মহামহিমায় তাঁহার মোহান্ধকার বিদূরিত হওয়ায় "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা" বলিয়া পরমানন্দে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া পূর্ণাভীষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে শাস্ত্র, গুরু ও সাধু সঙ্গের অমোঘ প্রভাবে মানবের বিবেকবুদ্ধি উন্মেষিত হইলে তখন সে উহার সমুজ্জ্বল আলোকে গুণময় জগতের কোন্‌টী আত্মা বা আমি, আর কোন্‌টী অনাত্মা বা আমি নহি, উহা বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করে। এইরূপ অনাত্মা হইতে আত্মার বিবেকই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—সিদ্ধির পরম উৎকর্ষ ও আনন্দের অমৃত ভাণ্ডার। আত্মার প্রকৃত স্বরূপপরিচয়েই ভগবানের সহিত মুক্ত ভক্তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে। পাশ্চাত্য সাধক Socrates এর মহত্তর অনুশাসন—'Man! Know thyself and you will know God"

আত্মতত্ত্বের পরমগুরু ভগবান্ ব্যাসদেব অতিসংক্ষেপে দুর্ব্বল মন্দমেধা মাদৃশ কলির জীবের সহজে স্থূলতঃ আত্মানাত্মবিবেক উপলব্ধি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে যে সুন্দর আভাস দিয়াছেন, নিম্নে উহা সঙ্কলিত হইল। আচার্য্যপাদ শঙ্কর আত্মা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যেহেতু তিনি সকলকে প্রাপ্ত হন, সকলকে গ্রহণ করেন, সকল বিষয় ভোগ করেন এবং সদা সর্ব্বত্র স্বীয়ভাবে "দিবীব চক্ষুরাততম্" ন্যায়ে সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন, সেহেতু তিনি আত্মা।'

—"যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্তিতঃ॥"

—কঠভাষ্য

ভগবান্ মনুর উপদেশ—"আততত্বাচ্চামৃতত্বা-চ্চাত্মাহি পরমো হরিঃ"। ১২।১৯। এই আত্মা নিত্য—অনাদি নিধন-'Eternal,' ইনি অব্যয়—ক্রমিকক্ষয়—'Decay' এবং একান্তধ্বংসশূন্য—

'Indestructible,' ইনি শুদ্ধ—নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়ালেশশূন্য—'Free from Maya,' ইনি এক—অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদত্রয় বর্জ্জিত—'Absolute or Homogeneous,' ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মারূপে প্রতিক্ষেত্রে (দেহে) বিরাজমান—'Individual soul,' ইনি সকলের আশ্রয়—অধিষ্ঠান—'Substratum,' ইনি অবিক্রিয়—নির্ব্বিকার—'Immutable,' ইনি স্বদৃক্ বা স্বপ্রকাশ—'Selfshining,' ইনি হেতু বা সর্ব্ব-কারণের কারণ—অর্থাৎ মূল কারণ—'Fountain-head,' ইনি ব্যাপক বিভু—'Unlimited,' ইনি অসঙ্গ—সঙ্গ বর্জ্জিত—'Unattached,' ইনি অনাবৃত—'All-pervading' শ্রীল ব্যাসদেব সংক্ষেপে তটস্থ বিশেষণরূপে আত্মার এই দ্বাদশটী ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। টীকার শ্রীধর স্বামিপাদ প্রত্যেকটির শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি প্রসঙ্গ ভয়ে ঐগুলি অনুদ্ধৃত হইল। যাহা এই দ্বাদশটির বিপরীতধর্ম্মী অর্থাৎ যাহা অনিত্য, ব্যয়শীল, অশুদ্ধ, অনেক বা বহু, ক্ষেত্র বা জড়, আশ্রিত, বিকারী, দৃশ্য, কার্য্য, ব্যাপ্য বা পরিচ্ছিন্ন, আসক্ত ও আবৃত তাহাই অনাত্মা। সাধক "নেতিনেতি" বিচারমুখে ক্রমান্বয়ে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অনাত্ম-পদার্থগুলি বর্জ্জন করিয়া যখন নিত্য পদার্থের দর্শন-লাভ করিবেন, তখন তিনি পুরীষভোজনতুষ্ট শুঁয়া পোকা (Caterpillar) প্রজাপতিজন্ম লাভ করিলে মধুপানে তৃপ্তিলাভের ন্যায় অদৃষ্টও অননুভূত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব আত্মরূপ দর্শনে কৃতার্থম্মন্য হইবেন। সংসারী মানবের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে যতক্ষণ তাহার পরমপ্রিয় অর্থ,—টাকা মাটিতে—পরমার্থে রূপান্তরিত না হইবে, ততক্ষণ উহাকে প্রজাপতি হইবার আশায় শুঁয়াকীটজন্ম ত্যাগের প্রয়াসের মত বহু জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কঠোর সাধনায় তনুপাত করিতে হইবে। যখন সাধক ভগবান্ বুদ্ধদেবের মত "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ং প্রযাতু" প্রতিজ্ঞায়—প্রাণপণ করিয়া বজ্রকণ্ঠে—"স্বয়ং গ্রহীষ্যামি যদত্র নিশ্চিতং" বলিয়া লব্ধবোধি হইয়া "যতো যতো মে পততীহ নেত্রম্, ততস্ততঃ পশ্যতি ব্রহ্ম মুর্ত্তম্" ভাবে অনুভাবিত হইয়া আপনি আপনার রূপে স্তব্ধ, বিস্মিত, তৃপ্ত, মোহিত ও চমৎকৃত হইবেন তখন ঐ মুক্ত সাধকের অবস্থা "নাভিকা গন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুড়ত ব্যাকুল হৈ" হইবে। বস্তুতঃ আত্মদর্শনের সাক্ষাৎ কোন বাচিক উপদেশ নাই। উহা প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপের মত ব্রহ্মজ্ঞ-দেশিকের সন্নিধানে শিষ্যের ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিতে "শোভতেঽস্য মুখম্" এই দৃষ্টান্তে জ্ঞানীর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া উহার অন্তরে জ্ঞানের বিকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী বিবেকচূড়ামণিকার বুঝাইয়াছেন,—"আমি দেবদত্ত" ইহা বুঝিতে দেবদত্তের যেমন কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্ম বুঝিবার জন্য তাহার আর কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকে না।

—"দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্ বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাঽহমিতি বেদনম্" ॥৫৩২।

ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্যশিরোমণি এই শঙ্করাচার্য্যই অন্যত্র স্পষ্ট-ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন :—

"চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥"

এই সকল মহামান্য মহাজনের শাসনে স্থির বিশ্বাসী ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য ব্রহ্মদর্শী ব্যাসদেবের উপলব্ধ ও উপদিষ্ট "আত্মানাত্মবিবেকের" আলোচনায় সমূহ উপকৃত হইবেন ইহা নিঃসন্দেহ।

রিক্ত

বীরেশ্বর চৈতন্য

জীবনের প্রথম বেলায়—
তিল তিল করি যাহা করিনু সঞ্চয়,
চাহিলনা কেহ কোন দিন। তবু তারে—
দিলেম বিলায়ে, রিক্ত করি আপনারে—
কোন্ প্রয়োজনে, নাহি জানি। সে ও
আপন খেয়াল, আ জ তবু আপূরিত
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে অবুঝ পরাণ
প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে। সকরুণ গান
আকাশে ধ্বনিয়া উঠে তার—"পেলি যাহা
ওরে মূঢ়,—কত তপস্যায়, আজি তাহা
হেলায় বিলায়ে দিলি? কত প্রয়োজন
আছে বাকী কিসে তাহা করিবি সাধন?"

জীবনের প্রথম আলোকে—
ফুটে উঠেছিল যাহা মম মর্ম্মলোকে
দীপ্তিময়, মনোরম—সেই চিত্রপট
যত্নে কত বর্ণে আঁকা—আমার নিকট
রেখেছিনু সযতনে বহুদিন ধরি।
অকস্মাৎ একদিন খণ্ড খণ্ড করি—
দশদিকে ছড়ালেম আপন খেয়ালে
তারে পথের ধূলির সাথে। চক্রবালে—
সূর্য্য ডুবে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামি আসে
পরিশ্রান্তা ধরণীর কোলে—দিন শেষে—
সেইক্ষণে, রিক্ত প্রাণে মোর, হাহাকার
উঠে শুনি—ফেলে দিলি? পাবি কি আবার?"

জীবনের তরুণ তপন—
এনে দিল একদিন মোরে যেই ধন—
দিয়াছি বিলায়ে তাহা। যেই ছবি খানি—
এঁকেছিনু একদিন সব শক্তি আনি
কুড়াইয়ে সযতনে আপন অন্তর হতে
প্রভাত-আলোকে বসি—তারে নিজ হাতে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি আমি। ব্যথা রিক্ত তার—
নিবিড় বাজিছে প্রাণে—তবু বলিবার
এই আছে—কষ্টলব্ধধন অযাচিতে
যে খেয়ালে দিনু বিলাইয়ে সেই আত্মঘাতে—
লভিয়াছি নব প্রাণ। মোর জীবনেরে
সে-ই পূর্ণ করিয়াছে—সে-ই ধন্য করিয়াছে মোরে।

ফকির সাহ জালালুউদ্দীন বাঙ্গালী

(সমাপ্ত)

শ্রীতামসরঞ্জন রায় এম, এস্-সি, বি, টি

আর কোন কথা হইল না; দুই জন দুই দিকে প্রস্থান করিলেন। শুধু সেই নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া সাহজীর সকরুণ প্রার্থনা-ধ্বনি টেকচাঁদের কর্ণে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।—

"হে ভবেশ, হে আমার প্রিয়তম বন্ধু, একবার আমার নয়ন সম্মুখে আবির্ভূত হও। দেখ তোমার বিরহে আমার চক্ষু অন্ধ হইতে চলিয়াছে, দেহযন্ত্র বিকল হইতে বসিয়াছে,—আমাকে দেখা দাও, কৃপা কর।" ধীরে ধীরে সে শব্দও বাতাসে মিলাইয়া গেল আর কিছুই শোনা গেল না। টেকচাঁদ নগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জালালউদ্দীন দীর্ঘ পাঁচ মাস ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্র অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থল ও লীলা নিকেতন এই অযোধ্যা। ইহার প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রত্যেকটি ধূলিকণা সেই পরম পুরুষেরই অক্ষয়স্মৃতি বুকে লইয়া পড়িয়া আছে। ইহার আকাশ, ইহার বাতাস, আজও যেন সেই অতীত দিনেরই কথা কহে। সাহজী আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। দিব্যভাবে সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল, তিনি ভাবস্থ হইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। জনৈক পথিক তাঁহাকে ঐরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিকটে যাইয়া বলিল, "সাহ সাহেব! আপনি একাকী বসিয়া কি করিতেছেন?" ভাবস্থ ফকির চমকিত হইয়া উঠিলেন, বিরক্তিভরে উত্তর করিলেন—"একাকী! আমি মোটেই একাকী ছিলাম না। তোমার আগমনেই আমি সঙ্গচ্যুত হইলাম।"

লোকটি কিছু বুঝিতে পারিল কিনা বলা কঠিন কিন্তু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিল।

তারপর সাহজী অযোধ্যার অলিতে গলিতে আপনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখনকার দিনে অযোধ্যার মন্দির সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এবং যে কয়টি ছিল তাহার কোন একটিতেও মুসলমান সাহজীর পক্ষে প্রবেশলাভ করা সম্ভব ছিল না। মন্দিরের দ্বারে যাইবামাত্রই বিগ্রহের নিকটবর্তী হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগ্রত হয়, কিন্তু কোন্ পুরোহিত তাঁহাকে সে অনুমতি প্রদান করিবে? প্রত্যেকটি দ্বারে প্রত্যেকটি বার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সাহজীর সমস্ত অন্তর দারুণ ব্যথায় ভরিয়া গেল। শ্রীরামচন্দ্রের স্থূল বিগ্রহটির পর্যন্ত দর্শন পাইলেন না ভাবিয়া তাঁহার প্রাণের জ্বালা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, নয়ন প্লাবিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ক্ষিপ্তের ন্যায় অযোধ্যার রাজপথ বাহিয়া তিনি সরযূর দিকে রওনা হইলেন। ভক্তের প্রাণের ক্রন্দন ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল। প্রেমের আহ্বান কি ব্যর্থ হইতে পারে? প্রেমাশ্রু কখনো বৃথায় নির্গত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাত্মা তুলসীদাস তাই কহিয়াছেন,—

"সরসীর বুক আলো করিয়া যে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে তাহাকে বিকশিত করিতে সূর্য্য ও চন্দ্র আলোক ধারা বর্ষণ করে—বহুদূর ব্যবধান হইতে; কিন্তু যেজন প্রেমিক,—প্রেমাস্পদ তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তলে সর্ব্বমহিমায় নিত্য বিরাজিত থাকে।"

এইরূপে যে মুহূর্ত্তে তিনি সরযূতীরে পৌঁছিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সহসা এক অশরীরী দৈববাণী

তাঁহার কর্ণে বাজিয়া উঠিল—"বাসালি, শীঘ্র এস, আমি তোমার বিরহ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" সে স্বর শুনিবামাত্র বাসালী আর সামলাইতে পারিলেন না, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া একেবারে নদীর ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তীরে স্নানার্থী যাহারা ছিল তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, অনেকে আবার তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য জলেও নামিল কিন্তু কেহই মহাত্মা বাসালীকে খুঁজিয়া পাইল না। বর্ষার প্রথমভাগে সরযূর জল তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তীব্রবেগে নদীস্রোত সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে। সকলেই ভাবিল লোকটিকে আর পাওয়া যাইবে না, তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে বাসালীর অচেতন দেহ ঘাটের নিকট ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল। যাহারা তখন ঘাটে উপস্থিত ছিল তাহারা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং বহুক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পর বাসালী আর মুহূর্ত্ত তথায় অপেক্ষা করিলেন না—আপন পথে আবার প্রস্থান করিলেন। সেদিন সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যে দিব্যদর্শন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব সুললিত ভাষায় তাহা তিনি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহারই মর্ম্মার্থ আমরা বিবৃত করিলাম।—বাসালী লিখিয়াছেন,—

> "সে অনুপম হৃদি মনোহারী রূপের তুলনা নাই। চাঁদের বুকেও কলঙ্ক রেখা আছে কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ অকলঙ্ক শশীর মত। গোলাপের স্বর্গীয় সুষমায় ভরা তাঁহার মুখকমল,—একবার চোখে পড়িলে আর চোখ ফেরান যায় না।
>
> "সেই ঋজু, উন্নত এবং তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি বিদ্যুৎবেগে একবার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সমগ্র চেতনাকে যেন পাগল করিয়া দেয়।
>
> "সে ভাবময় ঢল ঢল চোখ, ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, যাঁর ঈক্ষণে সর্ব্ব সংশয় নিরাকৃত হয়—সে রূপের কি আর তুলনা হয় ?
>
> "বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল তাই করুণাময় অশেষ করুণায় স্বয়ং আমার দ্বারে উপনীত হইয়া আমায় ডাক দিলেন, 'বাসালী'।
>
> "ভাবের আবেগে দিশেহারা আমি—তাঁহাকে সর্ব্ব-ভূতাশ্রিত, চরাচরব্যাপী দেখিলাম। তাঁহার প্রেমে হৃদয় যখন ভরিয়া যায়, তাঁহার বিরহে প্রাণ যখন বিদীর্ণপ্রায় হয় তখনই সর্ব্বত্র, সর্ব্বদিকে তাঁহার অনুপম রূপ ফুটিয়া উঠে।"—

ইহার পর মহাত্মা বাসালী অযোধ্যাতেই রহিয়া গেলেন।

এদিকে টেকচাঁদ অনুতপ্তচিত্তে কিছুদিন মুলতানে অপেক্ষা করিয়া সাহজীর সন্ধানে অযোধ্যায় চলিয়া আসিলেন। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন—এই ভাবিয়া টেকচাঁদের দুঃখের আর শেষ নাই। প্রাণে কেবল একটিমাত্র ক্ষীণ আশা জাগিয়া আছে। সে আশা সাহজীর প্রতিশ্রুতি—"পুনর্ব্বার দেখা হইলে তোমার তৃতীয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।" কিন্তু অযোধ্যায় বহু খোঁজ করিয়াও টেকচাঁদ মহাত্মা বাসালীর দেখা পাইলেন না। তারপর সহসা তাঁহার মাথায় এক বুদ্ধি জাগিল, তিনি ভাবিলেন, রামায়ণ পাঠ করিতে করিতেই একদিন সে মহাপুরুষের সহিত আমি পরিচিত হইয়াছিলাম কাজেই যদি পুনরায় সেই রামায়ণ গান আমি আরম্ভ করি তবে আজ হউক আর কাল হউক সেই আকর্ষণে তিনি আসিবেনই। এই ভাবিয়া তিনি অযোধ্যায় একটি স্থান স্থির করিয়া নিত্য তথায় তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পাঠের ভঙ্গি, ভক্তিপ্লুত কণ্ঠ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মধুর স্বরে বহু লোক তাঁহার কথকতায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। অচিরে তাঁহার খ্যাতি অযোধ্যায় ছড়াইয়া পড়িল। দিনের পর দিন এইরূপে কাটিতে লাগিল কিন্তু সাহজীর দেখা মিলিল না। টেকচাঁদ অন্তরে অন্তরে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তারপর সহসা একদিন বাঙ্গালী সে সভায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু টেকচাঁদের নিকটে না আসিয়া দূর হইতে পাঁচটি শস্যকণা ছুঁড়িয়া দিলেন। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিল শস্যকণাগুলি সোনার। টেকচাঁদ সাহজীকে দেখিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তৃতীয় বরটির জন্য ধরিয়া বসিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাঙ্গালীর মনে দয়ার উদ্রেক হইল, বলিলেন, "প্রমোদ বনে চীরবৃক্ষের ছায়ায় আমার সহিত দেখা করিও তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" —তারপর নিমিষের মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

টেকচাঁদ তাঁহার গ্রন্থ তুলিয়া রাখিয়া প্রমোদ বনের দিকে রওনা হইলেন। শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁহার সহগামী হইতে উদ্যত হইলেন। টেকচাঁদ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া একাকী সে বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল। ফলে টেকচাঁদ নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূলে যাইয়া আর সাহজীকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাহাতে নিতান্ত নিরাশ হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। লোকটিও গাছের নিকট অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ পর ফিরিয়া চলিয়া গেল। তখন সাহজী আসিয়া টেকচাঁদকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন "পণ্ডিতজী, তুমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, আজ যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ তাহা নিঃশেষে ভিক্ষুককে দান করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরে পুনরায় এইস্থানে আসিও তোমার তৃতীয় প্রার্থনা পূর্ণ হইবে; কিন্তু এবার যেমন এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে তদ্রূপ পুনরায় কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আসিও না।"

গভীর রাত্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া টেকচাঁদ দেখিলেন সাহজী গভীর ধ্যানে মগ্ন। তিনি নিঃশব্দে সাহজীর নিকট যাইয়া বসিলেন কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলিত না করিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে সাহজী বলিলেন—"আমি যখন অযোধ্যায় প্রথম উপনীত হইয়াছিলাম তখন তিনটি শ্লোক স্বতঃই আমার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছিল। আজ তাহাই পুনর্ব্বার আবৃত্তি করিতেছি আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উচ্চারণ করিয়া যাও।"

শ্লোক তিনটির মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

(১) ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বদা যে বিভোর তথাকথিত ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা জাগতিক ভোগ—কোনটিই সে গ্রাহ্য করে না।

(২) একই বৃক্ষশাখার কতগুলি ফল যেমন পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে বাগানের ভিতরে এবং অন্য কতগুলি বাগানের বাহিরে পতিত হয় আমরাও তদ্রূপ কর্ম্মবশে জগতের বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি।

(৩) জগতের কোন বস্তুই আমাদের কাম্য নহে। আমরা কেবল সেই পরমধনের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—'যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'

ইহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সাহজী বলিলেন, "এখন তুমি আল্লার সহিত এক হইয়া অবস্থান কর; তদ্গত হইয়া যাও।"

ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাহজী, আমি ব্রাহ্মণ, টেকচাঁদ।"

সাহজী তখন যেন নিজে ভুল করিয়াছেন এরূপভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক, ঠিক—তুমি রামের সহিত এক হইয়া অবস্থান কর।"

ঐ কথা শুনিবামাত্র টেকচাঁদ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন, তাঁহার প্রেমোন্মাদ অবস্থা লাভ হইল। টেকচাঁদ জীবনে উক্ত শ্লোক তিনটি আর ভুলেন নাই। উহারা তাঁহার জীবনে এমনই একটি প্রেরণা দান করিয়াছিল যে পরবর্ত্তীকালে আরবী ও পারশী ভাষায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎরচিত কয়েকটি গ্রন্থ গভীর চিন্তা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া বিদ্বৎ সমাজে গৃহীত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর দিন আবার পূর্ব্বেরই মত কাটিতে লাগিল। টেকচাঁদ সহরে বাস করেন আর সাহজী সেই বৃক্ষতলে দিন কাটাইয়া দেন। কিন্তু রজনীতে উভয়েই একত্রিত হইতেন এবং রাত্রির অধিকাংশ কাল গভীর ধ্যানেই কাটিয়া যাইত। এই সময়ই একদিন "মৌলানা নাজির' নামে একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত সাহজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। যথাবিহিত অভিবাদনাদি করিয়া মৌলানা নাজির সহসা টেকচাঁদের নিকট কথিত শ্লোক তিনটি আবৃত্তি করিলেন। সাহজী চমকিত হইয়া মৌলানাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব শ্লোক আপনি কাহার নিকট হইতে জানিলেন ?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত মনীষী পীরজাদা নাকি সাহেব এই শ্লোক তিনটি প্রায়ই আবৃত্তি করিয়া থাকেন—তাঁহারই মুখে ইহা শুনিয়াছি।" সাহজী চুপ করিয়া থাকিলেন।—

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সাহজীর খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তারপর একদিন স্বেচ্ছায় সমাধিযোগে এই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া মহাত্মা জালালউদ্দীন বাসালী তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সাধন স্থান সেই "চীর বৃক্ষ" মূলেই তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হইল। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি মুসলমানের গৃহে জন্মিয়াছিলেন তাই বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের দিক্ দিয়া তাঁহাকে অনেকে 'স্বধর্ম্মত্যাগী' বলিয়া অভিযুক্ত করিত। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ দিয়া, অন্তরের দিক্ দিয়া এবং সর্ব্বোপরি প্রেমের দিক্ দিয়া ধর্ম্মের যথার্থ রূপটি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সাহজী এই সব জাগতিক নিন্দা প্রশংসার বহু উর্দ্ধে সর্ব্বদা স্থিত থাকিতেন। মানুষের দেওয়া সম্মান অসম্মান কোন দিন তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।"—এই বাক্যের সত্যতা সাহজীর জীবনে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বন্ধুহীন, সমাজহীন, আত্মীয়স্বজনহীন সাহজী—অকুতোভয়ে কেবল সেই পরম প্রেমাস্পদকেই লক্ষ্য করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রেমিক, শ্রীরামচন্দ্রকেই জীবনে ঐকান্তিকভাবে চাহিয়াছিলেন তাই ভক্তাধীন শ্রীভগবান তাঁহার নিকট ধরা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সাধক জীবনে যে কত তুচ্ছ জিনিষ, যথার্থ সাধকের নিকট সমাজ বা সম্প্রদায়গত বিধি নিষেধ যে কতদূর অর্থহীন, মহাত্মা বাসালীর জীবনে জগৎ তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছে। স্বার্থগন্ধহীন ভক্তি ভালবাসা ও দৃঢ়নিষ্ঠা সহায়ে অগ্রসর হইলে অন্তর্যামী ভগবানের কৃপালাভ যে মানুষ নিশ্চয়ই করিতে পারে সেকথাও তাঁহার জীবনে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। দেশ, কাল ও সমাজের গণ্ডি অক্লেশে ছিন্ন করিয়া এই মহাপুরুষ জগতের সর্ব্বদেশকেই আপনার দেশ এবং বিশ্বের সর্ব্বজাতীয় লোককেই আপনার লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। খোরাসানের এক ঊষর জনপদে 'কোন্ দূর শতাব্দের এক অখ্যাত দিবসে'—তাঁহার জন্ম হইয়াছিল আর সে স্থান হইতে শত শত ক্রোশ দূরে সম্পূর্ণ বিজাতীয় আর এক আবেষ্টনীর মধ্যে, অযোধ্যার এক নির্জ্জন বনে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। জীবনে এক ভগবান ভিন্ন অন্য কিছু তিনি চাহেন নাই, এক ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্দর্শন ভিন্ন আর কিছু কামনা করেন নাই।

অর্থবল, লোকবল, বিদ্যাবল প্রভৃতি সব বলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র 'রামনাম'কেই সম্বল করিয়া জীবনের দুর্গমপথে তাঁহার যাত্রা সুরু হইয়াছিল এবং চরমে তাঁহার কাম্যবস্তু লাভ করিয়া নিজেত তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেনই পরন্তু ভাবীকালের জন্য এক অমর আদর্শও স্থাপন করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই সর্ব্বকালের, , সর্ব্বদেশের নরনারীরই যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তির তিনি অধিকারী। তাহার জীবনের বিশদ বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বিখ্যাত পত্রিকা "কল্যাণ" কিছুকাল পূর্ব্বে এই মহাপুরুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত করিয়াছিল এবং তাহারই ছায়ানুসরণ করিয়া মাদ্রাজের ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা "ত্রিবেণী"তে আসা সৈয়দ ইব্রাহিম দারা তদীয় জীবনী আলোচনা করেন। সেইসব রচনা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমরা বর্ত্তমান আখ্যায়িকা গ্রথিত করিলাম। পাঠকবর্গ ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মাটির পুতুল

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সময় চলিয়া যায় কত কাজ অসম্পূর্ণ রয়,
যৌবন-গোধূলি লগ্নে এই কথা মনে গুমরায়,
হে অদৃশ্য সৃষ্টি-কর্ত্তা স্মিতহাস্যে ক্ষমিও আমায়,
মোর অক্ষমতা লাগি আঁখি-পাতে অশ্রুর সঞ্চয়।

জানি আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র তোমার ভুবনে,
সংসার-আবর্ত্ত-পঙ্কে আমি এক মাটির পুতুল,
সহস্র কর্ম্মের ভীড়ে পিপাসার্ত্ত বেদনা-ব্যাকুল,
তবু অসমাপ্ত কাজ আজিকার অন্তিম জীবনে।

মৃত্যুর সমুদ্র-শব্দ বেপথু-উৎক্ষিপ্ত জানিলাম,
কোন মোর ভয় নাই, এ বিদায় স্বচ্ছ সুশীতল,
শুধু মর্ম্মভেদী দুঃখ কর্ম্ম-স্তূপ পিছু রাখিলাম ;
হেন বেদনার গ্লানি করিছে দংশন অবিরল।

হে মৃত্যু নিকটে এসো, ফেলে দাও তব আচ্ছাদন,
মদির অস্পষ্টপ্রেরণা, ধ্বংস করো ক্রন্দন স্পন্দন।

মা

শ্রীশশাঙ্ক শেখর

'মা আমি বিদেশ যাব।'

'কেন রে, ঘরে কী হল তোর?'

'কী আর হবে? আমার ভাল লাগছে না। আমি বিদেশ যাব, তোমায় বলে রাখনুম।'

'ছেলের শোন কথা। মাকে বুঝি আর ভাল লাগছে না, বাবা?'

'আমি অত বকতে পারি নে মা. আমি বিদেশ যাবই।'

'তা যখন যাবি, তখন যাবি, এখন কী?'

ছেলে আর কিছু বলে না, চুপ করে যায়। মা ভাবেন,—আবদারে ছেলের পাগলা মন। কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যাবে। মাকে ছেড়ে ছেলে থাকতে পারবে না।

গভীর রাত। বসন্তের চাঁদ আকাশে ছুটায় হাসির ফোয়ারা। পৃথিবীর গায় ডাকে জোৎস্নার বান। ঘুমন্ত কোকিল, মাঝে মাঝে ওঠে জেগে, ডাকে কুহু কুহু,—আধ আধ স্বরে।

মা ঘুমে অচেতন। ধীরে ধীরে ওঠে ছেলে, চুপি চুপি আসে—ঘর ছেড়ে। প্রকৃতি শান্ত মনে, সারা অঙ্গ দিয়ে—করছে পান চাঁদের জোৎস্না ধারা। ঘর ছেড়ে যায় ছেলে,—বকুল তমালের তলা দিয়ে, পদ্মপুকুরের পাড় বেয়ে, বুড়ো শিবের মন্দির পেরিয়ে। তারপর দূরে, আরো দূরে, ছেলে গেল লুকিয়ে,—কালো কালো বনানীর গায়। মা ঘুমে অচেতন।

পূব আকাশে ওঠে আরক্ত আলোর রেখা। চালে বসে ডাকে কাক,—কা—কা। মা ওঠেন জেগে। 'কই বাবা, বাইরে গেলি?' কোনো সাড়া নেই। 'ভোর বেলা উঠে কোথা গেলিরে?' চালে বসে ডাকে কাক,—কা—কা। দুয়ার খুলে দেখেন জননী, কেউ কোথা নেই। শুধু চালে বসে ডাকে কাক,—কা—কা—কা।

অবুঝ ছেলের পাগলামি মা বুঝতে পারেন। দুচোখে আসে অশ্রু তাঁর। দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভাবেন, শুধু ভাবেন, ছেলের কথা,—পাগলা অবুঝ ছেলের কথা।

বিদেশ,—সেথানে গাছে গাছে ফোটে ফুল,—হীরে মণি, জহরৎ। নদ, নদী, ঝরণা ধারায় বয়ে যায়—মধু, ক্ষীর, সরবৎ। কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, মৌমাছির গান শুনে বিদেশীর ভাঙ্গে ভোরে ঘুম। হাটে তারা ফুলের উপর দিয়ে, কথা বলে বীণার ঝঙ্কার, হাসে হাসি আকাশের চাঁদের, তারার। চলে ছেলে চলে, যাবে বিদেশে, সে যাবেই।

যেতে যেতে পথে, জোটে সাথী একজন। বলে,—'বন্ধু, কোথা যাও, আমায় নাও সাথে।' ছেলের লাগে বেশ। বলে,—'এস, এস, সাথী; যাই এক সাথে।' সাথী বলে,—'তুমি আমার জন্মজন্মের বন্ধু, আমি তোমায় ভালবাসি।' ছেলে বলে,—'আমিও।' লজ্জায় মুখখানি তার হয় রাঙা।

কতদিন যায়। আনন্দের জোয়ারে আসে ভাটা। চলে ছেলে,—সঙ্গে তার সাথী। স্বপ্নের বিদেশ তবু দিল না দেখা। ছেলে ভাবে মনে মনে,—'কী সুখ লাভ হল আমার? সাথী বলে, —'বন্ধু, তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ দিন দিন।'

আরো যায় কিছু দিন। বন্ধু ছেড়ে,—যায় সাথী পালিয়ে। কেঁদে কেঁদে ছেলে হয় সারা। এতদিন পর, মার কথা পড়ে মনে। 'মা, মাগো মা, তোমায় ছেড়ে এসে কী কুকর্ম্মই করেছি মা!' দিবানিশি অনুতাপ অনলে জলে ছেলের অন্তর, চোখে ধারা, মুখে,—মা—মা। বাতাস ছড়ায় আগুন, তটিনীর জলে বহিছে শোণিত, কোকিলের ডাক যেন দুঃসহ উপহাস।

'মা—মা—মা, ডেকে ডেকে চলে ছেলে।' ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রান্তদেহে হয় অচেতন, পড়ে যায় পথের উপর। যখন জেগে চোখ চাইলে,—দেখে মার কোলে মাথা তার। স্নেহের প্রতিমা, করুণার দেবী মার অপরূপ রূপ, তার সব শ্রান্তি, সব বেদনা, দূর করে দিলে। অমৃত মূর্ত্তিমান হয়ে, মার কণ্ঠে ওঠে বাণী,—'**ভয় নেই, ভয় নেই, বাছা; আমি তোর মা।**'

মাধুকরী

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেব,— গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সে প্রতিভা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইল কি করিয়া তাহা বঙ্গের জনসাধারণের নিকট আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিলেও চলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে বাংলার গিরিশচন্দ্র, বাংলার রঙ্গমঞ্চ কিরূপ অপূর্ব্ব সম্পদে ভূষিত হইয়াছিল এবং বাংলার জাতীয় চরিত্রের উপর তাহা অজানিতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল অতীতের সেই গৌরবময় ইতিহাস আজ অনেকেই বিস্মৃত। জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও সাহিত্যের মধ্যদিয়া জাতীয় চরিত্র নিয়ন্ত্রণে মহাপুরুষগণের কতখানি কৃতিত্ব থাকে তাহা আমাদের স্থূলদৃষ্টি অনেক সময়েই এড়াইয়া যায়—তাঁহাদের স্বল্প কর্ম্ম পদ্ধতিকে অনেক সময়ে আমরা লীলা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা, কৌশল ও গভীরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারি না—তাঁহাদের সহজ কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যদিয়া আমাদের অজানিতে তাঁহারা কত কী করিয়া যান তাহা আমাদের অদূরদর্শী স্থূলদৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

বর্ত্তমান বাংলাভাষার অতুলনীয় সম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন। * * সে কথোপকথন যেমন একদিকে অসীম অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণের ভাণ্ডার তেমনই ভাষার ঐশ্বর্য্য ও মানবের মনোনিয়ন্ত্রণের গূঢ় মনোবিজ্ঞান সম্পদে তাহা চির নূতন, চির নবীন, চিরবিস্ময়কর। তাঁহার ভাষা ছিল কোথাও চকচকে ছোরার মত ধারাল, কোথাও স্ফটিক-স্বচ্ছ ঝরনাধারার উপর প্রহত কলতানময়ী, সে যেন হৃদয়ের উচ্ছলকলগীতিনী—জ্ঞানের উজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ—কোথাও রঙ্গময়ী, কোথাও নাট্যরসময়ী—বাঙ্গালার প্রাণের প্রশ্নের উত্তরে প্রমথিত প্রজ্ঞাগিরির গৈরিকনিস্রাবের মত—প্রাণের নিবিড় স্পর্শময়ী, শান্তি মাখান মায়ের হাতের শীতল স্পর্শের মত—সে ভাষা যে আজও বাংলাসাহিত্যে কোনই স্থান পায় নাই ইহা কি বাঙ্গালী চরিত্রের বিকৃতি, মূঢ়ত্ব ও চিরদারিদ্র্য ঘোষণা করিতেছে না?

সে ভাষার উলঙ্গ সহজ সম্পদ, সে ভাষার অভূতপূর্ব্ব উপমা এমন এক কথোপকথন সাহিত্য বাংলায় সৃষ্টি করিয়াছে যাহা শুধু একটা সাময়িক ভাববিহ্বলতায় মানুষকে বিবশ করিয়া রাখে না,

যাহা আজও মানুষের আশা, উদ্দীপনা ভরসা জাগ্রত করিয়া ব্যর্থ জীবনের গতিবেগকেও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। তাই সাহিত্য বলিতে যদি সেই ভাষা হয় যাহা মানবসমাজকে হিতে উন্নীত করে তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত বঙ্গ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। "প্লেটোর ডায়লগ্" যদি গ্রীক সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সম্পদ বলিয়া আজও সর্ব্বজন আদরণীয় হয় তবে সাহিত্যহিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিসমূহ বঙ্গসাহিত্যে কোন স্থানের অধিকারী তাহা কি দেশের সাহিত্য সুধিবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবেন না ?

এই অপূর্ব্ব ভাষাসম্পৎশালী দেবচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের সহিত গিরিশচন্দ্রের ঘটিয়াছিল একটা নিগূঢ় যোগ। প্রথম দর্শনে প্রেমের মত গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে কেমন যে একটু ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সার্থক করিতে নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়া। সহজ প্রেমের মধ্য দিয়া অজ্ঞাতসারে গিরিশচন্দ্রের লেখনীমুখে নিঃসৃত হইত শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই মত নিরাভরণা উলঙ্গ সহজ সরল ভাষা—কিন্তু তাহা ছিল মানব চরিত্রের গূঢ় অভিজ্ঞতাখচিত, নাট্যকলাময়ী,—মানব হৃদয়ের দ্বন্দ্বাভিঘাতের যে উজ্জ্বল কলতান উঠিয়াছিল গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মধ্য দিয়া তাহা বাঙ্গালীর নাট্যরসহীন জীবনে গূঢ় নাট্যরস সঞ্চার করিল—জগতের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকারগণের সহিত তাঁহাকে যে আমরা আজ তুলনা করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি সে অপূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইল বাংলা সাহিত্য গিরিশচন্দ্রের উদ্বুদ্ধ প্রতিভার মধ্য দিয়া—আর সে প্রতিভার বোধন সঙ্গীত গাহিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—বাংলার প্রাণগলান-সত্যিকার ভাষা আবিষ্কার করিয়া।

সরল ব্রাহ্মণের সহজ জীবন যাপনের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সঞ্চারিত করিলেন নাট্যপ্রতিভা বাংলার সাহিত্যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে নরনারীর জীবনে। বাংলার জীবন ছিল একঘেয়ে মেয়েলী ধাঁচের—সে জীবনে স্ফুরিত করিলেন সমৃদ্ধ বিচিত্র কর্ম্মে বাংলার দীন ব্রাহ্মণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—সে যুগের চাণক্যেরই মত, নানা বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বাভিঘাতে নাট্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল বাংলার সাহিত্যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে, বাংলার রাজধানী বণিক্‌বৃত্তি অধ্যুষিত কলিকাতার বৈশ্যসমাজের নরনারীর মধ্যে —বাঙ্গালীর জীবনে আনিলেন কর্ম্মের বন্যা, সেবার প্লাবন—আর তাঁহার এ মহাযজ্ঞের ছিলেন প্রধান হোতা বিবেকানন্দ আর গিরিশচন্দ্র। বিবেকানন্দ আনিলেন নূতন কর্ম্মপ্লাবন বাংলার জীবনে, গিরিশচন্দ্র আনিলেন বাংলার সাহিত্যে। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি ও ভাষা শক্তির সহস্র ভাগের এক ভাগও স্ফুরিত হয় নাই ইঁহাদের জীবনে—তাই কি তাঁহার শতবার্ষিকীতেও এতযুগ ধরিয়া আমরা তাঁহার প্রতিভাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না ?

আজ তাঁহার শতবার্ষিকী আসন্নপ্রায়—এ মহাযজ্ঞে তাঁহার সাহিত্য ও কর্ম্মের নব নব দিক কি আমরা সশ্রদ্ধ ধ্যানের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া বাংলার জীবনকে আরো মহনীয় করিয়া তুলিতে পারিব না ? —সৎসঙ্গী, ৩রা আশ্বিন', ৪২।

প্রক্ষিপ্ত চিন্তা,—

* * * আমি আমার ধর্ম্মের সম্বন্ধে পাঁচ কথা বলিতে যাইয়া যদি পরধর্ম্মকে আঘাত করি তবে অপর ধর্ম্মীর প্রাণে ব্যথা লাগিবেই। * * আমাদের পঠদ্দশায় বিবেকানন্দের ভাবে সমগ্র দেশ টলমল করিত। গ্রামে গ্রামে বিবেকানন্দ পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইত, কিন্তু কোন মুসলমানকে বিবেকানন্দ তথা বেলুড়মঠের

বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে দেখি নাই। বরঞ্চ অনেক মুসলমান যে স্বামীজির রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি পুস্তক সকল আগ্রহ সহকারে পড়িতেন তাহা দেখিয়াছি। অশিক্ষিত মুসলমান বিবেকানন্দের কোন চেলার বুকে ছুরি মারিয়াছে এরূপ ঘটনা শুনি নাই। এই একদিক। আবার আর এক দিক দেখুন। আজকাল আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য যে দল গঠিত হইতেছে সেই দলের উপরই মুসলমানগণ খড়্গ হস্ত। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে এই সব দলের ভিতর কোথায় গলদ আছে, মনে হয় যেন এই সব দল উদারতারূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অবশ্য আমার এই উক্তিতে ভুল থাকিতে পারে।

এই কথা হিন্দুর পক্ষে ও খাটে মুসলমানের পক্ষেও খাটে। মুসলমানগণও যদি হিন্দুধর্ম্মকে উপেক্ষা না করিয়া নিজ নিজ ভাবে মুসলমান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন তবে কোন হিন্দুই তাহাতে আপত্তি করিবেন না, বরঞ্চ তাঁহাদের কথা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবেন, এবং পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন।—এডুকেশন গেজেট, ১০ই আশ্বিন, ৪২।

ভারতের স্বাস্থ্য,—স্বাস্থ্যই যদি সম্পদ হয়, তাহা হইলে ভারত সরকারের ১৯৩৩ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণ পাঠ করিয়া এই সত্যই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভারতের বিপদ ভয়ানক। কারণ, এদেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা যেরূপ ভয়াবহ, কলেরা প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা যেরূপ সংক্রামক এবং সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়া যেরূপ ভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য হাঁ করিয়া আছে তাহাতে সাবধান না হইলে ভারতবাসীর বিপদ অনিবার্য্য। জন্মের হার বৃদ্ধি পাইলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়া বেশী আশঙ্কার কারণ নহে। কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার যেখানে সীমাতীত, সেখানে দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তাই ঘনীভূত হইয়া আসে। ১৯৩৩ সালে সমগ্র ভারতে জন্ম সংখ্যা ছিল ৯৭ লক্ষ এবং জন্মহার ছিল হাজার করা ৩৫.৫। জন্ম এবং মৃত্যুর এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা সত্য সত্যই ভয়াবহ। ১৯৩৪ সালে ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। ভারতের সমগ্র-মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাই শতকরা ২৭টি। কর্ণেল রাসেল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যেখানে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বার্ষিক প্রায় ১৭ লক্ষ, সেখানে কোন স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীই নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারেন না।" কারণ, প্রত্যেক জাতির স্বাস্থ্যের পরিচয় তাহার শিশু-মৃত্যুর হারের মধ্যেই পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে কলেরা, প্লেগ ও বসন্তে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের জীবন শেষ হইয়াছে। জ্বরে মরিয়াছে ৩৫ লক্ষ, তাহার মধ্যে একমাত্র ম্যালেরিয়াতেই দশ লক্ষ। বিভিন্ন হাঁসপাতালে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার মধ্যে শতকরা বিশ জনই মরে ম্যালেরিয়ায়। এই রোগ নিবারণের জন্য যে পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত, অত্যধিক দামের জন্য জনসাধারণ তাহা ক্রয় করিতে পারে না। কর্ত্তৃপক্ষও তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। এই অসহায়তার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়। সহরে, পল্লীগ্রামে যতদিন বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, আবর্জ্জনা দূর ও মল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা না হইবে, ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কুইনাইন সুলভ না হইবে ততদিন ইহার প্রতিকারের আশা বৃথা।—নবশক্তি, ১লা কার্ত্তিক, ৪২।

সঙ্ঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সামলাতাল (আলমোড়া),—আমরা সামলাতাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৩৪ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই আশ্রমটী হিমালয়ের গভীর অরণ্যের মধ্যে একটী অতি মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। আশ্রম হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে স্থানে স্থানে দরিদ্র শ্রেণীর লোকের বসতি থাকা সত্ত্বেও কোন ঔষধালয় নাই। এজন্য এই আশ্রম হইতে একটী দাতব্য ঔষধালয় পরিচালন করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ইনডোর বিভাগে ১৬ জন রোগীকে স্থান দিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং আউট ডোর বিভাগ হইতে ২০৩৮ জন রোগী ও ৪৮২টী গো-মহিষকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এই সেবাশ্রমের মোট আয় ১৫৫২৸৶১১ পাই এবং ব্যয় ১০১৭॥৶৩ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ,—লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সেবাশ্রমের দাতব্য ঔষধালয় বিভাগ হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ৩২১৩৬ জন নূতন ও মোট ১,২০,০৫৪ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে এবং ৪৯৪৪ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। আশ্রম পরিচালিত "ব্রহ্মচারী বীরেশ চৈতন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে" ৬৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। আশ্রমের "বিদ্যার্থী ভবনে" ৯ জন ছাত্র অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল, গত ১৯৩৪ সনের এপ্রিল মাসে এই বিভাগ অর্থাভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্রম হইতে ভদ্র পরিবারভুক্ত ৯ জন নিরাশ্রয়া বিধবা, ৬ জন দুঃস্থ এবং ৬৭ জন নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৫০৯৴৯ পাই সাময়িক অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮০ জন ব্যক্তিকে আশ্রমে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে কয়েকটী দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা এবং ১৫৯৬ খানি পুস্তক সম্বলিত একটী গ্রন্থাগার আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে এই আশ্রমের মোট আয় ৭২১৯৸৶৪ পাই এবং মোট ব্যয় ৬২৩৫৸৵০ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা),—নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনের কার্য্য বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য এই সেবাশ্রম হইতে ২১০৭ খানা বিবিধ বিষয়-গ্রন্থসম্বলিত একটী গ্রন্থাগার, ৯টী দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাযুক্ত একটী পাঠাগার এবং ২ জন বিদ্যার্থীকে লইয়া একটী বিদ্যার্থী ভবন পরিচালন করা হইতেছে। সেবা বিভাগের আউট্‌ডোর ঔষধালয় হইতে উভয় সনে মোট ৪৯৮২ জন নূতন রোগী এবং ১৩৪৫২ জন পুরাতন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কয়েকজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ৬৫৸৶৬ পাই সাময়িক সাহায্য করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে সেবাশ্রমের মোট আয় ১৩১৭।৶৯ এবং মোট ব্যয় ১৩০২৸৵০ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শিলচর,—শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৩৪ সনের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সেবাশ্রম কর্ত্তৃক

একটী ছাত্রাবাস, একটী নৈশ-বিদ্যালয় এবং একটী পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। ছাত্রাবাসে ছাত্র সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ১৪ জন, ইহাদের মধ্যে ৫ জনের সমুদয় ব্যয় ও ৪ জনের আংশিক ব্যয় আশ্রম হইতে দেওয়া হইয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়ে গুর্খা, মুসলমান, ঝাড়ুদার, মুচি প্রভৃতি জাতীয় ৯০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বয়ন, সেলাই প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানেরও চেষ্টা চলিতেছে। পাঠাগারে ৯৯৫ খানি পুস্তক ও কয়েকটী পত্রিকা আছে। এই আশ্রমের মোট আয় ১৬৯১৷৮৵ এবং মোট ব্যয় ১৫৭৫৷১৫ আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাঁকীপুর, পাটনা,—গত মাসে স্বামী বাসুদেবানন্দ গবদানী-বাগ ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভায় 'শক্তিবাদ' বিষয়ে ইংরেজীতে এবং শ্রীযুত মথুরানাথ সিংহ মহাশয়ের ভবনে এক মহিলা সভায় 'দেবী মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। উভয় বক্তৃতাই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সপ্তাহে ৬ দিন করিয়া তিনি সহরের বিভিন্ন স্থানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবৎ, পাতঞ্জল যোগসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বেদান্ত সোসাইটী, প্রভিডেন্স (আমেরিকা),—স্বামী অখিলানন্দ গত ২৫শে আগষ্ট উইলিয়াম্‌স্ টাউনে গমন করিয়া "মানবীয় আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠান' কর্ত্তৃক আহূত একটী বিশাল সম্মেলনে অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা কি করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি দূর হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। গত ৭ই অক্টোবর তিনি ক্লিভল্যাণ্ডে যাইয়া "ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞান," "অবচেতন মনের অধ্যয়ন" এবং "ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন" সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতাদানে বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

স্বামী প্রভবানন্দ—হলিউড্ বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া কয়েক মাসের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করত সম্প্রতি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে বেদান্তধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্তা ভগ্নী ললিতা (Mrs. Carrie Mead Wychoff) নাম্নী জনৈকা মার্কিন মহিলাও আসিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ক্যালিফোর্ণিয়ায় বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন সেই সময় স্বামীজির বক্তৃতায় ইঁনি এবং ইঁহার এক ভগ্নী বিশেষ আকৃষ্টা হইয়া স্বামীজিকে ইঁহাদের হলিউডস্থ বাসভবনে নিমন্ত্রণ করেন। স্বামীজি এই স্থলে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতিতে ঐ বাসভবনের নাম "বিবেকানন্দ হোম্" রাখা হইয়াছে। ভগ্নী ললিতা হলিউড্ বেদান্ত সমিতিকে এই গৃহ দান করিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে হলিউড বেদান্ত সোসাইটীর সভ্যবৃন্দ উভয়কে গত ১৮ই আগষ্ট বিদায় অভিনন্দন দান করিয়াছেন।

বেদান্ত সোসাইটী সানফ্রান্‌সিসকো (আমেরিকা),—অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ বেদান্ত সোসাইটী হলে প্রতি শুক্রবারে উপনিষৎ ও বেদান্ত ক্লাশ করিতেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৭টি এবং অক্টোবর মাসে ৯টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। "ধ্যান ও একাগ্রতা," "সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন," "কে যোগী হইতে পারে," "মরণের রহস্য," "শিষ্যত্ব কি," "মানুষ কি নিয়তির দাস," প্রভৃতি তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। তাঁহার ওজস্বিতা, পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা সভায় ও ক্লাসে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেছেন।

পরলোকে "বড়দা" (বটকৃষ্ণ ঘোষ)—দীর্ঘকাল বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বাস করিয়া গত ৫ই কার্ত্তিক সন্ধ্যায় প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে বটকৃষ্ণ ঘোষ (বড়দা) দেহত্যাগ করিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ (ছটুকো গোপাল) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। বড়দা তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বটকৃষ্ণ ঘোষ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট "বড়দা" বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং এই নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—আগামী ১লা পৌষ মঙ্গলবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ - শতবার্ষিকী - গ্রন্থ-প্রকাশ,—গতমাসে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী "গ্রন্থ-প্রকাশ শাখা সমিতি'র একটী অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ, তদীয় শিষ্যবর্গ ও শ্রীমাতাঠাকুরাণীর চিত্র সম্বলিত একখানি চিত্র-পুস্তক প্রকাশ করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ-মিশনের সকল শাখা-কেন্দ্রের চিত্র এবং উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে। সভায় ভারতের দেশসমূহের বিশিষ্ট লেখকগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধযুক্ত একটী পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র নিউইয়র্ক 'বেদান্ত-সমিতি,' ও সানফ্রান্সিস্কো "হিন্দুমন্দির," বোষ্টন "বেদান্ত-সমিতি," লা' ক্রিসেণ্টা "আনন্দ-আশ্রম," পোর্টল্যাণ্ড "বেদান্ত-সমিতি," প্রভিডেন্স "বেদান্ত-সমিতি" চিকাগো "বেদান্ত-সমিতি," ওয়াসিংটন "বেদান্ত-সমিতি'র অধ্যক্ষ স্বামীজিগণ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগে মার্কিনের প্রধান প্রধান স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী বিশেষভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেণ্টাইন প্রদেশের, বিওনেজ আইরেস্ "শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের" অধ্যক্ষ স্বামীজিও তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি শতবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সূত্র স্থাপিত হইবে মনে করিয়া "বহুজন হিতায়" এই মহাব্রত সফল করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ-শত বার্ষিকী,—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী যতীশ্বরানন্দ অনেক দিন হয় জার্ম্মাণীতে অবস্থান করিয়া বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সহিত ইউরোপের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী যথোচিত অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য তিনি স্থানীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগে চেষ্টা করিতেছেন। এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট গ্রন্থাবলী ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত করিবার আয়োজন চলিতেছে। ইতালী, অষ্ট্রিয়া ও জুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের ৩৫টী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের চেষ্টা হইতেছে।

ফরাসী দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী,—ফরাসী দেশে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য বিখ্যাত দার্শনিক কবিবর মঃ রোমাঁ রোলাঁ, "বাইবেল এবং ভারতবর্ষ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ-রচয়িতা মঃ এম্, সোভিন, দার্শনিক পণ্ডিত মঃ মরিস ম্যাগার, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মঃ ফ্র্যান্সিস্ এক্ বোনোমন ম্যাগার এবং অনেক গ্রন্থকার, পণ্ডিত ও সাংবাদিক চেষ্টা করিতেছেন। এই শতবার্ষিকীকে পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থানে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া উল্লিখিত প্রথিতযশাঃ ব্যক্তিগণ কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিয়াছেন।

ইংলণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী.—কিছুদিন হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অব্যক্তানন্দ লণ্ডন নগরীতে "শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করত ক্লাস ও বক্তৃতা করিতেছেন। আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন ভক্ত ও স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহযোগে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য সম্প্রতি একটী কমিটি গঠিত হইতেছে।

সিংহলে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী,—সিংহলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটী বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কিছুদিন হয় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য কলম্বো সহরে একটী কমিটি স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান, এডেন, ফিজি, উগণ্ডা, জাঞ্জিবার এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের চেষ্টা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন

দুর্ভিক্ষ ও বন্যা সেবাকার্য্য

জনসাধারণ ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন যে বাঁকুড়া জিলায় কয়েকবৎসর যাবৎ শস্য না হওয়ায় দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ঐ জেলার কয়েকটী থানা হইতে ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছে যে সহস্র সহস্র পরিবার অনাহারে অদ্ধাহারে কাল যাপন করিতেছে। অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে শীঘ্র খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা না করিলে বহু-লোকের মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য আমাদের হাতে অর্থ না থাকিলেও আমরা কাপিষ্টা, মেদিনীপুর ও ছাগলিয়া নামক গ্রামে তিনটী দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঐ সকল কেন্দ্র হইতে বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাটী, ওন্দা ও তালডাঙ্গা থানায় সাহায্য বিতরণ করা হইতেছে। অন্যত্র আমাদের বন্যা সেবাকার্য্য ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ৩রা হইতে ১৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমরা উক্ত তিনটী দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্র হইতে ২৬ খানি গ্রামে ১৬৩ মণ ৩৮ সের চাউল ও কিছু কাপড় বিতরণ করিয়াছি। চাউলের এই অত্যল্প পরিমাণ হইতে বুঝা যায় আমরা কি অকিঞ্চিৎকর ভাবে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারিতেছি।

আমাদের হুগলী জেলায় চাঁপাডাঙ্গা ও ভাঙ্গা-মোড়া কেন্দ্র হইতে বন্যা সেবাকার্য্য এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমানে শতাধিক কুটীর নির্ম্মাণের জন্য বাঁশ, খড়, দড়ি ইত্যাদি প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহারা একেবারে নিঃসম্বল কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করা হইতেছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে

বোম্বাইয়ের জনৈক সদাশয় বন্ধু আমাদের সেবা-কার্য্যের জন্য সম্প্রতি ১০০০৲ এক হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়োচিত সাহায্য না পাইলে আমাদের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইত। লোকের দুর্দ্দশা এত চরমে উঠিয়াছে যে সাহায্যের জন্য আরও বহু অর্থের একান্ত প্রয়োজন। শীত আরম্ভ হওয়ায় বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে কুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য এখনই না করিলে নয়। আবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত অংশেও চাউল বিতরণের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উভয় স্থানেই কম্বলও বিশেষ প্রয়োজন। শীঘ্রই উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে সামান্যভাবেও নিরাশ্রয় ও বুভুক্ষু নর-নারায়ণগণের সেবা করা আমাদের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিবে। পরদুঃখকাতর সকল সহৃদয় নরনারীর নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন অচিরে আমাদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেন। নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে উহা সাদরে গৃহীত হইবে।

(১) অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,—
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

(স্বাঃ) স্বামী মাধবানন্দ
অস্থায়ী সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন
৬।১১।৩৫ ইং

পৌষ — ১৩৪২

"মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয় জয়ের দ্বারাই হয়, ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না। অতএব, যে ব্যক্তি সুখাভিলাষী, তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, যে ব্যক্তি অনিত্য বাহ্য বিষয়ের অনুসরণ করে তাহারও মনে শান্তি নাই, যিনি আত্মারাম এবং যাঁহার অনুরাগ তীব্র, তিনিই শান্তিভোগ করেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ অনূদিত "খ্রীষ্টের অনুসরণ"

যিশুখৃষ্ট

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ

ওগো বীর, ওগো কর্ম্মী, হে ত্যাগী মহান্,
হে প্রেমিক, হে সাধক, মহাশক্তিমান্,
সৌম্য ওগো, শান্ত ওগো, স্থির জ্যোতির্ম্ময়,
নয়নে অমৃত-দীপ্তি, বদনে অভয়।

দধীচির মত পরহিতে আত্মদান,
ভৃগুসম বিধাতার হে প্রিয় সন্তান,
বিশ্বজয়ী প্রেম তব, বিশ্বময় প্রাণ,
"সাম্য" "মৈত্রী" "ভ্রাতৃত্বের" উড়ালে নিশান।

স্নিগ্ধ ওগো—শরতের ওগো পূর্ণ ইন্দু,
মহাযোগী,—গাম্ভীর্য্যের হে অতল সিন্ধু,
ওগো তীর্থরেণু, ওগো পূত হোমশিখা,
বিশ্ব তব ভালে আঁকে গৌরবের টীকা।

"ত্যাগে অমৃতত্ব" তুমি শিখিলে কোথায়?
বৈরাগ্যের মহামন্ত্র, দীক্ষা নিলে তায়,
তরুণ বয়সে তাই ত্যজি গেলে গেহ,
বাঁধিয়া রাখিতে নারে জননীর স্নেহ।

প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গভীর বেদন,
পাপীর ক্রন্দন-রোলে ক্ষুব্ধ করে মন;
তব শুভ আগমনে স্তব্ধ চরাচর,
অসহায় জীবলোক পুলক অন্তর।

হে প্রিয় সন্তান, ওগো সুর-সেনাপতি,
তোমার অপূর্ব্ব বাণী, তব দিব্যজ্যোতিঃ,
শ্রবণে, দর্শনে কারো মাতিল পরাণ,
বিদ্বেষ অনল কারো হৃদে দীপ্যমান।

হিংসা পেলে, বিনিময়ে প্রেম দিলে তাঁর,
হলাহল বিনিময়ে অমৃতের ধার,
মৃত্যুরে বরণ করি' অনন্ত জীবন,
মিথ্যা পেয়ে বিনিময়ে দিলে সত্যধন।

হে যোগিন্, অলৌকিক কর্ম্ম-সমুদয়,
পাষণ্ড-হৃদয়ে নাহি জাগাল প্রত্যয়,
রাজদ্বারে তাই তব হইল বিচার,
লাঞ্ছিত হইয়া দিলে শোধ লাঞ্ছনার।

খলেরা দুষ্কার্য্য করে, সাধু ফলভাগী,
সহিলে যন্ত্রণা তাই, পাষণ্ডের লাগি,
বজ্রশঙ্কু সম হৃদে না তোলো স্পন্দন,
অন্তরে জাগিল নাকো করুণ ক্রন্দন।

যুক্ত হোলো তব কর—চক্ষু নিমীলিত,
কাতরে ডাকিলে তুমি—'হে স্বর্গস্থ পিতঃ,
ক্ষমা কর এই সব অজ্ঞান সন্তান,
নাহি নিও অপরাধ, কর পরিত্রাণ।'

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করি' অনুভব,
বিশ্ব চরাচরে হের ব্রহ্মময় সব,
মহাজ্ঞানী, তব কণ্ঠে পুরাতনী বাণী,
'পিতার সহিত মোর ভেদ নাহি মানি।'

অজ্ঞান-হৃদয়ে তাই জাগে মহাভয়,
ধর্ম্মদ্রোহী বোলে সবে করিল প্রত্যয়,
তাদের কল্যাণ তরে করি' আত্মদান,
নিখিল এ বিশ্বমাঝে হ'লে মহীয়ান্।

তব শুভ জন্মদিনে কর আশীর্ব্বাদ,
মিটে যাক্ হিংসাদ্বেষ, ঘুচুক প্রমাদ,
দূর করি দাও দেব সকল বাধন,
তাঁ'রি প্রিয়কার্য্য যেন করিগো সাধন।

জ্ঞানের আলোক জ্বাল নাশি অন্ধকার,
প্রেম দাও, দূর করি' সংশয়ের ভার,
নিখিলের মর্ম্মবীণে জাগাও স্পন্দন,
বিপুল পুলকে বিশ্ব করুক নর্ত্তন।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামী অশেষানন্দ

কবি গাহিয়াছেন—"একে একে নিবিছে দেউটি।" প্রদীপমালার পর পর নির্ব্বাণের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচরগণও একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। উজ্জ্বল আভায় দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়া তাহারা জ্বলিতেছিল। ক্রমে তাহারা ধরণীর বক্ষে খসিয়া পড়িল। কাল বলবান। পার্থিব জগতের যাহা কিছু সকলই কালের নিকট পরাজিত। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া মানুষ বজ্রমুষ্টিতে উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রিয়জন-বিরহে অভিভূত হইয়া তখন সে দিশেহারা ও শোকে মুহ্যমান হইয়া কাঁদিতে থাকে। মহামায়া দেখিয়া হাসেন। অবোধ শিশুর খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন দুঃখ হয়, আমাদেরও তেমনি পরিজনগণের বিচ্ছেদে অপরিসীম যন্ত্রণা হয়। প্রাণে সর্ব্বদা হাহাকার ধ্বনি উঠিতে থাকে। কিন্তু মায়ের প্রকৃত সন্তান হাসি কান্না মিলনবিরহ সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে কিছুতেই অবসন্ন হন না। শক্তি উপাসক জন্ম মৃত্যু উভয়ই করুণার-দান মনে করিয়া অবিচলিত রহেন। জগন্মাতা তাঁহাদের কর্ণে অভয়বাণী শুনাইয়া বলেন—"মা থাকিতে সন্তানের ভয় কি? সকলে ছাড়িলেও আমি কখনও ছাড়িব না। যাহার আনন্দময়ী মা রহিয়াছেন তাহার আর ভাবনা কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের পূতসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারাই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন এমন দেবদুর্ল্লভ বস্তু সংসারে পাওয়া দুর্ঘট। উঁহাদের তুলনা নাই। দেখা গিয়াছে কত শোকাতুরা জননী ইঁহাদের প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা পাইয়া পুত্রশোক একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। কত পথহারা পথিক পথের সন্ধান পাইয়া নূতন উৎসাহে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন। সাধক তাঁহাদের অগ্নিময়ী বাণীর প্রবলছটায় এবং উজ্জ্বল ভাস্বর জীবনের জলন্ত তেজে উদ্দীপিত হইয়া উৎসাহ আনন্দে সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কালের করাল স্পর্শে সকলকেই একদিন এই রঙ্গভূমির নাট্যলীলা শেষ করিয়া বিদায়ের সঙ্গীত গাহিতে হইবে। জীবন তাঁহাদেরই ধন্য যাঁহারা কোনও ভগবদ্দর্শী মহাত্মার কৃপালাভ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিবার এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ছাঁচে জীবন গড়িবার প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে। লাখ টাকার বিনিময়েও 'তেমন মনের মানুষ মেলা ভার'। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে যদি সকলই ধ্বংস হইত তবে মানবের আপনার বলিবার আর কি থাকিত? দেহ গেলেও স্মৃতি যায় না। পথিক চলিয়া গেলেও তাহার পদচিহ্ন রহিয়া যায়। অপর পথিক তাহাই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয় এবং গন্তব্য ধামের সন্ধান করিয়া লয়। কথায় বলে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। যশস্বী মানব মরিয়াও অমর। পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি চিরস্মরণীয়। তেমন একজন কীর্ত্তিমান, পরদুঃখে কাতর, বিগলিত-হৃদয়, অহেতুকী ভালবাসার চলন্ত মূর্ত্তি, করুণার জীবন্ত বিগ্রহ মহাপ্রাণ অসাধারণ মানুষ ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। কথা প্রসঙ্গে একদিন জনৈক আশ্রিত যুবক বলিতেছিল—"এমনক রিয়া আমাদের কেহই ত আর ভালবাসে নাই। জানিনা দুইদিন না মিশিতেই

কেন যে তাঁহার কেনা গোলাম হইয়া গেলাম। বাপমার ভালবাসা এঁর কাছে কত তুচ্ছ মনে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কাছে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। ছেড়ে যেতে মন এতটুকু চায় না। এমনি বাঁধনে বেঁধে ফেলেছেন যে, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, সব একেবারে ভুল হ'য়ে গেল। এমন স্নেহ জগতে আর কারু কাছে পাইনি" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের বিশেষত্ব এই যে, বক্তৃতা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা নহে শুধু কোমল হৃদয়ের স্নেহের দ্বারাই তাঁহারা ধনী নির্ধন, অন্ধ আতুর, বিদ্বান মূর্খ, সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া আপনার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের দেহরক্ষার পর অন্য আর একজন গৃহী ভক্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন—"কাণ্ডারী হারা হ'য়ে আমরা অকূল পাথারে ভাসছি। পারের কোনও সাড়া সন্ধান পাচ্ছি না। মাতৃহারা বালকের ন্যায় পথে পথে ঘুরছি। কেবল কান্নাই সার হচ্ছে। সেই হারা হ'য়ে চারদিক অন্ধকার দেখছি।—কোথায় ছিলুম আর কেমন করে ঠাকুরের সংসারে এ'সে পড়লুম। আমাদের সাধ্য কি যে মহামায়ার শক্ত বাঁধন কেটে বের হই। শরৎ মহারাজের ভালবাসায় পড়ে ঠাকুরের পদে মাথা বিকিয়েছি। সংসারের শত প্রলোভনেও কিছু কত্তে পারে নি। তাঁর নামে শান্তি পেয়েছি। তিনি যে আমাদের হাত ধ'রে সকল বাধাবিঘ্নের ভেতরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ তিনি কোথায়?" প্রাপ্তবয়স্ক প্রৌঢ়ের বেদনার বাণী সত্যই বড় মর্ম্মান্তিক। এইরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস হতশ্বাস শোকের অশ্রুবারি কতই না সংসার দাবদগ্ধ, চিন্তাতাপক্লিষ্ট জীর্ণদেহ সংসারী ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। শুধু স্বামী সারদানন্দের নহে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহারাজগণের অনুরাগী ও আশ্রিতগণের মুখ হইতেও এই প্রকার বিষাদের আর্ত্তনাদধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িবে সেই কয়েকটা দিন যাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া একসময় তাহাদের জীবন একান্ত মধুময় করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বরণীয় মহানুভবগণ ছিলেন তাহাদের সংসার সমুদ্রের কর্ণধার ও জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেক সন্তানের ভিতরই একটা না একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"আমার পাঁচ ফুলের সাজি"। স্বামী সারদানন্দের জীবনে অদ্ভুতভাবে প্রকটিত হইয়াছিল তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য ও হিমালয় সদৃশ গাম্ভীর্য্য। বাহির হইতে তাঁহাকে চেনা বড়ই শক্ত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে তিনি একজন সুবিশাল দেহ, গজানন সদৃশ লম্বোদর বপু, গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ভিতরে ছিল এমন একটী সরস, প্রেমমাখা, সহানুভূতিপূর্ণ কোমল প্রাণ যাহা মৃদুমন্দ ভাবে নিঃশব্দে সদাই বহিয়া যাইত। যাহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ না পাইয়াছে, তাহারা কখনই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তাঁহার স্বভাব ছিল এতই চাপা যে গভীর জলের মাছের মত তাহা বাহিরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইত না। অন্তর্হৃদয়ের গুপ্ত কথা শুনিবার সৌভাগ্য কৌতূহলাক্রান্ত মানবের ঘটিয়া উঠিত না। দুর্ভেদ্য দুর্গ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশের সাহসও তাহাদের সাধারণতঃ হইত না। কিছুদিন তাঁহার সঙ্গ কর। আইস যাও। শুষ্ককণ্ঠ পিপাসিত জনের ব্যাকুল-তৃষ্ণা মিটাইবার ন্যায় আন্তরিকভাবে মিশিবার ইচ্ছা প্রাণে প্রাণে পোষণ কর। দেখিবে তিনি কি মধুর, কত আপনার—অসামান্য প্রেমিক হৃদয়, যেন ভালবাসার জীবন্ত-মূর্ত্তি। আর সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই। মনে হইবে 'যেন নিজের ঘরের আপন মানুষ'—তোমার যুগ-যুগান্তের সাথী, হৃদয়ের দেবতা, আপনার হইতেও অতি আপনার!

"হেসে দুটো কথা কইলেন, মাথায় হাত দিয়ে

আশীর্ব্বাদ করলেন, গায়ে হাত দিয়ে বললেন আবার এসো'— সংশয় ছিন্ন হইল, অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল, পথের সকল বাধা দূরে অপসারিত হইল। উৎফুল্ল প্রাণ সহসা নাচিয়া উঠিল। সংসারের সকল জ্বালা, সকল ব্যথা কোথায় অন্তর্হিত হইল। শ্রীভগবানের দুয়ারে মন একমাত্র কামনা জানাইল—
"জীবনে মরণে যেন না ভুলি তোমায়, ওহে প্রিয়তম মোর।"

কেবল ভক্ত শিষ্যদের প্রতি স্নেহ নহে গুরু ভাইদের প্রতিও স্বামী সারদানন্দের অসামান্য প্রণয় ও গভীর অনুরাগ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর তাঁহার কি অদ্ভুত টান ও শ্রদ্ধাই না দেখা যাইত। তাঁহার প্রতি কথাটী বেদবাক্যের ন্যায় অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে যত্নপর হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার মানসপুত্রে কিছুমাত্র পার্থক্য বোধ ছিল না। যেন স্বয়ং গুরুদেব অন্য মূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। একদিন বলরাম মন্দির হইতে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণামপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেখলুম, যেন ঠাকুরই ব'সে রয়েছেন। ঠিক তাঁরই মত মধুর হাসি, রঙ বেরঙের যষ্টি নাষ্টি আরও কত কি" স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহরক্ষার পর ব্যথিত হৃদয়ে এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"এক অঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। কুটো গাছটী নাড়াবার শক্তি নেই। এখন কাজ কম্ম তোমরা সব বুঝে পড়ে নাও।"

শরৎ মহারাজের হৃদয় যে কত উচ্চ ও মহান তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব কেমন করিয়া ধারণা করিবে? এখনও অনেকে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানেন যে তাঁহার ন্যায় "হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক" মাতৃগতপ্রাণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিরানুগত সেবক সংসারে বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। অনুরাগী ভক্তগণ বলিবেন—"তাঁহার চরণছায়ায় বসিতে পারিলে আমাদের মনে হইত যেন দিব্যসঙ্গে অজানা দেশের কোন এক আনন্দের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছি। সেখানে ক্ষুদ্র সংসারের পঙ্কিলতা নাই, আবিলতা নাই, আছে কেবল শান্তি, ভালবাসা ও প্রেম। তথায় দুঃখদৈন্যের ক্রন্দন নাই, ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, আছে শুধু একটানা ভাব-মন্দাকিনীর সুমধুর কলকলধ্বনি ও জগৎভোলা আনন্দের সুবিমল হাসি।" স্থূলশরীর ধারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ আমাদিগকে সুখের সাগরে ভাসাইয়াছিলেন, প্রাণে উৎসাহ ও ভরসার সঞ্চার করিয়া কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাই গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা করিতেছি—"হে পথপ্রদর্শকগণ, যদিও তোমরা বাহ্যদৃষ্টির অগোচর তথাপি একেবারে অন্তর্হিত হও নাই। চক্ষুর আড়ালে থাকিলেও মনের অন্তরালে নহ। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পারি। আমাদের উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন তোমাদের পূজার অর্ঘ্যরূপে নিযোজিত হয়। আমরা ভুলিলেও তোমরা কিন্তু ভুলিও না। দেহ মন যেন তোমাদের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হয়।" পরিশেষে নরনারায়ণের চরণসরোজে আমাদের এই ব্যাকুল মিনতি—

"তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি॥"

দূর প্রাচী

স্বামী বাসুদেবানন্দ

চীনের সুদূর ইতিহাসে ও জীবনের প্রতি কোনও অবজ্ঞা দেখা যায় না—পার্থিব সুখ দুঃখকে তারা হাসিমুখেই গ্রহণ করেছিল। চীন ভারতের আধ্যাত্মিক ছাত্র হলেও মূলতঃ উভয়ের চরিত্রে একটা বিরুদ্ধ ব্যবধান আছে—চীনের প্রকৃতি ব্যবহারিক, পরন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক। গঙ্গা তটের দেবতার মহিমা, শূন্যের শান্তি, ব্রহ্মের পূর্ণতা, হরিদ্রা নদীর (Yellow River) তটভূমিকে আচ্ছন্ন করলেও কনফুসের জীবন বেদ চৈনিক সমাজের শক্তি কেন্দ্র। বেদ জগৎকে বরাবর অস্বীকার করেই চলেচে, ত্রিপিটক জগৎকে স্বীকার করলেও নির্দ্দেশ করেচে যা বৈদিক সিদ্ধান্ত। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু আদর্শে তাদাত্মই লাভ করেচে, পরন্তু চীনের অন্তর-প্রকৃতি হচ্চে এই দৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতি একটা দার্শনিক প্রীতি। জ্ঞানী ও বিদ্বৎ সমাজের অতি প্রাচীন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এক অপূর্ব্ব ব্যক্ত-জীবনের অতি নিখুঁত রূপায়ণই রচিত হয়ে এসেচে। কথাটা হচ্চে চীনেরা পার্থিব মানবতার সাধক। ভারতও তাই, তবে সেটা অদৃশ্য আধ্যাত্মিক;—সার্ব্বভৌম সমাজাদর্শ উভয়ে সাধারণ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গণ্ডিবদ্ধ নেশন প্রতিষ্ঠা কল্পে জগতের স্বার্থকে ভোগাগ্নিতে আহুতিরূপে ত্যাগ করা তাদের সাধনার পরিপন্থী। প্রাচীর কৃষ্টি এক-তন্ত্র নয়—তার আত্মায় স্বার্থ তৃপ্তির কলুষ নেই, আছে সমষ্টির সার্ব্বজনীনতা। তবে ভারত পার্থিব সাম্যের ওপরও ততটা বিশ্বাসী নয়, তাই সে আত্মিক সাম্যের আবিষ্কারে এত প্রযত্নশীল। কিন্তু চৈনিক কৃষ্টির পট-ভিত্তি হচ্চে এই সুদৃশ্য পৃথিবী—জীবন-চিত্রকে কি ভাবে সুসমঞ্জস করতে পারলে ব্যক্তি ও সমষ্টি এক আন্তরিক সৌহার্দ্দ্যের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে।

পৃথিবীর সজ্জা পরিবর্ত্তন হেতু আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, নিরন্তর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাগমে মহাচীনের আদিম ইতিহাস এক অস্পষ্টতার যবনিকাচ্ছন্ন। প্রবাদে নৃ-পশুর স্তর হতে উৎকৃষ্ট মানব পর্য্যন্ত নানা ইতিহাসই আছে। শোনা যায় ফু সি, শেন নাং এবং হাং তি ই নাকি চৈনিক প্রগতিতে যুগান্তর উপস্থিত করেন। এঁরা কতদিনের লোক তা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, তবে এঁদের সময় হতেই শস্য ও রেশমের চাষ, লাঙল, চাক্, জাল, মৎস্য-যন্ত্র (compass), পশুর ব্যবহার, ঔষধ, লিখন, সংগীত ও বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রকোষ্ঠ সমাজ-সংঘের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঐ চাষাগুলো যে অজানিত কাল হতে ধীরে ধীরে এক বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠীর প্রযত্নে অভিব্যক্ত হয় তা নয়, হরিদ্ নদীর উভয় তটে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন গোষ্ঠার উপনিবেশের সহিত সেগুলি রোপিত হয়েছিল। আবার কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে মানব সভ্যতার আদিম কেন্দ্র হতেই যার রেশ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, হিন্দু, ইরাণ ও মেসপোটেমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির যা থেকে উদ্ভব,—এক বিশিষ্ট জাতির আদিম অধিবাসীদের সহিত ঔপনিবেশিক মিশ্রণের ফল স্বরূপ হচ্চে ঐতিহাসিক চীন। ক্রমে আবেষ্টনীর বৈচিত্র্যে এবং পরবর্ত্তী কালের বিভিন্ন মানব প্রবাহের আগমনে জাতির সামাজিক বৈচিত্র্যও সংঘটিত হয়েচে।

ভারতের মত চীনও কাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং উভয়ই মূলতঃ কৃষি জাতি এবং অধিকাংশ লোকই পল্লী ছায়ায় বৃদ্ধিশীল। বিভিন্ন পরিবারের প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম্য-সমিতি এবং কর্ম্মের প্রতিনিধি নিয়ে নগর-সমিতি গঠিত হওয়ায় সমাজ ভিত্তি খুবই গণতান্ত্রিক। এই বুননের প্রতি কেন্দ্র হতে একটা সাধারণের যা প্রাপ্য সবই সুগম ছিল। আমরা আজকাল যাকে National এবং Political consciousness বলি প্রাচীন ভারতের মত চীনেরও তা অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষেও যেমন বিজয়ীর পর বিজয়ীর স্রোত এসেছে, কিন্তু গ্রামবাসীরা যেমন কর দিয়েই খালাস এবং তাতে তাদের গ্রাম্য স্বাধীন কৃষ্টির কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটে নি, চীনেদেরও রাজনীতিক বলতে যা কিছু তা ঐটুকুই—সম্রাটের নিকট বাৎসরিক কর দাখিল করা। এক জন রাজপ্রতিনিধির মধ্য দিয়ে এই সব লেন দেন চলত। এই পদবী প্রতিষ্ঠিত ছিল পাণ্ডিত্যের ওপর এবং মাত্র খুব গোলমালের সময় তিনি গ্রাম্য ও নগর সমিতির কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতেন। সম্রাটের অত্যাচারের একমাত্র লক্ষণ ছিল করাধিক্য এবং প্রতিকারের একমাত্র উপায় ছিল তাঁকে শারীরিক ভাবে অপসারিত করা—শাসন বদলে গেলেই সমাজ যের যেমন তেমনি নিস্তব্ধ। এই নিশ্চিন্ত শান্তির মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ তাও ধর্ম্মের উদ্দীপক ও সংস্কারক লাওট্‌জির আদর্শ জীবন ছিল —"গ্রাম্য পশুপক্ষীর শব্দ রোজই শুনি, কিন্তু সারা জীবনে কখনও গ্রামের ভেতর যাই নি।" "নিরালায় আশ্রয় নেওয়াই স্বর্গের রাস্তা।"

গ্রামের পরিবার বর্গের প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম্য-সভা রচিত হত এবং তার একজন সভাপতি থাকত। বাস্তবিক পক্ষে এঁরাই গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক। প্রত্যেক পরিবারের কিছু কিছু জমিজমা থাকত এবং একটা একটা পরিবারে প্রায় চার পুরুষ একত্রে বসবাস করত। সকলের রোজগার একবারে সমভাবে ব্যবহৃত হোত। পরিবারের যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তিনিই নেতা-রূপে বিবেচিত হতেন। পারিবারিক সভাই শিশু-শিক্ষা ও বিবাহের ব্যবস্থা করতেন। বিবাহটা বংশরক্ষার ব্যাপার—এখানে ব্যক্তিগত মতামত বা পছন্দ চলতে পারে না। অবশ্য আর্থিক ও যৌন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংকুচিত হলেও, সারা জীবনের দায়িত্ব পারিবারিক সভাই গ্রহণ করতেন; কারণ জ্যেষ্ঠেরা বয়সের অভিজ্ঞতার দ্বারা কোথায় কিরূপ ব্যবহার, কার কিরূপ কর্ত্তব্য, কে কিরূপ সুবিধা পাবে কনিষ্ঠদের চাইতে বোঝেন ভাল। পিতাই শ্রেষ্ঠ—কারণ বংশের ধারা এবং ঐক্য রক্ষা, যেটা হচ্ছে চৈনিক জীবনের আদর্শ, সেটার মূল ভিত্তি হচ্চে পিতৃভক্তি। এতে জীবন মোটামুটি বেশ চলে যায়—কিন্তু এ পদ্ধতি ঠিক ভারতেরই মত জীবনের উদ্দীপনা ও বিকাশের বিরোধী হয়ে পড়েছে এবং গতানুগতিক পদ্ধতি সমাজে এমন এক জড়ত্বের পাহাড় সৃষ্টি করেছে, যা পরিবর্ত্তনের সকল ঝড়কেই অগ্রাহ্য করে স্থির থাকে।

চীন দেশে বংশানুক্রমিক শাসক কোন কালেই ছিল না। গ্রাম্য প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান তাঁদের নিয়ে একটা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্বৎ-অভিজাত সমাজ সৃষ্টি হয়—তাঁরাই সমাজের শাসক। ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়েরাই শাসক এবং ব্রাহ্মণরা তাঁদের মন্ত্রী, কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণই শাসক এবং কৃষ্টির অনুশীলনকারী। শিক্ষার বিষয় ছিল—প্রাচীন লিপি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, দর্শন। সমাজ শাসনের এ সব জ্ঞান শাসকেরাই বরাবর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আসচেন। এই সব চৈনিক জ্ঞানরাশির দুটো দিক—কৃষ্টি একদিকে যেমন উচ্চ হতে নীচে প্রবর্ত্তিত হোত, আর এক দিকে সকল কৃষ্টির মূল উৎস ছিল গ্রাম্য জীবনের বিচিত্র চরিত্র। এক কথায় চৈনিক সাহিত্য, দর্শন

এবং রূপায়ণিক বৃত্তি আদর্শ-তন্ত্র হতে বস্তুতন্ত্রই অধিক ; পরন্তু ভারতীয় আনুশীলনিক বৃত্তি প্রধান ভাবে আদর্শ-তান্ত্রিক। চীনেরা জীবনের চাঞ্চল্য, কোলাহল, উদ্দীপনা ও অনুরাগ যে পরীক্ষা করে নি তা নয়—যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসই তাদের প্রাণের চাঞ্চল্যকে শান্ত করতে শিক্ষা দিয়েচে ; কেবল, আগের মত নবাবিষ্কারের দ্বারা সমাজকে কিরূপে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়ে নিতে হয়, ভুল যাওয়ায়, ভাগ্য ও পুরুষকারের এত বড় একটা সামাজিক মীমাংসা অহিমের ঝিমুনিতেই পরিণত হয়েচে।

চৈনিক সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী হচ্চে বিদ্বান ঠিক ভারতেরই মত, তারপর পর পর কৃষক, বণিক, গৃহকর্ত্রী, চাকর বাকর এবং সকলের নিকৃষ্ট হচ্চে সৈনিক যারা "জীবন-নাশক" বলে পরিচিত। পরন্তু ভারতে ক্ষত্রিয় রাজা ভগবানের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হোত।

বণিক, কারিগর এবং তাদের অন্যান্য সহযোগী নিয়ে, ঠিক গ্রাম ও নগর সমিতির পাশাপাশি, আবার একটা করে বাণিজ্য সমিতি প্রায় ২৫০০ বৎসর ধরে চীনদেশে চলে আসচে। চাউ বংশের রাজত্ব কাল থেকে এর আরম্ভ। সহরের নানাবিধ পণ্যশিল্পের শাখাগুলি সংঘবদ্ধ করবার জন্য সরকার থেকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হোত। প্রত্যেক সমিতিই স্বাধীন ভাবে, কর বিভাগের প্রতিনিধির সাহায্যে, নিজেদের ব্যবস্থা, যেমন, পণ্যের মূল্য নির্দ্দেশ, কাজ এবং মজুরীর সংযম, বিবাদের মীমাংসা, চুরির দণ্ডবিধান প্রভৃতি করতেন। এই সব সমিতির মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ থাকায় এবং সকল প্রতিনিধি সমবেত ভাবে বিচার মীমাংসা করায়, কারও কিছু বলবার থাকত না। এই সকল প্রথার বহুকালের অভ্যাসের ফলে চৈনিক জীবনে শৃঙ্খলা ও শান্তি, সমষ্টির বশ্যতা, যুক্তি-তান্ত্রিকতা, প্রতি ব্যক্তির প্রতি সম্মান জ্ঞান খুব স্বাভাবিক ভাবেই বর্ত্তমান। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ বা চীন সমগ্র পৃথিবী নয়। একটা বিশিষ্ট দেশ ও কালে ও বহু অভিজ্ঞতার ফলে যে শান্তিপূর্ণ কৃষ্টি এই উভয় জাতি লাভ করেছিল, তা পৃথিবীর অপরাংশ সকলে পরিব্যাপ্ত না হওয়ায়—তাদের ব্যক্তিত্ব এবং নেশানের অসীম আকাঙ্ক্ষা, অর্থ-গৃধ্নুতা, নিত্য নূতন অভাব, সাম্রাজ্যলিপ্সা, ইন্দ্রিয়ের অসংযম হেতু এই উভয় জাতির শান্তিময় সাম্য, দর্শন, বিজ্ঞান রূপায়ণ প্রভৃতি কৃষ্টি আজ ধ্বংসমুখী। বৌদ্ধ ভারত ও কনফুস চীন পশুবীর্য্যকে উপেক্ষা করায় আজ তারা তাদের বহুকালার্জ্জিত প্রতিষ্ঠান রক্ষায় অসমর্থ। খৃষ্টের ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে কনফুসে প্রথম বলেন, 'যে রূপ ব্যবহার তুমি নিজে পছন্দ কর না, সেরূপ ব্যবহার কারুর প্রতি করো না।" এ নীতির স্থান এখন কোথায় ?

কনফুসে এবং লাউট্‌জির শান্তিময় সমাজের আদর্শ চৈনিক-কৃষ্টিতে এমন মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট যে বহুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তথায় বিরাট অভিযান এবং মধ্যযুগে ইসলাম ও ইদানীং খৃষ্টধর্ম্ম তথায় প্রবেশের চেষ্টা করলেও, উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের পরকালের অপূর্ব্বতা, তাদের ব্যবহারিক পার্থিব আদর্শকে অতিক্রম করতে পারে নি। যত রকমের ধর্ম্ম আসে আসুক, কিন্তু চীনকে দেখাতে হবে তার পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা। বৌদ্ধধর্ম্ম এমন বিপুল ভাবে যে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রসায়ন বিজ্ঞান, বৈদ্যক শাস্ত্র, শিল্প ও দান প্রাধান্যের জন্য।

ভারত ও চৈনিক সভ্যতার দুটো অদ্ভুত পরিপাক শক্তি দেখতে পাওয়া যায়। ভারত যখনই কোনও অপরিচিত শক্তির বশীভূত হয়ে পড়ে তখনই তার আত্মবেদ প্রবুদ্ধ হয়ে সেই বিজাতীয় শক্তিকে এমন বশীভূত করে ফেলে যে কয়েক শত বর্ষ পরে সেই স্বতন্ত্র শক্তি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য হীন হয়ে তার জন সমুদ্রে এমন ভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে

তাকে আর চিন্তেই পাবা যায় না। পরন্তু চীনের পরিপাক শক্তি বিভিন্ন—সেটা হচ্চে তার জীবনবেদ, (Philosophy of Life)। 'কেমন করে শান্তিময়, উত্তেজনাহীন, সাদা জীবন যাপন করতে হয়'—এইটাই হলো চৈনিক দৃষ্টিতে প্রধান, ধর্মাদি গৌণ। পরন্তু ভাবতে আধ্যাত্মিক ঐক্যই মুখ্য—শাসন ও সমাজ সব গৌণ—সব আত্মবেদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু উভয় বেদের মধ্যদিয়েই, উভয় জাতি ত্যাগ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, সামাজিক সম্বন্ধ ও পবিত্রতা, পরোপকার প্রভৃতি সার্ব্বভৌম ব্রত শিক্ষা করেছে।

চীন সর্ব্বকালে, দার্শনিক থেকে কৃষক পর্য্যন্ত মানবতার উপাসক। কৃষকের জীবন কিন্তু অত্যধিক ভাবে প্রকৃতি-শক্তির সহিত জড়িত। কারণ তার হাতে রয়েছে খাদ্যের চাবি। খাদ্যের ওপর মানুষের এমন সুন্দর জীবন নির্ভর করচে। কিন্তু সেই মানব জীবন যে খাদ্যের উপর নির্ভর করে, আবার পৃথিবীর গতিবিধি হেতু আকাশ, বাতাস, জল, বায়ুর ওপর—তাই প্রতি ঋতু পরিবর্ত্তনে তাদের উৎসবের আয়োজন। সে কখনও অমূর্ত্তির কান্তারে বা গিরিগুহায় বাসের ইচ্ছা করে না, কারণ তা হলে মানবের পার্থিব স্বর্গ সৃষ্টির যে আমরণ চেষ্টা, তা থেকে সে চ্যুত হবে। তাই তাদের রাজকীয় দিক হতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, আকাশ বেদীর তলে, সর্ব্বমানবের ধনধান্যে পূর্ণ হবার জন্য, উপহার সংগ্রহ। তাও ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ গণিতিক আঁক চোক, মন্ত্র তন্ত্র, অমৃতের সন্ধান সন্ধি এই পার্থিব জীবনকে পূর্ণ করবার জন্য প্রাকৃত শক্তিগুলির সঙ্গে একটা আপোষ।

লাওট্জি (৫৭০-৫৯০ খৃঃ পূঃ) দর্শনের 'তা' বেদান্তের 'তৎ' বা 'মহৎ এবং 'তি' বেদান্তের 'শক্তি'। লাওট্জি এই 'তা'কে 'সৎ' মাত্র বলেন, উপনিষদের 'চিৎ' ও 'আনন্দ' স্বরূপ স্বীকার করেন না। কিন্তু এদিকে 'তা'কে একটা অপরিত্যাজ্য 'নিয়ম' (way) রূপেও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "ত্রিকালে নিত্য এক সত্তা আছে। তাকে, নানা ভাষায় নানা নাম দেওয়া হয়েছে, আমরা তাঁকে বলি হুয়াং (হুঁ) অর্থাৎ রহস্য পুরুষ তার কোন নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, কারণ ভাষা সীমারই সংকেত, সসীমকেই সে স্পর্শ করতে পারে; পরন্তু তা অকারণ, অতীন্দ্রিয় এবং এর পর আর নেই। 'আউ' (নিরবয়ব) তা সৃষ্টির মূল উৎস।" 'তি' 'তা' থেকেই বেরন। 'তি' স্খলন অসৃষ্টির ঘনান্ধকার—সৃষ্টির গর্ভ। সে গর্ভবস্তু অমূবস্তু—সে অক্ষবস্তু সত্বির হতে সহস্ররূপ বাষ্পাকারে নিরন্তর উঠচে, কিন্তু 'তা' ও 'তির' তাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি নেই।" 'তা' তে কিং'—যে 'তা' বুদ্ধি গ্রাহ্য তা ঠিক 'তা' নয়। এই দর্শনই হচ্চে চৈনিক জীবন-বেদের মূল ভিত্তি। কিন্তু এ সবই উপনিষদের প্রতিধ্বনি।

সমাজের ঐক্য ভিত্তি সম্বন্ধে একজন তাও গুরু বলচেন, "জগৎটা যে একটা সুরে বাঁধা তার প্রমাণ সুষুপ্তি। সেখানে সব একাকার। সেখানে কেবল 'তা'ই থাকেন। একটা সুর থেকেই সব সুর বেরুচ্চে—একটা রস আছে বলেই ফলের এত রস বৈচিত্র্য।" (উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, ৩১ বর্ষে "তাও ধর্ম্মে শক্তি বাদ" দেখুন)। তাই লি সুং বলচেন, "এই তত্ত্ব জানলেই লোকে—সমাজে সাম্যের অনুসরণ, বিদ্বৎ সমাজকে বরণ, আন্তরিকতা এবং শান্তির সমর্থন, বিশ্বের সহিত মৈত্রী, বৃদ্ধের অন্নসংস্থান, যুবকের সেবার নির্দ্দেশ, জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, বিধবা, অনাথ ও দুস্থের প্রতি সহানুভূতি, দায়িত্ব গ্রহণ, নারীর যথোপযুক্ত সংস্থান, ধন-স্তূপীকরণের বিরোধিতা, মাত্র নিজের জন্য সংস্থানকে ঘৃণা, শক্তির অপব্যবহার—স্বার্থপরতা—আত্মম্ভরিতা—চুরি ডাকাতি বর্জ্জন—করবে। তখন আর মানুষের দরজা দেওয়ার দরকার হবে না—তখনই

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।" (Book of Rites—Li yun P'ien)। এ সবই স্বামিজীর বেদান্তের প্রয়োগিক দিক (Practical Vedanta) যা তাঁর "Work is Worship"এ অধিকতর পুষ্ট হয়েছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সমাজকে Cosmic unityর ভাগী করা। কনফুসে (৫৫১ খৃঃ পূঃ) এবং তাঁর শিষ্য মেনসাস্ উভয়েই মানব-সমাজের সামঞ্জস্য বিধান করে দিলেন, কিন্তু লাওট্জির মত দর্শনের দিকটা প্রবল না হওয়ায় তিনি Cosmic Tao ঔপনিষদিক হিরণ্যগর্ভ ধরতে পারেন নি। (উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৩৯, ৩৪ বর্ষ, "কথাপ্রসঙ্গে" চৈনিক-ধর্ম্ম দেখুন।) আইনষ্টিনের ভাষায়, *যখনই ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য* আসে, তখনই যেন আমরা একটা ভাগ্যের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, 'The totality of existence as a unity"

এই যে গণ্ডিবদ্ধ ভাব এর মস্ত দোষ হচ্চে প্রতিবেশীকে অতিক্রম করে তার আর দৃষ্টি চলে না—'তোমরা মর ছাড় আমাদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, তোমারাও আমাদের অনুকরণ কর শান্তিতে থাকবে।' ভারতবর্ষে এর প্রতিবাদ আরম্ভ হলো বুদ্ধের সময় হতে। 'দুঃখান্বিত জগতে'র কল্যাণ বিধান হচ্চে ধর্ম্মের এক বিরাট অঙ্গ। লাওট্জি পরোপকার সম্বন্ধে একটা জবাব দিয়ে গ্যাছেন—"প্রকৃতি মানুষের প্রতি ঠিক খড়ের কুকুরের মত ব্যবহার করেন।" যখন যার কাজ শেষ হয়ে যায় প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাকে সরিয়ে দেন। জগতের এ সত্যের সম্মুখীন সকলের সাহসের সহিতই হওয়া উচিত। কিন্তু নব-বিজ্ঞান বলেন, 'ব্যাধি, রোগ, দারিদ্র্য আমরা পুরুষকার বলে আস্তে আস্তে জয় করচি;' কিন্তু চীন বলে, 'তোমরা ও প্রকৃতি নিয়ে যুদ্ধ-মহামারী কখনও জয় করতে পারবে না।' হিন্দু বলেন, 'স্থিরতা, ত্যাগ, সমষ্টির ঐক্য, ব্যক্তিত্বের সংযম, ভোগে অনাসক্তি যেমন সামাজিক শান্তির অপরিত্যাজ্য বিষয়, তেমনি পরহিত ব্রতে সমষ্টি বৃত্তের পরিধির বিবৃদ্ধি, হেতু স্বীয় গণ্ডির পারের বস্তুকে আর উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে না এবং সমষ্টি মানবতার জাগৃতি হেতু বিশ্বে সার্ব্বজনীন কল্যাণই সকলে উপভোগ করতে পারবে। তা হলেই আমাদের হিরণ্যগর্ভ বা তোমাদের Cosmic Taoএর বাস্তব দিক আমরা এই পার্থিব জীবনে এবং তাকে অতিক্রম করেও 'তা' ও 'তৎ' এর অসীমদিককে উপলব্ধি করতে পারব।

বুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এবং সর্ব্বকালে চীন অপর *জাতির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারে নি কেন?* —তার একটা ভৌগলিক কারণ হচ্চে উভয় দেশই দুর্গম পর্ব্বত, সমুদ্র এবং মরুভূমির দ্বারা বেষ্টিত এবং উভয় দেশই বিরাট, তথা জীবন-যাত্রার উপাদানসমূহে পরিপূর্ণ। তা ছাড়া ক্রমাগত জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ রাজবংশের পরিবর্ত্তন, বিদেশী বিজেতাদের পরিপাক নিয়ে তাদের এত ব্যস্ত থাকতে হোত যে বাহিরের দিকে তাদের আর দৃষ্টিক্ষেপ করবারই সময় হোত না। শ্রীকৃষ্ণ ভারতে শান্তির নিমিত্ত সমস্ত রজঃ শক্তিকে দমিত করে গেলেন, কিন্তু বাহিরের পশু সমুদ্র হতে ভারতে ক্রমাগত তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসতে লাগলো। শ্রীবুদ্ধ বুঝতে পেরে তাঁর ধর্ম্মচক্র চালিয়ে দিলেন দেশ বিদেশে; কিন্তু ক্রমে সে চক্রচালকগণ হীনশক্তি হয়ে পড়ায় দুর্ব্বার পশু শক্তির পুনরভ্যুত্থান। চীন বাহিরের কথা ভাববার অবসরই পায় নি, তাই সে তার সীমাকে কখনও অতিক্রম করে নি। ভারতবর্ষের মত চীনেরও বিশ্বাস ছিল যে তারা মানব সভ্যতার কেন্দ্রশক্তি। দূর সীমান্তের বর্ব্বর জাতিরা বিস্ময়ের সহিত দেখত তাদের স্থপতি বিজ্ঞান, মৎস্যযন্ত্র (magnetic needle), রেশম,' সূত্র, তৈজস-

পত্র, কাগজ, হরপ, ছাপা, বারুদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্ভার, নৌযান, তাদের গণিত বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যালয় আরও কত কিছু।

এইভাবে ভারত ও চীন উভয়েই বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে যখন কাল কাটাচ্ছিল, তখন পাশ্চাত্য তিনটি অদ্ভুত জিনিষ খুব আবিষ্কার করে ফেল্লে, —বারুদ, বাষ্পের ব্যবহার এবং ছাপাখানা। সে তার যন্ত্রপাতি, কল, কব্জা সহায়ে এই দুই বিরাট দেশের সম্মুখীন হয়ে দেখলে যে অফুরন্ত কাঁচা মাল ও বিরাট বাজার। উভয় দেশের নিবীর্য্য ক্ষত্রিয় শক্তির বাহুবল যন্ত্রশক্তির নিকট সহজেই পরাভূত হলো, তারপর তারা দেখলে যন্ত্রের কী অদ্ভুত শক্তি—তারা সেই শক্তি আয়ত্ত করবার জন্য ক্রমে প্রতীচির নিকট শিষ্যত্বও স্বীকার করলে—আশা তাদের নিকট এই যন্ত্র-রহস্য অবগত হয়ে, তারা তাদের সমাজকেও একটা নবগঠন দেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নূতন মতবাদ সকলও তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে লাগলো—স্ত্রী স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থাপন, অধিক বয়সে বিবাহ, প্রত্যক্ষ ভিত্তিতে শাস্ত্রাদির আলোচনা। সমাজে একটা মস্ত গোরগোল পড়ে গেল—সমাজে যা কিছু প্রাচীন সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে লাগলো, যান্ত্রিক পণ্যশিল্পের দ্বারা হস্ত ও কুটির শিল্পের উচ্ছেদ হেতু, দলে দলে লোক অন্নাভাবে কলকারখানার চারি পাশে জড় হতে লাগলো—কোথায়ই বা রহিল তার আচার ব্যবহার বিধি নিষেধ। এদিকে রুশের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য জার্ম্মাণী গোপনে জাপানীকে নিজেদের বিদ্যায় শিক্ষিত করে তাদের লাগিয়ে দিলে রুশের পেছনে। জাপান প্রতীচ্যের বিদ্যা দিয়ে রুশকে করলে পরাজিত। তখন সমগ্র প্রাচ্য জাতিই মনে করলে জাপানের অনুসরণই হচ্ছে স্বদেশকে গৌরবান্বিত করবার এক মাত্র উপায়। মহোৎসাহে প্রতীচির অনুসরণ ও প্রাচ্যের যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ আরম্ভ হলো।

কিন্তু হঠাৎ এই সময় একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো—চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভায় প্রাচ্য ধর্ম্মের মহাজয় ঘোষিত হলো—চাকা ঘুরলো—সহস্র যুগের প্রাচীন কৃষ্টির প্রতিপালক হিন্দু জাতি বুঝতে পারলে আমাদেরও কিছু দেওয়ার আছে; সেইটিই হচ্ছে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং যা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব—মানব সমাজ থেকে সেটি অপসারিত হলে সমস্ত নৃজাতিরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যের জড়শক্তিকে ব্যবহারিক করতে হবে সত্য—কিন্তু সেটা যদি আধ্যাত্মিকতার নীচেয় না থাকে, তা হলে বুদ্ধ, খৃষ্ট, কনফুসে, লাওট্জির দেব-মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে—এক অতিকায় নরপশুর মাত্র সৃষ্টি হবে। তাই চিকাগো বিজয়ী বীর বলচেন—"Shall India die? Then from the world all spirituality will be extinct; all moral perfection will be extinct; all sweet-souled sympathy for religion will be extinct, all ideality will be extinct; and in its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as its price, fraud, force and competition its ceremonies and the human soul its sacrifice Such a thing can never be The power of suffering is infinitely greater than the power of doing; the power of love is infinitely of greater potency than the power of hatred. Those that think that the present revival of Hinduism is only a manifestation of patriotic impulse, are deluded"—"বাস্তবিকই কি ভারত মৃত্যুমুখ? তা যদি

হয়, তা হলে বুঝতে হবে জগতে আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু থাকবে না, নীতির সম্পূর্ণতা বলে কিছু থাকবে না, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতি বলে কিছু থাকবে না, আদর্শ বলে কিছু থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে মাত্র কাম ও বিলাসিতা, এই দুই পুং ও স্ত্রীদেবতা উপাসনার দ্বৈতবাদ মাত্র জগতে রাজ্য করবে। তার পুরোহিত হবে—কাঞ্চন ;—উৎসব হবে প্রতারণা, বলপ্রয়োগ, প্রতিযোগিতা ; এবং দুর্ব্বল প্রাণী হবে তার বলিস্বরূপে কল্পনা। এমন কখনই হতে পারে না। দুঃখ-সহনশক্তি প্রতিকার-শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠা—ঘৃণা অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে শক্তিমতী। যাঁরা মনে করেন যে বর্ত্তমান ভারতের পুনরুজ্জীবন মাত্র একটা স্বাদেশিকতার উত্তেজনা, তাঁরা ভ্রান্ত।"

চীনেরা একশো বছর আগে প্রথম যন্ত্র-সভ্যতার ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। এদিকে বিংশ শতাব্দীর ক্ষুধিত জাপান নিজেদের সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিকতার দ্বারা বিবর্ত্তিত করে চীনের ওপর তার সমগ্র যুদ্ধশক্তির বেড়াজাল নিক্ষেপ করছে। যদিও চীন প্রতীচ্য উপায়ে যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্র সহায়ে দাঁড়াবার দুর্ব্বল চেষ্টা করছে, তথাপি তার মনস্বীরা এখনও তার প্রাচীন কৃষ্টির মূল ভিত্তিকে ত্যাগ করে নি। লিয়াং সি জি একজন চীনের পূর্ব্বতন মন্ত্রী—তাঁর বাণীর ভেতর দিয়েই আমার চৈনিক মনে যুদ্ধবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার আভাস প্রাপ্ত হই—"Compelled against our will to turn our energies to the gigantic task of western warfare, at a time when those energies should have been devoted wholly to education and acquiring the modern arts of peace, we have been developed a hybrid system which results in niether defence nor industrial progress For the consequent brigandage and lawlessness we blame ourselves, but we blame also those nations which have forced us to feel that physical power is the one and only prerequisite to independence We welcome every change and turn which brings the world nearer to the time when vast armies will no-longer be considered an essential of civilisation We do not want to be compelled to take the worst from the west, but its best and highest ideals Our people are not facile learners of the arts of war, for we hate war and all the wasteful trappings of war" "আমরা বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যানুকরণে বিরাট যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছি, বাস্তবিক পক্ষে, সেই শক্তিকে শিক্ষা ও আধুনিক শান্তি-শিল্পকে আয়ত্ত করবার জন্য লাগান উচিত ছিল। আমরা এখন একটা দোঁয়াশলা পদ্ধতির সৃষ্টি করেছি, যা আত্মরক্ষাও করতে পারে না বা যন্ত্র-প্রগতির ও গতি সম্পাদন করতে পারে না। বর্ত্তমানের বে-আইনী রাহাজানীর জন্য আমরাই দায়ী এবং যে সকল জাতিরা শিক্ষা দিয়েছেন যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এক মাত্র পশু বলই সাপেক্ষ, তাঁরাও এর জন্য দোষী। আমরা জগতের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনকে সাদরে আমন্ত্রণ করি, পক্ষান্তরে সে সকলের সদ্ব্যবহারের দ্বারা আমরা প্রতিপন্ন করব যে বিরাট সৈন্য-বাহিনী সভ্যতার কোনও বিশিষ্ট অঙ্গ নয়। আমরা চাই না যে আমরা বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যের যা কিছু খারাপ তাই নেব, আমরা নিতে চাই তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও উচ্চ আদর্শ। আমাদের জন-সাধারণ যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষ ছাত্র নয়

—কারণ আমরা অন্তরের সহিত যুদ্ধ ঘৃণা এবং তার উপকরণ সংগ্রহকে অপচয় মনে করি।"

দূর প্রাচীর আর এক শক্তি হচ্চে রুশ। সে খৃষ্টধর্ম্মের ভেতর দিয়ে তার কৃষ্টিগত দীক্ষা নিয়েছিল ইউরোপের নিকট—যা বিগত মহাযুদ্ধে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন যে দুর্ব্বলের কৃষ্টি উৎকৃষ্ট হলেও সবলের পেষণে সে কৃষ্টির ধ্বংস অধিকাংশ স্থলেই অনিবার্য্য, যদি বা দুর্ব্বল বাঁচে তা হলেও তার কৃষ্টির দ্বারা সবলকে পরিপাক করাতে বহুকাল সাপেক্ষ। তার চাইতে সবলের বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আয়ত্ত করে তাদের সম্মুখীন হওয়া এবং সভ্যতার আদিম যুগ হতে যে অর্থ ও সমাজনীতির বৈষম্যে জনসাধারণ প্রপীড়িত, তাকে অপসারিত করে জগতে শান্তির ব্যবস্থা এবং উচ্চ জীবনের সম্ভোগ। তাঁরা প্রাচ্য মনস্বীদের বাসনা সংযমের দ্বারা যান্ত্রিকতার ধ্বংস স্বীকার করেন না। কিন্তু যাঁরা একটু সূক্ষ্মদর্শী তাঁরাই ভাবত, রুশ ও চীনের ভেতর একটা সমন্বয়ের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন। তাই আজ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও স্বামিজীর কথার প্রতিধ্বনি করে জগৎকে সাবধান করছেন, "The problem is a world problem. No nation can be saved by breaking away from others We must all be saved or we must perish together."

ভাবধারা

ত্যাগ ও ভোগ

বর্ত্তমান যুগে এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়া ত্যাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহারা ত্যাগের ভগ্নস্তূপের উপর জগৎ জোড়া ভোগের সৌধ রচনায় বদ্ধপরিকর। ত্যাগের বিরুদ্ধে ভোগের অভিযানের ফলে এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং আধুনিক নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা ক্রমেই অধিক মাত্রায় বিস্তার লাভ করিতেছে। এই অভিযানকারিগণ মোটামুটি তিনটী প্রধান দলে বিভক্ত। এক শ্রেণীর লোক জগতের সর্ব্বত্র সকল কালেই দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা বিশ্ব-নিয়ামক-ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং এই পৃথিবী অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, স্ত্রীপুরুষের মিথুনোৎপন্ন ও কামমূলক বলিয়া মনে করেন। 'যেন তেন প্রকারেণ' আপন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই এই 'চার্ব্বাক-পন্থী'দের আদর্শ। অনেকে ধর্ম্মের আবরণে এই মতাবলম্বী। সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে স্বীকার না করিলেও সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। এই কামভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট 'ত্যাগ' অর্থহীন শব্দমাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সম্প্রদায় আসুরিক বিশেষণে বর্ণিত হইয়াছে।*

এই প্রাচীন নিরীশ্বরবাদিগণের নব্য সংস্করণ-রূপে বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সমুদ্ভূত আর এক দল লোক বলিতেছেন— 'ঈশ্বরাস্তিত্বের বিজ্ঞান-সম্মত কোন প্রমাণ নাই, ভগবান ভীতি-বিহ্বল মানব-মনের দৌর্ব্বল্য-প্রসূত

* গীতা,—১৬ অঃ, ৮-২০ শ্লোক।

কল্পনা, সমাজের উচ্চস্তরে স্থাপিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক নিম্নস্তরের ইতর সাধারণ অল্পলোকদের পরিশ্রমে জীবনধারণ করিবার মতলবে তাহাদের মস্তিষ্কের ভিতর নানা কৌশলে পরলোকের মিথ্যা ভয় চাপাইয়া রাখিয়াছে।' ত্যাগ বা আত্মসংযম এ শ্রেণীর নিকট আত্ম-পীড়ন (Self-repression) এবং ইন্দ্রিয় বিলাসের (Self expression) অন্তরায়। ইঁহাদের মতে যৌন-আকর্ষণ যৌবনের স্বাভাবিক বিকাশ; ইহাকে তথাকথিত মন্ত্রপূত-বিবাহ-রূপ কুসংস্কারের দোহাই দিয়া শাস্ত্র-কল্পিত সতীত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার। দুঃখের বিষয় অনেক বিদুষী ভদ্রমহিলাও এই তথাকথিত সাম্যবাদের দুর্নীতি-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইদানীন্তন অনেক মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা এই শ্রেণীর লেখক-লেখিকাদের প্রবন্ধে পূর্ণ। গল্পের ভিতর দিয়া আর্টের নামে অনেক নব্য-সাহিত্যিক মানুষের যৌন আকর্ষণটাকে নগ্নমূর্ত্তিতে নানাভাবে রূপায়িত করিয়া দেখাইতেছেন। এই কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারে দেশের তরুণ-তরুণীগণের নৈতিক জীবন আক্রান্ত হইতেছে। জাতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে এই উগ্র অসংযম পরিহার করা আবশ্যক।

এই উদীয়মান সাহিত্যিকগণ বলেন—'আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে রূপ দিয়া মানুষকে আনন্দ দান করা, আর্টকে নিবৃত্তি-মার্গে টানিয়া আনিয়া ইহার সর্ব্বতোমুখী সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি হইতে ইহাকে বঞ্চিত করিলে সাহিত্যের একদিক অসম্পূর্ণ থাকিবে।' আমাদের মতে আর্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'সত্য ও শিবের সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্ত করিয়া মানবকে দেবত্ব দান করা।' 'আর্টের জন্যই আর্ট' (Art for Art's sake) অজুহাতে ভালমন্দ বিচার না করিয়া সাহিত্যের সেবা করিলে মানব সমাজ অসত্য ও অশিবের কুৎসিত লীলাস্থল হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা নারী জাতির মাতৃত্ব, সতীত্ব, লজ্জাশীলতা, সংযম ও ত্যাগ প্রভৃতি প্রাচ্য-সুলভ গুণের সঙ্গে পাশ্চাত্য মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, কর্ম্মকুশলতা ও ভোগ প্রভৃতি গুণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান করার পক্ষপাতী। আমাদের বিশ্বাস—এই ভাবেই আদর্শ নারী সমাজ গঠিত হইতে পারে। ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন সমানাধিকারবাদিগণ তাঁহাদের মতবাদের মূলনীতি হিসাবে উলঙ্গ ভোগ-স্বার্থের আদর্শ প্রচার করিলেও তাঁহাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রে উন্নত লোকের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে একটা স্বাদেশিকতার উত্তেজনামূলে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি লাভই মানুষের মহত্ত্বের সকল দিক নহে। মানুষের ভোগ-বিলাস এমন সংযমহীন নগ্নমূর্ত্তি ধারণ করিলে ফৌজদারী বিচারালয়ের আয়বৃদ্ধি হইবে, ফলে পশুর সঙ্গে তাহার পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

অপর এক শ্রেণীর প্রথিতযশাঃ ব্যক্তিগণ ঈশ্বর বিশ্বাসী হইয়াও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন বা অনুভব করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ বা সন্ন্যাসকে "অপ্রাকৃত" বলিয়া মনে করেন। "সৃষ্টির বৈচিত্র্য ক্ষুন্ন হয় বলিয়া যৌন সংযম নীতির" (celibacy) উপর এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ "একান্ত ঝোঁক" দেওয়ার পক্ষপাতী নন। "প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মানসিক, দৈহিক, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতির পরিপূর্ত্তির একটা স্থান আছে" মনে করিয়া এই খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসকে "প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা "ভারতের সেই প্রাচীন আশ্রম ধর্ম্মে মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শের সন্ধান" পাইয়াছেন। ইঁহাদের মতে "ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষা জীবনের ভিত্তি করিয়া পবিত্র গার্হস্থ্য জীবনে আপনাকে ফলন্ত ও বিকশিত

করত বানপ্রস্থের আহ্বানে জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানশক্তি লোককল্যাণার্থ সঞ্চারিত করিয়া ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দেওয়ার চরম অধিকার অর্জ্জনই মানুষের আদর্শ জীবন-নীতি।" এই মতবাদিগণ প্রবৃত্তি বা ভোগ-মূলক আশ্রমধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি বা ত্যাগ-মূলক মোক্ষধর্ম্মের অধিকার ভেদ অস্বীকার করত উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াই যত গোল বাধাইয়াছেন। প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভোগ বা প্রবৃত্তির পথে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া সকল মানুষকে ভগবৎ সান্নিধ্যে উপনীত করাই আশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বর্ণচতুষ্টয়ের গুণগত স্বধর্ম্ম ও এই একই লক্ষ্যে নিয়মিত। মোক্ষধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্মকে সহায়কমাত্র প্রতিপন্ন করিয়া ত্যাগ বা নিবৃত্তি-পথে ভগবান লাভের উপরই সম্পূর্ণ জোর দিয়াছেন। সুতরাং চরম উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যত কিছু বৈষম্য ত্যাগ ও ভোগ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি-পথ লইয়া।

এখন প্রশ্ন এই "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (১)—যাঁকে লাভ করিলে অন্য প্রকার কোন লাভ অধিক মনে হয় না, "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো যে মনো বিদুঃ" (২)—যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর অপ্রাপ্য কিছু থাকে না সেই সচ্চিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করাই যাঁহারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য বলিয়া আন্তরিকভাবে অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টা কি "অপ্রাকৃত",—না অত্যন্ত স্বাভাবিক? যেমন তীব্র ক্ষুধা সমুৎপন্ন হইলে ভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে রুচি হয় না,—যেমন জ্বলিত মস্তক পুরুষ অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া জলাশয়ের নিকট গমনের জন্য উৎকণ্ঠিত হন,—বিলম্বও সহে না, তেমনভাবে যদি কাহারও শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষানুভব করিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে এই অবস্থাকে "প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন নহে। সন্ন্যাস বা ত্যাগের পথ গ্রহণে "প্রকৃতির বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ" বা "সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতির পরিপূর্ত্তি" হয় কি না হয় মুমুক্ষুর সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কোথায়? শ্মশান বৈরাগ্য বা মর্কটবৈরাগ্যের কথা বলিতেছি না,—"ব্রহ্ম এব নিত্যং বস্তু, ততঃ অন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্" (৩)—জ্ঞান যদি কাহারও বিবেকে সত্যই বদ্ধমূল হয়, তাঁহার পক্ষে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করিয়া নিত্যবস্তু লাভের চেষ্টা শুধু স্বাভাবিক নয়, সম্পূর্ণ অপরিহার্য্যও বটে। মুক্তি-শাস্ত্রে বৈরাগ্যের অসংখ্য প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে, যথা পরা,-অপরা,-তীব্র,-মধ্য,-মন্দ,-যতমান,-ব্যতিরেক,-একেন্দ্রিয়-বৈরাগ্য ইত্যাদি। যাঁহার বিবিদিষা অতি তীব্র তিনি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীভগবানে মন দিবার আশায় সারা জীবন আশ্রম-ধর্ম্মের ভোগানুষ্ঠানে তিনি কি করিয়া রত থাকিবেন? "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" (৪)—যাঁহার ভাব তাঁহার পক্ষে "বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থের আহ্বানে ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দিবার" জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব। জীবনের সায়াহ্নে অবসন্ন ভগ্ন দেহ ও নিস্তেজ ইন্দ্রিয় গ্রাম লইয়া সংসার হইতে অবসর প্রাপ্ত জীবন-যাপন করা মাত্রই সার হয়, তখন ব্রহ্মানুভূতির মধ্যে ডুব দিবার সঙ্কল্প আকাশ-কুসুম। উহা প্রচ্ছন্ন ভোগেচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র। শাস্ত্র বলেন—"তীব্র সংবেগানামাপন্নঃ

(১) গীতা—৬।২২
(২) বৃঃ উঃ, ৪।৪।১৮
(৩) বেদান্তসার, ১৩
(৪) বৃঃ উঃ, ৪।৪।২২

(সমাধিলাভ) (১)"—তীব্র বৈরাগ্য ভিন্ন সমাধি বা ঈশ্বর লাভ অসম্ভব। বৈরাগ্যের কোন কালাকাল নাই, এইজন্য "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (২)—যখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে তখনই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি। শাস্ত্রকারগণ বাল্য, যৌবন সব সময়ই সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন (৩)। যোগবাশিষ্টে আছে "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ"। ধর্ম্ম লাভের জন্য বাল্য এবং যৌবনই প্রশস্ত সময়। "আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ" (৪)—ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভের যোগ্য। সমগ্র উপনিষদ্ সমস্বরে বলিতেছেন—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" (৫)—কর্ম্ম, পুত্র বা ধন দ্বারা নয়, ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্বলাভ অসম্ভব। যাঁহারা কালাকাল বিচার না করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে যথার্থই ব্যাকুল, ত্যাগই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র উপায় "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (৬)"।

জগতের প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মমতই ঈশ্বর লাভের জন্য নিবৃত্তি বা ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পূর্ণ। মনু বলিয়াছেন—"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। ঈশদূত যিশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন—"One thing thou lackest · go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shall have treasure in heaven · and come, take up the cross, and follow me"—St Mark, 10 রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্কর রামানুজ, গৌরাঙ্গ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, কবীর, তাও এবং কনফুসে প্রভৃতি মহাপুরুষ ঈশ্বর লাভার্থ ত্যাগের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ। এই অতিমানবদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সমূহে কোন না কোন আকারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রেণী বর্ত্তমান। সকল ধর্ম্ম মতেই সংযমশূন্য ভোগবাদ শত ভাবে নিন্দিত এবং ঈশ্বরলাভার্থে ত্যাগ বা নিবৃত্তি উচ্চ প্রশংসিত। ইতিহাস প্রমাণ দেয় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষই ঈশ্বরলাভের জন্য ত্যাগ মাহাত্ম্য সমধিক প্রচার করিয়াছে এবং এই ত্যাগধর্ম্মই শত শত প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব এবং বহির্বিপ্লবের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "জগতের সকল জাতি দুইটী বড় বড় সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত উহার মধ্যে একটীর মীমাংসায় এবং জগতের অন্যান্য সকল জাতি অপরটীর মীমাংসায় নিযুক্ত। এখন প্রশ্ন এই দুই পথের মধ্যে কোনটী জয়ী হইবে? কিসে জাতিবিশেষ দীর্ঘ জীবনলাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতি শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জীবন সংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না, ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না, চৈতন্য জয়ী হইবে? * * ইন্দ্রিয় সুখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপ খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান জাতি অনেক দুরদৃষ্ট বিপদ এবং দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর জাতির মস্তকে পড়ে নাই) এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?"

"নানাবিধ মতমতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতজনগণ

---

(১) পাঃ যোঃ, সমাধিপদ, ২১
(২) জাঃ উঃ, ৪র্থ খণ্ড
(৩) বৃঃ উঃ, ৩।৫।১
(৪) তৈঃ উঃ, ২।৮
(৫) কৈঃ উঃ, ১।২
(৬) শ্বেতাঃ উঃ, ৩।৮

প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালে মানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পঁহুছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরব রাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইতেছে। * * অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের লক্ষ্য হইলেও যতদিন না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছ—ততদিন পর্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যাদি জাতির নিকট ঐ সকল বিষয় শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত—ত্যাগই আমাদের আদর্শ। * * পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন,—আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ওসব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্যকে ধরিয়া থাক।"

"কেবল ত্যাগ দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ লইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। * * ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, আর যেন বলিতেছে, সাবধান ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর।"

অপর দিকে দেখা যায় মোক্ষ-ধর্ম্মের পক্ষ হইতে অসংযত ভোগের বিরুদ্ধে প্রচার সত্ত্বেও জগতের সর্ব্বত্র পৌনে ষোল আনারও অধিক লোক ভোগ-পথে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং ইহাই স্বাভাবিক. কারণ সাধারণ মানুষের শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বাভাবিক তৃষ্ণাই ভোগলক্ষ্যে প্রধাবিত। হিন্দুশাস্ত্র এক শ্রেণীর অতি মুষ্টিমেয় লোককে মোক্ষমার্গে প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য একদিকে যেমন ত্যাগের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, অপর দিকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী সাধারণের জন্য তেমন ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেও কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ত্তব্য পালন না করিলে শাস্ত্রকারগণ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তস্মাৎত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা বিপূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব সমৃদ্ধরাজ্যম্"(১)—উঠ, যশোলাভ কর, ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণতন্ত্র গৃহস্থকে "যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আহার, নিদ্রা, মৈথুন পরিমিতভাবে করিতে এবং শত্রুর সমক্ষে শূর ভাবাপন্ন হইতে" (২) বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত যাগ, যজ্ঞ, দেব-দেবী অর্চ্চনা, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠানই ভোগ বা প্রবৃত্তি-ধর্ম্মমূলক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন—

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

পুরাণ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভোগধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মুখরিত। ভোগবাসনা থাকা সত্ত্বেও উহা চরিতার্থ করিতে অসমর্থতা

(১) গীতা,—১১।৩৩

(২) মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮ম উঃ, ৫৮, ৫২, ৫৩ শ্লোক।

প্রযুক্ত নিবৃত্তি ত্যাগপদবাচ্য নহে। ভিক্ষুক আবার কি ত্যাগ করিবে? জীবন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মর্কট বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষভাবে নিন্দিত। ভোগের উর্বর ক্ষেত্রেই ত্যাগের ফসল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইতিহাস প্রমাণ দেয়—রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত প্রাচীন রাজবংশের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেই সনক, সনাতন, যাজ্ঞবল্ক্য, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর রাজচক্রবর্তী অশোকের মহাবৈভবের মধ্যেই ভগবান শ্রীবুদ্ধের মহাত্যাগধর্ম অর্দ্ধ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মৌর্য্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজবংশের অনুপম ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেই শত শত কারুকার্য্যমণ্ডিত মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত এবং বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও দার্শনিক আচার্য্যগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ততটা আবশ্যকীয় না হইলেও কোন দেশ বা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ভোগের উপযোগিতা অপরিহার্য্য। তবে যে জাতি বা ব্যক্তি ভোগকে যত অধিক পরিমাণে মহতোদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে সে জাতি বা ব্যক্তি সেই পরিমাণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে, —সেই অনুপাতে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। একমাত্র ত্যাগ ধর্ম্মই ব্যক্তি বা জাতিকে মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, এবং অমৃতত্ব দান করিতে পারে। জগতের বিবিধ জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস এ কথার সমর্থন করে।

অনেকে বলেন—অতি মাত্রায় বৈরাগ্য প্রচারের ফলেই সমগ্র দেশ ভোগবিমুখ হইয়া ইহকাল ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তারত থাকিয়া এই দুরবস্থা আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু তাহা কি সত্য? দেশশুদ্ধ সকলে যথার্থই কি ঈশ্বর লাভার্থ বৈরাগ্যবান হইয়া এই পতনের নিম্নস্তরে উপনীত? কথা এই—ভারতের আপামর সাধারণ অজ্ঞতার ঘনান্ধকারে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, আজ পর্য্যন্তও প্রায় সেই অবস্থায়ই আছে; অতি মুষ্টিমেয় লোক যখন জ্ঞানালোকে জাগ্রত হইলেন, তখন দেখিলেন—ভোগ করা দূরের কথা দেশবাসীর জীবিকার্জ্জনের পথ পর্য্যন্ত জগতের উন্নত জাগ্রত জাতি সমূহের বিশ্বগ্রাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রুদ্ধ। দোষ সমাজ নেতা ব্রাহ্মণাদির যে পরিমাণ, সর্ব্ব সাধারণেরও সেই পরিমাণ। কারণ উভয় দলের অজ্ঞতাই সমান। স্বত্ব স্বাধিকার জ্ঞান হারাইয়া হতচেতনভাবে নিদ্রিত থাকিতে কে কাহাকে বাধ্য করিয়াছিল? জাগ্রত হইয়াই জীবন যাত্রার পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ দেখিয়া একদল অপর দলের উপর রাগের মাথায় গালাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শ্রেণীর দোষদর্শন এবং অভিমান আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে! জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে জন্মগত ভোগাধিকার বৈষম্য নষ্ট করিয়া সমগ্র দেশময় প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন ভারতের জনসাধারণ বৈরাগ্য প্রবণতার ফলে সত্ত্বগুণ অর্জ্জন করিয়া ভোগ বা রজঃ গুণের পথ ত্যাগ করিয়াছে তাঁহারা ভ্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক বিকার অথবা বিচার শূন্য উৎসাহ সম্পন্ন)। মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে,—ইহ জীবনে দাসত্ব,—পরলোকে নরক।"

অপর এক স্থলে বলিয়াছেন—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না, যাহা যবন-

দিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দন ইউরোপীয বিদ্যুতাধার হইতে মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতা বন্ধন, সেই উন্নতিব তৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত কবিয়া সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি, চাই আপাদমস্তক শিবায় শিবায় সঞ্চারণকারী রজোগুণ, * * আমি এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা এ দেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। * * এইরূপে আগে রজঃ শক্তির উদ্দীপনা কর—তারপর পরজীবনে মুক্তির কথা তাদেরে বল।”

একমাত্র ত্যাগই ভোগকে সংযমের পুণ্যস্পর্শে মহিমান্বিত এবং বহুজন কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। এ জন্য ত্যাগের পদে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানুষ মাত্রেরই মস্তক অবনত। বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্ব ভোগের বিজয়দুন্দুভি নিনাদে মুখরিত হইলেও মহান উদ্দেশ্যে ত্যাগ এখনও সর্ব্বত্র সম্মানিত। এখনও ধর্ম্ম, দেশ, জাতি, ও পরার্থে যেখানে যত বেশী ত্যাগ সেইখানে জগৎশুদ্ধ লোকের তত অধিক করতালি। মানব সমাজের মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব বিধানের জন্য অধিকারী ভেদে দুইটাই অপরিহার্য্য। যত দিন আলো অন্ধকার জগতে থাকিবে ততদিন ত্যাগ এবং ভোগ অধিকার ভেদে পাশাপাশি চলিবে। যাঁহারা মনে করেন—তনিয়া শুদ্ধ ত্যাগের পথে চলিলে ভোগের ধর্ম্ম অচল হইবে তাঁহারা ভ্রান্ত। সৃষ্টির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতে ত্যাগের পতাকা উন্নত শীর্ষে উড়িতেছে কিন্তু সব সময়েই অতি নগণ্য মুষ্টিমেয় লোক তাহার নিম্নে সমবেত দেখা যাইতেছে। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণাপূর্ণ জগতে নিবৃত্তির পথ চিরকালই ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, সুতরাং এ পথে সব সময়েই অতি অল্প সংখ্যক লোক বিচরণ করিবে। পক্ষান্তরে জগৎ শুদ্ধ লোক, যদি ত্যাগের পথে যথার্থ ই ধাবিত হয় তাহা হইলে ভোগ লোককল্যাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিবে। প্রতীচ্য জাতির ভোগ ত্যাগরূপ পরশমণির স্পর্শলাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই বিশ্বময় অমঙ্গলের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যজাতির ভোগ কোন মহান উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না বলিয়াই উহা সমগ্র পৃথিবীর আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোগের আতিশয্যে যেমন পাশ্চাত্য মরিতে বসিয়াছে, ভারত তেমন তার অভাবে মৃতকল্প। এই দৃশ্য দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—“ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব, পাশ্চাত্যে সেইরূপ সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরের রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।”

বিভিন্ন শক্তির সঙ্ঘাতেই জগতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের দ্বন্দ্বই সৃষ্টির উপাদান। ত্যাগ-ভোগের মত অস্তিনাস্তি, আলোক-অন্ধকার, রৌদ্র-বৃষ্টি, জীবন-মৃত্যু, জ্ঞান-অজ্ঞান, স্বর্গ-নরক, ভাল-মন্দ, শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় একটী ভিন্ন অপরটীর অস্তিত্ব—এমন কি কল্পনাও সম্ভব নয়। কি প্রাণী জগতে—কি জড় জগতে সর্ব্বত্রই এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। তথাপি জগতের গতি এমন বিচিত্র যে প্রত্যেক মানুষই আপন আপন ভাবানুযায়ী একটীকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া অপরটী পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে সচেষ্ট,—ইহারই নাম জীবন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে নানাবিষয়ে অপূর্ণ দেখিয়া প্রত্যেক মানুষ

আপন আপন শিক্ষা ও ভাবের অনুপাতে সব বিষয়ে পূর্ণ এক জগতে বাস করিতে আগ্রহান্বিত। জগতের সকল ধর্ম্ম সমস্বরে বলেন—'এই জীবভাব প্রাপ্ত অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক নয়, মানুষ ছিল ভাল, এই পৃথিবীতে আসিয়া হইয়াছে মন্দ, অথবা মন্দ কিছু কোন আকারে ছিল বলিয়াই তাহাকে পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছে। তাহাকে যাইতে হইবে ফিরিয়া আবার তার স্বধামে—স্বস্বরূপে।' এই স্ববস্থালাভের জন্য অজ্ঞানতাকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞান, মন্দকে ত্যাগ করিয়া ভাল, পাপকে ত্যাগ করিয়া পুণ্য, অসম্পূর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া পূর্ণতা, মৃত্যুকে ত্যাগ করিয়া অমরত্ব, অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্য এবং অস্বাভাবিক অবস্থাকে ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় যাইতে সকল ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র উপদেশ দান করেন। ইহাই ত্যাগ বা নিবৃত্তিমার্গেরও চরমাদর্শ। যাঁহারা কোন ধর্ম্ম বা নীতি মানেন না, তাঁহারাও মানুষকে ইহজীবনেই তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত এক পূর্ণত্ব দান করিতে চেষ্টিত। ভোগের চরম লক্ষ্যও এই পূর্ণত্বলাভ,—যে অবস্থায় আর কোন কিছু লাভ করিবার অবশিষ্ট থাকে না।

শাস্ত্র বলেন—"বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের কারণ (১)।" ত্যাগধর্ম্মী নিবৃত্তিপথে সর্ব্ববাসনা মুক্ত হন, ভোগধর্ম্মীও প্রবৃত্তি-পথাশ্রয়ে ভোগের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সকল বাসনা নির্ম্মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগ চরমে সম্পূর্ণ একত্ব বা অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভোগ পথের শেষ সীমায় যাইয়া বাসনা ত্যাগ বা তত্ত্বজ্ঞানলাভ এই সতত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে সম্ভব নয় বলিয়াই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ-পথের উপর জোর দিয়াছেন। একমাত্র অধিকার ভেদই উভয় পথ নির্ণয়ের মানদণ্ড। ভোগেচ্ছা থাকিতে ত্যাগ এবং মুমুক্ষুর পক্ষে ভোগ উভয়ই অসম্ভব। একের ঔষধ অপরের পক্ষে বিষতুল্য,—একের ধর্ম্ম অপরের বিরুদ্ধ। অধিকারভেদে ত্যাগ ও ভোগ উভয় পথে মানুষ চলিবেই। এই দুইটী আপাত বিরোধী শক্তিকে জগতের হিতার্থে মহান উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষকে অমৃতত্ব দান করাই "উদ্বোধনে"র জীবনাদর্শ।

---

(১) উপশম প্রঃ ৯১—১২।১৩।১৪

"A new commandment I give unto you, That ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another"

St. John, 13.

খৃষ্টভক্ত ফাদার ড্যামিয়েন্

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

প্রভু যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it. He that taketh not his cross and followeth after me, is not worthy of me. Heal the sick, cleanse the lepers; freely ye have received, freely give" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জীবনের দিকে তাকাইবে সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে যে ব্যক্তি ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুগামী না হয় সে আমার উপযুক্ত শিষ্য নয় পীড়িতের রোগ দূর কর, কুষ্ঠীদিগের সেবা কর; অযাচিতভাবে তুমি যাহা পাইয়াছ উহা মুক্তহস্তে দান কর"। প্রভু যীশুর সমসাময়িক শিষ্যমণ্ডলী এবং পরবর্ত্তী অনুগামিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার এই বাণী অনুসরণ করিয়া বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সেবা-ধর্ম্মের মূর্ত্ত-প্রতীক ফাদার ড্যামিয়েনের নাম খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। "Cleanse the lepers" অর্থাৎ "কুষ্ঠীদিগের সেবা কর"—যীশুর এই উপদেশটি জীবনের মূলমন্ত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদুদ্দেশ্যে জীবনপাত করিবার জন্যই যেন মহাত্মা ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে বেল্জিয়ামের অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে যোশেফ্ ডি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাওয়া যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে নানা-বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী-কালের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একই সময়ে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, সূত্রধর, গৃহনির্ম্মাতা, শিক্ষক, পাচক, উদ্যানরক্ষক ও চিত্রকররূপে বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে যোশেফ্ ডি ভিয়াষ্টার বাল্যকাল হইতেই এই সকল নানাবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি বাল্যকালেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পেম্পিলাসের ন্যায় ধর্ম্মযাজকের জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। ভ্রাতা পেম্পিলাস প্রসিদ্ধ লুভেইন নগরের মঠের (monastery) ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বালক ভিয়াষ্টার তাঁহার উনবিংশ জন্মদিবসের অব্যবহিত পরে একদিন লুভেইন মঠে ভ্রাতা পেম্পিলাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বালক সেইদিনই লুভেইন মঠে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য পিতাকে বিশেষরূপে ধরিয়া বসিলেন। পিতা পুত্রের দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া বালককে তখনই সেই মঠে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই মঠে ধর্ম্মপ্রচারের শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ড্যামিয়েন নামে অভিহিত হইলেন।

এই সময়ে ড্যামিয়েনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পেম্পিলাসের বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাইবার কথা স্থিরীকৃত হয়। যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে পেম্পিলাস গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দুইদিবস পরে

যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে জাহাজে যাত্রা করিবার তাঁহার কোন সম্ভাবনা রহিল না; কারণ তিনি যথাসময় আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এই শুভকার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পেম্পিলাস অতীব মর্ম্মাহত হইলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া ড্যামিয়েন্ বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আপনার পরিবর্ত্তে আমি যাইব —ইহাতে কি আপনার মনে শান্তি ও সুখ হইবে?"

পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নিশ্চিতই সুখী হইব। তুমি যদি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন কর তাহা হইলে আমি মনে করিব যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"

ড্যামিয়েন অনতিবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সঙ্ঘনায়ককে (Head of the Order) লিখিলেন। অনুমতি দেওয়া হইল; ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার রোগশয্যাপার্শ্বে গমন করিয়া উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রাতঃ, আমি অনুমতি পাইয়াছি। আমি আপনার পরিবর্ত্তে যাইব, আমি আপনার পরিবর্ত্তে যাইব।"

ড্যামিয়েন পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলেন। সময় অতি সঙ্কীর্ণ। পরদিন তিনি চিরদিনের জন্য বেলজিয়ম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের (South seas) উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ পাঁচ মাসের সমুদ্র যাত্রা করিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি দ্বীপ আছে—এইগুলি ১৭৭৪ খৃঃ কাপ্তেন কুক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই দ্বীপশ্রেণী অতি মনোরম এবং বিচিত্র পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত। অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ তীরভূমিতে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন্ ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। একশত বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় খৃষ্টান মিশনরী এইস্থানে গমন করিয়া অধিবাসিগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত হাওয়েই (Hawaii) নামক বৃহত্তম দ্বীপে একটি সজীব আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান থাকায় খৃষ্টান মিশনরিগণ দ্বীপের অধিবাসিগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে অত্যন্ত বেগ পাইয়াছিলেন। এই সজীব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের বিস্তর অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। দ্বীপবাসিগণ এই ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরিকে দেবী পিলির (Pelé) আবাসভূমি বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি তাহারা এই দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে তবে দেবী কোপান্বিতা হইয়া আগ্নেয়গিরি হইতে উষ্ণ গলিত পদার্থ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের ধ্বংস সাধন করিবেন। তাহারা অনেকবার জনবহুল গ্রামসমূহ এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত এবং কেহই দেবী পিলির পূজা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান মিশনরীদের প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহস করিত না।

হাওয়েই দ্বীপের রাণী দ্বীপবাসিগণের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন রাণী একাকিনী আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতল-ভূমি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বে আরোহণ করিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরের নিকট দাঁড়াইয়া গহ্বরের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তিনি বহু নিম্নে পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পদার্থ দেখিতে পাইলেন। দেবী পিলির নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত এক বৃক্ষের শাখা রাণী আগ্নেয়-গিরির মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পিলি, তুমি যদি

প্রকৃতপক্ষেই জাগ্রতা দেবী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ লও।" দেবীর ক্রোধের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না; ভূগর্ভ হইতে কোন গর্জ্জন শ্রুত হইল না; বীরহৃদয়া রাণীকে বিনাশ করিবার জন্য কোন গলিতস্রাবও নির্গত হইল না।

বীরাঙ্গনা রাণী বিজয়গর্ব্বে মাতোয়ারা হইয়া অক্ষতদেহে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিলে দেবী পিলি শক্তিহীনা। এই খৃষ্টান মিশনরিগণ যে পরমেশ্বরের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা নাই এবং খৃষ্ট ব্যতীত মানবজাতির অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই।" দ্বীপবাসিগণ এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া এবং রাণীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া খৃষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেশ্বরের কথা শুনিতে আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই সকল দ্বীপ দেখিতে সুশোভন ও মনোরম হইলেও একটি দোষে ইহারা কলঙ্কিত এবং ভীতির কারণস্বরূপ হইয়াছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ কুষ্ঠ নামক অতি ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এই দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপগুলিতে (South sea Islands) কুষ্ঠব্যাধি এত অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট ইহার সংক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মানসে কুষ্ঠীদিগের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য দ্বীপগুলি হইতে ঘন কৃষ্ণ অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই পল্লীতে এই হতভাগ্য কুষ্ঠিগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। তাহাদিগের সঙ্গে কোন চিকিৎসক এবং ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন না। অন্যান্যের নিরাময়ের জন্য এই কুষ্ঠীদিগকে নির্জ্জন দ্বীপে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইত।

দ্বীপগুলির বিশপ (প্রধান ধর্ম্মযাজক) যখনই পারিতেন তখনই কুষ্ঠীদিগকে দেখিতে যাইতেন। হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দ্বীপে ফেলিয়া যাইতে বিশপের প্রাণে দুঃখ হইত। অন্যত্র ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য চালাইবার লোক বিশপের হস্তে অতি অল্পই ছিল, ইহা ছাড়া কুষ্ঠীদিগের সহিত বাস করিবার জন্য কাহাকে পাঠাইলেই সে নিশ্চিতরূপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এই আশঙ্কাও ছিল। কাজেই বিশপ উভয় সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। একদিন ইউরোপ হইতে কতিপয় তরুণ ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ বিশপের নিকট গিয়া বলিলেন, "এই ধর্ম্মপ্রচারকগণই এক্ষণে আমার কাজ করিতে পারিবে। আমাকে মোলোকাই দ্বীপে গিয়া হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুমতি দিন"। বিশপ ড্যামিয়েনের অসাধারণ আত্মত্যাগের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মোলোকাই দ্বীপে যাইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ড্যামিয়েন তখন তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক বলিষ্ঠ ও করিৎকর্ম্মা যুবক। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতামাতা, গৃহ ও আত্মীয়স্বজনকে পুনঃ দেখিবার আশা চিরতরে পরিত্যাগ করিলেন। এই কার্য্য হইতে পরে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ভাবনাও তাঁহার মনে উপস্থিত হইল না। কুষ্ঠ যে কি ভীষণ ব্যাধি এবং মোলোকাইতে গমন করিলেই যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হইবেন ইহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। মোলোকাইতে যাইবার জন্য ড্যামিয়েন এতদূর ব্যস্ত হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হইতে যথোচিত বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং কোনরূ

নূতন পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ না করিয়া সেই দিবসই রওনা হইলেন।

একখানা ক্ষুদ্র নৌকা ড্যামিয়েনকে জাহাজ হইতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। ড্যামিয়েন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে নিজকে বলিতে লাগিলেন, "যোশেফ্, এই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত; এই কুষ্ঠীদিগের সেবাতেই তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।"

মোলোকাই দ্বীপে ড্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত হইলেন তখন তাঁহার বাসস্থানের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাইতেন। প্রায় আটশত কুষ্ঠী স্বহস্তনির্ম্মিত জীর্ণ কুটীরে নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ব না করিয়া কুষ্ঠ রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাষ্ঠাদি প্রেরণ করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে কেবল গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু প্রধান শিল্পী ও কর্ম্মকর্ত্তারূপে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যেও নিযুক্ত হইলেন। ড্যামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে কুষ্ঠিগণ সাময়িকভাবে কতকটা দুঃখযন্ত্রণা ভুলিবার জন্য সুরাপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে ড্যামিয়েনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কুষ্ঠীদিগের মধ্যে অনেকেই কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেদের বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সারি সারি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ কুটীর নির্ম্মিত হইয়া গেল।

কুষ্ঠিপল্লীতে প্রচুর জল সরাবরাহের বন্দোবস্ত ছিল না। জলের অভাবে পল্লীগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারা যাইত না। ফাদার ড্যামিয়েন পাহাড়ে একটি ঝরণার কথা শুনিয়া কতিপয় বালকের সহিত উহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এক উপত্যকার উপবিভাগে বৃহৎ একটি ঝরণা দেখিতে পাইলেন। ঝরণাটি গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপেও শুষ্ক হইয়া যাইত না—উহাতে সর্ব্বদাই অফুরন্ত জল পাওয়া যাইত। ড্যামিয়েন নলসংযোগে ঝরণা হইতে কুষ্ঠিপল্লীতে জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কুষ্ঠীদিগের জলের আর কোনও অভাব হইত না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। ড্যামিয়েন প্রতিদিন প্রাতে ক্ষুদ্র গির্জ্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হইতেন। এই দৈনিক উপাসনাই তাঁহাকে প্রতি কার্য্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিত। প্রথমতঃ তিনি মোলোকাইর পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভবনে (Orphanage) যাইতেন; পরে বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃহে ও হাসপাতালে রোগীদিগকে দেখিতেন। এই সকল নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন কিছু কিছু মিস্ত্রীর কাজও করিতেন। বলবান্ কুষ্ঠীদিগের সহায়তায় তিনি ক্ষুদ্র গির্জ্জাটির পরিসর আরও বাড়াইলেন। দুইটি নূতন গির্জ্জাও নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মযাজকরূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে, ফাদার ড্যামিয়েন মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদিগের বিচারক, পিতা, শাসক ও ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন। "Come unto me ; all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest" অর্থাৎ "তোমরা যাহারা দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত আছ। আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব"—যীশুখৃষ্টের এই আশ্বাসবাণী লইয়াই ফাদার ড্যামিয়েন কুষ্ঠীদিগের নিকট যাইতেন, হতভাগ্যদের শারীরিক ক্লেশ দূর করিতেন এবং ভগবানের কথা শুনাইয়া

তাহাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আশা সঞ্চারিত করিতেন। বহুবৎসর কুষ্ঠীপল্লীতে বাস করিয়া কুষ্ঠিদিগের সেবাকার্য্যে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলোকসামান্য নিঃস্বার্থ সেবার ফলে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইযাছিল।

একাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সেবার পরও কুষ্ঠব্যাধি তাঁহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্তু তিনি বেশীদিন এই সংক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পীড়িত ও মৃত কুষ্ঠিগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ শরীরে এই ব্যাধির সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে জনৈক ডাক্তার মোলোকাইতে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ড্যামিয়েনের শরীরে কুষ্ঠব্যাধির সংক্রমণ দেখিতে পাইলেন। ডাক্তার ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে পাইয়া ড্যামিয়েনকে বলিলেন, "ড্যামিয়েন, আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার শরীরে দুষ্ট কুষ্ঠ সংক্রমিত হয়েছে।"

ড্যামিয়েন হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি অনেক পূর্ব্বেই ইহা আশা করিয়াছিলাম। তুমি যদি বলিতে এখানকার কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার এই ব্যাধি সারিয়া যাইত তাহা হইলেও আমি এস্থান পরিত্যাগ করিতাম না। আমি এই হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবাকার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি—ইহাদের সেবাতেই আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

শিষ্যদিগের নিকট প্রভু যীশুর উপদেশ—"Cleanse the lepers" অর্থাৎ কুষ্ঠীদিগের সেবা কর, ভক্ত ফাদার ড্যামিয়েন তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কুষ্ঠীদিগের সেবাতেই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। এই কালব্যাধিতেই ড্যামিয়েনের জীবন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ড্যামিয়েনের জীবনের কার্য্য (mission) শেষ হইল। তিনি যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী লোকগণ উহা পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ স্বেচ্ছায় এই কাজে যোগদান করিলেন। আজকাল চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীগণ হাসপাতালে কুষ্ঠিগণকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠীবালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু ফাদার ড্যামিয়েন যখন প্রথম এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন কেহই তাঁহাকে উৎসাহ দেন নাই, কোনও সহানুভূতি দেখান নাই—সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত একটি ক্ষুদ্রদ্বীপে জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল বেলজিয়ামবাসী ধর্ম্মযাজক হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, বহির্জ্জগৎ এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাপুরুষের আত্মত্যাগের কথা জানিতে পারে। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে মোলোকাই দ্বীপস্থ কুষ্ঠিপল্লীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কুষ্ঠিপল্লীর জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইউরোপবাসিগণ ড্যামিয়েনের অলোকসামান্য সেবাপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা ড্যামিয়েনের অদৃষ্টপূর্ব্ব সেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অর্থসাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ড্যামিয়েন তাঁহার জীবদ্দশায়ই ইউরোপীয়গণের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যের কথা জানিতে পারিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ম্যাজিক্ লেণ্টার্ন, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য উপহারস্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মূল্যবান্ উপহার ড্যামিয়েন সযত্নে ও পরম প্রীতির সহিত নিজকুটীরে রক্ষা করিয়াছিলেন—উহা সাধু ফ্রান্সিসের নিকট প্রভুর আবির্ভাব বিষয়ক ক্ষুদ্র চিত্রখানি। এই চিত্রখানি ইংলণ্ডের একজন

বিখ্যাত চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ভক্ত ড্যামিয়েন নিজ প্রকোষ্ঠে শয্যার পাদদেশে প্রাচীরে এই চিত্রখানি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই চিত্রখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেন। দেখিতে দেখিতে বোধ হয় তিনি ভাবিতেন—সাধু ফ্রান্সিসের নিকট প্রভু যীশু কিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটও একদিন প্রভু আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

আজকাল মোলোকাই কুষ্ঠিপল্লীর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কুষ্ঠীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভক্ত ড্যামিয়েনের জীবনব্যাপী তপস্যা, নিষ্কাম সেবা ও আত্ম-ত্যাগের ফলেই কুষ্ঠিপল্লীর এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে যতদিন সেবাধর্ম্মের মহিমা থাকিবে ততদিন ভক্ত ড্যামিয়েনের নিষ্কাম সেবা ও আত্মত্যাগের কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

বাৎসল্য রস

শ্রীকানাইলাল পাল, এম্-এ, বি-এল

বৎসকে লালন করা হইতে বাৎসল্য শব্দের উৎপত্তি—সুতরাং আপনাকে লালক জ্ঞান ও শ্রীভগবানকে লাল্য জ্ঞান—এই রসের মূল কথা। এই রসে বৎসলতা স্থায়ী ভাব ও পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রাদি আলম্বন। এই রসে সম্ভ্রমের লেশ মাত্র থাকে না এবং শ্রীভগবানকে অনুকম্পার পাত্র মনে হয়। বাৎসল্য রতিবৃদ্ধিশীল হইয়া প্রেম স্নেহ অনুরাগ দশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মস্তক আঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন প্রতিপালন, হিতোপদেশ প্রদান এই রসের অনুভাব রূপে কীর্ত্তিত হয়।

শ্যামবর্ণ, সুমধুর, সর্ব্বসল্লক্ষণাক্রান্ত, মৃদু প্রিয়বাক্, সরল লজ্জাশীল বিনয়ী, মানদ, দানশীল, এই সকল গুণযুক্ত শ্রীভগবান এই রসে বিভাব বলিয়া কথিত হন।

গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্রীকৃষ্ণ বংশীরব করিতেছেন কি না উৎকর্ণা হইয়া মা ব্রজেশ্বরী তাহাই লক্ষ্য করিতেন এবং পুনঃ শ্রবণার্থ দ্বিগুণতর উৎকণ্ঠার সহিত স্তন হইতে ক্ষীরধারা মোচনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করতঃ ব্যাকুল হৃদয়ে কৃষ্ণের পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। এই দৃষ্টান্তে বাৎসল্য রতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

রতির পরিপাক অবস্থাকে প্রেম বলা যায়। প্রেমের একটী লক্ষণ ধ্বংসের কারণ থাকিলেও ধ্বংস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীমথুরায় গিয়া বসুদেবকে পিতা দেবকী দেবীকে মাতা বলিয়া তথায় অবস্থান করিলেন, আবার কত অসুর আদি বধ করিয়া দ্বারকায় গিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন, তথাপি মা ব্রজেশ্বরীর প্রেম বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই—ধ্বংস হওয়াত দূরের কথা। তাই দেখি, মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক স্তব করিতে থাকিলে মা গোকুলেশ্বরী পরম্পরায় তদীয় মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্তনদুগ্ধে কঞ্চুলিকা সিক্ত করতঃ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

প্রেম আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে 'স্নেহ' শব্দ

বাচ্য হয়, তখন চিত্তমধ্যে শ্রীভগবৎ দর্শনাদি জন্ম অতিশয় দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়। মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কোন বয়স্য এক সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ। ব্রজেশ্বরী তুষানলের উপর অবস্থান করিয়া যদি তোমায় দেখিতে পান তাহা হইলে সে তুষানল তাঁহার নিকট হিমবৎ প্রতীত হয়।

স্নেহে স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণের কথা সকলেই জানেন কিন্তু মা যশোদার স্নেহ এত গাঢ় ছিল যে ক্ষীরনদী স্তন হইতে বিগলিত হইত। আর তার সঙ্গে অশ্রুজল নেত্র-কজ্জলকে বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এত দেখার সাধ—তাহাও পূরণ হইত না।

গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয়ন পর্য্যন্ত মা যশোদার উৎকণ্ঠার সীমা নাই। সারানিশি সখীগণ সহ বিলাসের পর শেষ রাত্রে নিজ শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করিতে থাকিলে কত সন্তর্পণে মা গোপালকে জাগাইতে থাকেন। মনে করেন—আমার দুধের ছাওয়াল সমস্ত দিন কণ্টকপূর্ণ বনে বিচরণ করিয়া করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাই বাছার এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আবার অঙ্গে নখ-ক্ষতাদির চিহ্ন দেখিয়া ভাবিতেন, আর বনে গোচারণে গোপালকে পাঠাইব না, কণ্টকে বাছার অঙ্গ ক্ষত হইয়া যায়। আবার যদি কোনদিন নীল বসন অঙ্গে প্রাতঃকালে দেখেন, মনে করেন দাদা বলরামের কাপড় পরিতে সাধ গিয়াছে। কোন কিছুতেই গোপালের দোষ ধরেন না। প্রেমের স্বভাবই এই, প্রেমের উৎকর্ষে স্নেহ, স্নেহের পরিণতি রাগ সুতরাং সেখানে সবই গুণ বলিয়া গৃহীত হয়। তারপর গোপালের মুখমার্জ্জনাদির ব্যবস্থা হইতে থাকে, অপর দিকে নন্দ বাবা কপিলা গাভীর দুগ্ধ সদ্য দোহন করাইবার পর—মিশ্রী মিশ্রিত করিয়া শ্রীগোপালের সেবার জন্য আনিতে ব্যস্ত। আবার দুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনী প্রভৃতি যথাসময়ে সেবা করিবে বলিয়া মা যশোদা স্বয়ং দাসীগণ লইয়া কত ব্যস্ত।

দুর্ব্বাসার বরে শ্রীরাধারাণী অপূর্ব্ব রন্ধনপটু জানিয়া প্রতিদিন লোক পাঠাইয়া জটিলার অনুমতি লইয়া শ্রীরাধারাণীকে স্বীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক মা যশোদা রোহিণীমাকে সঙ্গে দিয়া শ্রীরাধারাণীর দ্বারা নানারূপ সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত করান এবং কত যত্নে শ্রীকৃষ্ণকে দাদা শ্রীবলরাম ও সখাগণ সঙ্গে ভোজন করাইয়া কত তৃপ্তি লাভ করেন। আবার গোষ্ঠে বিদায় দিবার কালে গোপালকে সাজাইতে গিয়া অশ্রুনেত্রে বুক ভাসিয়া যায়—সাজাইতে পারেন না—তখন হয় বাবা নন্দ, কি দাদা বলরাম, কি কোন সখা, বেশভূষা করিয়া দেন; আকুল নয়নে মা ব্রজেশ্বরী পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন কখনও বা আসিয়া মস্তক আঘ্রাণ করেন, অঙ্গে হাত বলাইতে থাকেন, মুখ চুম্বন করেন।* এস্থলে একটী পদ মনে পড়িল—

"গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী।
স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥
নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে।
মুখে চুম্ব দিতে ভাসাওল আঁখিনীরে॥
মাথায় লইতে ঘ্রাণ স্থগিত হইয়া।
চিত্র পুতলী যেন রহে কোলে লৈয়া॥
তবে স্থির হৈয়া পুন হাতে মুখ মাজে।
ঝাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহে পরিপূর্ণ কাজে॥
ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহ বীজমন্ত্র গলে বান্ধে লৈয়া॥
পৃথিবী আকাশ আর দশদিক পথে।
নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করুন ভালমতে॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়ে পুন আইস গৃহে।
নন্দের বিকলি কথা এ মাধবে কহে॥"

এই রসে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীভগবানে মমতা র প্রাচুর্য্য। সম্বন্ধ জ্ঞানটীই প্রধান, সেই সম্বন্ধ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮।৪৫

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—

বেদে যিনি অনেকস্থলে ইন্দ্র শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, উপনিষৎ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলেন, সাংখ্য যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করেন, যোগশাস্ত্রে যিনি পরমাত্মা শব্দবাচ্য, ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান বলিয়া মহিমা কীর্তন করেন, মা যশোদা সেই পরম তত্ত্বকে আপনার আত্মজ মনে করিতেন। শুধু তাই নয়, অপরাধ করিলে উদূখলে বন্ধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মমত্বের বল এতই অধিক। "আমার ছেলে"—আমি না শিক্ষা দিলে তার হিত কিরূপে হইবে? পুত্র মার সম্মুখেই পুতনা প্রভৃতি রাক্ষসী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন, সুবৃহৎ যমলার্জ্জুনকে উন্মূলিত করিতেছেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসীকে শিলাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেছেন, কালিয়নাগকে দমন করিতেছেন, দাবাগ্নি পান করিয়া ব্রজবাসীর ভয় দূর করিতেছেন কিন্তু এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশেও মার 'আত্মজ' বুদ্ধি বিন্দুমাত্র দূর হইতেছে না, সবই বিষ্ণু প্রসাদে হইতেছে ইহাই তিনি স্থির করিতেছেন। কি শয্যা-ত্যাগের সময় কি গোষ্ঠে গমনকালে মা যশোদার স্নেহভরে স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হয়, নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়, গদগদ স্বরে তিনি পুত্রের অঙ্গে মন্ত্র ন্যাস, ললাটে রক্ষা তিলক, হস্তে রক্ষা বন্ধন করিতে থাকেন। দধি নবনীত মন্থনকালে মা যশোদা কি শোভাই না ধারণ করেন!

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৯।৩

মা যশোদা স্থূল কটিতটে ক্ষৌম বসন সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া রজ্জু আকর্ষণ করিয়া দধি মন্থন করিতেছিলেন, পুত্রস্নেহে তাঁর স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইতেছিল, বাহুদ্বয় শ্রমযুক্ত হওয়ায় কঙ্কণ শব্দিত, কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় কম্পিত ও কবরী হইতে পুষ্পদাম স্খলিত এবং বদন বিন্দু বিন্দু স্বেদে অঙ্কিত হইতেছিল।

গোপালের বয়স, রূপ, বেশ, চাঞ্চল্য, মধুর বাক্য, মন্দহাস্য, ক্রীড়া কৌতুকাদি বাৎসল্য রসের উদ্দীপক। কৌমার বয়স প্রধানতঃ আদ্য মধ্য ও শেষ ভেদে তিন প্রকার। প্রথম কৌমারে বার বার পদক্ষেপণ, ক্ষণে ক্ষণে রোদন বা হাস্য, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ পান, উত্থান শয়ন এই সকল চেষ্টা প্রকাশ পায়। মধ্য কৌমারে নেত্র প্রান্তে কেশের অগ্রভাগ পতন, ঈষৎ নগ্নতা, কখন বস্ত্র পরিধান, কখন বিবসন, ছিদ্র কর্ণ, মধুর বাক্য, বিঙ্গণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। প্রথম কৌমারে মধ্য ভাগ ও উরুদেশের স্থূলতা, নেত্রপ্রান্ত শুক্ল বর্ণ, অল্প দন্তোদ্গম ও মৃদুতা দৃষ্ট হয়; এবং কণ্ঠে ব্যাঘ্র নখ, রক্ষাতিলক, নেত্রে কজ্জল, কটিতে পট্ট রজ্জু, হস্তে সূত্র প্রধান ভূষণ। মধ্য কৌমারে নাসাগ্রে মুক্তা, হস্তনখে নবনীত, কটিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভা পায়। শেষ কৌমারে মধ্যদেশ ঈষৎ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ বিশালতা, মস্তক কাকপক্ষ বিশিষ্ট দেখা যায়, এই অবস্থায় অল্প পরিসরযুক্ত দীর্ঘ কুঞ্চিত বসন, বন্যভূষণ, হস্তে ক্ষুদ্র বেত্র শোভা পায়। ব্রজের নিকট বৎসচারণ, সখাগণের সহিত ক্রীড়া, সূক্ষ্ম বেণু শৃঙ্গ ও পত্রাদির বাদ্য শেষ কৌমারের চেষ্টা।

পৌগণ্ডে মস্তকে উষ্ণীষ, গাত্রে কঞ্চুক, পদদ্বয়ে মনোহর নূপুর যুগল মধুর শোভা সম্পাদন করে। কৈশোরে অপাঙ্গ যুগল অরুণ বর্ণ বক্ষঃস্থল, উন্নত গলদেশে উজ্জ্বল হা রমণীয় রোমাবলী যুক্ত। নব কৈশোরেও মার নিকট পৌগণ্ড বয়স বিশিষ্ট লিয়া মনে হয়।

দুগ্ধ ভাণ্ড ভঙ্গ করণ, দধি নিক্ষেপ, সর নবনীত হরণ, মন্থন দণ্ড ভঙ্গ করণ, অগ্নিতে নবনীত নিক্ষেপ আদি চাঞ্চল্য শৈশবে প্রকাশ পায়। যার নিকট সে সকল আনন্দের হেতু হয়।

মা ব্রজেশ্বরী ছাড়া ব্রজে বাৎসল্য রস বিশিষ্টা অনেক ব্রজরমণী ছিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চাঞ্চল্যবশতঃ কখনও তাঁহাকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলে নয়নগোচর হইবামাত্র অনুরাগ বশে বালককে বাহু দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন; দর্শনে তাড়না করা ভুলিয়া যাইতেন।

স্তম্ভাদি আটটী ভাব ও স্তনদুগ্ধস্রাব বৎসল রসের সাত্ত্বিক ভাব। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করেন তখন মা ব্রজেশ্বরী স্তব্ধগাত্রী হইয়া নিশ্চলা রহিলেন—পুত্রকে আলিঙ্গন করা—তাহাকে ভালরূপে দর্শন করারও সামর্থ্য ছিল না। নয়ন বারিতে রুদ্ধকণ্ঠা হইয়া কোন উপদেশ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

প্রীতিরসের সমুদয় ব্যভিচারী ভাব ও অপস্মার —এই রসে প্রকাশ পায়। কালিয় নাগকে দমন করিয়া তীরে উঠিলে মা যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বার বার আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এটী—হর্ষ—নামক ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশ।

এই রসে অযোগে স্বভাবতঃ উৎকণ্ঠার উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাটিকায় বিহার করিলে দেবক নন্দিনীগণ ভাবিতেন কখন সেই শরদিন্দুবিনিন্দিত বদন দেখিতে পাইব?

বিয়োগে অশ্রুমোচনাদিই প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে মা যশোদা কেশাচ্ছন্নমুখী হইয়া বিবশদেহে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে হইতে হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। বিয়োগের সময় বহু ব্যভিচারী ভাব সম্ভব হইলেও প্রধানতঃ চিন্তা, বিষাদ, নির্ব্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা, উন্মাদ ও মোহ দশার উদ্রেক হয়।

যোগে সিদ্ধি, তুষ্টি বা হর্ষ প্রধান ভাব প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মাতৃগণকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, হর্ষে বিহ্বল হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, স্নেহভরে স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

প্রীতি ও সখ্যরস অনেক সময় বাৎসল্য রসযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্রীবলদেবের সখ্য, প্রীতি ও বাৎসল্য যুব। শ্রীযুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য প্রীতি ও সখ্য মিশ্রিত। শ্রীউগ্রসেন প্রভৃতির প্রীতি বাৎসল্য-যুক্ত। প্রাচীন গোপীগণের প্রীতি বাৎসল্য ও সখ্য মিশ্রিত। নকুল, সহদেব, নারদাদির মুখ্য প্রীতি-অন্বিত। রুদ্র, গরুড়, উদ্ধবাদির প্রীতি সখ্য মিশ্রিত।

আমরা এই বাৎসল্য রস বুঝিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যখন রামকৃষ্ণ দুই ভাই জানুচংক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন মা যশোদার আনন্দ আর ধরে না—

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষ-
রুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদ-
পেয়তুরন্তি মাত্রোঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮।২২

সেই রামকৃষ্ণ দুই ভাই নিজ নিজ পদদ্বয় পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক কটির ভূষণ ও চরণের ভূষণ কিঙ্কিণীর মধুর শব্দে বারম্বার ব্রজকর্দ্দমে যাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের মন আনন্দিত হইত, কখনও বা ইতস্ততঃ গমনশীল লোকদের পশ্চাতে ৩।৪ পদ গিয়া মুগ্ধ ও ভীতের মত জননীর নিকটে প্রত্যাগমন করিতেন।

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ পঙ্কাঙ্গরাগ-রুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাং। দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮।২৩

মা যশোদা ও মা রোহিণী আপন আপন পুত্রকে বাহুদ্বারা বক্ষে করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন, স্নেহভরে তাঁহাদের স্তন দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিত। চন্দনাদি পঙ্ক ও অঙ্গরাগে সুন্দর বালক দুইটীকে নিজ নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহারা স্তন প্রদান করিতেন, এবং সেই অবস্থায় তাহাদের ঈষৎ হাস্য ও অল্পদশনে সুশোভিত বদনের দিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেন।

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলাবন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮।২৪

তারপর যখন সেই রামকৃষ্ণের কুমার লীলা অঙ্গনাগণের দর্শনযোগ্য হইল তখন বালকদ্বয় ব্রজমধ্যে বৎসগণের পুচ্ছ ধরিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহারা ধাবমান হইলে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ কৌতূহল বশতঃ গৃহকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন ও হাস্য করিতে করিতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮।২৫

সেই বালক দুটী অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে শৃঙ্গি, দংষ্ট্রি, সর্প, অগ্নি, পক্ষী, জল ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে ও যথোচিত গৃহকার্য করিতে মা যশোদা ও মা রোহিণী অশক্ত হইয়া পড়িলেন সুতরাং তাঁহাদের মনের অবস্থা সর্ব্বদা উদ্বেগযুক্ত থাকিত।

তারপর যখন বালকদ্বয় সমবয়স্ক ব্রজবালকগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহাদের বাল্যচাপল্য দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণের পরমানন্দ উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কখনও অসময়ে বৎস সকলকে খুলিয়া দিতেন তাহাতে কেহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে হাস্য করিতে থাকিতেন। নানা উপায়ে সর, নবনীত প্রভৃতি চুরি করিয়া নিজে সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ভোজন করিতেন আবার, বানরদিগকেও খাওয়াইতেন; কখনও কুপিত হইয়া দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলিতেন। আবার কিছু না পাইলে শিশুদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেন। প্রতিবেশিগণ আসিয়া মা যশোদার নিকট অভিযোগ করিলে তিনি হাস্য করিতেন, পুত্রকে ভর্ৎসনা করিবার আদৌ ইচ্ছা হইত না।

একদিন স্তন্যপানে অতৃপ্ত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া মা যশোদা তাঁহার জন্যই দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতে প্রস্থান করিলে বালকের ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি একটী নোড়া দ্বারা দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া গৃহকোণে নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন উদূখলের উপর উঠিয়া বালক সদ্যোজাত নবনীত পাড়িতেছেন, নিজে খাইতেছেন, বানরকেও খাওয়াইতেছেন। মাকে দেখিয়া বালক ভয়ে চঞ্চল হইলেন, মা যষ্টি হস্তে পশ্চাৎদিকে আসিতেছেন দেখিয়া বালক ভীতপ্রায় হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; মাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। শেষে মাকে আলুথালু অবস্থায় দেখিয়া বালক ধরা পড়িলেন, মা তখন বালককে ভর্ৎসনা করিলেন, বালক রোদন করিতে লাগিলেন, মা তখন যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অপরাধী বালককে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু নিজের গৃহস্থিত—ব্রজস্থিত রজ্জুতেও তাঁহাকে বাঁধা গেল না। যাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, যাঁহার বাহির নাই ভিতর নাই, যাঁহার পূর্ব্ব নাই পর নাই, তাঁহাকে কে কি দিয়া বাঁধিবে? কিন্তু মার আবেশ—"আমার পুত্র অপরাধী আমি শাসন না করিলে কিরূপে কল্যাণ হইবে?" সেই আবেশ,

সেই মমতা, সেই লালা জ্ঞানেই শেষে কৃষ্ণ বাঁধা পড়িলেন,—যখন দেখিলেন মাব গাত্র ঘর্ম্মাক্ত, কেশপাশ ও পুষ্পমালা বিশ্লিষ্ট।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্তলিঙ্গমধোক্ষজম্।

গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৯।১৪

• সেই নববপু অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান কবিয়া মা যশোদা প্রকৃত বালকেব মত বজ্জু দ্বাবা উদুখলে বন্ধন কবিলেন। কেহ মনে করিতে পাবেন এও কি সম্ভব? কিন্তু শ্রীগীতার বাক্য ভুলিলে চলিবে না।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

যে যে ভাবে তাঁকে পাইতে চান বা ভজেন, তিনিও তাঁকে সেইভাবে ভজেন বা অনুগ্রহ কবেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবও বলিতেন "যেমন ভাব তেমনি লাভ"। শুধু তাই নয়, শ্রীভগবান এমনি প্রেমবশ যে গোপীগণ কবতালি দ্বাবা প্রোৎসাহিত কবিলে বালক শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য কবিতেন, কখনও বা মুগ্ধ হইযা তাঁহাদেব বশবর্ত্তী দাৰুযন্ত্রেব ন্যায় উচ্চৈস্বরে গান করিতেন। কখনও শ্রীনন্দ বাবাব পীঠ-পাদুকা বহন কবিতেন।

আবার মা যশোদাব স্নেহই বা কত গাঢ় ছিল। বালকগণেব সহিত ক্রীডা কবিতে কবিতে রামকৃষ্ণ যদি দেরি কবিতেন ও ক্রীড়ায় আসক্তি বশতঃ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না কবিতেন, তখন স্বয়ং ডাকিতে যাইতেন,—"হে বৎস। শীঘ্র এস, আব খেলায় কাজ নাই, ক্ষুধায় কাতর এখন ভোজন কব", —এইরূপ মিষ্ট সম্বোধনে ডাকিয়া আনিয়া ধূলিধূসরিত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া স্নান কবাইয়া অলঙ্কারে শোভিত করিয়া ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। শুধু তাই নয়, বাবা নন্দ ও মা যশোদা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধ ছাড়া একক্ষণও থাকিতেন না। অন্যান্য ব্রজবাসীরাও রামকৃষ্ণকে কম ভালবাসিতেন না, তাঁহাদেব মধ্যে বাৎসল্য ভাবাপন্না ব্রজাঙ্গনাগণ তাহাকে পুত্ররূপে স্তন্যাদি দান করিবার ইচ্ছা পোষণ কবিতেন। তাঁহাদেব সেই সাধ পূর্ণ কবিবার জন্য ব্রহ্মা গো-বৎস ও বালকগণকে অপহবণ কবিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক বৎস ও গোপ-বালকরূপ ধাবণ কবিয়া সেই সকল ব্রজাঙ্গনার সাধ পূর্ণ কবিযাছিলেন। গোমাতাদের অনুরূপ সাধও অপূর্ণ বাখেন নাই। কালিয়হ্রদে প্রবেশ কবিযাছেন জানিযা মা যশোদা নন্দবাবা প্রভৃতি কালিযহ্রদে জীবন ত্যাগ কবিতে উদ্যত হন। শ্রীবলদেব তাঁহাদেব নিবাবণ কবেন কিন্তু তাঁহারা সেই কালিযহ্রদেব তীরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত থাকেন। কালিযকে দমন কবিযা তীবে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলে তখন তাঁহাদেব মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন ধাবণ কবিলে পিতা মাতাব উৎকণ্ঠাব সীমা ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এত ঐশ্বর্য্যেও তাঁহাদেব শুদ্ধ বাৎসল্য ভাবেব কিছু রূপান্তর হয় নাই। তাঁহাবা মনে কবিতেন শ্রীনাবাযণেব কৃপায় সব ঘটিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যতদিন ব্রজে ছিলেন ততদিন সদাই মা বাবাব 'হাবাই হাবাই' ভাব কিন্তু যখন মথুবায় বামকৃষ্ণ গমন কবিলেন, তখন বিবহে তাঁদের শোকেব সীমা বহিল না। একটী পদ উদ্ধৃত কবিয়া আমবা এ প্রবন্ধ উপসংহাব করি—

"বজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে নিঝবে নয়ন ঝরে॥
তবে মনে পড়ে তাবা মধুপুবে তবহি হবয়ে জ্ঞান।
ফুললকুন্তলে লোটায় ভূতলে ক্ষেণে বহি মুরছান॥
শ্রীদাম সুবলে আসিয়া সেবেলে শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম কবি উঠয়ে ফুকরি শুনি থির বাঁধে হিয়া॥
চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া যতেক বিলাপ করে।
সেকথা শুনিতে মনুষ্য পশুজ পবাণ নাহিক ধরে॥
তিল আধ তোবে না দেখিলে মরে বনে না পাঠায় যেহ
এ পুরুষোত্তম কহয়ে সেজন কেমনে ধরিবে দেহ॥"

পুষ্পরাণী

শ্রীঅপর্ণা দেবী

ওগো, চিবশুভ-সূচনা !
তুমি বিধাতাব মুগ্ধ-মনেব
স্বপন-মাধুবী বচনা ,
এসেছ কি তুমি চাঁদিমা হইতে ।
বুকে সুধা, মুখে জ্যোছনা !

ওগো, সৌবভ-পালিকা !
তুমি, সুব-নন্দনে মন্দাব বনে
রচ' স্বপনেব মালিকা ,
চিব-সুন্দবী স্বর্গকুমাবী.
চিব মধুময়ী-বালিকা ।

ওগো, বসন্ত-বাহিনি !
ধবণীব চিতে এস কি জাগাতে
সুখের স্ববগ-কাহিনী !
মন্দাকিনীব পীযূষ-পৃক্ত
সৌবভ-অবগাহিনী ।

ওগো, শান্ত-সুধীবা-দামিনি ।
তোমারি পুলকে আলোকিত হয
অন্ধতামসী-যামিনী ;
ধবণীর বুকে কত রূপে হাস,—
বেলী, যুথি, চাঁপা, কামিনী ।

ওগো, ক্ষণপ্রভা-ক্ষণিকা !
তুমি, কোন্ অমরীব কণ্ঠমালাব
উজ্জল হীবক-কণিকা !
পাতালপুরের কোন্ নাগিনীর
যতনের নিধি 'মণিকা' !

হে পূত-পাবনী-গঙ্গে !
কোন্ ভগীবথ তোমারে এনেছে
তাপিত-ধবাব অঙ্গে !
রূপেব সাগবে, মধুব তুফানে
তবণী বাহিযা রঙ্গে ।

ওগো, ত্রিদিব-অপ্সবি !
শ্যামা-বনানীব আকুল-পুলক
সুপ্ত সুষমা সুন্দবী ;
কোন্ তাপসের তপের প্রভাবে
ফুটিযা উঠিলে রূপ ধবি' !

অমিয-কুম্ভ কক্ষে,
বক্ষে অপাব শান্তি-সুষমা,
করুণা-কিবণ চক্ষে ;—
ক্ষীবোদসিন্ধু-বাসিনী-'কমলা'
এলে কি ধবাব বক্ষে !

চির-গৌরব-মণ্ডিতা !
শান্ত-চিত্ত, বিপুল বিত্ত,
লজ্জা-নম্র-কুন্ঠিতা ;
মধুব-হাসিনী, নীরব-ভাষিণী,
সুষমায় অবগুন্ঠিতা ।

জননী-জগদ্ধাত্রি !
নিত্য-নারাযণি ! সত্য-সনাতনি !
বিধাতা-জনম-দাত্রি !
প্রণমি তোমারে বিশ্ব-পালিনি !
বিশ্ব-প্রতিষ্ঠাত্রি !

মহাভারতীয় সভ্যতা

মহাভারত

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

মহাভারত কাব্যে ইতিহাস। ইতিহাসে কাব্য। ছন্দে গ্রথিত বলিয়া মহাভাবতকে কাব্য বলিলাম, বস্তুতঃ উহা মহাকাব্যেব লক্ষণাক্রান্ত হইলেও ইতিহাস। ভাবতবর্ষেব কাব্য ইতিহাস হইতে দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত পর্য্যন্ত সবই ছন্দ-গ্রথিত। ছন্দ হইতেছে মাধুর্য্যপূর্ণ প্রকাশ, উহাতে বহিয়াছে বিকাশেব পাবিপাট্য। মহিম্ন ভাব ও আদর্শসমূহ সৌষ্ঠবযুক্ত ভঙ্গিমায অভিব্যক্ত হইলে তাহাব গূঢ়ার্থ সুপ্রকাশিত হয় বলিয়া ভাবতবর্ষীয় তাবৎ ভাবরাজি ছন্দকে আশ্রয় কবিযা আত্মপ্রকাশ কবিযাছে।

ভাবতবর্ষেব ইতিহাস, য়ুবোপেব হিষ্ট্রী (History) নহে। 'ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্।' এই অধোদেশ এই মর্ত্ত্যভুবন, এই ইহলোক। ইহাব মূল বহিযাছে ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধ অর্থ উচ্চ নহে,—আদি। যাহা হইতে সমগ্র বিশ্বপ্রসূত হইতেছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' বা বেদান্তসূত্রে যে পবম দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ।'

ঊর্দ্ধলোকে সৃষ্টিব মূল বলিয়া আমাদেব ইতিহাসও ঊর্দ্ধ হইতে আবম্ভ হইযাছে। তাই ভাবতবর্ষেব ইতিহাস পুবাণ। উহাকে বুদ্ধি, বিচাব, অনুসন্ধান, গবেষণাব সাহায্যে অধিগত কবিতে পারা যায় না। কিম্বা উহা ঘটনা পুঞ্জ (catalogue of events) ও নহে। পৌবাণিক ইতিহাসকে অধিগত করিতে হয় ধ্যানযোগে। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ইতিহাসের বীজদান করা হয়। সংবাদপত্রের সাহায্যে নহে, দিব্যদৃষ্টিব সাহায্যে, সঞ্জয কুরুক্ষেত্রের সমব সংঘটন লক্ষ্য কবেন।

এইটুকু মনে বাখিযা ইতিহাস কথা—ভারত-বর্ষেব ইতিহাস কথা, আলোচনা কবিতে হইবে। মহাভাবত যে মহান্ ইতিহাস, ইহা সংশয়বিহীন বুদ্ধিতে অঙ্গীকাব কবিয়া তবে মহাভাবতীয় সভ্যতাব আলোচনা ও অবধাবণ কার্য্যে অগ্রসব হইতে হইবে।

মহাভাবত দ্বাপব যুগেব ইতিকথা। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক উহা বিবচিত। কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয যুযুধান গোষ্ঠীদ্বযেব সমব সংক্রান্ত ব্যাপাব উহাব কেন্দ্রবস্তু হইলেও উহা ভাবতবর্ষের মহান্ জীবনেব বিবাট ইতিবৃত্ত। উহাতে সমসাময়িক কালেব ঘটনা পাবম্পর্য্যও বহিযাছে, আবাব বহু লক্ষ যুগ পূর্ব্বেব পৌবাণিক অবদানও প্রকীর্ত্তিত। মহাভাবতে যুদ্ধবৃত্তান্ত আছে; আবাব বাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিও মহাভাবতের বক্তব্যেব বিষয়ীভূত। মহাভাবত যথার্থ নাম।

মহাভাবত কি ও কেমন, সে পবিচয় দিতেছি না, মহাভাবতে ভাবতবর্ষীয় সভ্যতা সাধনার যে পবিচয় বহিয়াছে, তাহাবই সন্ধান লইতে চেষ্টা কবিব। পাঁচটি হাজাব বছব আগে দেবব্রত ভীষ্ম শবশয্যায় শায়িত হইযা ক্লান্তমনা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়াই বক্তব্যকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইব। এই ভীষ্মকথা শান্তিপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, শান্তিপর্ব্বই মহাভারতীয় সভ্যতার উপাদান।

দেবব্রত ভীষ্ম শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম এবং আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই ভারত জীবনের সমগ্রতার পরিচয় রহিয়াছে। আবার ভীষ্মদেব কেবল তাঁহার সমসাময়িক দিনের কথাই কহেন নাই, বহু পুরাতন পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করিয়া তাঁহার অভিমতের পোষকতা করিয়াছেন। দেবব্রত উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুরাতনীর পুনরুক্তি মাত্র। এই হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও তাহার ইতিহাস অগ্রকারও নহে, কল্যকারও নহে; তাহা বহু বহু পুরাতনের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পরম্পরাগত।

মহাভারত বলিলে আমরা মহাভারত গ্রন্থখানিকে বুঝিয়া থাকি। উক্ত মহাগ্রন্থের এবম্প্রকার নামকরণ হইবার কারণ মহান্ ভারতবর্ষের বিরাট জীবন-কাহিনী উহাতে বিবৃত হইয়াছে। ঐ বিরাটত্ব ঘটনার বহুলত্ব নহে, ভাবের মহিমতার সহিত তাহার বৃহৎ জীবনের ব্যাপকত্ব। কয়েকটা নৃপতি বা সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, কয়েকটা শতাব্দীর জীবন কাহিনী এইটুকু মাত্র মহাভারতের বিষয়বস্তু নহে। ভারত কথা সত্যে গিয়াছে, ত্রেতায় গিয়াছে, ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়াছে, ইন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, মান্ধাতার যুগের সহিতও তাহার সম্পর্ক পাতাইয়াছে। উহাতে শোণিত সংক্ষুব্ধ কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণের কথাও রহিয়াছে, আবার মোক্ষধর্ম্মও উহাতে বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য উহা মহাভারত।

আবার মহান্ ভারতবর্ষের অবদান কথার লেখমালা উহার পর্ব্বে পর্ব্বে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুলিখিত রহিয়াছে বলিয়া উক্ত ভারত কাব্যখানি মহাভারত। রাজন্যবর্গ কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, কাঁহার রাজ্যে রাজস্ব কত, এই সকল ইহলৌকিক ভোগমূলক কথা মহাভারতের অঙ্গীভূত হইলেও উহা তাহার সারাংশ নহে, সমগ্রের অংশীভূত হইয়াই উহার উপযোগিতা। মহাভারত কিন্তু সমগ্র ভারত সভ্যতার মর্ম্মকথাই পরিব্যক্ত করিয়াছে। কেবলমাত্র রাজকাহিনী হইলে মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইত না।

পঞ্চমবেদ এই কথাটায় মহাভারতের কতকটা পরিচয় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। বেদ সমগ্র বিদ্যা বিজ্ঞানের উৎস। বেদ অপৌরুষেয় ঈশ্বর বাণী। বেদ কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা। বেদবিদ্যা অধিগত হইবার জন্য তপস্যার আশ্রয় লইতে হয়। সেই বেদবিদ্যা লোকায়ত হইয়াছে পুরাণসমূহের মধ্য দিয়া। মহাভারত উহার অন্যতম সুপ্রকাশ। ভারতবর্ষের সভ্যতা সাধনা বেদ হইতে প্রসূত হইয়াছে। কাজেই, যাহা বেদান্তর্ভুক্ত, তাহাতেই বেদবিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

তবে, বেদে রহিয়াছে—সত্যের আদিরূপ, তাহার শব্দ মূর্ত্তি। মহাভারত কিন্তু জীবন কাহিনীর আশ্রয় করিয়া সত্য ও তত্ত্বসমূহকে প্রকটিত করিয়াছে। ইহার কারণ, ভারত সভ্যতা চাহিয়াছে—তত্ত্বকে জীবনে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে। সেইজন্যই বেদে এমন যজ্ঞ প্রাধান্য। জ্ঞানমাত্র সম্পূর্ণ ও সার্থক নহে; উহার প্রাণ স্পন্দন নাই। চাই চেতনাযুক্ত জীবন।

সেই জীবন-চৈতন্য রহিয়াছে মহাভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে। রূপাকর আশ্রয়ে কতকগুলি তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় ঐ মহাকাব্য রচিত হয় নাই। উহা ঠিক মহাভারতের সজীব জীবন চিত্র। উহার শরশয্যাও সত্য, উহার গীতা গাথাও সত্য। অতি পৌরাণিক সমসাময়িক যত কথা ও কাহিনী আছে, তাহার প্রত্যেকটিই সত্য। মহাভারত কথা কহিবার আগে এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে—উহা ব্যাস বিরচিত, বৈশম্পায়ন প্রকীর্ত্তিত! আর ঐ সকলও ঋষি মহর্ষি ক্রমে প্রাপ্ত। ভারতের সকল বিদ্যাই গুরুমুখী বিদ্যা। ইতিহাস পুরাণও তাহার বহির্ভূত নহে। গবেষণা করিয়া, উপাদান সংগ্রহ করিয়া এ দেশের ইতিহাস কখনই রচিত হয় নাই। ইহা সংগৃহীত ইতিহাস নহে, প্রাপ্ত।

এইখানে রামায়ণ রচনার ইতিকথাটি স্মরণযোগ্য বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি। পিতামহ ব্রহ্মা বাল্মীকিকে পুরাণী বীজ দান করিলেন। তাহাই রামায়ণ রচনার আদি। এই রীতিই সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। মহাভারতেও তাহার অন্যথা হয় নাই। সেইজন্য দেখিতে পাই ভীষ্মদেব যখন কোনও কাহিনী কহিতেছেন, তখন কোথায়ই বলিতেছেন না—আমি ইহা বলিতেছি। কোথাও বলিতেছেন—ব্রহ্মা বলিতেছেন, কোথাও নারদের কথা, কোথাও বা বলিতেছেন—পর্ব্বত ঋষির উক্তি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক একটা যুগ তাহার নিজস্বতাতেই সম্পূর্ণ হইয়া যায় নাই। একটা যুগের সহিত আর একটা যুগের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। ত্রেতা স্বয়ম্ভু নহে, উহা সত্যের উত্তরাধিকার। ত্রেতার উত্তরকাল দ্বাপর। এইরূপ চক্রনেমী ক্রম চলিতেছে এবং ইহার আদি নাই, অন্ত নাই—অনন্ত। আর্য্য সভ্যতাকে সনাতন সভ্যতা ঐ জন্যই বলা হয়। উহা আবহমানের, শাশ্বত দিনের।

এইখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন; বেদের নাম শ্রুতি। শ্রুতি এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, উহা গুরুক্রমে শ্রুত। যে ঋষি বা দেবতা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সমিদপাণি শ্রদ্ধালু শিষ্যকে উহা উপদেশ দান করিয়াছেন। এইরূপ পারম্পর্য্যক্রম।

এই গুরু পারম্পর্য্যকে না জানিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধিগত করিতে পারা যায় না। আর্য্য ইতিহাসের রহস্য যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহারা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর তত্ত্বকথা বুঝিতে না পারিয়া ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণা করিয়া ফেলেন। দ্রৌপদীর বর্ত্তমানতা লইয়া প্রতিবাদ করা পৌরাণিক দৃষ্টির অভাব মাত্র। পাঞ্চালীর পঞ্চ স্বামীত্বকে বুঝিতে হইলে আর একটা জন্মান্তরে গিয়া তাহার তত্ত্ব ও রহস্য অধিগত হইতে হয়।

যে দৃষ্টি ও বুদ্ধি দিয়া প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পড়িতে ও বুঝিতে হয়, সে দৃষ্টি ভঙ্গিমায় ভারতবর্ষের পৌরাণিকতা, তথা তাহার ঐতিহাসিকতা বুঝিতে পারা যাইবে না। বুঝিতে চাহিলে তাহার বিকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে মাত্র। রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা হয় না, হইলেও তাহা ইতিহাস হয় না, হয় কবিকথা: আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে এইটুকুই বুঝিতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মার সেই পৌরাণিক বীজদানের কাহিনীটা জানা থাকিলে পুরাণী ইতিহাস সম্বন্ধে আর বিকৃত ধারণা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাল্মীকি মুনিকে পিতামহ ব্রহ্মা রামায়ণ কথা রচনা করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন,—আজ তুমি যাহা রচনা করিবে তাহার প্রত্যেকটি সত্য। ইহা কাব্যে ইতিহাস, ইতিহাসে কাব্য।

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাসকে আমরা কতটুকু জানি বা বুঝি। মিশরের 'মমি' দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হওয়া ব্যতীত সেই চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার মৈসরিক মানবের জীবন কথা অবগত হইবার আমাদের কোনই উপায় নাই। অবশিষ্ট অভিজ্ঞান দেখিয়া তাহাদের অশন, বসন, ভাব, সাহিত্য সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিলেও সেই অতীত মানব সমাজের প্রাণের কাহিনী জানিবার উপায় মাত্র নাই। তাই এক যুগের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অন্য যুগে অপ্রামাণিক হইয়া উঠে।

কালের অতীত যিনি, পরন্তু কাল যাঁহার কুক্ষিগত, কেবল তাঁহার পক্ষেই ঐতিহাসিক হওয়া সম্ভব। তাই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদবাণীও উদ্গীত হইয়াছে, ইতিহাস পুরাণেরও তিনি বীজ দাতা।

এইরূপে ভারত ইতিহাসের অন্তর্গত রাজনীতি, সমাজ-নীতি, আবার আচরণ সভ্যতার তাবৎ কিছু বিষয়কে জানিতে হইলে স্থূলদৃষ্টির সহিত একটু প্রজ্ঞাদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইবে। অন্ততঃ তাহার

শরণাপন্ন না হইলে গত্যন্তর নাই। মহাভারতের মধ্যে ভারত-সভ্যতার যে ইতিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা রহিয়াছে পুরাণী ধারায়। রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে দেবব্রত যে উপদেশ দান করিতেছেন, তাহাতে কোথাও হয়ত মুচকুন্দ রাজার বিবরণ হইতে কর্ত্তব্যের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। অদ্যকার দিনে যেমন প্রমাণ পঞ্জী—'অথরিটি কোট' করা হয়।

মহাভারত ধারাবাহিক ইতিহাস। সমসাময়িক যুগের সহিত চিরন্তন দিনের ভারত কথা। নূতন কোনও আচার ব্যবহার, নূতন কোনও রীতিনীতি, তপস্যার অভিনব কোনও রূপ, ভারতবর্ষের কোনও যুগে সমাজ অথবা রাষ্ট্রকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইতে পারে না। তাই মহাভারতের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও মোক্ষনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পিতামহ ভীষ্ম কেবল পুরাণী কথাই কহিয়াছেন। এই পুরাণী কথার নাম প্রজ্ঞা পুরাণী। ইহার অদ্যকার-রূপ গতকল্যকার হইতে বিভিন্ন নহে। আবার অদ্য যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, তিনি লক্ষ বৎসরের পরবর্ত্তী যে ভবিষ্যৎ তাহাতেও অপরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

মহাভারতীয় সভ্যতার কথা অবধারণ করিতে গিয়া যখন ভীষ্মদেবের উক্তিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিব, তখন সেই সমুদয়কে শুধু ধরিয়া লইব—ভীষ্মদেব কথিত, পরন্তু কিছুতেই দেবব্রতের প্রবর্ত্তিত নহে। দেবব্রত বক্তা, কখনই প্রবক্তা নহেন। তিনি সেই প্রজ্ঞা পুরাণীকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের গোচরীভূত করিতেছেন মাত্র। এবং সেই পুরাণী কথাই যথার্থ ইতিহাস। তথাকথিত ইতিহাসের অপেক্ষাও সত্য ও বাস্তব।

দক্ষিণ-ভারতের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী সুন্দরানন্দ

পাঁচদিন পর কালাডি হতে প্রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে দ্বিপ্রহরে মালাবার প্রদেশের প্রধান সহর কোচিনের প্রাচীন রাজধানী ত্রিচূড়ে এলাম। রাস্তায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতরাজি এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলো বেশ দেখাচ্ছিল। জমি অধিকাংশই পাথুরে, তেমন উর্ব্বর নয়। ত্রিচূড়ে এসে কোচিনের দ্বিতীয় রাজা মাননীয় রবিবর্ম্মা মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত এবং খুব সজ্জন, রাজবাড়ীতে নিত্য স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজো করেন। ত্রিচূড় সহরটী বেশ বড়। দর্শনীয় তেমন কিছু নেই। সহরে বড় বড় বাড়ী ও দোকানপসার আছে। সহরটীর মাঝখানে একটী বিস্তীর্ণ জায়গায় পাঁচিলে ঘেরা একটী বড় মন্দির। মিঃ রামস্বামী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনলাম,—পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে এই মন্দিরের বাইরে অবস্থিত বিশালায়তন বটগাছটীর নীচে বসেছিলেন, তাঁর ব্রাহ্মণ শরীর ছিল না বলে তাঁকে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির এতে প্রবেশাধিকার নেই। মন্দিরের বিগ্রহ-পূজক নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। স্বামীজিকে যে মন্দিরে

প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, সে মন্দির দেখবার আগ্রহ আমার কিছুমাত্র ছিল না কিন্তু মিঃ রাম-স্বামীর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করলাম। এখানে "বড়কিন্নাথন" লিঙ্গমূর্ত্তি পূজিত। নিত্য ঘৃত-স্নানে এই বিগ্রহের উপর ঘৃতের একটা পুরু আবরণ পড়েছে। শুনলাম, প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এক বিশেষ দিনে লিঙ্গমূর্ত্তির গা হতে এই ঘি গলে পড়ে এবং এ উপলক্ষে 'পুরম্' নামক বিশেষ একটী উৎসব হয়ে থাকে। এই গলিত ঘৃত সর্ব্বব্যাধির ঔষধ বলে সকলে গ্রহণ করেন। দেখলাম, ১৮ জন নম্বুদ্রী মেয়ে বড় বড় তালপাতার ছাতা নিয়ে মন্দিরে পূজো দিতে এসেছেন। এদেশে অবগুণ্ঠন প্রথা নেই, মেয়েরা পুরুষদের দৃষ্টি অতিক্রম করবার জন্য বাড়ীর বের হলেই এ রকম ছাতা ব্যবহার করেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম—এ সহরের ছ'আনা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী—সব হিন্দু হতে। ত্রিচূড় সহরটী বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম নির্ম্মাণ করেছিলেন বলে প্রবাদ।

তিন দিন পর ত্রিচূড় সহর হতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গুরুকুলে গেলাম। বিস্তীর্ণ জমির উপর এক নির্জ্জন রমণীয় স্থানে এই কেন্দ্রটী স্থাপিত। নিকটে ছোট ছোট পাহাড়। মালাবর প্রদেশের মধ্যে অস্পৃশ্য অদর্শনীয় ছেলেদের শিক্ষার জন্য এই গুরুকুলটীই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এখানে একটী স্কুলে তিন শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে; এর এক তৃতীয়াংশ অস্পৃশ্য জাতীয়। গুরুকুলে ৩০টী গরীব অস্পৃশ্য ও অদর্শনীয় ছেলেকে উচ্চ শ্রেণীর কয়েকটী ছেলের সঙ্গে রাখা হয়েছে, খাওয়া থাকা সব এক সঙ্গে। এখানে মহাত্মা গান্ধী হরিজন সফরের সময় এসে একদিন ছিলেন। একজন সন্ন্যাসীর অধীনে স্থানীয় কয়েকজন ত্যাগী যুবক দ্বারা প্রতিষ্ঠানটী পরিচালিত।

মালাবরের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান গুরুভাউর এই গুরুকুল হতে মাত্র ৮ মাইল দূরে। একদিন গুরুকুলের একজন শিক্ষককে নিয়ে বাসে গুরুভাউরে গেলাম। গুরুভাউর একটী বড় গ্রাম। গ্রামের মাঝখানে মন্দির। মন্দিরটী খুব বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী হলেও বড় নয়। চারদিকে উচ্চ পাচিলের মাঝে নাতিউচ্চ গম্বুজযুক্ত মন্দিরে অদ্ভুত দর্শন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। তেলবাতি দিবার জন্য মন্দিরের তিন দিকে ছোট ছোট লক্ষ বাতি সাজান, স্তরে স্তরে পিতলের ধাপ। শুনলাম, সব বাতি জ্বালাতে একমণ তেল লাগে এবং মাঝে মাঝে ভক্তরা জেলে থাকেন। স্তূপীকৃত ঘৃষ্ট চন্দন এবং বিভূতি বিতরিত হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণের দুটী বড় ঘরে পুরাণ পাঠ চলছে: দুটী ঘরেই বহু শ্রোতা। এ মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশনের সংকল্প করেছিলেন, এবং এ দেশের বিখ্যাত নেতা মিঃ কালাপ্পন কয়েকদিন উপবাস করেছিলেন। কিছুদিন দুজনের মাথায় এ মন্দিরে সত্যাগ্রহও চলেছিল কিন্তু মন্দিরের মালিক জামু-রিণরা এতে বিচলিত হননি। এখানে মধ্যাহ্নে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী অবস্থান করে সন্ধ্যায় গুরুকুলে ফিরে এলাম।

আটদিন পর ত্রিচূড় সহর হতে প্রাতের ট্রেনে দক্ষিণ দেশের সিমলা শৈলনিবাস উটাকামণ্ড যাত্রা করি। ট্রেনটী অনেক দূর পর্য্যন্ত সমভূমির উপর দিয়ে নীলগিরি পর্ব্বতরাজির ভেতর প্রবেশ করে কতকদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপত্যকা অতিক্রম করে আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে একটীর পর আর একটী পর্ব্বত বেয়ে উঠতে লাগলো। পাহাড়ের গায় শত শত ঝরণা এবং ছোট ছোট গ্রামগুলোর দৃশ্য চমৎকার। ট্রেনটী পাহাড়ের গা বেয়ে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে শীর্ষদেশে যতই উঠতে লাগলো ততই সমতল ভূমি এবং পর্ব্বতের দৃশ্য অবর্ণনীয় আকার ধারণ করলো। রাস্তা খুব উঁচু নীচু বলে তিনটী লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চলে। মাঝের

লাইন কাটার মতো (Cog), দরকার হলে ঐসব জায়গায় ঐ কাটায় ট্রেন আট্‌কে থাকে। সন্ধ্যার পর ট্রেনটী উটি সহরের ষ্টেসনে এসে হাজির হ'লে আমি এখানে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে উপস্থিত হই। একটী পর্ব্বতশীর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ; মঠের সম্মুখে অনন্ত পর্ব্বতরাজি, পেছনে ইউকিলাপ্টাসের বাগান। নিকটে আর বসতি নেই। এখানে নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য যথার্থ ই উপভোগ্য। নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এ সহরটী বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। সমুদ্র হতে এর উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। দক্ষিণের সমতল ভূমিতে এখন খুব গরম কিন্তু এখানে এখনও উত্তর ভারতের মাঘের শীত। রাত্রে দুখানা মোটা কম্বল ছাড়া এখানে পোষায় না। স্নান-পান সব গরম জলে। পর্ব্বতগাত্রে এখানে সেখানে বাড়ী ঘর, পর্ব্বতের বিস্তীর্ণ অধিত্যকায় সহর, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, পীচ ঢালা রাস্তা, দোকানপসার ও বাগান-গুলোর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সহরের একপ্রান্তে মান্দ্রাজ গবর্ণরের বাংলোর নিকট বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় অনেক অদ্ভুতদর্শন বৃক্ষ এবং পুষ্প দর্শনীয়। জগতে যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ফুল আছে, তা এ বাগান না দেখ্‌লে ধারণা করা শক্ত। মঠের নিকটেই একটী পর্ব্বত-শীর্ষে মহীসুরের রাজবাড়ী, বিশেষ করে উদ্যানটী দর্শনীয়। লতাপাতা কেটে ছেটে শত শত মনোরঞ্জক ফুলগাছ দিয়ে বাগানটী সুন্দরভাবে সাজান। একদিন কয়েকজন মিলে নয় হাজার ফিট উঁচু এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠে উটি সহর ও নীলগিরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌লাম।

উটিতে ১০ দিন থেকে এখানকার ফার্ণহিল ষ্টেসন হতে দ্বিপ্রহরে ট্রেনে রওনা হই। ট্রেনটী পাহাড়ের গা বেয়ে তাড়াতাড়ি নেবে সমতল ভূমিতে এসে পড়্‌লো। পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে যে সময় লেগেছিল তার প্রায় আধাআধি সময় অবতরণ করতে লাগ্‌লো। অপরাহ্ণে ট্রেন হতে পদনুর ষ্টেসনে নেবে ওখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকুলে গিয়ে উঠ্‌লাম। এ দেশের বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী মিঃ অবিনাশীলিঙ্গম্ চেট্টিয়ার এই গুরুকুলটী স্থাপন করেছেন। ইনি ধনবান এবং অবিবাহিত, বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। গুরু-কুলে ৪০টী দরিদ্র বিদ্যার্থী আছে, অধিকাংশই অস্পৃশ্য শ্রেণীর। শিক্ষক ও ছেলেরা মিলে আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষাও দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমবাসী ছেলেরা মন্দিরে সমবেত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্কৃত স্তব পাঠ কর্‌লে। এই দূরদেশে তামিল ছেলেদের কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্তব শুনে ভারি আনন্দ হলো। একটা বড় ইক্‌মিক্-কুকারে একসঙ্গে এখানে ৫০ জন লোকের পাক হয়,—একবারে তিনপদ। গুরুকুলটীর সব শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহাত্মা গান্ধী হরিজন উন্নয়নের জন্য পরিভ্রমণের সময় এখানে একদিন ছিলেন। প্রতি বৎসর এই গুরুকুলে ৬।৭ হাজার টাকা খরচ হয়, বেশীর ভাগ খরচ এর স্থাপয়িতা বহন করেন। পদনুর কয়াটোর সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

একদিন পদনুর গুরুকুলে বিশ্রাম করে ওখান হতে প্রাতের ট্রেনে প্রসিদ্ধ তীর্থ মাদুরায় রওনা হলাম। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট বড় গ্রাম এবং স্থানে স্থানে পাহাড় দেখা গেল। গ্রামের মাটীর দেয়াল যুক্ত পর্ণকুটির গুলো অধিবাসীদের দারিদ্র্য ঘোষণা কর্‌ছে, কচিৎ কোনো কোনো গ্রামে দু একখানা পাকাবাড়ীও দেখ্‌লাম। এ অঞ্চলের জমিগুলো বেশ উর্ব্বর মনে হলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেনটী মাদুরা ষ্টেসনে এলে আমি একজন কুলী নিয়ে রায় বাহাদুর মিঃ চেট্টিয়ারের বাড়ী গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌লাম। এই ভদ্রলোক একজন ক্রোড়পতি

জমিদার হয়েও এত সাধারণ ভাবে থাকেন যে এঁকে প্রথম দৃষ্টিতে আমি এ বাড়ীর একজন চাকর বলেই মনে করেছিলাম। ধনবানের মধ্যে এমন নিরভিমান ধার্ম্মিক লোক খুব কম দেখা যায়।

মাদুরা পাণ্ড্য প্রভৃতি কয়েকটী রাজবংশের রাজধানী ছিল, একে দক্ষিণভারতের এথেন্স (The Athens of Southern India) বলা হয়। দক্ষিণে মান্দ্রাজের পরই মাদুরার স্থান। মাদুরা সহরের মাঝখানে এখানকার ভারত বিখ্যাত মন্দির। মন্দিরটী বেষ্টন করেই সহর গড়ে উঠেছে। মন্দির প্রাকারের চারদিকে থাকে থাকে বাড়ীঘর দোকানপাট এবং প্রশস্ত রাস্তা। সমগ্রভারতের মধ্যে এই মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ঐশ্বর্য্যশালী। মন্দিরের চারদিকে তিন থাকে প্রাচীর এবং দশতলা চারটী গোপুরম। এতে পুরাণের সব ঘটনা সংখ্যাতীত মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করে দেখান হয়েছে। এগুলো খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল। মন্দিরকে অবলম্বন করে দ্রাবিড়ী ভাস্কর্য্য ও ললিতকলা যে একসময় কত উন্নতি লাভ করেছিল তা দক্ষিণ দেশের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলো দেখ্‌লে বোঝা যায়। ফটক হতে কতকগুলো বড় বড় নাটমন্দির অতিক্রম করে একটী অপরিসর গর্ভমন্দিরে প্রধান বিগ্রহ "সোমসুন্দর" লিঙ্গমূর্ত্তি। এখানে এই বিরাট মন্দিরের অন্যতম স্থাপয়িতা তিরুমল নায়েক (খৃঃ ১৬২৩-১৬৫৯) এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী-দের প্রস্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর মাদুরার নায়েকরাজগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। হাজার প্রস্তর স্তম্ভের উপর একটী নাটমন্দির এখানে বিশেষ দর্শনীয়। ছোট বড় মণ্ডপ অনেক, এক একটী বিরাট প্রস্তরখণ্ড খোদাই মূর্ত্তি মণ্ডপগুলির গায়ে লাগানো। ভেতরে দুটী পাড়বাধানো বড় পুকুর। কয়েকটী বড় কোঠা ভর্ত্তি সোনারূপা, ও কাঠের বড় বড় হাতি, ঘোড়া, উট্‌, পাল্কী প্রভৃতি। উৎসবাদিতে এসব দিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। "সোমসুন্দরের" মন্দিরের অদূরে আর একটী প্রধান মন্দিরে দেবী "মীনাক্ষী"। এই মন্দিরের সামনে কারুকার্য্যযুক্ত বিখ্যাত "বসন্ত বা পাদুমণ্ডপ"। মাদুরার মন্দিরের ভাস্কর্য্যকে সাঁচির গুপ্ত আর্টের পরবর্ত্তী বিকাশ বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন*। দেবী মীনাক্ষী দর্শনে বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সমাধি হয়েছিল। পৃথক পৃথক মন্দিরে নৃত্যরত চতুর্ভুজ নটরাজ শিব, সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিক) এবং পিলাইয়ার (গণেশ) প্রভৃতি দেবতা ও দক্ষিণ দেশের অবতারকল্প শৈবসাধক আপ্পারস্বামী, সুন্দর-মূর্ত্তি, তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর, মাণিক্যবাসকর প্রভৃতি ৬৩ জন "নায়েনার" (নেতৃস্থানীয় সাধু) নিত্য পূজিত। এখানে চোকামেলা, নন্দোপোদোয়ান, নন্দ প্রভৃতি অস্পৃশ্য তামিল শৈব সাধু ব্রাহ্মণ পূজারী কর্ত্তৃক পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরে এই সব স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য শৈবাচার্য্যদের জন্মতিথি পূজা যথানিয়মে হয়ে থাকে এবং এ উপলক্ষে তাঁদের উপদেশ ও জীবনী পাঠ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদের অনুদারতার মধ্যেও এরূপ উদারতা প্রশংসার্হ। মন্দিরে বারমাস সমানে নিত্য নহবৎ এবং বাজনার ব্যবস্থা আছে। নিত্য রাজকীয় ধরণে বারংবার ভোগরাগ চল্‌ছে। কোন না কোন উৎসব এবং তদুপলক্ষে লোকের ভিড় লেগেই আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথে এবং ভেতরে অসংখ্য পুষ্প, মাল্য, চন্দন, কর্পূর, ধূপকাঠি ও বিভূতির দোকান। স্তূপীকৃত বিভূতি-চন্দন বোঝা বিক্রি হচ্ছে। শত শত ভক্ত মন্দিরে এসে পাঠ, পূজা, জপ, ধ্যান এবং করুণস্বরে 'থেবারম' (তামিল স্তোত্র) পাঠ করছেন। মন্দিরে এসে নারকেল ভাঙ্গা, কর্পূর পোড়ান, বিভূতি ও নির্ম্মাল্য ধারণ এ দেশে ধর্ম্মের

* "History of Indian And Indonesian Art" by A. K. Coomarswami.

অঙ্গ। অনেকে দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য মন্দিরে এসে নিজ কর্ণ মর্দ্দন এবং নিজগণ্ডে চপেটাঘাত করেন। কোন কোন ভক্ত কার্য্যোদ্ধারের জন্য কর্পূর মানত করে বিগ্রহের সামনে পোড়ায়ে থাকেন।

এই মন্দিরটীকে অবলম্বন করেই সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শৈবমত বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। পাণ্ড্যরাজগণ এবং অন্যান্য অনেক রাজা মাতুরার মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দক্ষিণ দেশে যে একটী বিশেষ কৃষ্টি আছে—যা দ্রাবিড়ী সভ্যতা বলে ইতিহাসে পরিচিত—তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছে এই মন্দিরটী। এমন কি এ দেশের অধিকাংশ প্রাচীন সহরও গড়ে উঠেছিল মন্দিরকে আশ্রয় করে। মাতুরার মন্দিরটী এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। দক্ষিণের মন্দিরগুলো সংখ্যাতীত অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সৃষ্টি করেছে এবং তাঁদের প্রভাবেই এ দেশের আধ্যাত্মিক ভূমি আজও উর্ব্বর। শুধু ধর্ম্ম নয়, দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত শৈবদর্শন, "সঙ্গম ও লিঙ্গায়েৎ সাহিত্য", ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা প্রভৃতি মন্দির আশ্রয়েই সম্ভূত এবং বিস্তার লাভ করেছে। মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধবাদীদের এ বিষয় প্রণিধান যোগ্য। একদিকে যেমন এ দেশের মন্দিরের এই সব গুণ দেখা যায়, তেমনি অপরদিকে এর দোষও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণের মন্দিরগুলো মানুষের অন্তরের ধর্ম্মকে যেন বাইরে এনে অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে পর্য্যবসিত করেছে। ফলে দেশ শুদ্ধ লোকের দৃষ্টি বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বরের প্রতি মাত্রা ছাড়িয়ে নিবদ্ধ হওয়ায় এ দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক উন্নতি অবজ্ঞাত এবং পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। দেশশুদ্ধ লোককে জোর করে 'মোক্ষকামী' করবার চেষ্টার ফলে ভারতে বৌদ্ধদের অবস্থাও এই আকার ধারণ করেছিল।

মাতুরা সহরের দক্ষিণ দিয়ে 'ভইগেই' নদী প্রবাহিতা। নদীটীর বক্ষ প্রশস্ত হলেও এখানে সেখানে সামান্য বদ্ধ জল মাত্র রয়েছে। এখানে এখন গরম অসাধারণ। নদীর সামান্য জলে অসংখ্য গো-মহিষের সঙ্গে অগণিত জনসঙ্ঘ স্নান করছে। এই ভীষণ নোংরা জলে স্নান করে এ লোকগুলো কি করে যে বেঁচে আছে তা গবেষণার বিষয়। এ নদীতে প্রতি বৎসর মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে 'তাইনির' নামক স্নানোৎসব হয়। সহরটী অপরিষ্কার এবং ধূলোবালি পূর্ণ। সহরে তিরুমল নায়েকের রাজবাড়ী এবং অদূরে "মারিয়াম্মানকোভিল" পুকুরটী দর্শনীয়। রাজবাড়ীটি এখন সরকারী কাছারিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুকুরের মাঝখানে একটী সুদৃশ্য ছোট মন্দির আছে।

আট দিন পর মাতুরা থেকে দ্বিপ্রহরে রওনা হয়ে অপরাহ্ণে ত্রিচিনাপলী সহরে এসে মিঃ সঙ্গম-পীলে নামক একজন ভদ্রলোকের বাড়ী উপস্থিত হলাম। সহরের এক প্রান্তে এক খোলা যায়গায় ভদ্রলোকটীর বাড়ী। ত্রিচিনাপলী দক্ষিণ ভারতের রেলের প্রধান কেন্দ্র। এখানকার রেলের কারখানায় পাঁচ হাজারের উপর কারিগর কাজ করে। ত্রিচিনাপলী হতে আরম্ভ করে নেলোর পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব্ব প্রদেশের নাম চোলরাজ্য। চোলরাজগণ শিব ও বিষ্ণুর অসংখ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভক্তিবাদ এ সময় বিশেষ বিস্তার লাভ করে। কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানে তামিল ভাষা প্রচলিত। সহরের উত্তর দিয়ে গঙ্গাতুল্য কাবেরী নদী প্রবাহিতা। জল খুব পরিষ্কার এবং এতে স্নান করা বিশেষ আরাম-জনক। সুবিস্তীর্ণ সহরের একপ্রান্তে একটি উঁচু পাহাড় কেটে এখানকার বিখ্যাত মন্দির তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়টীর শীর্ষদেশে সুদৃশ্য বিনায়কের (গণেশ) মন্দির এবং একটী উঁচু ঘণ্টাঘর। ঘণ্টার শব্দ ৪।৫ মাইল দূরে হতে শোনা যায়। পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি আছে। পাহাড়টী ৫০৩ ফিট উঁচু। বিনায়কের মন্দিরের সামনে বিস্তৃত ঢালু প্রাঙ্গণ। এখান হতে সহরের রাস্তা, বাড়ীঘর ও কাবেরী নদীর দৃশ্য মনোরম। পাহাড়টীর মাঝখান কেটে দুটী কারুকার্য্য মণ্ডিত মার্ব্বেল পাথরের বড় মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছে,—সম্মুখে নাটমন্দির। প্রধান বিগ্রহ "তাউমানবর" শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করা হয়। অপর মন্দিরটীতে দেবী মূর্ত্তি নিত্য পূজিতা। ক্রমশঃ

দেবী সারদামণির সমদর্শন

শ্রীহরিবোলা নাথ রায়চৌধুরী

পরস্পর বিবদমান জগতে একমাত্র সমদর্শনই মানবকে প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী-পথে চালিত করতে পারে। আমরা অনেক সময় সমদর্শনের সীমা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে গোলমালে পড়ে যাই এবং নানামুনির ভাষ্যবিড়ম্বনায় আপন আপন সংকীর্ণতাকে সমদৃষ্টি বলে ব্যাখ্যা করি। অতি বড় ঈশ্বরজ্ঞানিত মহাপুরুষ বলে আমরা যাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করি তিনিও অনেক সময় সমদর্শনের নামে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সীমার মধ্যে আমাদের টেনে রাখতে চেষ্টা করেন। সমদৃষ্টি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার বাইরে।

মানব জীবনের উপর ধর্ম্ম সাধনার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রে হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা বা কোন খেয়াল সিদ্ধি। সাধকের উদ্দেশ্য এইখানেই ব্যর্থ হয়ে যায়, ফলে তিনি তাঁর ধর্ম্মকে স্বার্থপ্রেরণায় স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যে জটিল করে সমদৃষ্টি লাভের পথ হতে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। প্রকৃতির ক্ষুধা বুঝি অনুরূপ, তাই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন না হলে এর বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করে জয়যুক্ত হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যায়—ধর্ম্মপথে গিয়েও মানবসমাজ সর্ব্বধর্ম্মের সার্ব্বজনীন আদর্শ সমদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়ে আছে। মানব সমাজের এই সংকীর্ণতার মূলে আঘাত করার জন্য এবার ভগবান অশ্রুতপূর্ব্ব সমদৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অলৌকিক জীবনে সমদৃষ্টি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেছিল। এমন অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বলৌকিক সমদর্শনের দৃষ্টান্ত ধর্ম্ম-জগতে আর দেখা যায় না।

যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীরূপে এসেছিলেন এক মহিয়সী নারী, যাঁর জীবনে তাঁরই মত সমদর্শন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করেছিল। বৈদিক যুগের ঋষিকন্যাদের মত প্রকৃতির অতি নিভৃত কোলে—বঙ্গের একটী সুদূর পল্লীগ্রামে ঋষিতুল্য জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণ কুটীরে প্রাচ্যনারীর আদর্শ স্থানীয়া সারদাদেবীর কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের ঋষিকন্যাদের মত ছিল তাঁর বাল্যজীবন, আধুনিক শিক্ষার পরশ মাত্র তাঁতে ছিল না। আমরা সুলভা, চূড়লা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববরা এবং গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞা নারীর জীবন কাহিনী প্রাচীন শাস্ত্রে পাঠ করি, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পরশে অপ্রাকৃত শিক্ষাবর্জ্জিতা সারদাদেবীও তাঁদের মতই ব্রহ্মজ্ঞানের শীর্ষে আরূঢ়া হয়েছিলেন, সমদৃষ্টি তাঁর জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল এক অশ্রুতপূর্ব্ব মাতৃভাবের ভেতর দিয়ে। এ জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে "মা" নামে পরিচিতা।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরের নহবৎখানার ক্ষুদ্র কুটীরে সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করে লজ্জাশীলা পল্লীকুলবধূটীর মত লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সাধন জীবন যাপন করে গিয়েছেন, সে ইতিহাস অশ্রুতপূর্ব্ব, ধর্ম্মরাজ্যে নারীসাধিকার এমন কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিবৃত্ত শাস্ত্র পুরাণে দেখা যায় না। প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ স্বামী প্রেমানন্দ যথার্থই বলেছেন, "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্য্যের

লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য্য ছিল; তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে! কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত লুপ্ত! একি মহাশক্তি! * * * দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছি না—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন—অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা!!—আমাদের কথা কি বলছো—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটা করতে দেখিনি! তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই করে লোক নিতেন। * * * তোমরা দেখ্‌তে এলে?—রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন। এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার করছেন! * * মা জয়রাম বাটীতে থেকে, অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য—অপরিসীম করুণা—সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমান রাহিত্য। দেখ, চিন্তা কর, বোঝ, মার ছেলে তোমরা—ঠিক ঠিক মার ছেলে হতে হবে—তবে তো। * * * কি কঠোর দায়িত্ব তোমাদের! ভোগের পরিণাম দেখে সমস্ত জগৎ এইবার যোগের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্ছে। কে তাদের পথ দেখাবে?—এইবার তোমাদের সম্মুখে। স্পর্শমণি স্পর্শ করে তোমরা ত সব সোনা হয়ে গেছ। এইবার অন্য সকলকে সোনা কর্ত্তে হবে। মনে রেখো সুখে দৈন্যে, সম্পদে বিপদে, দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে বিগ্রহে—সর্ব্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা!—

মা যথার্থই বিশ্বমানবের 'মা' ছিলেন, সারা বিশ্বের সকল মানব ছিল তাঁর সন্তান, তাঁর কথা এবং আচরণে এভাব স্বতঃই প্রকাশ পেতো। বিশ্বব্যাপী সমরানলে যখন দুনিয়ার সকলের অন্তরে কেবল ত্রাসের সঞ্চার হতেছিল সে সময় মা বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁর ভক্ত সন্তানদের নিকট হতে যুদ্ধের সংবাদ জেনে নিতেন, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একদিন বলেছিলেন, "কেবল তোমরাই কি আমার ছেলে?" দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভক্তগণ পর্যান্ত এই দেবীর নিকট এসে মাতৃ বাৎসল্যে শান্তি লাভ করতো। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক যেমন "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"—আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আত্মস্থ দেখেন, তেমন দেখা গেছে এই ব্রহ্মজ্ঞা সাধিকার সন্তান বাৎসল্য জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানবের উপর। আমি এই প্রবন্ধে এই দেব দেবীর সমদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা কৌতূহলী পাঠকদের উপহার দিব।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিভ্রান্ত জাতির কল্যাণের জন্য এই আদর্শচরিত্রা অলোকসামান্যা নারীকে তাঁর সাধন সহায়রূপে সঙ্গে এনেছিলেন এবং এঁকে ভক্তি অর্ঘ্য অর্পণ করে ভারতে মাতৃ জাতির স্থান যে কত উচ্চ সীমার নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন তা আমাদের ধারণার অতীত। এই ভোগবিলাসের যুগে জাতির কল্যাণের জন্য এমনই একটী আদর্শ এ যুগে অপরিহার্য্য। শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁকে নিজ হাতে একে একে কুলকুণ্ডলিনীর ক্রিয়াগুলি এবং সাধনার প্রত্যেকটী বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। ভবিষ্যতে বিরাট ভক্ত সংঘের জননীরূপে অসংখ্য সংসার তাপ-ক্লিষ্ট জীবের দুঃখ মোচন করতে হবে জেনে শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাঁকে কত রকমে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে গেছেন সে সব অন্যত্র বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এখানে কেবল শ্রীশ্রীমার পুণ্য জীবনের কয়েকটী ঘটনা মাত্র পুনরুল্লেখ করবো।

জয়রামবাটীতে মার বাড়ী সর্ব্বক্ষণ ভক্ত-সমাগমে মুখরিত থাকতো। একজন মুসলমান কুলি প্রায়ই ভক্তদের জিনিষপত্র নিয়ে মার বাড়ীতে যাওয়া আসা করতো। শ্রীশ্রীমার দর্শন ইচ্ছা তার মধ্যে মধ্যে মনে উদয় হলেও কোন সুযোগ কিম্বা ভরসা না পেয়ে সে কথা কাকেও বলতে সাহস

করে নি। একদিন জনৈক ভক্তের দ্বারা তার বাসনা শ্রীশ্রীমার নিকট প্রকাশ করলে মা তখনই তাঁকে দর্শন দিয়ে বল্লেন, "বাবা তুমি আজ এখানে খেয়ে যেও।" মুসলমানটী যথা সময় খেতে বসলে জনৈকা মহিলা অপেক্ষাকৃত অযত্নের সহিত তাকে পরিবেশন করতে লাগলেন, এ দৃশ্য দেখে মা বল্লেন—"তুমি ওকে ঘৃণা করে পরিবেশন করছো, কিন্তু স্থির জেনো, শরৎ যেমন আমার ছেলে—ও ঠিক তেমনি আমার ছেলে।" অতঃপর মা নিজ হাতে তাকে সযত্নে পরিবেশন করতে লাগলেন। জগন্মাতার স্নেহময়ী দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয় সন্তান ও সেবক স্বামী সারদানন্দের মত মহাপুরুষও একটী অপরিচিত কুলি মজুরের সঙ্গে এক হয়ে গেল! এমন সমদর্শন কি সাধারণে সম্ভব? বেদান্তের একত্ব এবং অভেদত্ব কেবল গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়; কিন্তু এমন ভাবে জীবনে পরিণত হতে দেখা যায় না।

একবার একটী যুবক পুলিশ-কবল হতে মুক্তি পেয়েই মনের আবেগে শ্রীশ্রীমার দর্শন মানসে জয়রামবাটীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাকে স্থান দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন, সংবাদটী মার কর্ণগোচর হলে তিনি তখনই বলে পাঠালেন—"ওরে আমার কাছে এসেছে—একটা দিন আমার কাছে থাকবে।" দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ভয়ে যাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—মা তাকে আশ্রয় দিলেন। দেশ কালের ভয়-ভীতি এই পল্লীমহিলার অপার স্নেহের নিকট স্থান পেল না।

শ্রীশ্রীমা যে বেদান্তের সমদর্শন সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন তাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। একবার কোন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁর পার্ষদদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছিল, এ বিষয় শ্রীশ্রীমার নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থিত হলে তিনি বলেছিলেন—"ঠাকুর কি অদ্বৈত ছাড়া?" একজন নিরক্ষরা পল্লীনারীর এমন সহজ সরল সমদর্শনের তুলনা মিলে না।

ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে শ্রীশ্রীমা কখন কখন নিমগ্ন হয়ে থাকলেও বিশ্বমানবের প্রতি ঐকান্তিক সন্তানবাৎসল্যের প্রেরণায় ঐ ভাবকে সর্ব্বক্ষণ করতলগত করে চেপে রাখতেন। চার দিকে যে মার অসংখ্য সন্তান, তাঁর পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সমাধিতে নিমগ্ন থাকার অবসর কোথায়? মা যশোদার যেমন বাল গোপালের প্রতি আকর্ষণ ছিল—মা কৌশল্যার যেমন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্নেহ ছিল—মা সারদামণি দেবীর তেমন বিশ্বের সকল মানবের প্রতি সমদৃষ্টি-পূর্ণ সন্তান বাৎসল্য ছিল। বেদান্তের একত্ব-সমদর্শন মাতৃভাবের মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে শতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

"যদি জগৎ তোমাকে ঘৃণা করে, তাহা হইলে জানিও যে তোমাকে ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে সে 'আমাকেই' ঘৃণা করে।"

সেণ্ট জন, ১৫।

ভাব-কণা

স্বামী বামদেবানন্দ

হরিদ্বার। ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যা আগত প্রায়। তবে বাস্তার আলো তখনও জ্বলিয়া উঠে নাই। সবে মাত্র কয়েকদিন হরিদ্বারে আসিয়াছি। নূতন জায়গায় যেমন হয়—এদিক ওদিক ছুটাছুটী। এটা ওটা দেখা। আজকের সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডের আরতি দর্শন। দেখিলাম আমার মত অনেকেই পূর্ব্ব হইতে আরতির জন্য দাঁড়াইয়া। পাশ দিয়া ক্ষরবেগে কুলুকুলু ধ্বনি করিয়া, পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা পতিতোদ্ধারে চলিয়াছেন। তাঁহারই বাঁধান সিঁড়িতে বসিয়া ভক্তজনগণ সন্ধ্যাহ্নিকের তোড়জোড়ে ব্যস্ত। সিঁড়ির পাশে নাতিদীর্ঘ চাতালে ছোট ছোট বৈঠক বসিয়াছে। কোথাও রামায়ণ—কোথাও মহাভারত—কোথাও বা গীতাপাঠ। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী—হরেক রকম লোক। কেহ বা মনোযোগ সহকারে পাঠ শ্রবণে ব্যস্ত, কেহ বা চাতালের এ মাথা ওমাথা ঘুরিয়া আনন্দিত। আবার কেহ কেহ বা গঙ্গায় ভাসমান শত শত মৎস্যকে আহার দানে অতি মাত্রায় অস্থির।

পাশেই ফুলের দোকানীর আসর বেশ জমিয়াছে। ফুলের ডালি—রকমারি ফুল তাহাতে। প্রত্যেকটাতে আবার একটা করিয়া বাতি দিবার ব্যবস্থা। সস্তাও খুব। পয়সায় দুটী একটী। খুব ভিড়—সকলেই আনন্দের সহিত কিনিতেছে, বাতিটী জ্বালাইয়া ফুলের ডালি ভক্তিভরে নম্রশিরে মা গঙ্গার বক্ষে ভাসাইয়া যুক্তকরে সব দণ্ডায়মান। কত ভক্তি, কত বিশ্বাস, কত প্রার্থনা, কত কাকুতি মিনতি ইহার পশ্চাতে! রাশি রাশি ফুলের ডালি ক্ষরস্রোতা মা গঙ্গার বক্ষে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। দূর-বহুদূর হইতেও মিটমিট আলোর রেখা বাস্তবিক বড়ই মনোরম।

এতক্ষণ শুধু দ্রষ্টা হিসাবে সব দৃশ্য দেখিয়াই যাইতেছি। কিন্তু গঙ্গার বক্ষে ফুলের ডালি ভাসাইবার লোভ আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দুই চারিটী লইয়া যাত্রীদের মতই ভাসাইয়া দিলাম। তফাৎ শুধু রহিল তাহাদের সরল বিশ্বাস এবং আমার অল্প বিশ্বাসের মধ্যে।

এবার সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। চারিদিকের আলোর প্রতিচ্ছায়া গঙ্গাবক্ষে বড়ই মনোরম। কার্ত্তিক মাস।—বেশ একটু শীতের আমেজও দিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। অসংখ্য উজ্জ্বল তারকারাশির আলোকে অন্ধকার আকাশখানিও আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে হিমালয়ের ২।১টী খণ্ডগিরি ধীরে ধীরে আঁধারকোলে মিশিয়া গিয়াছে। দৃশ্য বাস্তবিকই সুন্দর!

ব্রহ্মকুণ্ডের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ বন্ধ। দলে দলে লোক চারিপাশে দাঁড়াইয়া। এই দৃশ্যটী সত্যই বড় করুণ! ভাবের আবেগে কতই না ভক্তিভরে নিজ নিজ মনের বাসনা আজ বিশ্ব নিয়ন্তার কাছে জানাইতেছে। আরতির সুমধুর দৃশ্য সমবেত যাত্রীর হৃদয় যেন মোহিত করিয়া দিয়াছে। শঙ্খ ঘণ্টার গম্ভীর ধ্বনি, গুণগুণ হরিনাম, গঙ্গার কুলুকুলু শব্দ, ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় রব—সব যেন একসঙ্গে মিলিত হইয়া অনন্ত আকাশে এক অপূর্ব্ব লহরীর সৃষ্টি করিয়াছে। বড় স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর ভাব।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিহ্বল হইয়া এই সুমধুর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। চলচ্চিত্রের মত আজ একে একে চিন্তার ধারা মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক তীর্থ দর্শন হইয়াছে। সব স্থানে সেই একই দৃশ্য। দলে দলে লোক, তাহাদের সবল বিশ্বাসটুকু আঁচলে বাঁধিয়া তীর্থস্থানে চলিয়াছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শুধু চলিয়াছে,—পুণ্য করিতে—সংসারের জ্বালা জুড়াইতে। রাস্তার কত কষ্ট, কত দুর্গতি—ভ্রূক্ষেপ নাই। শুধু হৃদয়ে বিশ্বাস—পুণ্য হইবে। মনে পড়িল—এই হরিদ্বারে, মাত্র একদিন পূর্ব্বেই নিকটস্থ মনসার পাহাড়ে গিয়াছিলাম। সেখানকার দেবী নাকি মানস পূর্ণ করেন! তাই মন্দিরের নিকটস্থ বৃক্ষগুলিতে শত শত গাঁট—অর্থাৎ এক একটী গাঁটে একটী করিয়া মানস।—কাহারও মনের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইবে কিনা—কখনও হইয়াছে কি না জানি না—শুনিও নাই। কিন্তু সবল বিশ্বাস—সরল যাত্রীদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। পাণ্ডা বাবাজীরা এই সহজ সরল বিশ্বাসের সুবিধাটুকু লইয়া খুব জমকালো বক্তৃতায় ক্ষুদ্র মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া উঠাইয়াছেন এবং বেশ দু পয়সা উপায়ের জন্য একটু অতি-মাত্রায় ব্যস্ত।

কয়েক মাইল দূরে চণ্ডীর পাহাড়। সেখানে নির্জ্জন স্থানে মা চণ্ডীদেবী বিরাজিতা। যাওয়ার রাস্তা ভাল নয়। সেখানেও দেখিলাম একই দৃশ্য। বৃদ্ধা অতি কষ্টে চলিয়াছেন—পুণ্য সঞ্চয় করিতে।

দুপুর বেলা এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে আসিয়া দেখিয়াছি—বাধান সিঁড়িগুলি হাড়ের টুকরাতে ভর্ত্তি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সিন্ধী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি যাত্রীরা মৃত ব্যক্তিদের অস্থিখণ্ড হাড়গুলি বস্তা ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসেন—ব্রহ্মকুণ্ডে ফেলিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে। সরল বিশ্বাসের—এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও কত।

কিন্তু আজ ভাবি—ভগবন! তোমার বিরচিত বিরাট বিশ্ব প্রহেলিকার কেউ তো আজ পর্য্যন্ত ইতি করিতে পারে নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, নদী বনরাজি কত কাল ধরিয়া আছে—কতকাল থাকিবে কে জানে? বিবেক বুদ্ধিহীন ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী আসে যায়—দুনিয়ার কি বুঝে তাহারা? বিবেক-বুদ্ধিপূর্ণ মানুষ—সেও আসে যায়—দুনিয়ায় ইতি করিতে পারে না। কাহার শাসন—কাহার অঙ্গুলি সঞ্চালনে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে—কে দিবে জবাব তাহার? দার্শনিক? তাঁহাদের হয়ত জবাবের অভাব হইবে না। তবুও প্রশ্ন—কোথা হইতে? কি ভাবে? অনন্ত কাল ধরিয়া এই প্রশ্ন চলিয়াছে—অনন্ত কাল ধরিয়া ইহার জবাব দিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। তবুও প্রাণ কিন্তু শীতল হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র মন থাকিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বসে—কোথা হইতে এই সব?

তাই বুঝি অল্প বুদ্ধি মানুষ প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়াই ছুটিয়া যায় মন্দিরে—ছুটিয়া যায় পাহাড় পর্ব্বতে—ছুটিয়া যায় নদনদীতে? কোথায় যে সংসারের জ্বালা জুড়াইবে—কে জানে? সরল বিশ্বাসই শুধু তাহাদের কর্ণধার। কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কে বলিবে?

হাঁ ভগবন! আমার মত অল্পবিশ্বাসী লোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ইহাদের? ইহাদের হইবে তো?

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী ধর্ম্মেশানন্দ

শ্রীবামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনে আমবা অনেক সময়ে নিজেদেব অদূরদর্শিতা বশতঃ যে অসামঞ্জস্য ও মতের অনৈক্য দেখিতে পাই তাহা তাঁহাদেব চরিত্রে উত্তমরূপে বিশ্লেষণ কবিলে আব দেখা যায় না। "শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ কবিলে অনেকেব মনে হইতে পাবে যে শ্রীশ্রীঠাকুব কলিতে কেবল নাবদীয়া ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনপথ বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। আবাব স্বামী বিবেকানন্দেব বাণীতে আমবা কর্ম্মযোগেব উপব শ্রদ্ধা উপদিষ্ট দেখিতে পাই। "শ্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত" প্রণেতা পূজনীয় শ্রীম—মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুবেব নিকট সাধারণতঃ ববিবাব বা বিশেষ ছুটিব দিনে যাইতেন, এবং তাঁহাব অন্যান্য ত্যাগী ভক্তেব ন্যায় তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিবাব সুযোগ পান নাই। ববিবাবে ঠাকুবেব নিকট অধিকাংশই গৃহীভক্ত যাইতেন এবং তাঁহাদেব সমক্ষে তিনি কতকটা সংসাব ও ঈশ্বরকে বজায় বাখিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সহজে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মমার্গ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়াই যে কেবল নাবদীয়া ভক্তিব উপব জোর দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মযোগ অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম বড় কঠিন। জীবেব অন্নগতপ্রাণ, সকল সময সদ্‌গুরু পাওয়া এবং তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে থাকা অনেকেব পক্ষেই সম্ভব নয়, যোগাভ্যাসও সাধাবণ মানুষেব প্রকৃতিব অনুকূল নহে, সংসাবাশ্রমীকে নানাকর্ম্মে জড়িত থাকিতে হয়, কাজেই বিচাব-বৈবাগ্য-মূলক জ্ঞান-যোগের পথ গ্রহণও তাহার পক্ষে অসম্ভব। সংসারাশ্রমীর প্রধান কবণীয় সেবা—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। স্বামিজী তাঁহার উদাহবণ দিতেন, সেই যে শুক্তুযব-কণাস্পর্শে অর্দ্ধ-সুবর্ণাঙ্গ নকুল, অতিথি সংকাবে উৎসৃষ্ট-জীবন ব্রাহ্মণ-দম্পতির প্রেম-যজ্ঞের সহিত বাজাধিবাজ যুধিষ্ঠিবেব বিরাট বাজসূয় যজ্ঞেব কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্য না দেখিয়া সে ক্ষোভে বলিযাছিল—'এ যজ্ঞ যজ্ঞই নয়, এখানে ত্যাগেব সে পরাকাষ্ঠা নাই—সে মহিমা নাই', তাই তাহাব অপব অর্দ্ধাঙ্গ যজ্ঞেব ধূলিস্পর্শে স্বর্ণাভ হইল না।

ঠাকুব তাঁহার কোন কোন সংসাবী ভক্তগণকে বলিতেন, 'পূজা, জপ, ধ্যান-ধাবণা, তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ আব শ্রীহবিব নাম সঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম।' নির্জ্জনে গোপনে, ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিলে তাঁহাব সাকাব দর্শন মিলে—মানবজন্মেব একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বব দর্শন সম্ভব হয়। পবোপকাবাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তকেব পক্ষে চিত্তশুদ্ধিব হেতু বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভগবানে প্রেম ও ভক্তি। ঈশ্বব সম্মুখে আসিলে কি তাঁহার নিকট হাসপাতাল ডিস্পেন্সাবী চাহিবে? বাজি মিথ্যা, বাজিকবই সত্য, আম খেতে এসেছ আম খাও; বাগানের গাছে কত পাতা আছে তাহায় সংখ্যা নির্ণয়ে কি প্রয়োজন!

স্বামিজী বলিতেছেন—'মুক্তি ফুক্তি রেখে দে, আগামী পঞ্চাশংবর্ষ ভাবতমাতাই তোদেব উপাস্য হউন; অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত, একমাত্র এই দেবতাই জাগ্রত আছেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবায় মনঃপ্রাণ অর্পণ কব। আমি হাজাব নরকে যাব তবু যদি একজনেরও মুক্তির সহায়তা করতে পারি। ঘণ্টা ফণ্টা বেখেদে, বিগ্রহ ছেড়ে জাগ্রত দেবতার আগে পূজা কর; তাতেই মুক্তি। নিজেকে

বিলিয়ে দে, নিঃস্বার্থপর হ।' সাধারণের জন্য কীর্ত্তনাদির তিনি উপদেশ করেন নাই; বরং বলিয়াছেন 'যদি সত্য সত্য ভাবই হয়, তথাপি ভাব উপশমের পরে তাহার অতি মন্দ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া আবার ততোধিক শীঘ্র নিম্নাভিমুখিনী হন; কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনানুসারে যোগাভ্যাস করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে জাগ্রতা করিলে তাঁহার ঊর্দ্ধগমন স্থায়ী হয়।' আবার আমেরিকায় তিনি তাঁহার কতিপয় নির্ব্বাচিত শিষ্যকে ঐ যোগাভ্যাসও শিখাইলেন। কথামৃতে আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কাহাকেও কাহাকেও কিন্তু বলিতেছেন "যোগমার্গ বড় কঠিন, কলিতে নারদীয়া ভক্তি, তাঁর লীলা কীর্ত্তন, মনন, তজ্জন্য উৎসবাদির অনুষ্ঠান আর ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা।" এ দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা তাঁহাদের জীবনী ও বাণী অবলম্বনে এ বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা করিয়া যাই, সমাধান প্রত্যেকের ভাব ও বুদ্ধি অনুযায়ী করিবেন।

সনাতন ধর্ম্ম চতুরাশ্রম স্বীকার করে। শাস্ত্র ও প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ তাহারই অনুবর্ত্তন করে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ও বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগনেতৃবৃন্দ সে নিয়মের কিছু ব্যত্যয় করিয়া যাইতেছেন দেখিতে পাই। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম সাধকের জীবনে ক্রমপরিণতিতে অনুবর্ত্তিত হয়, ইহা যুক্তিসহ। প্রাচীনকালে গার্হস্থ্য জীবন সমাপনান্তর ভগবল্লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ কঠোর বানপ্রস্থ জীবন যাপনের নিমিত্ত নির্জ্জন বনপ্রদেশে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে যাইতেন। তৎপর মনের সংসার-মালিন্য স্বভাবতঃ দূরীভূত হইত, তখন সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস-পূর্ব্বক ভিক্ষুর জীবন যাপন করিতেন এবং জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উপদেশ ও বক্তৃতার মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া যদি তাঁহাদের জীবনযাপন-ধারা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের জীবন একেবারে স্থূলতঃ অবিকল সৌসাদৃশ্য না হইলেও ভাবগত সমতাপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে শাস্ত্রশ্রবণ, সাধুসঙ্গ, দেবপূজা ভালবাসিতেন, স্বামিজীও শাস্ত্রপাঠ, ঈশ্বরদর্শী সাধুর অন্বেষণ, শিবপূজা ও ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করিতেন। উভয়েই সত্যানুসন্ধিৎসু। উভয়েরই সুদৃঢ় দেহমন কঠোর তপস্যায় দক্ষ। উভয়েরই জীবন ভক্তিমধুর, ব্যবহার রসপূর্ণ এবং উভয়ে সংসারকে ঈশ্বর-লীলা জ্ঞান করিতেন। তাই—উভয়ে রসমর্ম্ম ও উভয়ের জীবন শান্তিদায়ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর অবশ্য বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণীকে মাতৃবুদ্ধি করিলেন। স্বামিজী বাল্যেই শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হইলেও তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়া তাঁহার পট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী শিবের আদর্শ পছন্দ করিলেন। ঠাকুর সন্ন্যাস লইয়াও গেরুয়া পরিধান করিয়া থাকিতেন না, স্বামিজী গেরুয়া পরিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আহারাদি বিষয়ে আজীবন নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, স্বামিজী কিন্তু সে বিষয়ে খুব উদার। এই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহাদের জীবনে ব্যবহারাদির পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের ভাবগত বা চরিত্রগত কোন পার্থক্য ছিল না। অপরপক্ষে স্বামিজীকে সুদূরদেশে সাধারণ জনসমষ্টির মধ্যে আপনাকে রাখিয়া প্রচার করিতে হইয়াছিল। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কঠোর সাধনার তুলনায় পরিব্রাজক, তপস্বী, ধ্যাননিষ্ঠ স্বামিজীর জীবন সাধনা অল্প। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বলিতে গেলে "এখানকার —(শ্রীরামকৃষ্ণের) তখন তখন যে তোড় এসেছিল তার তুলনায় নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা অল্প।" একথা তিনি বলিয়াছিলেন যখন কাশীপুর আশ্রমে স্বামিজী ঈশ্বরদর্শনের জন্য উন্মত্তের মত সারারাত ধুনি

জানিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। উভয়ের সাধনজীবনের তুলনা করিলে প্রথমটীকে বৃক্ষ ও দ্বিতীয়টীকে তাহার পুষ্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রচার জীবনে—কর্ম্মজীবনে আমরা দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর একস্থানে বসিয়া মা মা করিয়া বালকের ন্যায় আত্মহারা, আর স্বামিজী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া উহার দুঃখ মোচনে ব্যথিত হইয়া নিজ সাধনারত্ন জগতে ছড়াইবার জন্য উদগ্রীব। এক্ষেত্রেও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে দক্ষিণেশ্বরে মথুর বাবুর বাড়ীর ছাদে উঠিয়া ভক্তদের জন্য ক্রন্দন, সমাগতদের জন্য চিন্তা, মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া কলিকাতায় ভক্তদের বাড়ী আগমন প্রভৃতিতে বিবেকানন্দের প্রচার জীবনের সহিত বেশ ভাবগত সাদৃশ্য আছে। তবে বৈসাদৃশ্য কোথায়? উভয়েই ভক্ত ও জ্ঞানী। তাঁহাদের ভাবে বলিতে গেলে ঠাকুরের অন্তরটী ছিল অদ্বৈতানুভূতিময়, বাহিরে মা তাঁকে ভাবমুখে থাকিতে বলিয়াছিলেন তাই তিনি ভক্তিমার্গে প্রেম-করুণা-রঞ্জিত, আর স্বামিজী 'ঠাকুর' বলিতে পাগল, অন্তরটী ভক্তিতে গদ্‌গদ্ কিন্তু উহা সকলের অলক্ষিতে ছিল। সে প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বাহিরে নির্ব্বেদময় বৈরাগ্যোজ্জ্বল জ্ঞান-অসি ব্যবহার করিয়াছিলেন? ঠাকুর কালী সাধনায় সিদ্ধ। স্বামিজীও বেলুড় মঠে দশভুজা, কালী, লক্ষ্মীপূজা করাইয়াছিলেন। তবে তিনি বঙ্গদেশে বাহিরঙ্গপূজার কপট আড়ম্বর ও শুঁচিবাইগ্রস্ত আচার প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। ছুঁৎমার্গী পূজকের পূজাকে ভোগাসক্ত গৃহীর রাঁধুনী ও রান্নাঘরের সহিত তুলনা করিতেন ও বলিতেন;—'ধর্ম্ম তোদের ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে।" স্বামিজীর দুই একটী ঘটনা দ্বারা তাঁহার উদার মত অথচ নিষ্ঠা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহারাজ বলেন, কচিৎ হইলেও তাঁহাকে যখনই পূজাগৃহে দেখা যাইত, তখন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শাস্ত্রোক্ত উচ্চ ভাব লক্ষণ সমূহ দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর একবার নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে. অবস্থিত তখনকার মঠে শিবরাত্রির দিনে দ্বিপ্রহরের আহার কালে যখন শুনিলেন যে সেইদিন সাধুরা কেহ শিবরাত্রির উপবাস করেন নাই, তখন তাঁহার শিষ্য শ্রীমৎ. স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিলেন "তুই কিছু খেয়েছিস?" তিনি বলিলেন, "না"। স্বামিজী বলিলেন, "উপোস্ টুপোস্ করেছিস্ কখন?" ছেলে বেলায় তাঁহার উহা অভ্যাস ছিল জানিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুইই আজ শিবরাত্রির উপোস্ কর। দুটো পূজো করিস্, প্রসাদী ফলটল কিছু খেয়ে নিস্।" শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ স্বামিজীর কথামত ঠিক্ তাহাই করিলেন। সেবার উপবাস তিনি একাই করিয়াছিলেন, আর কেহই করেন নাই। ইহাতে তাঁহার প্রতি স্বামিজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে সেবার শিবরাত্রি ব্রত মঠে পালিত হইল। তদবধি আর কখনও বাদ যায় নাই। এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে স্বামিজীর পূজাদিতে কতটা নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন শিষ্য দ্বিপ্রহরে যখন ভোজনে বসিতেছেন তখন তিনি তাঁহাকে হঠাৎ আহার হইতে ফিরাইয়া উপবাস করিতে বলিলেন।

প্রচলিত ভক্তিযোগের সাধনে ভক্ত একটী প্রতীক বা প্রতিমা অবলম্বনে ইষ্টদেবের উপাসনা করেন। ভক্তিমান্ কর্ম্মযোগী মাটির প্রতিমা পূজা না করিয়া মানুষকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করিতে চাহেন। এখন দুইটীর কোন্‌টী আমরা করিব? কোন্‌টা যুগধর্ম্ম এই প্রশ্ন উঠে। স্বামিজীর জীবনে একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইহার মীমাংসা কিরূপ হয় দেখা যাউক।

একবার স্বামিজীর একশিষ্য কাশীতে কোন

এক ভক্তের নিকট বলেন—"স্বামিজী আমাদের বলেছেন—'ও পূজোঅর্চ্চায় এখন হবেনা, এখন মানুষের সেবা'—স্বামিজীর ইহাই মত।" কিছুদিন পরে স্বামিজীর শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ কাশীতে গেলে সেই ভক্তটী তাঁহাকে বলিলেন—"কিগো স্বামিজীর কি মত?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "স্বামিজীর মত 'কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি' এই চারিটীই।"

তাহাতে ভক্তটী বলিয়াছিলেন যে তাঁহার একজন গুরুভাই বলিয়া গেলেন, 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম নয়, কর্ম্মযোগ'—এই স্বামিজীর মত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—স্বামিজীর মত ত এত সঙ্কীর্ণ নয়, তিনি কত উদার। এরূপ ভাবিয়া তিনি মঠে ফিরিয়া সুযোগ বুঝিয়া একদিন ঐ ঘটনাটী স্বামিজীকে বলিলেন। স্বামিজী তাহাতে গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "এখন কর্ম্মের উপর অধিক জোর দিতে হবে বৈ কি?" শিষ্য ভাবিয়াছিলেন তাঁহার গুরু ভাইয়ের সঙ্কীর্ণ মতটী কাটিয়া উদার মত স্থাপন করিবেন। কিন্তু স্বামিজী এখানে "কর্ম্মযোগই" যুগধর্ম্ম বলিলেন। তবে তাঁহার কর্ম্মযোগ 'নরে নারায়ণ' বুদ্ধিতে সেবা। ইহা সাধারণ বিশ্বাসহীন তথাকথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ নহে। আমরা সহানুভূতি পূর্ব্বক দান বা কর্ম্মের নিন্দা করিতেছি না। উহাতে মান, যশঃ, আসক্তি, মমত্ব প্রভৃতি থাকে ইহাই বলিতেছি। কোন কোন উচ্চ মানবের স্বভাবগত চিত্তপ্রসাদ হইতে আর্ত্তের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত সেবা দেখা যায় কিন্তু তাহাও দুর্ল্লভ। প্রেমে সেবা দুর্ল্লভ। আমরা যেন জীবে দয়া দেখাইয়া অহঙ্কারের প্রশ্রয় না দেই। অনিত্য জীবনে অহঙ্কারের মোহ যেন নিত্য বস্তু-লাভের পথ রুদ্ধ না করে। আমরা দয়া করিবার কে? যে জীব নিজের জন্মের পূর্ব্বের সংবাদ রাখে না, মৃত্যুর পরে কি হইবে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যে নিজের ক্ষণিক জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ উপশম করিতে অক্ষম, সে অপরকে দয়া করিবে কি? ঠাকুর কি স্বামিজীকে কর্ম্মযোগেরই উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন? রাজযোগের কি পক্ষপাতী ছিলেন না?

অল্পমতি আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের একদেশ লক্ষ্য করিয়া একটী মাত্র ভাবের কথামৃত শ্রবণ করিয়া অন্য ভাবের সহিত সামঞ্জস্য না করিয়া, ভক্তিই একমাত্র এ কালের পথ অথবা সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞানযোগ ছাড়া উপায় নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসি এবং ধারণা করি, ও রাজযোগ ষট্চক্র-ভেদ এ যুগের জন্য নয়, রামকৃষ্ণ শিষ্য-ভক্তগণের রাজযোগের অভ্যাস প্রয়োজন নাই—কেবল কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। আবার স্বামিজীর গ্রন্থাংশ মাত্র অধ্যেতা যুবক বলিবে—"কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিযোগে কি আছে? ওটা কুড়েমিযোগ ও মস্তিষ্কহীনের জন্য।" শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামিজীর ইহা শিক্ষা নয়।

পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ বলেন, 'একদিন স্বামিজী বলিলেন—"ঠাকুর আমাদের আর কি শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি একদিন এই শরীরে (নিজ শরীর দেখাইয়া) আলপিন ফুটিয়ে দিয়ে মূলাধার হতে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র স্থানে লক্ষ্য করিয়া এক একবার বলতে লাগলেন, এখানে এখানে মন স্থির কর। আর আমাদের ও সেই জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম ফুটে জ্যোতিঃ দর্শন হোতো, আনন্দে সব পরিপূর্ণ বোধ হোতো—শান্তি এসে সব অভাব চলে যেতো—আশা, তপস্যা ও সাধনার শেষ গতি লাভ হতো। আমাদের ঠাকুর কেবল মুখের উপদেশ দিতেন না, অনুভব করিয়ে দিতেন। আর অন্য সাধারণ উপাসনা অবলম্বন করবার দরকার হোতো না। ঠাকুর তো আমাদের রাজযোগই দিয়ে গেছেন।"

স্বামিজীর রাজযোগ-পুস্তক যখন আমরা পড়ি

করি তখন দেখি স্বামিজী কত আত্মস্থ, যেন স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। তখন মনে হয় স্বামিজী রাজযোগী। ভক্তি বা জ্ঞান তাঁহার বাহিরের জিনিষ। এইরূপ সর্ব্বত্র। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আলোকের মধ্যে যিনি এসেছেন তিনি স্বীয় সাধ্যানুযায়ী জ্ঞানের ক্ষীণরশ্মির অনুগমন করিয়া যখন মধ্যস্থানে পৌছিবেন তখন তিনি সমন্বয়ের আনন্দ পাবেন এবং জানিবেন যে, সমস্ত পথই সাধন স্থানে পৌছিয়ে দেয়। "যত মত তত পথ"। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভক্তসঙ্ঘ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধারণা যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ তিনিই বিবেকানন্দ।

মাধুকরী

বাংলার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু—

১৯৩১ সনের আদমসুমারীর বিবরণে বাঙ্গালার অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিত আছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দুর বৃদ্ধি বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা কম। আমরা দেখিতে পাই হিন্দুর মধ্যে ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা, যাহারা সন্তানবতী হইতে পারিত তাহাদের সংখ্যা ১০৬,১২৭ জন। অর্থাৎ বাঙ্গালার ১০৫৭১২৭৮৪ জন হিন্দু নারীর মধ্যে প্রায় ৮ ভাগের ১ ভাগ সন্তান-ধারণক্ষম হিন্দু নারী বিধবা। মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাই যে, ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা বিধবাদের সংখ্যা ৮০২৮০৫ জন। অর্থাৎ বাঙ্গালার ১৩৮৪৩৩৪৩ মুসলমান নারীর মধ্যে ১৫ ভাগের ১ ভাগ সন্তান-ধারণক্ষম মুসলমান নারী বিধবা। এইখানেই বাঙ্গালার হিন্দুর সংখ্যা কম হইবার একটা কারণ পাই।

বঙ্গদেশের বৃটিশ প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৫০১১৪০৭২ জন, এবং স্বাধীন রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯৭৩৩৩৬ জন, মোট ৫১০৮৭৩৩৮ জন। স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে ১৯২১ সন হইতে লোক-সংখ্যা হ্রাসের শতকরা হার ˙২৭। এই হ্রাস কেবল হিন্দুর মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুর হ্রাস হইয়াছে শতকরা ৪৭৩ জন।

ত্রিপুরারাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে ৯৩ জন লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে সংখ্যা-বৃদ্ধির হার শতকরা ২৫˙৬। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেও লোকবৃদ্ধির হার শতকরা ২২˙৯।

১৯৩১ সনে বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ৫ কোটী ১০ লক্ষ ছিল। সেনসাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিতেছেন, বাঙ্গালার হিন্দুর সংখ্যা স্থায়ী হইয়া পড়িতেছে। যে অবস্থায় সংখ্যাবৃদ্ধির গতি থামিয়া থাকে বাঙ্গালার হিন্দু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা স্থায়ী হইবার অবস্থায় আসে নাই। এমন সময় আসিবে যখন মুসলমানের সংখ্যা ৪২ গুণ হইবে অর্থাৎ হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সিকি হইবে। বৃদ্ধির দিক হইতে হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের বহু পিছনে পড়িয়াছে। হিন্দু সমাজ বৃদ্ধির শেষ সীমায় পৌছিয়াছে, কিন্তু মুসলমান সমাজ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আদমসুমারির লেখক বলিতেছেন যে মুসলমানগণ পূর্ব্ববঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে এবং হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গের অস্বাস্থ্যকর ও কম উন্নতিশীল স্থানে বাস করে,

তজ্জন্যও ইহা হইতে পাবে। মিঃ বেণ্টলী বলিয়াছেন, উর্ব্বর স্থানে বাস ও পূর্ণ খাদ্য পাইলে মৃত্যুর হাব কম হয় ও স্বাস্থ্য উত্তম থাকে। পূর্ব্ববঙ্গেব অবস্থা সেইরূপ। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বাঢ় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গেব উর্ব্বব স্থানে যাইযা বাস কবিতে আবম্ভ কবে। যে কাবণে প্রাচীন হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া গিযা নিজেদেব উন্নতি কবিতে পাবিয়াছিল, মুসলমানও ঠিক সেই কাবণেই পূর্ব্ববঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯২১ সনে বাঙ্গালা দেশে মুসলমানদেব সংখ্যা শতকবা ৫২ জন বৃদ্ধি পাইযাছিল এবং হিন্দু শতকবা ০·৭ জন কমিযাছিল। ১৯৩১ সনে হিন্দু ও মুসলমানেব বৃদ্ধিব হাব প্রায় এক বকম ছিল। মুসলমানেব বৃদ্ধিব হাব ছিল শতকবা ১০। হিন্দুব বৃদ্ধির হাব শতকবা ৬৭ ছিল। অর্থাৎ মুসলমানেব দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সনে বাঙ্গালাব হিন্দু ও মুসলমানেব সংখ্যা নিম্নরূপ—

মোট লোক-সংখ্যা	·	৫১০৮৭৩৩৮ জন
মুসলমান	···	২৭৯১০১০০ জন
হিন্দু	··	২২২১২০৬৯ জন

গত ২০ বৎসবে বঙ্গদেশে হিন্দু মুসলমানেব ও খৃষ্টানেব সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—

সন	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান
১৮৮১	১৮২৯৩৪২৬	১৮০৭১২৯৬	৭২২৮৯
১৮৯১	২০১৭৪৮৩২	১৮৯৭৮৩০০	৮২৩৭৯
১৯০১	২১৯৫৪৯৫৫	২০১৫৫৬৭৪	১০৬৫৯৬
১৯১১	২৪২৩৭২২৮	২০৯৪৮৩৫৭	১২৯৭৪৬
১৯২১	২৫৪৮৬১২৪	২০৮১২৫২৯	১৪০০৬৯
১৯৩১	২৭৮১০১০০	২২২১২০৬৯	১৮৩০৬৭

উক্ত তালিকায় দেখা যাইবে যে, ১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ সনে হিন্দুব সংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছিল ১৯৩১ সনে হঠাৎ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা সম্ভব নহে। হিন্দুদেব যে শুদ্ধি আন্দোলন হইয়াছে তাহাবই দ্বারা অহিন্দু অবনত জাতি, পার্ব্বত্য জাতি ও আদিম জাতির লোককে হিন্দুরূপে বর্ণনা করিবার ফলে হঠাৎ হিন্দুব বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে; ইহা প্রকৃত বৃদ্ধি নহে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন তালিকা উদ্ধৃত কবা গেল। বঙ্গদেশে পার্ব্বত্য ও আদিম জাতিব সংখ্যা ১৯১১ সনে ৭৩০৭৮০, ১৯২১ সনে ৯৪৯০৪৫ এবং ১৯৩১ সনে ৫২৯৪১৯ ছিল। হঠাৎ ১৯৩১ সনে পার্ব্বত্য ও আদিম জাতির সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ কমিয়া গেল কেন? ইহাদেব মধ্যে মড়ক হইযাছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, উঁহাবা আন্দোলনেব ফলে হিন্দুরূপে নাম লিখাইয়াছে।

উক্ত তালিকা হইতে শতকবা বৃদ্ধিব হার বিচার কবিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমানদেব নিকট হাবিয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালী হিন্দুব মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা ১৯৩১ সনে নিম্নরূপ। এই তালিকাকে তিনভাগে বিভক্ত কবা গেল। ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহাদেব বিবাহেব সম্ভাবনা আছে এবং ৩৫ হইতে ৫৫ বৎসব বয়স পর্য্যন্ত। তৃতীয়তঃ যাহাদের বিবাহ হইবে না।

বযস	২৫—৩৫	৩৫—৫৫	৫৫—৭০	মোট ও তদূর্দ্ধ
সংখ্যা	৭৭৩১৪	২৫০৯৬২	১৭৪০৫৬	৫০৩৪৩২

১৯৩১ সনে অর্দ্ধলক্ষ পুরুষ হিন্দু অবিবাহিত ছিল। ঐ সময অবিবাহিত ও সন্তানধারণক্ষম হিন্দু নাবীব সংখ্যা ৬২০৬২২। অর্থাৎ ১৯৩১ সনে প্রায় ৬॥ লক্ষ অবিবাহিত হিন্দু নাবী ছিল। ঐ সনে সন্তানধাবণক্ষম হিন্দু বিধবাব সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

বয়স	১০—৩০	৩০—৩৫	মোট
সংখ্যা	৪৭৫১৯৪	৮১১৬০৬	১২৮৬৮০০

(ক) অবিবাহিত হিন্দু নাবীর সংখ্যার মধ্যে দেখা যায় যে, ৪৫ হইতে ৭০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে অবিবাহিত নাবীর সংখ্যা ৪০৮৯ জন।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে অনেকটা নিজ সামাজিক নিয়মের ফলে।—জনশক্তি।

মনু সংহিতার বহ্ন্যুৎসব—

বোম্বাইএ অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রায় আটশত যুবক নাসিক বোর্ডে একটি সভার পরে মনুসংহিতা ও অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু যাত্রা, হিন্দু তীর্থস্থান সমূহ, হিন্দু-পুরোহিত ও হিন্দু উৎসবাদি বর্জ্জন করিবার জন্য তাহারা হরিজনদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছে। উত্তেজনার মুখে প্রত্যেক ব্যাপারেই অতিশয়তা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধ উত্তেজনা কোন কালে কোন সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে নাই, হরিজনদেরও পারিবেনা। স্মৃতি ও সংহিতার বহ্ন্যুৎসব করিয়া তাঁহারা যদি মনে করিয়া থাকেন বর্ণ হিন্দুদিগকে খুব শিক্ষা দিলাম, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। হিন্দুদের যাত্রা, তীর্থস্থান, উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি বর্জ্জন করিলেই যদি তাঁহাদের উন্নতি হয়, তবে তাঁহারা তাহাই করুন। কিন্তু আত্মোন্নতির চেষ্টায় ক্রোধান্ধ হইয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবার সঙ্কল্প কখনো শুভবুদ্ধি নহে। হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের সংহিতা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যুগধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে মানুষের আচার আচরণেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং হরিজনগণ ইচ্ছা করিলেই হিন্দুধর্ম্মের নূতন সংহিতা রচনা করিয়া তাহা পালন করিতে পারেন। যাহারা তাহাদের মতাবলম্বী, তাঁহারা সেই সংহিতারই অনুশাসন মানিয়া লইবেন। হিন্দু ধর্ম্ম কাহারো একার নহে, প্রয়োজন হইলে নূতন করিয়া শাস্ত্র রচিত হইবে। ইহাতে ধৈর্য্যহারা হইয়া আকস্মিক উত্তেজনায় বহ্ন্যুৎসব করিবার কি আছে?—নবশক্তি, ১৫ নবেম্বর, ৩৫।

"যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তাহাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা তোমার সঙ্গে ঘৃণা-ব্যঞ্জক ব্যবহার করে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।"

সেন্ট লিউক, ৬।

সত্যের পথ বা আমির সন্ধান, শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য বি-এ; খানিপুর দেবসঙ্ঘ, পোঃ পলাশ, ঢাকা। পৃঃ ৭৪; মূল্য ছয় আনা।

ইহাতে গ্রন্থকারের নিজ জীবনের ধর্ম্মোপলব্ধি এবং ধর্ম্মসাধন বিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বয়সে নবীন, এইজন্য তাঁহার কথাতে 'হয়ত সমালোচকের দৃষ্টিতে দোষ দর্শন ঘটিবে' প্রকাশক এই ভয় করিয়াছেন। ধর্ম্মব্যাখ্যাতার যথার্থ ভয় বয়সে নহে,—ভয় সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে, অনুভূতিতে। সাক্ষাৎ অনুভূতি ছাড়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গেলে, কখন কখন—'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এরূপ হইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আচার্য্য শঙ্কর অতি নবীন বয়সেই তাঁহার ভাষ্যাদি শেষ করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারত জয় করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চিকাগো মহাসভার শীর্ষদেশে যখন তরুণরবি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখি তখন সারা জগৎ আশ্চর্য্য বোধ করিলেও আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য হই না।

'অচিরেই কুয়াসার ন্যায় জ্যোতিঃ, লাল, নীল, প্রভৃতি বর্ণে প্রকাশিত হইয়া পরে অতি শুভ্র একটি বিরাট পর্ব্বতবৎ দৃষ্ট হইবে। ভ্রমর গুঞ্জন, বাঁশী, বীণা, কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গের শব্দ শুনা যাইবে, তাহার পর অশ্রুপুলককম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সব প্রকাশিত হইবে।' যে সাধনার দ্বারা সাধক ক্রমে পবিত্রতা, সংযম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য, ভগবৎ প্রেম, জ্ঞান, প্রভৃতি লাভ করেন, তাহাই প্রকৃত সাধন। যে সব দর্শনাদির দ্বারা এই সব লাভ হয় না, তাহা হয় স্বপ্নদর্শন, না হয় মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রসূত। অতি উচ্চ অবস্থায় প্রেমিক ভক্তের অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, সাধারণ মানুষেরও অশ্রু পুলকাদি হয়, সেগুলি সত্ত্বের লক্ষণ নয়,—তার বিপরীতের লক্ষণ। এইসব দর্শনাদির কথা শুনিয়া সাধারণ লোকের মনে সাধনার জন্য একটা স্পৃহা জাগিতে পারে। এইমাত্র ইহার উপকারিতা। প্রথম অবস্থায় আবার এগুলির অপকারিতাও কম নয়। সাধকগণ এগুলিকেই সাধনার লক্ষ্য মনে করিয়া ইহাদের প্রতিই সমস্ত মনোযোগ প্রদান করেন। তবে গ্রন্থের শেষে একথাও আছে, 'কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু তাহারা এইখানেও স্থির হন না।'

চিঠিতে সাধনা ও উপলব্ধির কথা (১ম খণ্ড)—প্রকাশক খানিপুর দেবসঙ্ঘ, পলাশ, ঢাকা। মূল্য বার আনা।

এই পুস্তকখানার একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণত দেখা যায়, শিষ্যেরা নানা বিষয়ে উপদেশের জন্য গুরুকে পত্র দেন। উত্তরে গুরু অধিকারী ভেদে নানা উপদেশাদি দান করেন। শিষ্যেরা পরে সেগুলির যে সব অংশ পাঠ করিলে সাধারণের উপকার হইবে, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পুস্তক খানা অন্যরকম। গুরুর উপদেশে সাধনা আরম্ভ করিয়াই শিষ্যগণ অনেক অলৌকিক দর্শনাদি করিয়াছেন। তাঁহারা তাহা পত্র দ্বারা গুরুকে জানান। সেই চিঠি গুলিই উক্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ২১ জন শিষ্যের নানা অলৌকিক দর্শনাদির কথা আছে।

ব্রহ্মচারী নবীন, আমরা তাঁহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে অলৌকিক দর্শনাদি অপেক্ষা ত্যাগ, তপস্যা, আদর্শ জীবন যাপন, পবিত্রতা, প্রেম, সত্যানুরাগ, ঈশ্বর প্রেম প্রভৃতির কথাই বেশী শুনিতে পাইব, আশা করিতেছি।

রূপায়তন,—কবিতা পুস্তক, শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকে ২৮টী কবিতা আছে। সমস্ত কবিতাগুলি প্রায় একই ভাবের। আমরা এই তরুণ কবির উদ্যম প্রশংসা করি এবং তাঁহার নিকট হইতে শীঘ্রই আরো উচ্চ ভাবের ও মৌলিকতাপূর্ণ কবিতা পাইব আশা করিতেছি। দুইএকটি বর্ণাশুদ্ধি সত্ত্বেও পুস্তকখানার ছাপা ও সংস্করণ ভালই হইয়াছে।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, (শ্যামবাজার, কলিকাতা),—

কলিকাতা, শ্যামবাজার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩৪১ সনের বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তপস্বিনী শ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর ঐকান্তিক সাধনা এবং অক্লান্ত চেষ্টায় হিন্দু-নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত। বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৮০ জন। এখানে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি, চিত্রাঙ্কন, গৃহশিল্প, ধর্ম্মসঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত বোর্ডের উচ্চতর পরীক্ষা এবং হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থাও আশ্রমে আছে। আশ্রম হইতে একজন মহিলা বি, এ, পরীক্ষায় এবং বহু ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ব্যাকরণতীর্থা ও সাংখ্যতীর্থা উপাধিও কয়েকজন লাভ করিয়াছেন। আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ৪৬ জন। তন্মধ্যে ১৭ জনের ব্যয় অভিভাবকগণ বহন করেন, অবশিষ্ট সকলের ব্যয় আশ্রম হইতে দেওয়া হয়। আমরা বঙ্গের এই নারী-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি কামনা করি। আলোচ্যবর্ষে এই আশ্রমের মোট আয় ২৮০৭৪।১০ এবং মোট ব্যয় ৮০২৭॥৶৫ আনা।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির, (চন্দননগর),—চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরের ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী ১৯৩১ সনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। হুগলী জেলার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ইহাই একমাত্র ম্যাট্রিক স্কুল। বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা গতবর্ষে ছিল ১৬১, আলোচ্য বর্ষে ছাত্রীসংখ্যা বিবরণে উল্লেখ নাই। দুইজন ছাত্রী আলোচ্য বর্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইহার ছাত্রী নিবাসে ছাত্রীসংখ্যা মোট ৬ জন। অবৈতনিক পুরস্ত্রী বিভাগে ৯ জন ছাত্রী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও সাধারণ বিষয় ভিন্ন চিত্রাঙ্কন, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, সেলাই, গার্হস্থ্যনীতি, রোগী পরিচর্য্যা, রাষ্ট্রিকনীতি (civics) প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করি। এই শিক্ষা-মন্দিরের মোট আয় ১০,৮৬১৸৴১০ এবং মোট ব্যয় ৯০৬৯৶৫ আনা।

সঙ্ঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শাখাকেন্দ্র, বরিশাল,—আমরা বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শাখাকেন্দ্রের ১৯৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই কেন্দ্র পরিচালিত বিদ্যার্থীভবনে বর্ষশেষে ১৩ জন কলেজের ছাত্র আছে, ইহাদের মধ্যে ৬ জনের সম্পূর্ণ এবং ৫ জনের খরচ অংশতঃ মিশন হইতে দেওয়া হইয়াছে। গতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন পরীক্ষার্থী ছাত্রের মধ্যে ১ জন বি-এ, এবং ৩ জন আই-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। ছেলেদের অবসর সময়ে কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষাকে ধর্ম্ম, নীতি ও সংস্কৃতি শিক্ষাদ্বারা পূর্ণতা বিধান করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এ জন্য বিদ্যার্থী

স্থানে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা আছে। মিশনের গ্রন্থাগারে ৭১৪খানি পুস্তক ও ২০টি পত্রিকা আছে। আলোচ্য সনে ৪৩জন গরীব নিঃসহায় রোগীকে বিবিধ প্রকারে সেবা এবং ২০১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। এই মিশনের মোট আয় ৩৮৯৫।৶৩ এবং মোট ব্যয় ২৯৫৫।২ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদন, সালিখা (হাওড়া),—সালিখা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদনের ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ সনের কার্য্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সবা প্রতিষ্ঠানের অনাথ ভবনে আলোচ্য বর্ষে ৩ জন গরীব ছাত্রকে স্থান দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ খরচ বহন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে, ১ জন কলেজের ৪র্থ বার্ষিক, ১ জন ৩য় বার্ষিক, ১ জন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এবং ৬ জন সালিখা এম, ই, স্কুলে অধ্যয়ন করে। ১ জন ছাত্র ম্যাট্রিক্ পড়িয়া মোজার কলে কাজ করিতেছে, ১ জন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডার পরীক্ষায় পাশ করিয়া ব্যবসা চালাইতেছে এবং ১ জন প্রাইভেট পড়িয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। সেবাসদনের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় হইতে গড়ে রোজ ১১০ জন দরিদ্র রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে এবং মুষ্টিভিক্ষার চাউল দ্বারা অনেক দুস্থলোককে সাহায্য করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে আয় যথাক্রমে ১৩৩০।৶৭।।, ৩৭২৩।।১।। ও ২৭১০।৵১০ পাই এবং ব্যয় ১৫৭৬।৶৪।।, ৩৬১৬।৶১০।।, ১৯৪৬৷৵১০ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর),—চণ্ডীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সনের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই আশ্রমে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহাতে হোমিওপ্যাথিক ও য়্যালোপ্যাথিক মতে সমাগত রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ৩৫৪৮ ও ৩১৮৩ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১৮৫ ও ১৪৩০ জন রোগী নূতন। ৪৫ ও ৫৬ জনকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। পথক্লিষ্ট অসহায় রোগিগণকে এই আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা ও সেবা করা হয়। এইরূপ রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ৭ জন। ২৯৮ ও ৩০৫ জন অসমর্থ রোগীর বাটীতে গিয়া আশ্রম কর্ম্মিগণ চিকিৎসা করিয়াছেন। ৩৬০ ও ৩২৫ জন বিপন্ন পথিককে এই আশ্রম আশ্রয় ও আহার্য্য দিয়াছে। আশ্রম পরিচালিত "শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ বিদ্যালয়" নামক একটী উচ্চ প্রাথমিক অবৈতনিক স্কুলে ৭০ জন গরীব ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহার পুস্তকাগারে ৩৫০ খানি পুস্তক এবং কয়েকটী মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানের মোট আয় যথাক্রমে ৫৭৮।।৶১৭।। ও ৭৮৪।।৵১২।। এবং ব্যয় ৬৭০৶৫ ও ৯৭৭।।৵৭। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থে খরচ কুলান হইয়াছে।

আগামী ২রা মাঘ, পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মৃতি-গ্রন্থ,—ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডবল ক্রাউন সাইজের কাগজের ২০০০ পৃষ্ঠার বিশ্ব কোষাকৃতি একটি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থটী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এক খণ্ডে বৈদিক যুগের পূর্ব্ব হইতে ভারতের সংস্কৃতি ও তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইবে।

একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। বেদ ও উপনিষৎ, (২) [illegible] কাব্য, (৩) [illegible] ও জৈন ধর্ম্ম, (৪) দর্শন, (৫) স্মৃতি, তন্ত্র পুরাণ, (৬) ভক্তিধর্ম্ম, (৭) ব্রাহ্মধর্ম্ম, থিওজফি, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি (৮) জোরোয়াষ্টার সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম, সুফিবাদ প্রভৃতি, (৯) চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থপতিবিদ্যা, সঙ্গীত কলা, নৃত্যকলা প্রভৃতি, (১০) আয়ুর্ব্বেদ, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা, (১১) রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি, (১২) বৃহত্তর ভারত বিভাগ,—বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভারতীয় সংস্কৃতি কি ভাবে ক্রম বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থখানির অবশিষ্ট বিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, ভারত এবং বিশ্ব সংস্কৃতির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলী, রামকৃষ্ণ মিশনের উৎপত্তি ও বিস্তার এবং ইহার ভবিষ্যতের আভাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের খ্যাতনামা লেখকদের অধিকাংশই গ্রন্থখানির প্রকাশকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী,—গত ৭ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের উদ্যোগে কাশী অপারনাথজী মঠে (সংস্কৃত বিদ্যালয়) একটি সভার অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কর মঠ, রামকৃষ্ণ মঠ, টেকরা মঠ, গোবিন্দ মঠ, পাটমবাড়ী মঠ এবং অন্যান্য মঠ হইতে বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক মঠে স্থানীয় অবস্থা ও সঙ্ঘের উপযোগীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে, সভায় ইহা স্থিরীকৃত হয়।

কাশীর মহারাজা স্যর আদিত্যনারায়ণ সিং কে, সি, এস, আই বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটী গঠিত হইয়াছে। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা কুমার ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইহার সহ-সভাপতি এবং কাশীর সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি উহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরলোকে আচার্য্য সন্তদাস বাবাজী

গত ২২শে কার্ত্তিক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী মোহন্ত মহারাজ ৭৯ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি গার্হস্থ্য জীবনে তারা কিশোর চৌধুরী নামে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন। শ্রীহট্ট জেলায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমজীবনে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, পরে বৈরাগ্য উদয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কাঠিয়া বাবার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও গুরুর দেহত্যাগের পর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বৈষ্ণব সমাজে তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন এবং শিবপুরে তিনি দুইটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে আমাদের দেশের একজন উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষের অভাব হইল। আমরা তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।